১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

নিঃসঙ্গতার একশ বছর

অনুবাদ । জি এইচ হাবীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'Cien Anos de Soledad' (১৯৬৭) বা 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব্ সলিচিউড' (১৯৭০) বা 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর' (২০০০) একটি পরিবারের কাহিনী। এই 'বুয়েন্দিয়া' পরিবারেই একজনের নেতৃত্বে একদল দুঃসাহসী অভিযাত্রী দক্ষিণ আমেরিকার গহীন এক জঙ্গলে বসতি স্থাপন করে। সূত্রপাত ঘটে – প্রায় আক্ষরিক অর্থেই, এক মহাকাব্যিক জগতের; একই সঙ্গে নিয়তির আশীর্বাদপুষ্ট, অভিশাপলাঞ্ছিত আর খামখেয়ালীর শিকার একটি অসাধারণ বংশের; অভূতপূর্ব ঘটনা-দুর্ঘটনা পরম্পরার; আর সেই সঙ্গে অবশ্যই একটি অলোকসামান্য উপন্যাসের, প্রকাশের পর মুহূর্ত থেকেই যা পাঠকের মনোযোগ এবং ভালোবাসা অর্জন করে ক্লাসিকের পর্যায়ভূক্ত হয়ে গেছে। মূলত এই উপন্যাসটির জন্যেই ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন লেখক।

উপন্যাসটির অসংখ্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে রয়েছে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মতন অসাধারণ কৌতুহলী, উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন, দুঃসাহসী, ও বুদ্ধিমান চরিত্র, যে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়েই আবিষ্কার করে ফেলে যে পৃথিবী গোল; তার স্ত্রী, উরসুলা ইগুয়ারান নামের কর্মঠ, সর্বব্যাপিনী, সর্বংসহা, শতায়ু, নিঃসঙ্গ নারী, যাকে সারা জীবন তাড়া করে ফেরে তার বংশে শুয়োরের লেজবিশিষ্ট কারো জন্মের আশংকা; রয়েছে, পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুড়ে বেড়ানো, বিদগ্ধ, রহস্যময়, বেদে মেলকিয়াদেস; সুন্দরী রেমেদিওস নামের সৃষ্টিছাড়া সৌন্দর্যের অধিকারিণী এক অপার্থিব রমণী, যার প্রণয়পিপাসুরা একের পর এক বৃথাই আত্মাহুতি দিয়ে চলে তার রূপের অনলে, আর অবশেষে যে প্রকাশ্য দিবালোকে ধীরে ধীরে উর্ধাকাশে উঠে মিলিয়ে যায় অসীম শূন্যে; রয়েছে, কর্ণেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। বত্রিশটি সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করে সব কয়টাতেই হেরে গিয়েছিল সে, এড়িয়ে গিয়েছিলো তার প্রাণের ওপর চালানো চোদ্দটা হামলা, তিয়াত্তরটা অ্যামবুশ আর একটা ফায়ারিং স্কোয়াড। যুদ্ধের পর তাকে দেয়া আমরণ অবসর ভাতা ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে গিয়েছিল নিজের কামারশালায় বসে ছোট ছোট সোনার মাছ বানিয়ে। আর রয়েছে, এসব ঘটনা-দুর্ঘটনা, লৌকিক-অলৌকিকের কেন্দ্রবিন্দু মাকোন্দো নামের গ্রামটি, যে-গ্রামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের প্রায় সব পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৈধ-অবৈধ যৌন-জীবন; আর এসব এক অদ্ভুত উপায়ে মিলেমিশে গিয়ে যে-জগতের সৃষ্টি করেছে তা একদিকে যেমন পাঠকের কাছে রীতিমতন আশ্চর্য আর অদ্ভুত বলে মনে হয়, তেমনি আবার তা নিতান্ত পরিচিত বলেও ঠেকে; মনে হয়, এ-কাহিনী যেন মানবেতিহাসেরই এক সুনিপুণ পুনর্বয়ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

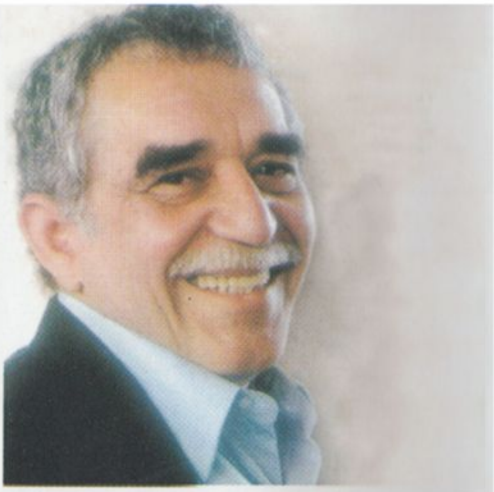

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের জন্ম ১৯২৮ সালে কলম্বিয়ার আরাকাতকায়। বোগোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়াশোনা শেষ করে কলম্বিয় সংবাদপত্র এল এক্সপেক্তাদর-এ প্রতিবেদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং উক্ত দৈনিকের পক্ষে বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে রোম, প্যারিস, বার্সেলোনা, কারাকাস ও নিউইয়র্কে কাজ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে নীল কুকুরের চোখ (১৯৪৭), পাতাঝড় (১৯৫৫), কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখেনা (১৯৫৮), অশুভ প্রহরে (১৯৬২), বড় মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (১৯৬২), নিঃসঙ্গতার একশ বছর (১৯৬৭), সরলা এরেন্দিরা ও অন্যান্য গল্প (১৯৭২), গোত্রপিতার হেমন্ত (১৯৭৫), মৃত্যুর কড়ানাড়া (১৯৮১), কলেরার সময় প্রেম (১৯৮৫), গোলকধাঁধায় সেনাপতি (১৯৮৯), বারো অভিযাত্রীর কাহিনী (১৯৯২), প্রেম ও অন্যান্য দানব (১৯৯৪), একটি অপহরণ সংবাদ (১৯৯৬) আমার স্মৃতির বিষাদ গণিকারা। নিঃসঙ্গতার একশ বছর উপন্যাসের জন্য ১৯৮২ সালে মার্কেস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বর্তমানে মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে বাস করছেন।

অনুবাদক : জি এইচ হাবীব-এর জন্ম ১৯৬৭ সালে, ঢাকায়। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে বি এ এবং এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। বছর দুয়েকের সাংবাদিকতার পর, পেশা হিসেবে বেছে নেন অধ্যাপনা। বর্তমান নিবাস, চট্টগ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের অস্তিত্ব না থাকলে এই উপন্যাস থেকেই তা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো।'

– ফ্রেড ডা'অগিয়ার, গার্ডিয়ান

'দক্ষিণ আমেরিকার এক সুদূর বসতি মাকোন্দো-র পত্তনকারী বুয়েন্দিয়া পরিবারের গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস রচিত সম্মোহক ইতিহাস ফ্যান্টাসি আর বাস্তবতার এক প্রাণবন্ত উপাখ্যান। ... প্রহসন আর উচ্চহাস্য তাঁর জগতের বিশেষ মেজাজটি গড়ে দিয়েছে। ... মার্কেস কে একজন কবিই বলা চলে প্রায়, একজন দ্রষ্টা, এক আলকিমিয়াবিদ। এক দুর্দান্ত শক্তিশালী কাজ, মোহনীয়, সংবর্তসংকুল এবং রূঢ়।'

– দ্য টাইম্‌স্ লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট

'তাঁর মাস্টারপীস এবং শতাব্দীর এক অনস্বীকার্য ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম।'

– ব্রায়ান মর্টন, দ্য টাইম্‌স্ এজুকেশনাল সাপ্লিমেন্ট

'বাস্তবতা আর ফ্যান্টাসি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে এ-উপন্যাসে : জঙ্গলে এসে ওঠা স্পেনদেশীয় এক জাহাজ, গেরিলা অভ্যুত্থান, কলা কম্পানির গণহত্যা, বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবির্ভাবের চাইতে বাস্তব এখানে উড়ুক্কু গালিচা, হলুদ ফুলের মেঘ, নারীর গর্ভে ইগুয়ানা। ... অভিজ্ঞতার বিচারে উপন্যাসটি প্রকাণ্ডভাবে, বিচিত্ররকমে, বোধাতীতভাবে সজীব।'

– গার্ডিয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

নিঃসঙ্গতার একশ বছর

অনুবাদ : জি এইচ হাবীব

গ্রেগরি রাবাসা-র ইংরেজি অনুবাদ থেকে

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের উৎসর্গ

আম্মা গুলনাহার হাবিব
আব্বা মো. হাবিবুর রহমান
এবং
এই অনুবাদ দুষ্কর্মটির কারণে যাদের প্রতি
দীর্ঘদিন মনোযোগ দিতে পারিনি
স্ত্রী নাজমুন্নাহার লাভলি
ও
পুত্র অনিন্দ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেশ প্রকাশিত অনুবাদকের অন্যান্য বই:

তাড়িখোর / আমোস টুটুওলা
অদৃশ্য নগর / ইতালো কালভিনো
দ্য সাইন অভ ফোর / স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
ফাউন্ডেশন / আইজাক আসিমভ
ফাউন্ডেশন এন্ড এম্পায়ার / আইজাক আসিমভ
সোফির জগৎ / ইয়স্তেন গার্ডার
এলেম আমি কোথা থেকে? / পিটার মাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমপঞ্জি

তারিখ	লেখকের জীবন	সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত	ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
১৯২৮	মার্চ ৬। গাব্রিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেস-এর জন্ম। নানার বাড়ি বসবাস।	ডি এইচ লরেন্স: *লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার* মিখাইল বুলগাকভ: *দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা* মেসিদোনিও ফার্নান্দেজ: *উই আর নট অলওয়েজ অ্যাওয়েক হোয়েন আওয়ার আইজ আর ওপেন*	ইরিগয়েন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। পেনিসিলিন আবিষ্কার।
১৯২৯		ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা: *জিপসি ব্যালাড্স* উইলিয়াম ফকনার: *দ্য সাউন্ড অ্যান্ড দ্য ফিউরি* আর্নেস্ট হেমিংওয়ে: *আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস* ওরতেগা ই গাসেৎ: *দ্য রেবেলিয়ন অভ্ দ্য মাসেস*	মেক্সিকান ন্যাশনাল রেভলিউশনারি পার্টি গঠিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ট্রটস্কি নির্বাসিত। যুক্তরাজ্যে ভুখা মিছিল। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে ধস।
১৯৩৩		পাবলো নেরুদা: *রেজিডেন্স অন আর্থ* এফ স্কট ফিট্জেরাল্ড: *টেন্ডার ইজ দ্য নাইট*	জার্মান রাইখস্ট্যাগ-এ সর্ববৃহৎ দল হিসেবে নাৎসিদের আবির্ভাব।
১৯৩৬		ভ্লাদিমির নাবোকভ: *ডেসপায়ার*	চিলিতে সামরিক শাসন জারি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৯ পর্যন্ত)। যুক্তরাজ্যে অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ সংক্রান্ত সংকট।
১৯৩৬-৪৬	কলম্বিয়ার পাহাড়ি এলাকার স্কুলে গমন।		
১৯৩৯		জেমস জয়েস: *ফিনেগানস ওয়েক*	জার্মানির চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড আক্রমণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	লেখকের জীবন	সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত	ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
১৯৪০		আদলফো বিওয় কাসারেস: *দি ইনভেনশন অভ্ মোরেল* গ্র্যাহাম গ্রীন: *দ্য পাওয়ার অ্যান্ড দ্য গ্লোরি* আর্নেস্ট হেমিংওয়ে: *ফর হুম দ্য বেল টোল্‌স*	জার্মানির প্যারিস দখল। চার্চিল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।
১৯৪১			জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ। কলম্বিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা। নরম্যান্ডিতে অবতরণ এবং প্যারিসের মুক্তি।
১৯৪৪		হোর্হে লুইস বোর্হেস: *ফিক্‌শনেস* (১ম সংস্করণ) জাঁ পল সার্ত্রে: *হুইস ক্লস*	
১৯৪৫		জাঁ পল সার্ত্রে: *দ্য রোডস টু ফ্রীডম* জর্জ অরওয়েল: *অ্যানিমেল ফার্ম*	জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ: হিটলারের আত্মহত্যা। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমাবর্ষণ। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা
১৯৪৬			পেরন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট।
১৯৪৭-৪৯	বোগোতায় আইন অধ্যয়ন। *এল এসপেক্তাদোর* পত্রিকায় লেখালেখি।		
১৯৪৮		জাঁ পল সার্ত্রে: *হোয়াট ইজ লিটরেচার?*	কলম্বিয়ায় গাইতান আততায়ীর হাতে নিহত: বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ: ১৯৫৩ পর্যন্ত প্রায় ২০০,০০০ লোকের মৃত্যু। আততায়ীর হাতে মহাত্মা গান্ধী নিহত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারীভাবে বর্ণবাদ গৃহীত। ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৯		হোর্হে লুইস বোর্হেস: *দি আলেফ* সিমন দ্য বুভ্যয়র: *দ্য সেকেন্ড সেক্স* অরওয়েল: *নাইনটিন এইটি ফোর*	ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা। হাঙ্গেরিতে কম্যুনিষ্ট শাসন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	লেখকের জীবন	সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত	ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
১৯৫০	সার্বক্ষণিক সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ।		কোরিয় যুদ্ধ (১৯৫৩ পর্যন্ত)
১৯৫৩		মার্টিন হাইডেগার: *বীয়িং অ্যান্ড টাইম* সল বেলো: *দি অ্যাডভেঞ্চার অভ্ অগি মার্চ*	জেনারেল পিনিলার নেতৃত্বে কলম্বিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান।
১৯৫৫	য়্যুরোপে কর্মগ্রহণ। তাঁর প্রথম নভেলা *লীফ স্টর্ম* কলম্বিয়ায় প্রকাশিত।	ভ্লাদিমির নাবোকভ: *লোলিতা*	
১৯৫৬	জেনারেল পিনিলা-র আদেশে *এল এসপেক্তাদোর*-এর প্রকাশনা বন্ধ। প্যারিসে অবস্থান, পূর্ব য়্যুরোপ ভ্রমণ। *নো ওয়ান রাইট্‌স টু দ্য কর্নেল* এবং *নাইনটি ডেজ বিহাইন্ড দি আয়রন কার্টেন* রচনা। পিনিলার পদত্যাগ এবং মার্কেস-এর কারাকাস প্রত্যাবর্তন। *মোমেন্টো* রচনা।	আলবেয়ার কামু: *দ্য ফল*	কলম্বিয়ায় পিনিলা আর উদারপন্থীদের 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সুয়েজ সংকট।
১৯৫৮	মার্সিডিজ বার্চার সঙ্গে পরিণয়। *বিগ মামা'জ ফিউনারেল* রচনা। বেশ কিছু সাময়িক পত্রে কর্মগ্রহণ।	বরিস পাস্টেরনাক: *ডক্টর জিভাগো* স্যামুয়েল বেকেট: *দি আন্‌নেমেবল* গুইসেপ তোমাসি ল্যাম্পেদুসা: *দ্য লেপার্ড* এডগার রাইস বারোজ: *নেকেড লাঞ্চ*	
১৯৫৯	বোগোতায় কিউবান প্রেস এজেন্সি স্থাপন।	গুন্টার গ্রাস: *দ্য টিন ড্রাম*	কিউবায় ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সরকার গঠন।
১৯৬০		হোহে লুইর্স বোর্হেস: *দ্য মেকার* চে গুয়েভারা: *গেরিলা ওয়ারফেয়ার* জন আপডাইক: *র‍্যাবিট, রান*	জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	লেখকের জীবন	সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত	ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
১৯৬১	বসবাসের জন্যে মেক্সিকো সিটি গমন। *নো ওয়ান রাইটস টু দ্য কর্নেল* প্রকাশিত।	জোসেফ হেলার: *ক্যাচ-২২* ভি এস নাইপল: *আ হাউস ফর মি: বিসওয়াস*	কিউবার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কচ্ছেদ; 'বে অভ্ পিগস'। বার্লিন ওয়াল নির্মাণ। প্রথম মানবসন্তান হিসেবে ইউরি গ্যাগারিন-এর মহাকাশ ভ্রমণ।
১৯৬২	কলম্বিয়ায় *ইন ঈভ্ল আওয়ার* পুরস্কৃত, তবে বইটির 'সংশোধিত সংস্করণ' মার্কেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান।	ভ্লাদিমির নাবোকভ: *পেইল ফায়ার* মারিও ভার্গাস ইয়োসা: *দ্য টাইম অভ্ দ্য হিরো* আলেকজান্ডার সোলঝেনেৎসিন: *ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অভ্ ইভান দেনিসোভিচ*	কিউবার মিসাইল সংকট।
১৯৬৩		হুলিও কর্তাসার: *হপকচ* প্রীমো লেভি: *দ্য ট্রুস*	জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ড।
১৯৬৫	*ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অভ্ সলিচিউড* রচনা শুরু।	ইতালো কালভিনো: *কসমিকোমিক্স* হ্যারল্ড পিন্টার: *দ্য হোমকামিং*	
১৯৬৬		রোলাঁ বার্থ: *ক্রিটিসিজম অ্যান্ড ট্রুথ* ভ্লাদিমির নাবোকভ: *স্পিক, মেমোরি*	'রেভলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অভ্ কলম্বিয়া'-র সৃষ্টি।
১৯৬৭	*ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অভ্ সলিচিউড* প্রকাশিত। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ। বার্সেলোনা গমন।	জ্যাক দেরিদা: *অভ্ গ্র্যামাটোলজি* প্রাইমো লেভি: *ন্যাচ্‌রল স্টোরিজ* কাবরেরা ইনফান্তে: *থ্রী ট্র্যাপ্‌ড টাইগার্স*	আরব দেশ সমূহ এবং ইজরায়েল-এর মধ্যে ছয় দিন স্থায়ী যুদ্ধ। প্রথম সফল হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট।
১৯৬৮		আলেকজান্ডার সোলঝেনেৎসিন: *ক্যান্সার ওয়ার্ড*	রাশিয়ার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ। মার্টিন লুথার কিং হত্যাকাণ্ড।
১৯৬৯		মারিয়ো ভার্গাস ইয়োসা: *কনভার্সেশন ইন দা কেথীড্রাল*	প্রথমবারের মতন মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ।
১৯৭২	*ইনোসেন্ট এরেন্দিরা* প্রকাশিত।	ইতালো কালভিনো: *ইনভিজিব্‌ল সিটিজ*	যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন ট্রীটি (সল্ট) স্বাক্ষর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	লেখকের জীবন	সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত	ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
৯	বামপন্থী পত্রিকা *অল্টারনেটিভা* প্রতিষ্ঠা।	আলেহো কার্পেন্তিয়ার: *রীজনস অভ্ স্টেট* সল বেলো: *হাম্বোল্টস গিফট*	ওয়াটারগেট কেলেংকারি। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদত্যাগ।
১৯৭৫	*অটাম অভ্ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক* প্রকাশিত।	হোর্হে লুইস বোর্হেস: *দ্য বুক অভ্ স্যান্ড* প্রীমো লেভি: *দ্য পীরিয়ডিক টেবল* কার্লোস ফুয়েন্তেস: *টেরা নস্ট্রা*	বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমান হত্যাকাণ্ড। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তি।
১৯৭৭	*অপারেশন কার্লোটা*, আফ্রিকার সঙ্গে কিউবার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত।	টনি মরিসন: *সং অভ্ সলোমন*	পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান।
১৯৭৮		প্রীমো লেভি: *দি রেঞ্চ*	
১৯৮০			এম ১৯ কর্তৃক কলম্বিয়ার ডমিনিকান রিপাবলিক-এর দূতাবাসে পণবন্দী আটক, সানদানিস্তাপন্থী শহুরে গেরিলা আন্দোলন।
১৯৮১	*ক্রনিকল অভ্ আ ডেথ ফোরটোল্ড* প্রকাশিত। ফরাসি পুরস্কার লীজেন অভ্ অনার-এ ভূষিত।	মারিয়ো ভার্গাস ইয়োসা: *দ্য ওয়ার অভ্ দ্য অ্যান্ড অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড* জন আপডাইক: *র‍্যাবিট ইজ রিচ* রুশদি: *মিডনাইট্স চিল্ড্রেন*	রোনাল্ড রিগান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড।
১৯৮২	নোবেল পুরস্কার লাভ। পি এ মেন্দোজার সঙ্গে কথোপকথন *দ্য ফ্রেইগ্রেন্স অভ্ গুয়াভা* প্রকাশিত। নিকারাগুয়া সংক্রান্ত গ্রন্থ *ভিভা সান্দিনো* রচনা।	ইসাবেল আলেন্দে: *দ্য হাউস অভ্ দ্য স্পিরিটস* প্রাইমো লেভি: *ইফ নট নাউ, হোয়েন?*	রক্ষণশীল বেতানকার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ব্রিটেন এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে ফকল্যান্ড যুদ্ধ।
১৯৮৪		ইসাবেল আলেন্দে: *অভ্ লাভ অ্যান্ড শ্যাডোজ*	প্রেসিডেন্ট বেতানকার এবং গেরিলা আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	লেখকের জীবন	সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত	ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
১৯৮৫	*লাভ ইন দ্য টাইম অভ্ কলেরা* প্রকাশিত।		কলম্বিয়ায় এফআরকে সহিংসতামূলক কার্যক্রম স্থগিত করে প্যাট্রিয়টিক যুনিয়ন পার্টিতে পরিণত: এম১৯ দলের যুদ্ধবিরতি মানতে অস্বীকার, বোগোতার এক আদালতে ৩০০ লোককে জিম্মি হিসেবে আটক।
১৯৮৬		প্রীমো লেভি: *দ্য ড্রাউনড্ অ্যান্ড দ্য সেভড*	
১৯৮৯	*দ্য জেনারেল ইন হিজ ল্যাবিরিন্থ* প্রকাশিত।		বার্লিন দেয়ালের পতন। চীনে তিয়েনআমেন স্কোয়ারে গণহত্যা। ডি ক্লার্ক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত।
১৯৯০		জন আপডাইক: *র‍্যাবিট অ্যাট রেস্ট*	সাতাশ বছর কারাবন্দি থাকার পর নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তিলাভ।
১৯৯১		বেন ওক্‌রি: *সংস অভ্ এনচান্টমেন্ট*	উপসাগরীয় যুদ্ধ; ভারতে রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ড।
১৯৯২	*স্ট্রেঞ্জ পিলগ্রিমস* প্রকাশিত।	মাইকেল ওনদাৎজে: *দি ইংলিশ পেশেন্ট*	সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় গৃহযুদ্ধ।
১৯৯৪	*অভ্ লাভ অ্যান্ড আদার ডীমনস* প্রকাশিত।		দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচনে ম্যান্ডেলা এবং এএনসি বিজয়ী। রোয়ান্ডায় গণহত্যা।
১৯৯৬	*নিউজ অভ্ আ কিডন্যাপিং* প্রকাশিত		

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুসরণ করে শব্দের বামে এ-কার বোঝাতে 'ে', এবং 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝাতে 'ে' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

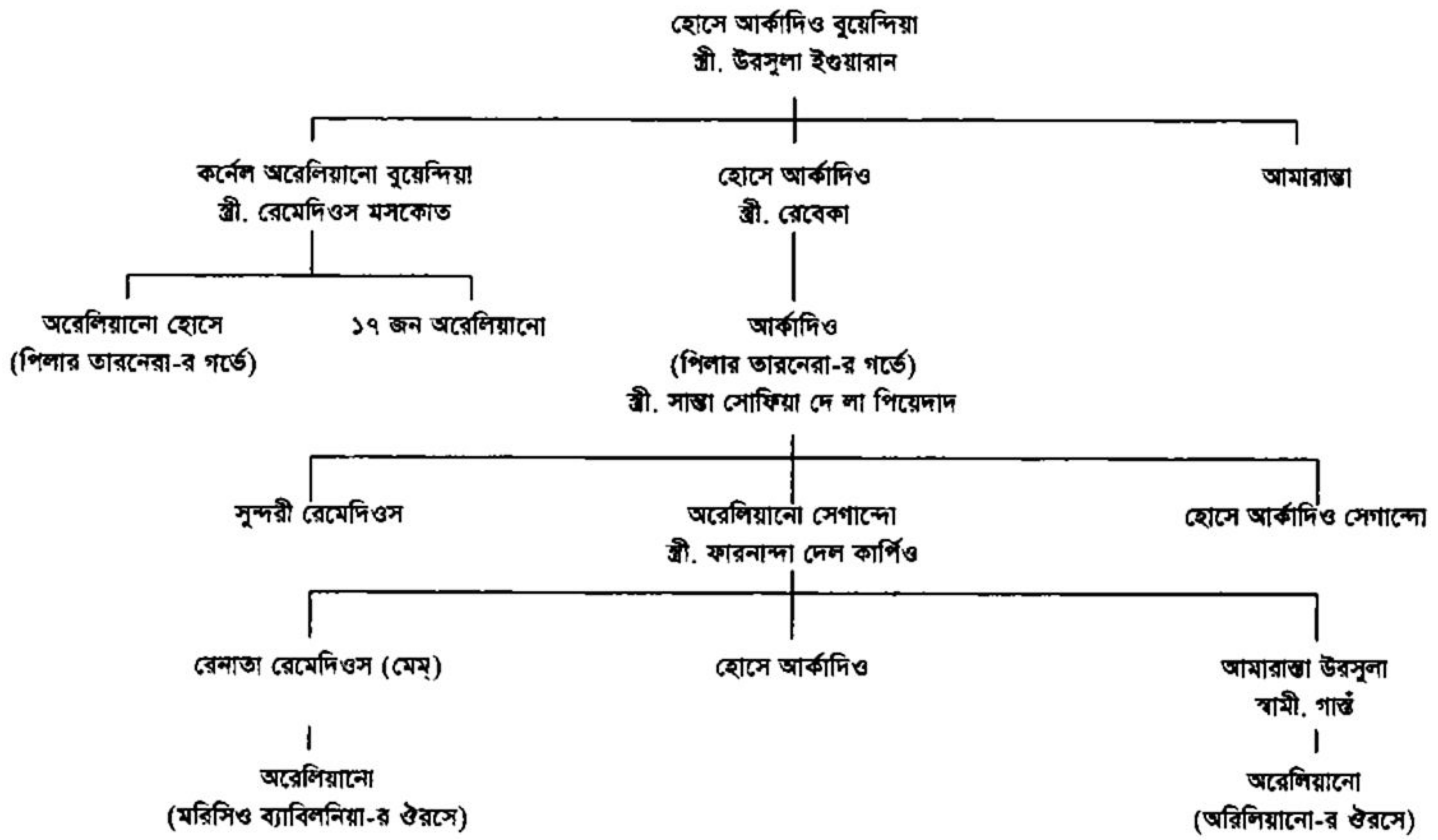

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু বছর পর, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মনে পড়ে যাবে সেই দূর বিকেলের কথা, যেদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে বরফ আবিষ্কার করেছিল তার বাবা। প্রাগৈতিহাসিককালের ডিমের মতো সাদা, প্রকাণ্ড আর মসৃণ সব পাথরের একটা প্রান্তরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাকচক্ষু জলের এক নদী, তারই তীরে রোদে শুকানো ইটের তৈরি কুড়িটি বাড়ির এক গ্রাম তখন মাকোন্দো। জগৎ এমনই আনকোরা যে মেলা জিনিসেরই নেই কোনো নাম, ওগুলো দেখাতে হলে আঙুল তাক করে বুঝিয়ে দিতে হয়। ফি-বছর, মার্চ মাসে, টুটাফাটা জামা-কাপড় পরা, উস্কোখুস্কো চেহারার এক দল জিপসি এসে তাঁবু খাটায় গ্রামের কাছে, বাঁশী আর খোল-করতালের তুমুল হল্লা তুলে দেখিয়ে বেড়ায় নিত্য-নতুন যতো আবিষ্কার। প্রথমবার আনে তারা চুম্বক। মেলকিয়াদেস বলে নিজের পরিচয় দিয়ে, বেয়াড়ারকমের দাড়ি-গোঁফ আর সরু লিকলিকে হাতের এক দশাসই জিপসি শুরু করে, তার নিজের ভাষায়, মেসিদোনিয়ার বুজুর্গ আলকিমিয়াবিদদের অষ্টমাশ্চর্যের এক গণপ্রদর্শনী। ধাতব দুই পিণ্ড টক্কর টানতে বাড়ি বাড়ি যায় লোকটা, আর তাজ্জব হয়ে সবাই দেখে গামলা, কড়াই, আংটা আর কাঁসারিগুলো সব যার যার জায়গা থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে, আর বেরিয়ে আসার চেষ্টায় থাকা ইস্ক্রু-পেরেকের হতাশায় কড়িকাঠ উঠছে ক্যাচকেচিয়ে, এমনকি বহু দিন আগে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া জিনিসগুলো পর্যন্ত যেখানে সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছিল তাদের ঠিক সেখান থেকেই বেরিয়ে এসে মেলকিয়াদেসের জাদুর লোহার পেছন পেছন ছুটছে তুলকালাম ডামাডোল সৃষ্টি করে। কর্কশ গলায় জিপসি ঘোষণা করে, 'সব জিনিসেরই আলাদা আলাদা প্রাণ আছে। এ-হচ্ছে স্রেফ ওগুলোর আত্মাকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপার।' যার লাগামছাড়া কল্পনার কাছে সবসময়ই হার মেনে যেতো প্রকৃতির খামখেয়াল, এমনকি হার মেনে যেতো অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার আর ভেলকিবাজি, সেই হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাছে মনে হয়, অকেজো এই আবিষ্কারটা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর পেটের ভেতর থেকে সোনাদানা টেনে আনা যেতে পারে। মেলকিয়াদেস ভালোমানুষ, সে তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়: 'এ-জিনিস দিয়ে ও-কাজ হবে না।' কিন্তু জিপসিদের ভালোমানুষীতে সে-সময় বিশ্বাস জন্মেনি হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার, কাজেই নিজের খচ্চর আর এক জোড়া ছাগের বদলে চুম্বকে পিণ্ডদুটো কিনে নেয় সে। ওদের সামান্য গেরস্থালি সয়-সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে ঐ জন্তু দুটোর ওপরই ভরসা তার বৌ উরসুলা ইগুয়ারান-এর, তাকে সে ফেরাতে পারে না। তার স্বামী তাকে বলে, 'শিগ্‌গিরই আমাদের এতো সোনাদানা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে যে সারা বাড়ির মেঝে মুড়েও বেশি থেকে যাবে।' বেশ ক'মাস বেদম খাটে সে তার ধারণার সারবত্তা প্রমাণ করার জন্যে। এলাকার ইঞ্চি ইঞ্চি জায়গা, এমনকি নদীর তলাটাও চষে ফেলে লোহার পিণ্ড দুটো টানতে টানতে আর জোরে জোরে মেলকিয়াদেসের জাদুমন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে। তাতে সে কামিয়াব হয় কুল্লে মাত্র একটা কাজে—মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে বের করে আনে পঞ্চদশ শতকের একটা বর্ম, সেটার অংশে অংশে মরিচার জোড়া, আর ভেতরে, পাথর-ভর্তি এক বিরাট লাউয়ের খোলের ফাঁপা অনুরণন। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার অভিযানের চার সঙ্গী যখন বর্মটা খুলে ফেলতে সফল হয়, ভেতরে পায় তারা গলায় তামার লকেট পেঁচানো একটা চুন-হয়ে-যাওয়া কংকাল, আর সেই লকেটের ভেতরে পাওয়া যায় এক রমণীর চুল।

মার্চ মাসে ফিরে আসে জিপসিরা। এবার এনেছে তারা একটা দূরবীণ আর ঢাকের মতো দেখতে একটা আতশকাচ, আমস্টার্ডামের ইহুদিদের সর্বশেষ আবিষ্কার হিসেবে সেগুলো দেখায় তারা। এক জিপসি রমণীকে রাখে গাঁয়ের এক মাথায়, আর দূরবীণটাকে বসায় তাঁবুতে ঢোকার মুখে। পাঁচ রিয়েল দর্শনীর বিনিময়ে দূরবীণে চোখ রেখে লোকজন দেখতে পায় সেই জিপসি রমণীকে, মোটে এক হাত তফাতে। মেলকিয়াদেস ঘোষণা করে, 'বিজ্ঞান দূরত্বকে নিকেশ করে দিয়েছে। শিগ্‌গিরই লোকে ঘর থেকে এক পা না-নড়েও দেখতে পাবে দুনিয়ার সব জায়গায় কী হচ্ছে না হচ্ছে।' এক তাতানো দুপুরের রোদে জিপসিরা আতশকাচটা দিয়ে দেখানো হয় এক তাজ্জব ঘটনা: রাস্তার মধ্যিখানে রাখে তারা একগাদা শুকনো খড়, তারপর সূর্যরশ্মি একবিন্দুতে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। চুম্বকের ব্যর্থতার জ্বালা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মনে তখনো রয়ে গেলেও, এই আবিষ্কারটাকে যুদ্ধের একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাবার বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। ফের তাকে বলে কয়ে থামানোর চেষ্টা করে মেলকিয়াদেস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আতশকাচের বদলে সেই চুম্বকে পিণ্ডদুটো আর তিনটে উপনিবেশিক স্বর্ণমুদ্রা নিতেই হয় তাকে। মনের কষ্টে কেঁদে ফেলে উরসুলা। এক বঞ্চিত জীবনের গোটা সময় ধরে তার বাবা একটা সিন্দুকে যে-ক'টা স্বর্ণমুদ্রা জমিয়েছিল, সেখানকার টাকা এটা, আর এগুলো সে লুকিয়ে রেখেছিল তার বিছানার নিচে, সে-রকম দরকারি কোনো সময়ে কাজে লাগানোর জন্যে। রীতিমতো বৈজ্ঞানিকের আত্মনিবেদনে, এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার রণকৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পুরোপুরি ডুবে থাকা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া কোনো চেষ্টাই করে না উরসুলাকে সান্ত্বনা দেবার। শত্রুসৈন্যের ওপর কাচটা কীরকম কাজ করে তাই দেখাবার জন্য একবিন্দুতে আনা সূর্যরশ্মি নিজের শরীরে ফেলে গা পুড়িয়ে ফেলে সে, আর তা থেকে এমন-ই ঘা হয় যে সেটা সারতে লেগে যায় বহু দিন। এমন ভয়ংকর এক আবিষ্কার দেখে সন্ত্রস্ত তার বৌ-এর চেঁচামেচিতে এক পর্যায়ে তো সে বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দেয় আর কি। তার অভিনব অস্ত্রের কৌশলগত সম্ভাবনার হিসেব-নিকেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে সে তার ঘরের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সফল হয় নির্দেশনাগত স্বচ্ছতার একটা তাক-লাগানো ম্যানুয়াল আর দৃঢ়তার এক দুর্দম শক্তিকে এক সঙ্গে জুড়ে দিতে। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বেশুমার বর্ণনা আর ব্যাখ্যামূলক অগুনতি নকশাসহ সেটা সে পাঠিয়ে দেয় সরকারের কাছে, এক বাহকের হাতে, সে-লোকটা পাহাড় ডিঙোয়, জলাভূমিতে বেপথু হয়, পায়ে হেঁটে পেরোয় খরস্রোতা নদী, তারপর হতাশা, প্লেগ আর বুনো জন্তু-জানোয়ারের উৎপাতে চলেই যেতে বসে খরচের খাতায়, যদিও শেষতক বেঁচে যায় ডাক-বওয়া খচ্চরগুলোর পথের সঙ্গে গিয়ে মেশা পথটা পেয়ে। রাজধানী শহর পর্যন্ত যাওয়া সে-সময়ে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি হলেও হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া দিব্যি করে বসে যে, সরকারি হুকুম পেলে সে সেই সফরেই নেমে পড়তে রাজি, যাতে করে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তার আবিষ্কারটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে পারে সে, আর সৌরযুদ্ধের জটিল বিদ্যায় ওদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে সে নিজেই। জবাবের আশায় বসে থাকে সে বহু বছর। শেষে, পথ চেয়ে থেকে থেকে হদ্দ হয়ে গিয়ে, করুণ গলায় মেলকিয়াদেসকে জানায় তার প্রকল্পের ব্যর্থতার কথা, আর তখনই সেই জিপসি এক মোক্ষম প্রমাণ দেয় তার ভালোমানুষীর: আতশকাচটার বদলে সে ফিরিয়ে দেয় সেই পিণ্ড দুটো, সেই সঙ্গে দেয় কয়েকটা পর্তুগীজ মানচিত্র আর নৌ-বিদ্যার বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। নিজের হাতে সাধু হেরমানের পরীক্ষার একটা সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেছিল মেলকিয়াদেস, সেটাও সে দিয়ে দেয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে, যাতে অ্যাস্ট্রোলেব, কম্পাস আর সেক্সটান্টটাকে কাজে লাগাতে পারে সে। বাড়ির কোনায় ছোট্ট যে একটা ঘর বানিয়েছিল সে, সেইখানে কাটিয়ে দেয় বর্ষা মরসুমের লম্বা মাসগুলো, যাতে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কেউ কোনো বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। ঘর-গেরস্থালির সমস্ত দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে রাতের গোটা সময় কাটাতে থাকে বাড়ির আঙিনায় তারাদের গতিবিধি দেখে দেখে; আর দুপুর নির্ণয় করার ঠিক-ঠিক পদ্ধতি বের করার চেষ্টায় আরেকটু হলেই সর্দি-গর্মি বেঁধে যাওয়ার দশা হয় তার। যন্ত্রগুলোর ব্যবহার আর উপযোগিতা সম্পর্কে ওস্তাদ বনে যাবার পর স্থানের ব্যাপারে তার এমন একটা ধারণা জন্মে যায় যে নিজের ঘর না ছেড়েই অচেনা সাগরে পথ চিনে চলার, জন-মনুষ্যহীন রাজ্যে বেড়িয়ে আসার, আর চমৎকার সব প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোর ক্ষমতা পেয়ে যায় সে। ঠিক এই সময়টাতেই আপনমনে কথা বলার আর কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাড়িময় হেঁটে বেড়াবার অভ্যেসটা জন্মায় তার মধ্যে, ওদিকে উরসুলা আর বাচ্চারা তখন বাগানে গাধার খাটুনী খেটে কলা আর ক্যালাডিয়াম, কাসাভা আর মিঠে আলু, আহুয়ামার শিকড় আর বেগুন ফলাচ্ছে। হঠাৎ করে, কোনোরকম জানান না দিয়েই, তার নেশাগ্রস্ত কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটে, আর সেখানে এসে ভর করে এক ধরনের মোহমুগ্ধতা। নিজেরই বোধ-বুদ্ধির বাইরের ভয়ংকর কিছু ধারণার এক ছড়া মালা নরম গলায় আপনমনে জপতে জপতে ভূতগ্রস্তের মতো বেশ কিছু দিন কাটে তার। শেষে, ডিসেম্বরের এক মঙ্গলবার, দুপুরের খাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়, আচমকা ঝেড়ে ফেলে সে তার জ্বালা-যন্ত্রণার পুরো ভার। বাচ্চারা তাদের বাকি জীবনভর মনে রাখবে কী মহান গাম্ভীর্য নিয়ে, দীর্ঘদিনের রাত-জাগা আর তার কল্পনার চণ্ডপনায় বিধ্বস্ত তাদের বাবা ঘোষণা করে তাদের কাছে নিজের আবিষ্কারের কথা:

'পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল।'

এইবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় উরসুলার। সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'পাগল হতে চাও তো দয়া করে একাই হও! কিন্তু জিপসিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া তোমার ঐ আজগুবি চিন্তাগুলো বাচ্চাদের মাথায় ঢুকিও না।' ততক্ষণে সে মেঝেতে আছড়ে ভেঙে ফেলেছে তার স্বামীর অ্যাস্ট্রোলেবটা, কিন্তু নির্বিকার হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তার বৌ-এর উত্তেজনাতে ভড়কাবার পাত্র নয়। সে আরেকটা তৈরি করে ফেলে, গ্রামের লোকগুলোকে ডেকে আনে তার ছোট্ট কামরায়, আর তারপর, যেসব তত্ত্বের মাথামুণ্ডু কিছুই তাদের মাথায় ঢোকে না তাই দিয়ে সে তাদের দেখিয়ে দেয় পুব দিক বরাবর একটানা জাহাজ চালিয়ে গেলে যাত্রাস্থানেই ফিরে আসার সম্ভাবনাটা। সারা গাঁয়ের লোকজন যখন নিশ্চিত, মাথা বিগড়ে গেছে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার, ঠিক তখনই ব্যাপারটার হাল ধরতে ফিরে আসে মেলকিয়াদেস। যে-লোকটা তার নিখাদ জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত ধারণা থেকেই এমন এক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে যা কিনা এরি মধ্যে বাস্তবে প্রমাণিত, যদিও মাকোন্দোতে তখনও অজানা, তার জ্ঞান-গম্যির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সে সবার সামনেই, আর তারপর মেলকিয়াদেস তার মুগ্ধতার প্রমাণ হিসেবে উপহার দেয় তাকে আলকিমিয়াবিদদের পরীক্ষাগার, পরে যার বিশাল প্রভাব পড়বে সেই গ্রামের ভবিষ্যতের ওপর।

আশ্চর্য গতিতে বুড়িয়ে গেছে তখন মেলকিয়াদেস। গোড়ার দিককার সফরগুলোয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ারই সমান বয়েসী বলে মনে হয়েছে তাকে। কিন্তু ঘোড়ার কান পাকড়ে সেটাকে ধরাশায়ী করে ফেলার অসাধারণ তাকৎ পরের জনের তখনো রয়ে গেলেও, জিপসি লোকটা যেন কোনো নাছোড় ব্যারামে পড়ে রোগাশোকা হয়ে গেছে। আসলে সেটা জগৎজোড়া তার অগুনতি সফরের সময় বাঁধানো অজস্র আর বিরল সব রোগ-বালাইয়ের ফল। পরীক্ষাগারটা দাঁড় করানোর কাজে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে হাত লাগাতে লাগাতে তাকে সে যা বলে তা হচ্ছে, একেবারে গা শুঁকতে শুঁকতে সবখানেই মরণ পিছু নিয়েছিল তার, কিন্তু থাবার শেষ ছোবলটা বসানোর ব্যাপারে কখনোই সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি। মানবজাতিকে এ-পর্যন্ত যত সব দুর্যোগ আর দুর্ঘটনা চাবকানি দিয়েছে তার প্রত্যেকটার ফাঁদ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে সে। পারস্যদেশে উৎরে গিয়েছিল সে পেলাগ্রা রোগ থেকে, মালয় দ্বীপপুঞ্জে স্কার্ভি, আলেকজান্দ্রিয়ায় কুষ্ঠ, জাপানে বেরিবেরি, মাদাগাস্কারে প্লেগ, সিসিলিতে ভূমিকম্প, আর ম্যাগিলান প্রণালীতে এক বিধ্বংসী জাহাজডুবি। আশ্চর্য সেই লোকটা—নস্ত্রাদামুসের রহস্যের উত্তর যার নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নখদর্পণে—এক রাশভারি মানুষ, বিষণ্ণতার এক জ্যোতির্বলয়ে ঢাকা; চেহারাটা এশীয়, দেখে মনে হয় ঘটনার পেছনের ঘটনাগুলো তার দিব্যি জানা। বিপুলবিস্তৃত পাখনাঅলা দাঁড়কাকের মতো দেখতে পেল্লায় একটা কালো টুপি আর অযুত শতাব্দীর আঁকিবুকিকাটা একটা মখমলের গেঞ্জি পরে থাকে সে। তবে তার অগাধ প্রজ্ঞা আর রহস্যময় বিস্তৃতি সত্ত্বেও, মানবিক এক বোঝা, একটা পার্থিব দশা চেপে বসে থাকে তার ওপর, যা তাকে জড়িয়ে রাখে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সমস্যার ভেতর। তার বুড়োবয়েসের রোগবালাই নিয়ে অনর্গল বকে যেতো সে, ভুগতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ অর্থকষ্টে, আর স্কার্ভির কারণে দাঁতগুলো পড়ে যাওয়ায় হাসা বন্ধ করে দিয়েছিল সে অনেক আগেই। সেই দমফাঁসলাগা দুপুরবেলা জিপসি যখন তার গুহ্যকথা সব বলে যাচ্ছে, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া নিশ্চিত বুঝে যায় এ হচ্ছে এক মহান দোস্তির শুরু। বাচ্চাকাচ্চাদের তাক লেগে যায় লোকটার আজগুবি গল্প-কাহিনী শুনে। তার বয়স তখন পাঁচের বেশী হবে না, অরেলিয়ানো তার বাকি জিন্দেগীভর মনে রাখবে সেই বিকেলে সে যে দেখেছিল লোকটাকে—জানলা থেকে আসা ধাতব আর কাঁপাকাঁপা আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে লোকটা, তার গভীর মন্দ্র স্বর আলোয় আলোয় ভরে ফেলছে কল্পনার সবচেয়ে আবলুস-কালো এলাকাগুলোকেও, ওদিকে তার কপালের দু'পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গরমে গলে যাওয়া তেল। অরেলিয়ানোর বড় ভাই হোসে আর্কাদিও সেই নিদারুণ প্রতিমূর্তিকে এক বংশানুক্রমিক স্মৃতি হিসেবে তুলে দিয়ে যাবে তার সমস্ত উত্তরপুরুষের হাতে। অন্যদিকে, লোকটার সেবারের সফরের একটা মন্দ স্মৃতি রয়ে যায় উরসুলার মনে, কারণ, বেখেয়ালে পারদের বাইক্লোরাইডভরা একটা ফ্লাস্ক সবেমাত্র ভেঙে ফেলেছে মেলকিয়াদেস, এমন সময় ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে।

'এতো ইবলিসের গন্ধ,' উরসুলা বলে ওঠে।

'মোটেই না,' তাকে শুধরে দেয় মেলকিয়াদেস। 'ইবলিসের মধ্যে যে গন্ধকের গুণাগুণ আছে সেকথা প্রমাণ হয়ে গেছে, অথচ এ-হচ্ছে স্রেফ একটা সামান্য ক্ষয়কারী অধঃক্ষেপ।'

সার্বক্ষণিক নীতিবাগীশ মেলকিয়াদেস তখন হিংগুলের নারকীয় গুণাগুণ নিয়ে একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ফেঁদে বসে, কিন্তু তাকে কোনো আমলই দেয় না উরসুলা, যদিও বাচ্চাদের সে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় প্রার্থনায় বসাবার জন্যে। কড়া সেই গন্ধটা মেলকিয়াদেসের স্মৃতির সঙ্গে এক হয়ে সারা জীবনের জন্যে গেঁথে থাকবে তার মনে।

বাসন-পত্র, ফানেল, বকযন্ত্র, ফিল্টার আর ঝাঁঝরির ছড়াছড়ি ছাড়াও সদ্য তৈরি সেই পরীক্ষাগারে রয়েছে আদিম এক পানির পাইপ, লম্বা, সরু গলাঅলা একটা কাচের বিকার, পরশপাথরের একটা নকল, আর ইহুদি মেরির তে-হাতা বকযন্ত্রের নব্য-সংস্করণ মোতাবেক জিপসিদের নিজ হাতে তৈরি একটা পাতনযন্ত্র। এসবের সঙ্গে মেলকিয়াদেস রেখে যায় সাত গ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতটা ধাতু, মুসা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোসিমাসের সূত্র, যা দিয়ে সোনার পরিমাণ দ্বিগুণ করা যায়, আর 'মহতী শিক্ষার' পদ্ধতি সংক্রান্ত টীকা-নকশা, যেসবের অর্থোদ্ধার করা গেলে পরশপাথর তৈরি করা সম্ভব হবে। সোনার পরিমাণ দ্বিগুণ করার সূত্রগুলো সহজ দেখে তাতে প্রলুব্ধ হয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া হপ্তা কয়েক উরসুলার কাছে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে যাতে সে তার উপনিবেশিক মোহরগুলো বের করে তার হাতে তুলে দেয় আর তখন সেগুলোকে সে বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারে। বরাবরের মতো এবারো উরসুলা হার মানে তার স্বামীর তেড়িয়া জেদের কাছে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তখন তিনটে সোনার মোহর একটা কড়াইতে ফেলে তামার টুকরো, হরিতাল, গন্ধক আর সীসের সঙ্গে গলায় সেগুলোকে। তারপর সবটা নিয়ে রেড়ির তেলের এক পাত্রে রেখে ফুটাতে ফুটাতে পেয়ে যায় ঘন থিকথিকে একটা বিশ্রী রস, দেখতে সেটা যতটা না বহুমূল্য সোনার মতো তার চেয়ে ঢের বেশি মামুলি মিঠাইয়ের মতো। পাতনের ঝুঁকিবহুল আর বেপরোয়া পদ্ধতির কারণে, গ্রহবিজড়িত ধাতুর সঙ্গে গলে, নিস্পৃহ পারদ আর সাইপ্রাসের গন্ধকাম্লের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর মুলোর তেলের অভাবে শুয়োরের তেলে ফের রান্না হওয়ার জন্যে চুলোয় চড়াতে উরসুলার মহামূল্যবান উত্তরাধিকার পরিণত হয় দস্তুরমতো সিদ্ধ-হওয়া, শুয়োরের মচমচে চামড়ার একটা বড়সড় টুকরোতে, শক্তভাবে সেঁটে থাকে সেটা পাত্রটার তলায়।

জিপসিরা যখন ফিরে আসে, উরসুলার কল্যাণে গ্রামের তাবৎ লোক তখন তাদের বিরুদ্ধে চটে আছে। কিন্তু দেখা যায় ভয়ের চেয়ে কৌতূহলেরই শক্তি বেশি, কারণ জিপসিরা সে-সময়ে রাজ্যের সব বাদ্যযন্ত্র দিয়ে এক কান ফাটানো আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়াতে থাকে শহরময় আর এক ফেরিঅলা ঘোষণা দিয়ে চলে নাসিয়ানসেনদের সবচেয়ে আজব আবিষ্কারের প্রদর্শনীর কথা। কাজেই সবাই গিয়ে হাজির হয় তাঁবুতে, আর এক সেন্ট দর্শনীর বিনিময়ে দেখতে পায় রোগ থেকে সেরে ওঠা, বলিরেখা ছাড়া, নতুন ঝকঝকে একপ্রস্থ দাঁতসহ জোয়ান এক মেলকিয়াদেসকে। তার স্কার্ভিতে ক্ষয়ে যাওয়া মাড়ি, তার তোবড়ানো গাল আর তার চিমসানো ঠোঁটের কথা যাদের স্মরণে ছিল, ভয়ে-তরাসে কাঁপুনি লেগে যায় তাদের জিপসি লোকটার অলৌকিক হিকমতের মোক্ষম প্রমাণ দেখে। ভয়টা তীব্র আতংকের চেহারা নেয় তখন যখন মেলকিয়াদেস তার অক্ষত, মাড়িবন্দি দাঁতগুলো বের করে এনে দর্শকদের দেখায় মুহূর্তের জন্যে—চকিত সেই মুহূর্তটা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বছর কয়েক আগের সেই থুরথুরে লোকটায়—তারপর সেটা পরে নেয় আবার আর তার ফিরে পাওয়া যৌবনের পুরো কর্তৃত্ব নিয়ে মুচকি হাসে আরেকবার। এমনকি খোদ হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাছে পর্যন্ত মনে হয় যে মেলকিয়াদেসের বোধ-বুদ্ধি অসহ্য রকমের চরমে পৌঁছে গেছে। কিন্তু জিপসি লোকটা যখন কেবল তার কাছেই তার নকল দাঁতের জারিজুরির কথা খুলে বলে, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ে সে। ব্যাপারটা তার কাছে একই সঙ্গে এতোই সাদামাটা আর তাজ্জব বলে মনে হয় যে আলকিমিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় উৎসাহ রাতারাতি উবে যায় তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনমেজাজ বিগড়ে গিয়ে আরেক নতুন সংকট পেয়ে বসে তাকে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায় অনিয়মিত, সারাদিন হেঁটে বেড়াতে থাকে বাড়িময়। 'সৃষ্টিছাড়া সব কাণ্ড ঘটছে দুনিয়াতে,' উরসুলাকে বলে সে। 'নদীর ঠিক ওপারেই যত জাদুকরী যন্ত্রপাতির আখড়া, অথচ এখানে গাধার মতো দিন কাটাচ্ছি আমরা।' মাকোন্দোর পত্তনের পর থেকে তাকে যারা চিনতো, তারা সবাই অবাক বনে যায় মেলকিয়াদেসের প্রভাবে সে কতটা বদলে গেছে তাই দেখে।

গোড়ার দিকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ছিল এক তেজী, মোড়ল কিসিমের মানুষ, চাষবাসের খবরদারি করতো, কাচ্চাবাচ্চা আর জীব-জন্তু লালনপালনের ব্যাপারে উপদেশ-পরামর্শ দিতো লোকজনকে, আর গোত্রের ভালোর জন্যে সাহায্য-সহযোগিতা করতো সবাইকে, এমনকি গায়ে-গতরে খাটুনির কাজেও। তার বাড়িটা যেহেতু গোড়া থেকেই ছিল গ্রামের সেরা, বাকিগুলো গড়া হয়েছিল সেটারই আদলে, সেটারই মতো করে। ছোট্ট, বেশ আলো খেলানো একটা বৈঠকখানা, উজ্জ্বল রঙের ফুলঅলা, চাতালের মতো দেখতে একটা খাওয়ার ঘর, দুটো শোবার ঘর, বিশাল এক চেস্টনাট গাছসহ একটা উঠোন, নিয়মিত দেখাশোনা করা একটা বাগান, মিলেমিশে থাকা ছাগল, শুয়োর আর মুরগির একটা খোঁয়াড়, এই নিয়ে বাড়িটা। তবে শুধু তার বাড়িতেই নয়, গোটা বসতিতেই একটা প্রাণী ঢুকতে পারতো না, আর সেটা হল লড়িয়ে মোরগ।

উরসুলার খাটাখাটনির ক্ষমতা তার স্বামীরই মতো। সারা জীবন যাকে কেউ কখনো গান গাইতে দেখেনি, সেই কঠিন স্নায়ুর চটপটে, ছোটখাটো, অতি-হিসেবী মহিলা তার শক্ত, মাড়-দেয়া পেটিকোটের নরম খসখসানি নিয়ে যেন সবখানেই হাজির থাকতো, ভোর থেকে শুরু করে মেলা রাত পর্যন্ত। তার বদৌলতেই হাল্কা দুরমুস করা মাটির মেঝে, চুনকাম না-করা কাদার দেয়াল, তাদের নিজেদের তৈরি গেঁয়ো, কাঠের আসবাবপত্তর অষ্টপ্রহর ঝকঝকে তকতকে থাকতো, আর যেখানে ওরা ওদের কাপড়চোপড় রাখতো, সেই পুরনো সিন্দুক থেকে ভুরভুর করে বেরতো তুলসি পাতার গরম সুবাস।

হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মতো উদ্যমী লোক গাঁয়ে কখনো দেখা যায়নি; বাড়িগুলোকে সে এমনভাবে বসিয়েছিল যাতে যে-কোনো বাড়ি থেকেই নদী থেকে পানি আনা যেতো. সমান খাটনিতে, আর রাস্তাগুলোকে এমনই চমৎকার বোধবুদ্ধি খাটিয়ে সারিবন্দি করেছিল যে দিনের গরমের সময়টাতে কোনো বাড়িতেই অন্যটার চেয়ে বেশি রোদ পড়তো না। বছর কয়েকের মধ্যেই মাকোন্দো হয়ে দাঁড়ায় এমন এক গাঁ যা তার তিনশো বাসিন্দার জানামতে সে-সময়ের অন্য যে-কোনো গাঁয়ের চেয়ে ছিমছাম আর পরিশ্রমী। আসলেই একটা সুখী গ্রাম ছিল সেটা, যেখানে তিরিশ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের ছিল না কেউ, আর মারাও যায়নি কোনো লোক তখন পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসতি গাড়ার সময় থেকেই ফাঁদ আর খাঁচা বানাতো হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। শিগ্‌গিরই সে কেবল নিজেরটাই নয়, গাঁয়ের আর সব বাড়িও বোঝাই করে ফেলে ট্রুপিয়াল, ক্যানারি আর রেডব্রেস্ট দিয়ে। নানান পদের এতো পাখ-পাখালির ঐকতান এমন-ই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে যে, নিজের বাহ্যজ্ঞান যাতে লুপ্ত না হয় সেজন্যে উরসুলা মোম দিয়ে নিজের কান বন্ধ করে রাখতো। মাথাধরা সারানোর কাচের গুলি বেচতে প্রথম যেবার মেলকিয়াদেসের দল এসে পৌছেছিল, জলাভূমিটার মদালসে হারিয়ে যাওয়া গ্রামটা তারা যে খুঁজে পেয়েছে তাই দেখেই সবাই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল সেবার, আর তখন জিপসিরা স্বীকার করেছিল যে পাখির ডাক শুনেই আসলে পথ খুঁজে পেয়েছে তারা।

চুম্বক আর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত নানান হিসেব-নিকেশের হুজুগে, সোনা বানানোর স্বপ্নে আর বিশ্বের বিস্ময়গুলো আবিষ্কারের তাড়নায় সামাজিক কাজকর্মে নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই উৎসাহটা মিইয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যেই। ছিমছাম আর পরিশ্রমী এক মানুষ থেকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া হয়ে পড়ে চালচলনে ঢিলাঢালা, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে উদাসীন এক লোক, যার বুনো দাড়িগোঁপ ছেঁটে দিতে রান্নাঘরের একটা চাকু নিয়ে মেলা কসরত করতে হতো উরসুলাকে। অনেকেই ধরে নেয়, আজব কোনো মাথাবিভ্রম এসে ভর করেছে তার ওপর। অথচ যখন সে জমিজমা সাফ করতে তার যন্ত্রপাতি বের করে আনে তখন কিন্তু তার পাগলামির ব্যাপারে যাদের কিনা কোনো সন্দেহই ছিল না তারাও তাদের কাজ-কর্ম, পরিবার-পরিজন ফেলে ছুটে চলে আসে, আর তখন সে জড়ো হওয়া দলটাকে বলে এমন একটা রাস্তা তৈরি করতে যেটা মাকোন্দোকে জুড়ে দেবে বড় বড় সব আবিষ্কারের সঙ্গে।

এল্যাকাটার ভূগোল সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানা ছিল না হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার। তার কেবল জানা ছিল, পুব দিকে রয়েছে এক দুর্গম পর্বতমালা, আর, পাহাড়ের ওপাশে, প্রাচীন শহর রিয়োহাচা, যেখানে, তার দাদা প্রথম অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কথা অনুযায়ী, অতীতকালে কামান-বন্দুক নিয়ে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক গিয়েছিল কুমীর শিকারে আর তারপর সেগুলোকে সাফসুতরো করে ভেতরে খড়কুটো ঠেসে দিয়েছিল রানী এলিজাবেথের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। তার যখন জোয়ান বয়স, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার লোকজন তাদের বৌ-ছেলেমেয়ে, জীব-জন্তু আর সব কিসিমের গেরস্থালি সরঞ্জাম নিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়েছিল সাগরের দিকে বেরোবার একটা পথের খোঁজে, তারপর, ছাব্বিশ মাস শেষে, সে-অভিযানে ইস্তফা দিয়ে পত্তন করেছিল মাকোন্দোর, যাতে আর ফিরে যেতে না হয় তাদের। কাজেই, সেই রাস্তার ব্যাপারে তাদের আর উৎসাহ ছিল না, কারণ, সেটা কেবল অতীতেরই দিকে নিয়ে যেতে পারতো তাদের। দক্ষিণে ছিল জলাভূমিগুলো, চিরজীবী গাছপাতা আর উদ্ভিদের গাঁজলায় ঢাকা, আর—জিপসিদের বয়ান মোতাবেক—মস্ত বিলের সেই বিশাল জগতের কোনো কূলকিনারা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমের মস্ত জলাটা গিয়ে মিশেছে জলের এক অবাধ বিস্তারের সঙ্গে, সেখানে রয়েছে নারীর মাথা আর ধড়অলা দাঁতাল সব তিমি, সেগুলো তাদের অতুলহীন স্তনের মোহে ফেলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়তো নাবিকদের। নৌকোয় চেপে ছয় মাস ভেসে চলার পর পৌঁছয় ওরা সেই এক ফালি জমিটার কাছে যেখান দিয়ে ডাক-বওয়া খচ্চরগুলো চলাচল করে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার হিসেব বলছিল, সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর দিককার পথ বরাবর। কাজেই, মাকোন্দোর পত্তনের সময় থেকেই যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের হাতেই তুলে দেয় সে তার বনজঙ্গল সাফসুতরো করার যন্ত্রপাতি আর শিকারের অস্ত্রশস্ত্র। দিক ঠিক করার যন্ত্র আর মানচিত্রগুলো একটা বস্তায় ভরে নিয়ে পা বাড়ায় সে সেই বেপরোয়া অভিযানে।

প্রথম দিকে তেমন কোনো বাধার মুখোমুখি হতে হয় না তাদের। বহু বছর আগে যেখানটায় সেই সৈনিকের বর্মটা পেয়েছিল, সেইখানে চলে আসে ওরা নদীর পাথুরে তীর ধরে, আর সেখান থেকে ঢুকে পড়ে বনের মধ্যে বুনো কমলা গাছগুলোর ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা পথ ধরে। প্রথম হপ্তার শেষে একটা হরিণ মেরে আগুনে ঝলসে নেয় ওরা, কিন্তু ঠিক করে, খাবে কেবল সেটার আদ্ধেকটা, আর নুন মাখিয়ে বাকিটা মজুদ রেখে দেবে সামনের দিনগুলোর জন্যে। সেই একই আগাম সাবধানতা হিসেবে কড়া আর আঁশটে স্বাদের নীল মাংসের ম্যাকঅ পাখি ভোজনের প্রয়োজনটাকেও মুলতুবি রাখতে চেষ্টা করে তারা। এরপর, দশদিনেরও বেশি সময়ের জন্য সূর্যের মুখ আর দেখা হয় না তাদের। মাটি হয়ে আসে নরম আর স্যাঁতস্যাঁতে, আগ্নেয় ছাইয়ের মতো; গাছপালা হয়ে আসে ক্রমেই আরো নিবিড়, পাখির চিৎকার আর বানরের হৈ-চৈ সরে যায় দূর থেকে দূরে, জগৎ হয়ে আসে একেবারে বিষাদমাখা। তাদের বুট জুতো যখন দেবে যাচ্ছে বাষ্প ওঠা তেলের পুকুরে আর তাদের কুঠার বিনাশ করে চলেছে লিলি ফুল আর সোনালী সালামান্দারগুলোকে, স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা আর নিঃশব্দতার সেই স্বর্গে অভিযাত্রীরা তাদের আদি পাপেরও আগের আদিমতম স্মৃতির তাড়নায় অভিভূত হয়ে পড়ে। শোকের এক জগতের ভেতর দিয়ে—যে-জগৎ শুধু জ্বলজ্বলে পোকামাকড়ের একটানা প্রতিবিম্বের আলোয় আলোকিত—হপ্তাখানেকের মতো প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলে তারা নিশাচরের মতো, আর তাদের ফুসফুস ভরে ওঠে রক্তের দমবন্ধকরা গন্ধে। ফিরে যাওয়া আর হয় না তাদের, কারণ চলতি পথে একফালি যে জায়গাটুকু তারা ফাঁকা করতো, শিগগিরই তা এঁটে আসতো যেন তাদেরই চোখের সামনে নিমিষে গজিয়ে ওঠা নিত্য-নতুন গাছপালায়। 'অসুবিধে নেই,' হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বলতো। 'দিক না হারানোটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।' ভূতগ্রস্ত সেই এলাকাটা থেকে যাতে তারা বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্যে কম্পাস ধরে ধরে তার লোকজনকে সে পথ দেখাতে থাকে সেই অদৃশ্য উত্তরের দিকে। সে এক ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাত, নক্ষত্রের নামনিশানাহীন, কিন্তু সেই অন্ধকারটা ভরে ওঠে একটা টাটকা আর নির্মল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাসে। সেই দীর্ঘ পথচলায় ক্লান্ত-শ্রান্ত ওরা ওদের দোলখাটিয়া ঝুলিয়ে দুই হপ্তার মধ্যে এই প্রথমবারের মতো ঘুমিয়ে নেয় দু'চোখ ভরে। সূর্য যখন মাথার অনেক ওপরে, ঘুম ভেঙে জেগে উঠে এমনই মুগ্ধ হয়ে যায় ওরা যে মুখে কোনো কথা সরে না তাদের। দেখে, লতাগুল্ম আর তালগাছ বেষ্টিত হয়ে সকালের নীরব আলোয় সাদা আর মিহিদানার মতো ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্পেনদেশীয় এক বিশাল জাহাজ। স্টারবোর্ডের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকা জাহাজটার অক্ষত মাস্তুল থেকে অর্কিডশোভিত দড়াদড়ির মধ্যেখানে ঝুলে আছে পালের ময়লা-ঝয়লা কাপড়টা। শিলীভূত গুগলি শামুক আর মোলায়েম শ্যাওলার বর্মে ঢাকা জাহাজের কাঠামোটা শক্তভাবে গেঁথে আছে পাথরের চড়ায়। সময়ের কলুষ আর পাখ-পাখালির আসক্তি থেকে সুরক্ষিত গোটা কাঠামোটা যেন দখল করে আছে তার নিজ অবস্থান, সে-অবস্থান নিঃসঙ্গতা আর বিস্মৃতির। অভিযাত্রীরা সতর্ক সংকল্পে জাহাজটার ভেতরে খুঁজে দেখে, সেখানে ফুলের এক নিবিড় অরণ্য ছাড়া কিছু নেই।

ধারে কাছেই সমুদ্র থাকার একটা ইঙ্গিতস্বরূপ এই জাহাজ-আবিষ্কার হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার সমস্ত উৎসাহ গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়। একবার এন্তার ত্যাগ আর কষ্ট সয়ে সমুদ্র খুঁজে না পাওয়া, আরেকবার না খুঁজেই সেটাকে অলঙ্ঘ্য একটা জিনিসের মতো তার পথের ওপরে পড়ে থাকা অবস্থায় পেয়ে যাওয়া, এই ব্যাপারটাকে তার নিজের খামখেয়ালী নিয়তির একটা চাল বলেই মনে হয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাছে। বহুদিন পর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ফের পাড়ি দেয় এলাকাটা, তখন সেটা ডাকের রাস্তা হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছে, আর তখন জাহাজটার একমাত্র যে-অংশটা সে দেখতে পায় সেটা হচ্ছে আফিমের ক্ষেতের মধ্যে সেটার পোড়া কাঠামো। আর কেবল তখনই, যখন তার সন্দেহ কেটে যায় যে গপ্পোটা তার বাবার মনগড়া নয়, সে ভাবতে বসে ডাঙার ঐ জায়গটায় জাহাজটা কী করে পৌঁছেছিল। কিন্তু জায়গাটা থেকে আরো চার দিনের যাত্রা শেষে সমুদ্র পেয়ে যাওয়ার পর হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর মাথা ঘামায় না তা নিয়ে। তার স্বপ্নের মরণ ঘটে সেই ছাইরঙা, ফেনিল আর নোংরা সমুদ্রের সামনে এসে, যে-সমুদ্রের প্রাপ্য নয় অভিযানের এতো ঝুঁকি আর কষ্টস্বীকার।

'মরণ!' চেঁচিয়ে ওঠে সে। 'মাকোন্দোর চারদিকেই পানি।'

অভিযান থেকে ফিরে এসে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যে খামখেয়ালী মানচিত্র এঁকেছিল তারই কল্যাণে তিন দিকে পানি ঘেরা এক মাকোন্দোর ধারণাটা টিকে যায় মেলা দিন। ওটা সে এঁকেছিল রাগে গজরাতে গজরাতে, মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে, যোগাযোগের অসুবিধেগুলোতে বেশি বেশি রং চড়িয়ে, যেন একেবারে বোধবুদ্ধিহীনের মতো জায়গাটা বেছে নেয়ায় নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে। 'কোথাও যাওয়া হবে না আমাদের,' উরসুলার কাছে গিয়ে শোক করে সে। 'বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধেগুলো ভোগ না করেই পচে মরতে হবে আমাদের এখানে।' গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করা তার সেই ছোট্ট ঘরটাতে বসে মাস কয়েক ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবনা-চিন্তার পর সেই নিশ্চয়তাই তাকে নিয়ে যায় মাকোন্দোকে একটা ভালো জায়গায় সরিয়ে নেবার পরিকল্পনার দিকে। কিন্তু উরসুলা এবার আগেই ধরে ফেলেছে তার তড়পানো ফন্দি। ক্ষুদে এক পিঁপড়ের গোপন আর লেগে-থাকা শ্রমে গাঁয়ের মেয়েদের সে আগে থেকেই হাত করে রাখে এরিমধ্যে পাততাড়ি গুটোবার বন্দোবস্ত করতে থাকা ওদের কর্তাদের ঠাঁইনড়া মতিগতির বিরুদ্ধে। ঠিক কোন মুহূর্তে, কোন উল্টো বাতাসে তার মতলবটা ওজর-আপত্তি, হতাশা আর পাশকাটানির মাকড়শার জালে ঢাকা পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত একটা বিভ্রান্তিতে এসে ঠেকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তা ঠাহর করতে পারে না। নিরীহ মনোযোগে তাকে চোখে চোখে রাখে উরসুলা, আর যেদিন সকালে সে তাকে গবেষণাগারের যন্ত্রগুলোকে সেগুলোর আসল বাক্স-পেঁটরায় রাখতে রাখতে তার পাততাড়ি গুটোবার পরিকল্পনা নিয়ে বিড় বিড় করতে দেখে পেছন-ঘরে, সেদিন এমনকি খানিকটা করুণাও হয় উরসুলার তার জন্যে। সে তাকে বাঁধাছাদা শেষ করতে দেয়। বাক্সগুলোতে পেরেক ঠুকে তাতে একটা কালি লাগানো তুলি দিয়ে সই করতেও দেয় কোনো বকাঝকা না করে, যদিও ততক্ষণে সে জানে যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া টের পেয়ে গেছে (কারণ, উরসুলা তার স্বামীকে নিচু গলায় আপনমনে সে-কথা বলতে শুনেছে) লোকগুলো তাকে এ-কাজে কাঁধ দেবে না। যখন সে দরজাটা খুলতে যাবে, কেবল তখনই সাহস করে স্বামীকে সে জিজ্ঞেস করে তার ইচ্ছেটা কী, আর সে-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে খানিকটা কর্কশ হয়ে ওঠে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার গলা। 'কেউ-ই যখন যেতে চাইছে না, তখন আমরা একাই যাবো।' উরসুলা সে-কথায় ঘাবড়ায় না ।

সে বলে, 'আমরা যাবো না। এখানেই থাকবো আমরা, কারণ, এখানে একটা ছেলে জন্মেছে আমাদের।'

হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বলে, 'কিন্তু এখনো এখানে কেউ মরেনি আমাদের। মরে মাটির তলায় কেউ শুয়ে না থাকা পর্যন্ত কোনো জায়গায় কারো এক্তিয়ার জন্মায় না।'

কোমল একটা কাঠিন্য নিয়ে উরসুলা জবাব দেয়:

'তোমাদের বাকি সবার থাকার জন্যে যদি আমাকে মরতে হয়, বেশ তো, তাহলে না হয় আমি-ই মরব।'

হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ভাবতে পারেনি তার বৌয়ের ইচ্ছা শক্তির জোর এতো। সে তার আকাশ-কুসুম কল্পনার মোহ আর এক আশ্চর্য জগতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করে, যে-জগতে সর্বসাকুল্যে শুধু মাটিতে একটা জাদুই তরল ছিটিয়ে দিলেই যখন তখন ইচ্ছেমতো গাছে গাছে ফল ধরে যাবে, আর ব্যথানাশক সবধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে নামমাত্র দামে। কিন্তু তার অতীন্দ্রিয়তায় উরসুলা সাড়া দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে জবাব দেয়, 'ঐসব উদ্ভট আবিষ্কার মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়নোর বদলে তোমার উচিত তোমার ছেলেগুলোর দিকে নজর দেয়া। দেখো দেখি ওদের হাল, গাধার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সব এদিক-ওদিক।'

বৌ-এর কথাগুলো আক্ষরিক অর্থেই ধরে নেয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় সে, দেখে, রোদেলা বাগানে উদোম গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বাচ্চারা, আর তার কাছে মনে হয় উরসুলার জাদুমন্ত্রের কারণে ঠিক এই মুহূর্তে জন্ম হল ওদের। তার মনের মধ্যে তখন কিছু একটা ঘটে, রহস্যময় আর চূড়ান্ত কিছু একটা, যা তাকে উপড়ে ফেলে তার নিজের সময় থেকে আর ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে যায় তার স্মৃতির এক অভ্রমিত অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। উরসুলা যখন বাকি জীবনের জন্যে পরিত্যক্ত হওয়ার বিপদমুক্ত বাড়িটা ঝাঁট দেয়া শুরু করে, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে সে মগ্ন স্থির দৃষ্টি নিয়ে, একসময় ভেজা ভেজা হয়ে ওঠে তার চোখ দুটো বাচ্চাদের কথা ভাবতে ভাবতে, আর তখন সে ভারমুক্তির একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে হাতের পেছন দিয়ে মুছে নেয় চোখ দুটো ।

তারপর বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, বাক্স থেকে জিনিসগুলো বের করার কাজে এবার আমার সঙ্গে হাত লাগাতে বলো ওদের।'

বড় ছেলে হোসে আর্কাদিও-র বয়স চোদ্দ। চৌকো মাথা, ঘন চুল আর বাবার ধাত পেয়েছে সে। শরীরের বৃদ্ধি আর তাকতের একই ঝোঁক পেলেও, গোড়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে কল্পনাশক্তির ঘাটতি রয়েছে তার। মাকোন্দোতে বসতি গাড়ার আগে, সেই পাহাড় উজানোর কঠিন সময়ে পেটে এসেছিল সে, তার জন্মও সেই সময়ে, আর তার বাপ-মা ঈশ্বরকে এই দেখে শুকরিয়া জানিয়েছিল যে তার মধ্যে জান্তব কোনো ব্যাপার-স্যাপার নেই। মাকোন্দোতে জন্ম-নেয়া প্রথম মানব সন্তান অরেলিয়ানো ছয় বছরে পড়বে মার্চ মাসে। ছেলেটা চুপচাপ আর উদাসীন। মায়ের পেটে থাকতেই কান্নাকাটি শুরু করেছিল সে, আর দুনিয়াতে এসেছিল চোখদুটো খোলা রেখেই। নাড়ী কাটার সময় মাথা নাড়ছিল সে এদিক-সেদিক, যেন নিজের ভেতর ঢুকিয়ে নিচ্ছিল ঘরের ভেতরের জিনিস-পত্র আর বেপরোয়া কৌতূহলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল লোকজনের মুখগুলো। ওকে দেখতে কাছে চলে আসা লোকগুলোকে গ্রাহ্য না করে সে মন দিয়ে তাকিয়ে ছিল তালপাতায় ছাওয়া ছাতের দিকে, ছাতটাকে দেখে মনে হচ্ছিল বৃষ্টির তুমুল চাপে ভেঙেই পড়বে বুঝি। সেই দৃষ্টির তীব্রতার কথা উরসুলার আর মনে পড়েনি সেই দিনটির আগ পর্যন্ত যেদিন, সে যখন ফুটন্ত স্যুপের একটা গামলা চুলোর ওপর রাখতে যাচ্ছে, ছোট্ট অরেলিয়ানো এসে ঢোকে রান্নাঘরে। হতবাক শিশুটি দোরগোড়া থেকেই বলে ওঠে, 'স্যুপটা ছলকে পড়বে।' টেবিলের মাঝখানটায় ভালোভাবেই বসানো ছিল গামলাটা, কিন্তু বাচ্চাটার মুখ থেকে ঘোষণাটা বেরুনোমাত্র, যেন ভেতরের কোনো গতিময়তার সাহায্যে চালিত হয়ে, দিব্যি সরতে শুরু করে সেটা কিনারার দিকে, তারপর মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পেয়ে উরসুলা স্বামীকে ঘটনাটা জানায়, কিন্তু এটাকে সে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ব্যাখ্যা করে। লোকটা সে এরকমই সারাজীবন, নিজের ছেলেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন; তার খানিকটা এই কারণে যে, ছেলেবেলাটাকে সে গণ্য করতো মানসিক অপর্যাপ্ততার একটা সময় হিসেবে, আর খানিকটা এই কারণে যে তার নিজের উদ্ভট চিন্তাভাবনা ভাবনা নিয়েই ডুবে থাকতো সে অতিমাত্রায়।

কিন্তু সেই বিকেলের পর থেকে, যেদিন সে তার সন্তানদের তার পরীক্ষাগারে ডেকে এনেছিল বাক্স থেকে জিনিসপত্র বের করার কাজে তাকে সাহায্য করার জন্যে, সেদিন থেকে ওদের পেছনেই ব্যয় করতে থাকে সে বেশিরভাগ সময়। ছোট্ট সেই আলাদা ঘরটায়, যে-ঘরের দেয়ালগুলো ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল অদ্ভুত সব মানচিত্রে আর কাল্পনিক নকশায়, সেই ঘরে বসে সে তাদের শেখায় লিখতে, পড়তে, শেখায় অংক কষতে, আর বলে যায় বিশ্বের যত আশ্চর্য বিষয়ের কথা, আর তাই করতে গিয়ে সে যে তার বিদ্যের দৌড় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, বরং তার কল্পনার লাগাম পুরোপুরি ছেড়ে দেয় সে। আর ঠিক এভাবেই ছেলেগুলোর জ্ঞান এ-পর্যন্ত এসে ঠেকে যে আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এমনসব বুদ্ধিমান আর শান্তশিষ্ট মানুষ আছে যাদের অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় হচ্ছে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবা, আর তারা আরো শেখে যে পায়ে হেঁটে ঈজিয়ান সাগর পাড়ি দেয়ার উপায় হচ্ছে সালোনিকা বন্দর পর্যন্ত এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপ লাফিয়ে ডিঙোন। ছেলেবেলার স্মৃতিতে ঘোর-লাগা সেই সব বৈঠকের কথা এমনভাবে গেঁথে যায় যে, বহু বছর পরে পেশাদার সেনাবাহিনীর অফিসার ফায়ারিং স্কোয়াডকে গুলি ছোঁড়ার আদেশ দেয়ার ঠিক এক সেকেন্ড আগে, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আরো একবার দেখতে পায় সেই মার্চের বিকেলটাকে যে-বিকেলে তার বাবা পদার্থ বিদ্যা পড়ানোয় বিরতি দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হাত শূন্যে তুলে, স্থির চোখে, আর কান পেতে শুনছিল দূর থেকে ভেসে আসা সেই সব জিপসির বাঁশি, ঢোল আর প্রাণকাড়া সুরের শব্দ, যারা আবারো গ্রামে আসছে মেম্‌ফিসের সন্তদের সবচে' নতুন আর সবচে' তাজ্জব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করতে করতে।

এরা নতুন জিপসি, জোয়ান মেয়ে-পুরুষের দল, কেবল নিজেদের ভাষাতেই কথা বলতে পারে তারা, তেলতেলে গতর আর পটু হাতের চমৎকার নমুনা; তাদের গান-বাদ্য রাস্তাজুড়ে বপন করে দেয় হৈ-হুল্লোড়ভরা উল্লাসের এক আতংক, সঙ্গে আরিঅ্যা[১] আওড়াতে থাকা হাজারো রঙের কাকাতুয়া, খঞ্জনীর আওয়াজের তালে তালে একশোটা সোনার ডিমপাড়া এক মুরগি, মন-পড়ুয়া এক শেখানো-পড়ানো বানর, নানান-কাজের এক অস্ত্র যা দিয়ে একই সঙ্গে বোতাম সেলানো আর জ্বর

---

[১] অপেরা, ইত্যাদিতে গেয় একক কণ্ঠ সঙ্গীত। অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমানো যায়, মানুষের বাজে স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়ার এক যন্ত্র, সময় ভুলে যাওয়ার পুলটিস, এছাড়াও আরো হাজারটা আবিষ্কার যেগুলো এতোই আজব আর অসাধারণ যে তার প্রত্যেকটার কথা মনে রাখার জন্যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার নিশ্চয়ই একটা স্মৃতিযন্ত্র আবিষ্কার করার ইচ্ছে হয়েছিল। পলকের মধ্যে গ্রামটাকে বদলে দেয় তারা। মাকোন্দোবাসীরা দেখে, ভিড়ে ভিড়াক্কার মেলার কারণে নিজেদের চেনা রাস্তাতেই পথ হারিয়ে ফেলছে তারা।

হুড়োহুড়ির মধ্যে ওরা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্যে দুই হাতে দুই ছেলেকে ধরে, সোনায়-বাঁধানো দাঁতের দড়াবাজ আর ছয় হাতঅলা ভেলকিবাজদের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে, লোকজনের নিঃশ্বাসের পাঁচমিশেলী গন্ধে দমবন্ধ দশায় পৌঁছে, মেলকিয়াদেসের খোঁজে উন্মাদের মতো সবখানে ছুটে বেড়ায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, যাতে লোকটা তাকে সেই অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মানে খোলাসা করে বলতে পারে তাকে। বেশ কিছু জিপসির কাছে তার কথা জিজ্ঞেস করে সে, কিন্তু তারা তার কথাই বুঝতে পারে না। শেষে, মেলকিয়াদেস যেখানে সবসময় তাঁবু খাটাতো সেখানে পৌঁছে দেখা পায় এক বাকবিমুখ আর্মেনিয়র, নিজেকে গায়েব করে ফেলার সিরাপ ফেরি করছে সে হিস্পানী ভাষায় সেটার গুণকীর্তন করতে করতে। লোকটা তখন এক গেলাস হলুদপানা জিনিস এক ঢোকে গলা দিয়ে নামিয়েছে মাত্র, এমন সময় প্রদর্শনীর মুগ্ধ দর্শকদের কনুই দিয়ে ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সবার সামনে গিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিতে সফল হয়। জিপসি লোকটা তাকে তার নজরের রক্ত-জল-করা আবহে ঘিরে ফেলে ঘুরে দাঁড়ায় বিশ্রী, ধোঁয়া-ওঠা পিচের এক ডোবার দিকে; তার জবাবের প্রতিধ্বনি সেই ডোবার ওপর এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে: 'মেলকিয়াদেস মরে গেছে।' বেমক্কা এই খবরের ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, যতক্ষণ না অন্য সব জারিজুরির টানে ভেঙে যায় জটলাটা আর বাকবিমুখ আর্মেনিয়র ডোবাটা উবে যায় পুরোপুরি। অন্য জিপসিরা পরে তাকে পাকা খবর দেয়, মেলকিয়াদেস আসলে সিঙ্গাপুরের সৈকতে জ্বরে ভুগে মারা গেছে আর তার লাশ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে জাভা দরিয়ার সবচেয়ে গহীন জায়গায়। বাচ্চারা এ-খবরে কোনো গা-ই করে না। বরং বাবার কাছে বায়না ধরে মেম্ফিসের সাধুদের ঘোর লাগানো আজব জিনিসটা দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে; তাঁবুতে ঢোকার মুখেই এই বলে সেটার কথা চাউর করা হচ্ছিল যে ওটার মালিক ছিলেন রাজা সোলেমান। ওরা এমনই পীড়াপীড়ি শুরু করে যে তিরিশ রিয়েল দর্শনী দিয়ে ওদেরকে সে নিয়ে আসে তাঁবুর একেবারে মধ্যেখানে, সেখানে রোমশ ধড় আর কামানো মাথা নিয়ে, নাকে তামার মাকড়ি আর গোড়ালীতে লোহার বেড়ি পরে এক হার্মাদি সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অসুর। সিন্দুকটা সেই অসুর খুলে ধরতেই হিমেল একটা ভাপ বেরোয় সেটা থেকে। দেখা যায়, সেটার ভেতরে রয়েছে একটা মাত্র বিরাট, স্বচ্ছ গুঁড়ি, সেই গুঁড়ির ভেতরে অগুনতি ছুচ, সূর্যের আলো সেই অগুনতি ছুচের ওপর পড়ে রঙ-বেরঙের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারায় ভেঙে যাচ্ছে। ছেলে দুটো একটা চটজলদি ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রয়েছে বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে উঠে সাহস করে বিড়বিড়িয়ে ওঠে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াঃ

'এটা হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হীরা।'

'না,' জিপসি লোকটা শুধরে দেয় তাকে, 'এ হল বরফ।'

বুঝতে না পেরে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া টুকরোটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সেই অসুর ঠেলে সরিয়ে দেয় তার হাতটা। 'ছুঁতে চাইলে আরো পাঁচ রিয়েল।' হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া পয়সাটা চুকিয়ে দিয়ে বরফটার ওপর হাত রেখে ধরে থাকে মিনিট কয়েক, আর, একটা রহস্যের সংস্পর্শে এসে বুকটা তার ভরে ওঠে ভয়ে আর উল্লাসে। কী বলবে ভেবে না পেয়ে সে আরো দশ রিয়েল দেয় যাতে তার ছেলে দুটোও এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটা লাভ করতে পারে। ছোট্ট হোসে আর্কাদিও বরফটা ছুঁতে চায় না। কিন্তু অরেলিয়ানো এগিয়ে আসে এক পা, বরফের ওপর হাতটা রাখে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেয়। চমকে বলে ওঠে, 'ফুটছে ওটা।' কিন্তু তার বাবার তখন খেয়াল নেই তার দিকে। অলৌকিকের সাক্ষাৎ প্রমাণ পেয়ে উত্তেজিত হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া মুহূর্তের জন্যে ভুলে যায় তার উন্মত্ত পরিকল্পনাগুলোর হতাশা আর সমুদ্রশামুকের খিদের হাতে তুলে দেয়া মেলকিয়াদেসের লাশের কথা। আরো পাঁচ রিয়েল তুলে দেয় সে জিপসির হাতে, তারপর বরফের টুকরোটার ওপর হাত রেখে, যেন কিরে কাটছে সে বাইবেল ছুঁয়ে, এমনিভাবে বলে ওঠেঃ

'এ-জিনিস আমাদের কালের এক মহান আবিষ্কার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোড়শ শতাব্দীতে হার্মাদ স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক রিয়োহাচায় হামলা চালানোর সময় উরসুলা ইগুয়ারানের দাদীর দাদী পাগলা ঘণ্টির বাজনায় আর কামানের গোলার শব্দে এমনই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে বসে পড়েছিল একটা জ্বলন্ত চুলার ওপর। ফলে ঘরের লক্ষী হিসেবে বাদবাকি জীবনের জন্য বরবাদ হয়ে গিয়েছিল সে। বালিশে গা ঠেকা দিয়ে কেবল এক পাশ ফিরে বসতে পারতো সে, আর তার হাঁটার ধরনে নিশ্চয়ই অদ্ভুত একটা কিছু ঘটেছিল, কারণ লোকজনের সামনে তাকে আর হাঁটতে দেখা যায়নি কখনো। গা থেকে তার একটা ঝলসানো গন্ধ বেরোয়, এমন একটা ধারণায় তাকে পেয়ে বসায় সব ধরনের সামাজিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল সে। সকালবেলায় দেখা যেত বাড়ির আঙিনায় বসে আছে সে, কারণ, পাছে স্বপ্ন দেখে ইংরেজরা তাদের হিংস্র শিকারী কুকুরগুলো নিয়ে তার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে গনগনে লাল লোহার বেড়ি পরিয়ে তাকে ন্যাক্কারজনক সব অত্যাচারে জর্জরিত করতে, এই ভয়ে ঘুমোতে সাহস হতো না তার। তার স্বামী ছিল এক অ্যারাগনিয়র বণিক, তার ঔরসে দুটো বাচ্চা হয়েছিল তার, সে-লোকটা তার জমানো টাকা-পয়সার আদ্ধেকটা খরচা করে ফেলে ওষুধপত্রের পেছনে, আর তার অবসর সময়গুলো কাটিয়ে দেয় তার বৌ-এর আতংক কমানোর চেষ্টায়। শেষ পর্যন্ত সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে পরিবার নিয়ে থাকতে চলে যায় সমুদ্র থেকে দূরে, পাহাড়ের পাদদেশে নিরীহ রেড ইন্ডিয়ানদের এক বসতিতে, সেখানে গিয়ে সে তার বৌকে বানিয়ে দেয় জানলাবিহীন এক শোবার ঘর যাতে তার স্বপ্নের হার্মাদরা কোনো সুযোগ না পায় ভেতরে ঢোকার।

গহীন সেই গ্রামে দন হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া নামের স্থানীয় এক তামাক চাষী বেশ কিছুদিন ধরে বাস করতো, তার সঙ্গে উরসুলা ইগুয়ারানের দাদীর দাদী গড়ে তোলে এক যৌথ কারবার, সে-কারবারটা এতোই লাভের মুখ দেখে যে বছর কয়েকের মধ্যেই বড়লোক বনে যায় দু'জনে। কয়েক শতাব্দী পর স্থানীয় সেই চাষীর নাতির নাতি বিয়ে করে সেই অ্যারাগনিয়র নাতনীর নাতনীকে। কাজেই, যখনই উরসুলার ওপর তার স্বামীর ক্ষ্যাপাটে চিন্তা-ভাবনার ধকল এসে পড়তো তখনই সে এক লাফে তিনশো বছর পুরনো নিয়তিতে ফিরে যেয়ে গাল পাড়তে থাকতো সেই দিনটাকে যেদিন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক হানা দিয়েছিল রিয়োহাচায়। সেটা স্রেফ নিজেকে খানিকটা স্বস্তি দেবার একটা পথ, কারণ আসলে তারা দু'জনে মরণ পর্যন্ত এমন এক বাঁধনে বাঁধা যা কিনা ভালোবাসার চেয়েও শক্ত, আর সেটা হচ্ছে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনেরই একটা বিবেকের দংশন। তারা জ্ঞাতি ভাই-বোন। তারা দু'জন একসঙ্গেই বড় হয়েছে সেই আদিম গ্রামে যে-গ্রামটাকে তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের কাজ-কর্ম আর সুঅভ্যাস দিয়ে বদলে ফেলেছিল, গড়ে তুলেছিল প্রদেশের সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলোর একটা হিসেবে। যদিও তারা যখন দুনিয়াতে এসেছিল তখনই তাদের বিয়ের ব্যাপারটা লেখা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা যখন বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানাল তখন তাদের নিজেদের আত্মীয়রাই সেটা থামাতে চাইল। তারা এই ভেবে ভয় পেয়ে গেল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংকর জন্ম দিয়ে যাওয়া দুই বংশের দুই স্বাস্থ্যবান সন্তান ইগুয়ানা জন্ম দেয়ার মতো কলংক ভোগ করবে। সে-রকম একটা ভয়ংকর উদাহরণ যে ছিল না তা নয়। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার এক চাচার সঙ্গে বিয়ে হওয়া উরসুলার এক চাচীর এক ছেলে সারা জীবন ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে বিয়াল্লিশ বছর নির্ভেজাল কুমার জীবন যাপন করার পর রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছিল, কারণ জন্মের থেকেই সে বেড়ে উঠেছিল ছিপি খোলার যন্ত্রের মতো একটা উপাস্থিক লেজ আর সেটার ডগায় ছোট্ট এক গাছা চুল নিয়ে। সেটা ছিল একটা শুয়োরের লেজ, কোনো মেয়েমানুষকে দেখতে দেয়া হতো না সেটা, আর ওই লেজটার জন্যেই তাকে প্রাণটা খোয়াতে হয়েছিল, কারণ তার এক কসাই বন্ধু মাংস কাটার ভারি ছুরি দিয়ে এক কোপে সেটা নামিয়ে দেয়ার উপকারটুকু করে দিয়েছিল তাকে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তার উনিশ বছরের খামখেয়াল দিয়ে এক কথায় সমস্যাটার সমাধান করে দেয়: 'শুয়োরের ছানাতেও আমার আপত্তি নেই, যদি সেগুলো কথা বলতে পারে।' কাজেই, আতশবাজি আর ঢোলবাদ্যের তিনদিন ধরে চলা উৎসবের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় তাদের। এরপর ওরা সুখেই থাকতো যদি উরসুলার মা তাকে তাদের বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারে রাজ্যের অশুভ আগাম কথাবার্তা বলে ভয় ধরিয়ে না দিত তার মনে, বা এমনকি উপদেশ দিতে গিয়ে এই কথা না বলতো যে সে যেন স্বামী-সহবাস না করে। তার শক্ত-সমর্থ, একগুঁয়ে বর তাকে ঘুমের মধ্যে ধর্ষণ করতে পারে এই ভয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে উরসুলা যেনতেন রকমের পা-অলা একটা অন্তর্বাস পরে নিতো, পাল বানানোর মোটা কাপড় দিয়ে তার মা সেটা তৈরি করে দিয়েছিল তাকে, আর শক্তপোক্ত করে দিয়েছিল চামড়ার ফিতের আড়াআড়িভাবে বোনা একটা ব্যবস্থা দিয়ে, সেটার আবার সামনের দিকটা ছিল বন্ধ করা। এভাবেই বেশ ক'টা মাস কাটায় ওরা। দিনের বেলা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া দেখাশোনা করে কাটায় তার লড়িয়ে মোরগগুলো, আর উরসুলা তার মায়ের সঙ্গে করে যায় ফ্রেম সেলাই। রাতের বেলা বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটাতো তারা যন্ত্রণাভরা হিংস্রতায়—যেন সেটা যৌনমিলনের বিকল্প—যতদিন পর্যন্ত না লোকজনের স্বজ্ঞা অস্বাভাবিকতার এক ঝলক গন্ধ পেয়ে যায় আর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বিয়ের এক বছর পরেও উরসুলা অক্ষতযোনী-ই রয়ে গেছে, কারণ তার বর নপুংসক। গুজবটা হোসে আর্কাদি বুয়েন্দিয়ার কানে পৌঁছয় সবার শেষে।

নরম গলায় সে তার বৌকে বলে, 'লোকে কী বলে বেড়াচ্ছে শোন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরসুলা জবাব দেয়, 'বলতে দাও, কথাটা যে সত্যি না তা তো আমরা দু'জনেই জানি।'

কাজেই আরো দুই মাস সেই অবস্থাই বহাল থাকে, আর তারপর আসে সেই রোববারটা যেদিন হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া একটা মোরগ লড়াইয়ে জেতে প্রুদেনসিও আগিলারের সঙ্গে। নিজের মোরগের রক্ত দেখে দুঃখ পেয়ে ভীষণ ক্ষেপে যায় হেরে যাওয়া লোকটা, তারপর পিছু হঠে যায় হোসে আর্কাদি বুয়েন্দিয়ার কাছ থেকে, যাতে করে তাকে সে যা বলতে যাচ্ছে তা যেন শুনতে পায় সবাই।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'জিৎ রহো! মোরগটা যেন তোমার বৌয়ের কাজে লাগে।'

শান্তভাবে নিজের মোরগটা তুলে নেয় হোসে আর্কাদি বুয়েন্দিয়া। সবার উদ্দেশে বলে ওঠে, 'এক্ষুনি ফিরে আসছি আমি।' তারপর প্রুদেনসিও আগিলারকে লক্ষ্য করে বলে, 'আর তুমি বাড়ি গিয়ে একটা অস্ত্র জোগাড় করে নিয়ে এসো, কারণ আমার হাতে খুন হতে যাচ্ছো তুমি।'

দশ মিনিট পর ফিরে আসে সে তার দাদার খাঁজকাটা বল্লমটা নিয়ে। শহরের আদ্ধেক লোক তখন লড়াইয়ের মাঠে, আর সেটায় ঢোকার মুখে প্রুদেনসিও আগিলার অপেক্ষা করছে তার জন্যে। নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগই পায় না লোকটা। ষাঁড়ের মতো শক্তিতে আর তুখোড় যে-নিশানায় প্রথম অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া এই এলাকার জাগুয়ার নিধন করেছিল সেই একই ভাবে ছোঁড়া হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার বল্লমটা গিয়ে বেঁধে তার গলায়। সেই রাতে যখন মোরগ লড়াইয়ের মাঠে বিলাপ-জাগরে ব্যস্ত ওরা লাশটা নিয়ে, শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, দেখে, তার বৌ তখন তার সতীত্ব-পাজামাটা পায়ে গলাচ্ছে। বল্লমটা তার দিকে তাক করে সে হুকুম করে, 'খুলে ফেলো ওটা।' স্বামীর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উরসুলার মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। বিড়বিড় করে সে বলে, 'যা ঘটবে তার জন্যে কিন্তু তুমিই দায়ী থাকবে।' মাটির মেঝেতে বর্শাটা গেঁথে ফেলে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া।

বলে, 'তোমার পেটে ইগুয়ানা হলে ইগুয়ানাই পালবো আমরা। কিন্তু তোমার জন্যে শহরে আর কোনো খুন-খারাবী হতে পারবে না।'

জুন মাসের দারুণ এক ঠাণ্ডা, জোছনা-খেলানো সেই রাতে নির্ঘুম, শশব্যস্ত থাকে ওরা বিছানায় একেবারে ভোর পর্যন্ত, কোনো খেয়ালই থাকে না যে প্রুদেনসিও আগিলারের আত্মীয়-স্বজনের কান্নায় ভারি বাতাস বয়ে যাচ্ছে শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে।

মান-সম্মানের প্রশ্নে এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হিসেবেই দেখা হয় ব্যাপারটা, কিন্তু বিবেকের একটা দংশন থেকে যায় দু'জনের মধ্যেই। এক রাতে, ঘুমোতে না পেরে, পানি খাওয়ার জন্যে উঠোনে বেরিয়ে উরসুলা পানির পাত্রের পাশে প্রুদেনসিও আগিলারকে দেখতে পায়। নীলচে ধূসর চেহারা, মুখে শোকের ছায়া, গলার ফুটোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ করার চেষ্টা করছে সে এসপারাতো ঘাসের ছিপি দিয়ে। ভয় পায় না উরসুলা, বরং করুণা হয় তার। ঘরে ফিরে গিয়ে স্বামীকে জানায় কী দেখেছে সে, কিন্তু হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। 'এর মানে হচ্ছে, আমরা আমাদের বিবেকের জ্বালা সইতে পারছি না।' দুই রাত পর, উরসুলা ফের দেখতে পায় প্রুদেনসিও আগিলারকে, গোসলখানায়, গলার জমাটবাঁধা রক্ত সাফ করতে চাইছে এসপারাতো ঘাসের ছিপি দিয়ে। আরেক রাতে সে দেখে তাকে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে বেড়াতে। বৌ-এর মায়া-বিভ্রমে বিরক্ত হয়ে বল্লম হাতে উঠোনে বেরিয়ে আসে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া।

লোকটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'জাহান্নামে যা তুই! যতবার ফিরে আসবি, ততবারই খুন করে ফেলব আমি তোকে।'

প্রুদেনসিও আগিলার যায় না, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াও সাহস পায় না বল্লম ছুঁড়তে। এরপর থেকে আর কখনো ভালো ঘুম হয়নি তার। প্রবল বিষণ্নতা নিয়ে বৃষ্টির ভেতর যেভাবে মৃত লোকটা তাকিয়ে ছিল তার দিকে, বেঁচে থাকা মানুষগুলোর জন্যে আকুতিতে তার তীব্র স্মৃতিকাতরতা, আর যে-উদ্বেগ নিয়ে ঘাসের ছিপিটা ভেজাবার জন্যে ঘরময় খানিকটা পানি খুঁজে বেড়াতো সে, সব কিছু প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দেয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে। উরসুলাকে সে বলে, 'ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। লোকটা যে কী রকম নিঃসঙ্গ তা তুমি ওর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে।' উরসুলা এতো বিচলিত হয়ে ওঠে যে পরের বার থেকে মৃত মানুষটাকে চুলোর ওপর রাখা পাত্রের ঢাকনা সরাতে দেখেই সে বুঝে যায় কী চাইছে সে, আর এরপর থেকে সারা বাড়ি পানির জগ রেখে দিত উরসুলা। এক রাতে তার নিজের ঘরে লোকটাকে ক্ষতটা সাফ করতে দেখে আর সহ্য হয় না হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার।

'ঠিক আছে, প্রুদেনসিও,' সে বলে ওঠে তাকে, 'এই শহর ছেড়ে যতদূর পারি চলে যাচ্ছি আমরা। আর কখনো ফিরে আসব না। এবার শান্তিতে চলে যাও তুমি।'

তো, এজন্যেই পাহাড় ডিঙোতে পা বাড়াতে হয়েছিল ওদের। অভিযানের নেশায় মেতে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার অগুনতি ইয়ার-দোস্ত—তারা সবাই তার মতোই জোয়ান—তাদের ঘর-বাড়ি খুলে, বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে এমন এক দেশের দিকে যাত্রা করতে বাঁধাছাদা করে ফেলে যে-দেশের প্রতিশ্রুতি কেউ দেয়নি তাদের। রওনা হওয়ার আগে উঠোনে নিজের বল্লমটা গোর দেয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, আর তারপর এই বিশ্বাসে এক এক করে তার দুর্দান্ত লড়িয়ে মোরগগুলোর গলা কেটে ফেলে যে, এতে করে প্রুদেনসিও আগিলারকে সে খানিকটা হলেও শান্তি দিতে পারবে। উরসুলা সঙ্গে নেয় কেবল তার বিয়ের কাপড়-চোপড়ের একটা তোরঙ্গ, গেরস্থালি কয়েকটা থালা-বাসন আর তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সোনার মোহরের সেই ছোট্ট সিন্দুকটা। নির্দিষ্ট কোনো ভ্রমণ-পথ ঠিক করে না ওরা। স্রেফ রিওহাচার উল্টো দিকের রাস্তাটা ধরে যেতে চায় ওরা, যাতে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্ন ফেলে না যায় পেছনে বা কারো সঙ্গে দেখা না হয়ে যায় তাদের। সে এক উদ্ভট অভিযাত্রা। চোদ্দ মাস পর, বানরের মাংস আর সাপের স্ট্যুতে বিগড়ে যাওয়া পাকস্থলী নিয়ে, পুরোপুরি মানুষের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় উরসুলা। যাত্রার আদ্ধেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে সে একটা দোলখাটিয়ায়, দু'জন লোকের কাঁধে চড়ে, কারণ তার পা দুটো ফুলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আর তার ভেরিকোস ধমনীগুলো ফুলে উঠেছিল বুদবুদের মতো। যদিও বাচ্চাগুলোর বসে যাওয়া পেট আর অবসন্ন চোখ দেখলে করুণাই হতো, কিন্তু ওদের বাপ-মায়ের চেয়ে ওরাই ভালোভাবে উৎরে যায় যাত্রাটায়, আর ওদের জন্যে বেশ মজার-ই হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা বেশিরভাগ সময়ের জন্য।

প্রায় দু'বছরের পাড়ির পর এক সকালে পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম ঢালটা দেখতে পায় তারা, এর আগে কোনো মানবসন্তানের ওটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। পৃথিবীর অপর পার পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জলাভূমিটার বিপুল জলজ বিস্তার দেখতে পায় ওরা মেঘময় চূড়া থেকে। কিন্তু সমুদ্রটা খুঁজে পায় না ওরা। জলার মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েক মাসের বেপথু বিহারের পর এক রাতে, পথে দেখা হওয়া শেষ ইন্ডিয়ানটার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে তাঁবু ফেলে ওরা এমন পাথুরে নদীর তীরে যে-নদীর পানি জমাট কাচের খরস্রোতের মতো। বহু বছর পরে, দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সময়, হঠাৎ-হামলায় রিওহাচা কব্জা করার জন্যে এই একই পথ ধরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, কিন্তু ছ'দিনের যাত্রার পর সে বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা নেহাত পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তারপরেও যে-রাতে ওরা নদীর তীরে তাঁবু ফেলে সে-রাতে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বাবার দলকে যেন জাহাজডুবির উপায়হীন শিকার বলে মনে হয়, যদিও সেই পাড়ির সময় তাদের সংখ্যা গেছে বেড়ে আর তারা সবাই তৈরি ছিল (সফলও হয়) বয়সের ভারে মৃত্যুবরণ করতে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সে-রাতে স্বপ্ন দেখে, আয়নার দেয়ালঅলা বাড়িঘরের এক শোরগোলভরা শহর রাতারাতি দাঁড়িয়ে গেছে ঠিক ওখানেই। সে জানতে চায় শহরটার নাম কী, আর তার জবাবে লোকজন এমন একটা নাম বলে যে-নামের আদৌ কোনো অর্থ নেই, কিন্তু ঘুমের মধ্যে সে-নাম রেখে যায় এক অলৌকিক প্রতিধ্বনি: মাকোন্দো। পরদিন সে তার লোকদের বোঝায় সমুদ্র তারা আর কোনো দিনই খুঁজে পাবে না। গাছ কেটে, নদীর তীরের একেবারে কাছ ঘেঁষে একটা ফাঁকা জায়গা বের করার হুকুম দেয় সে তাদের, আর সেখানেই পত্তন করে তারা গ্রামটা।

বরফ আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত আয়নার দেয়ালঅলা ঘরবাড়ির স্বপ্নটার মানে কিছুতেই বার করতে পারেনি হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। কিন্তু সেদিন তার মনে হয়, স্বপ্নটার অতল অর্থটা ধরতে পেরেছে সে। তার মনে হয়, শিগগিরই তারা পানির মতো মামুলি একটা জিনিস দিয়ে বিপুল পরিমাণ বরফের চাঁই তৈরি করতে পারবে, আর তাই দিয়ে গড়ে তুলবে গ্রামের নতুন বাড়িগুলো। কব্জা আর দরজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কড়া যেখানে আগুনের তাপে বেঁকে যায় এমন শহর আর থাকবে না মাকোন্দো, বরং বদলে গিয়ে পরিণত হবে শীতল এক নগরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যে একটা বরফের কারখানা বানানোর জন্যে ঘাম ঝরায় না সে কেবল এই জন্যে যে সে-সময় তার ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে পড়েছে সে। বিশেষ করে অরেলিয়ানোর লেখাপড়া নিয়ে, আলকিমিয়ার ব্যাপারে যার একটা অদ্ভুত স্বজ্ঞা কাজ করতো প্রথম দিকে থেকেই। পরীক্ষাগারটা সাফসুতরো করা হয়। মেলকিয়াদেসের টীকাভাষ্য দেখে—সেগুলো এখন নতুনত্বের উল্লাসহীন, শান্ত—সময় আর ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা চালায় তারা গামলার তলায় লেগে থাকা জঞ্জাল থেকে উরসুলার সোনা উদ্ধারের। কিশোর হোসে আর্কাদিও কাজটায় কোনে অংশ নেয় না বললেই চলে। তার বাবা যখন তার পানির পাইপ নিয়ে মনেপ্রাণে লেগে আছে, একরোখা বড় ছেলেটা—বয়সের তুলনায় যাকে সব সময়ই বড় বলে মনে হয়—সে তখন হয়ে উঠেছে এক বিস্ময়-বালক। বদলে গেছে তার গলার স্বর, ওপরের ঠোঁটে দেখা দিয়েছে সদ্য গজানো এক ধরনের আঁশ। এক রাতে সে যখন বিছানায় যাবার জন্যে কাপড় ছাড়ছে, সেই ঘরে ঢুকে লজ্জা আর করুণা মেশানো একটা অনুভূতি হয় উরসুলার: স্বামীর পর হোসে আর্কাদিওই প্রথম পুরুষ যাকে সে নগ্ন দেখল, আর, জীবন যাপনের জন্যে হোসে আর্কাদিও তখন এতোটাই সশস্ত্র প্রস্তুত যে রীতিমত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল তাকে। তৃতীয়বারের মত্যে পোয়াতী উরসুলা বিয়ের প্রথম দিনগুলোর আতংক বোধ করে নতুন করে।

সেই সময়ই এক হাসিখুশি, দুর্মুখ, উত্তেজক রমণী গেরস্থালি টুকিটাকি কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে বাড়িতে আসে: তাস দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারতো সে। তার সঙ্গে নিজের ছেলের ব্যাপারে কথা বলে উরসুলা। তার ধারণা, ছেলেটার বেঢপ আকৃতি তার জ্ঞাতি ভাইয়ের শুয়োরের লেজের মতোই অস্বাভাবিক। শুনে এমন এক অট্টহাসি হাসে মেয়েটা যে বাড়িময় সে-হাসি ধ্বনিত হয় ভাঙা কাচের গুঁড়োর মতো। সে বলে, 'ঠিক উল্টো। খুব পয়মন্ত হবে ও।' নিজের ভবিষ্যদ্বাণীটা নিশ্চিত করতে দিন কতেক পর তাসগুলো নিয়ে বাড়িতে চলে আসে সে, তারপর রান্নাঘর থেকে খানিকটা দূরের এক শস্যগোলায় হোসে আর্কাদিওকে নিয়ে গিয়ে দরজাটা দেয় বন্ধ করে। মনে যা আসে তাই আওড়াতে আওড়াতে তার তাসগুলো শান্তভাবে রাখে পুরোন এক ছুতোরের বেঞ্চিতে, আর ওদিকে যতটা না মুগ্ধভাবে তার চয়ে বেশি বিরক্ত হয়ে ছেলেটা তার পাশে বসে থাকে। হঠাৎ করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি ছোঁয় তাকে। 'বাপ্‌স্‌,' সত্যি সত্যি-ই চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটা, আর কেবল এটুকুই বলতে পারে সে। হোসে আর্কাদিওর মনে হয় তার হাড়গুলো ভরে উঠেছে ফেনায়, এক অবশ-বিবশ ভয়ে আর কেঁদে ওঠার এক ভয়ানক ইচ্ছেয়। মেয়েটি কোনো ইশারা-ইঙ্গিত করেনি। কিন্তু হোসে আর্কাদিও সারা রাত ধরে বসে থাকে তার জন্যে, তার বগলের ধোঁয়ার গন্ধের জন্যে, যে-গন্ধ বন্দি হয়ে গেছে তার ত্বকের নিচে। তার ইচ্ছে হয় সারাক্ষণই থাকে সে মেয়েটির সঙ্গে, চায়, সে তার মা হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের দু'জনের জন্যে চায় সেই শস্যগোলা থেকে যেন কখনো না বেরোয় তারা, আর মেয়েটির জন্যে চায় সে যেন তার উদ্দেশে বলে ওঠে 'বাপ্‌স্‌!' একদিন আর ব্যাপারটা সহ্য হয় না তার, মেয়েটার খোঁজে তার বাড়ি গিয়ে হাজির হয় সে। রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করতে যায় সে, কিন্তু বৈঠকখানায় বোকার মতো বসে থাকে একটা কথাও না বলে। সেই মুহূর্তে সেই রমণীর জন্যে কোনো কামনা থাকে না তার মধ্যে। তাকে পায় সে অন্য চেহারায়, তার গন্ধে যে-প্রতিমূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন অবস্থায়, যেন সে অন্য কেউ। কফি খেয়ে বিষণ্ন মনে বেরিয়ে আসে সে বাড়িটা থেকে। সেই রাতে, না ঘুমিয়ে শুয়ে থাকার ভয়ংকর মুহূর্তগুলোয়, জান্তব ব্যগ্রতায় মেয়েটিকে কামনা করে সে আবার, কিন্তু শস্যগোলায় সে যেমন ছিল সেই চেহারায় তাকে কামনা করে না সে, করে সেই বিকেলে সে যেমন ছিল সেই অবস্থায়।

দিন কতেক পর, মেয়েটি হঠাৎ ডেকে পাঠায় তাকে তার বাড়িতে—সেখানে তখন তার মা ছাড়া আর কেউ ছিল না—তারপর একতাড়া তাস দেখানোর অছিলায় নিয়ে আসে শোবার ঘরে। এরপর এমন যথেচ্ছভাবে তাকে সে ছোঁয় যে প্রাথমিক শিহরণের পর একটা মতিবিভ্রমে ভোগে হোসে আর্কাদিও, আনন্দের চেয়ে ভয়-ই পায় বেশি। সে-রাতে তাকে দেখা করতে বলে মেয়েটি, তাড়াতাড়ি পালাবার জন্যে প্রস্তাবটায় রাজি হয়ে যায় সে, যদিও জানে যাওয়ার সাধ্য নেই তার। কিন্তু সেই রাতে, নিজের কণ্টকশয্যাতে শুয়ে সে বুঝতে পারে যেতেই হচ্ছে তাকে মেয়েটার কাছে, এমনকি যাওয়ার শক্তি তার না থাকলেও। অন্ধকারে তার ভাইয়ের শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, পাশের ঘরে তার বাবার কাশি, উঠোনে মুরগিগুলোর হাঁসফাঁস আর মশার গুনগুন, নিজের বুকের ধড়ফড়ানি, আর এর আগে পর্যন্ত খেয়াল না-করা এক জগতের নিরন্তর শোরগোল শুনতে শুনতে, হাতড়ে হাতড়ে পোশাক গায়ে চাপায় সে, তারপর বেরিয়ে পড়ে ঘুমন্ত রাস্তায়। তার সমস্ত মন-প্রাণ তখন চাইছে দরজাটা হুড়কো আঁটা থাকুক, মেয়েটি তাকে যেমনটি বলেছিল তেমন স্রেফ ভেজানো নয়। কিন্তু দেখা যায় সেটা খোলা। আঙুলের ডগা দিয়ে ঠেলা দেয় সে দরজার পাল্লায়, আর তার বুকের ভেতর একটা জমাট প্রতিধ্বনি তুলে বিলাপভরা পষ্ট এক গোঙানিতে কব্জাগুলো বশ মেনে নেয়। পাশ ফেরানো শরীরে, কোনো শব্দ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা নাকে আসে তার। দরদালানেই দাঁড়ানো সে তখনো, মেয়েটির তিন ভাই সেখানে এমনভাবে দোলখাটিয়া ঝুলিয়েছে যে সে ওগুলো দেখতে পায় না, আর শোবার ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে বিছানাটার নির্ভুল নিশানা খুঁজে পেতে অন্ধকারে পথ হাতড়ে যাওয়ার সময় সেগুলো ঠাহরও করতে পারে না সে। হঠাৎই পেয়ে যায় সে বিছানাটা। দোলখাটিয়ার দড়িতে ধাক্কা খায় সে; যেখানে ভেবেছিল তার চেয়ে নিচুতে দড়িগুলো, আর এক লোক তখনো নাক ডেকে যাচ্ছিল, ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে খানিকটা বিভ্রান্তির সুরে সে বলে ওঠে, 'বুধবার ছিল সেদিন।' শোবার ঘরের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজাটা ঠেলে খোলার সময় অমসৃণ মেঝেতে সেটার ঘষা খাওয়া ঠেকাতে পারে না হোসে আর্কাদিও। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এক নিরুদ্যম স্মৃতিকাতরতার সঙ্গে সে বুঝে যায় যে একেবারে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে সে। সংকীর্ণ সেই ঘরটায় ঘুমিয়ে রয়েছে মা, আর এক কন্যা, তার বর আর দুই বাচ্চা, আর সেই রমণী, যে হয়ত ওখানে না-ও থাকতে পারতো। খুবই বিভ্রান্তিকর অথচ সেই সঙ্গে খুবই পষ্ট সেই গন্ধটা ধরে ধরে হোসে আর্কাদিও নিজেই পথ চিনে নিতে পারতো, যদি না গোটা বাড়িতেই ছড়িয়ে থাকতো সেটা, ঠিক যেমনভাবে তার নিজের গায়েই লেগে থাকতো সেটা সব সময়। অনেকক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে সে, ভয়ে ভয়ে ভাবছে কী করে এই সর্বনাশের অতল কূপে এসে পড়েছে সে এমন সময় টান টান আঙুলসহ আর অন্ধকারে হাতড়ে চলা একটা হাতের ছোঁয়া লাগে তার মুখে। অবাক হয় না হোসে আর্কাদিও, কারণ নিজের অজান্তেই ব্যাপারটা আশা করছিল সে। এরপর সেই হাতটার কাছেই নিজেকে ছেড়ে দেয় সে, বিধ্বস্ত অবস্থার এক চূড়ান্ত পর্যায়ের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেতে দেয় আরেক আকৃতিহীন স্থানে, সেখানে খুলে ফেলা হয় তার কাপড়-চোপড়, আর এক বস্তা আলুর মতো তুলে ছুঁড়ে দেয়া হয় তাকে আঁধারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, সেখানে হাতদুটোর কোনো কাজ নেই, নারীর গন্ধের বদলে রয়েছে অ্যামোনিয়ার গন্ধ, আর সেখানে সেই রমণীর মুখটা মনে করতে গিয়ে সামনে পায় সে উরসুলার মুখ, বিভ্রান্তিকরভাবে সচেতন যে সে এমন এক কাজে ব্যস্ত যা সে করতে চেয়েছে অনেক দিন থেকেই, কিন্তু কখনোই আসলে তা করা সম্ভব হবে বলে কল্পনা করেনি, আর সে যা করছে তা করছে কিছু না জেনেই, কারণ সে বুঝতেই পারছে না তার পা দুটো কোথায় কিংবা কোথায় তার মাথা, কিংবা কার পা বা কার মাথা, আর টের পাচ্ছে যে কিছুতেই সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছেনা তার বুকের হিমজমাট গুরু গুরু শব্দ, আর তার অন্ত্রের বায়ু, আর ভয়টাকে, রুখতে পারছেনা সেই হতবিহ্বল করা উৎকণ্ঠাটাকে যা তাকে একই সঙ্গে পালিয়ে যেতেও বলছে আবার বলছে সেই বিধ্বস্ত নৈঃশব্দ ও ভয়ংকর নির্জনতায় চিরদিনের জন্যে থেকে যেতে।

মেয়েটার নাম পিলার তারনেরা। মাকোন্দো পত্তনের মধ্যে দিয়ে যে গন-হিজরতের সমাপ্তি ঘটে, তারই অংশ সে, আর তার পরিবারের লোকজনই তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেই লোকটার হাত থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে যে-লোক চোদ্দ বছরের মেয়েটাকে ধর্ষণ করার পর তাকে আবার ভালোবেসে গিয়েছিল তার বয়স বাইশে পৌঁছুনো পর্যন্ত, যদিও কখনোই সেই ভালোবাসার কথা সবাইকে জানাতে চায়নি, কারণ লোকটা ছিল একটু অন্যরকম। দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত তারনেরার পিছু নেবে বলে হলপ করেছিল সে, কিন্তু সেটা অনেক পরে, যখন সে তার কাজ-কারবার গুছিয়ে এনেছে, আর মেয়েটাও তার জন্যে পথ চেয়ে চেয়ে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত, তিন দিন, তিন মাস, কিংবা তিন বছরের মধ্যে স্থল বা জল পথে আসবে বলে তার তাসগুলোর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক লম্বা আর বেঁটে, লাল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো চামড়ার লোকজনের সঙ্গে অষ্টপ্রহর সেই লোকটাকে মেলাতে মেলাতে। পথ চেয়ে থাকতে থাকতে হারিয়ে ফেলে সে তার উরুর তাকৎ, স্তনের দৃঢ়তা, আর কোমল স্বভাব, কিন্তু তার মনের ক্ষ্যাপামী রয়ে যায় অটুট। সেই আশ্চর্য খেলনাতে পাগলপারা হোসে আর্কাদিও ঘরটার গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে প্রতি রাতেই ছুটতো মেয়েটার পেছনে। একবার গিয়ে সে দেখে দরজাটা হুড়কো আঁটা, কাজেই টোকা দেয় সে বেশ কয়েকবার, জানে, একবার সাহস করে টোকা দিতে পারলে শেষ পর্যন্ত টোকা দিয়েই যেতেই হবে তাকে; এক অনন্ত অপেক্ষার পর দরজাটা খুলে দেয় তারনেরা। দিনের বেলায়, স্বপ্ন দেখার জন্যে শুয়ে থেকে, হোসে আর্কাদিও আগের রাতের স্মৃতি গোপনে গোপনে উপভোগ করতো। কিন্তু মেয়েটা যখন বাড়িতে আসতো—হাসিখুশি, উদাসীন, গপ্পোবাজ—নিজের চাপা উত্তেজনা লুকোবার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতে হতো না হোসে আর্কাদিওকে, কারণ তখন সেই রমণীর সঙ্গে, যার বিস্ফোরক হাসিতে ভয় পেয়ে ঘুঘুরা পালায়, তার সঙ্গে সেই অদৃশ্য শক্তির কোনো সম্পর্ক থাকতো না যা তাকে শিখিয়েছে কী করে শ্বাস নিতে হয় ভেতর থেকে, আর শাসন করা যায় নিজের বুকের ধড়ফড়ানি, আর যা তাকে বুঝতে দিয়েছে লোকে কেন মরতে ভয় পায়। নিজের মধ্যেই সে এমনভাবে গুটিয়ে ছিল যে তার বাবা আর ভাই যখন এই খবরে গোটা বাড়িতে সাড়া ফেলে দেয় যে ধাতব জঞ্জাল ভেদ করে উরসুলার সোনা আলাদা করতে পেরেছে তারা, তখন সে এমনকি বুঝতেও পারে না সবার খুশির কারণ।

ঝকমারিভরা, আদাজল খেয়ে লেগে থেকে বেশ কিছুদিন ব্যয় করে তবেই সফল হয়েছে তারা। উরসুলা তো খুশি হয়েই, সে এমনকি আলকিমিয়া জিনিসটার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানায়, ওদিকে গাঁয়ের লোকজন ভেঙে পড়ে পরীক্ষাগারে, আর অবাক করা ব্যাপারটা উদ্‌যাপন করতে পেয়ারার জেলি মাখানো মচমচে বিস্কুট দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হয়, আর হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ওদেরকে দেখায় ফিরে পাওয়া সোনাসহ মুচিটা, যেন সে এইমাত্র আবিষ্কার করেছে জিনিসটা। চারপাশের সবাইকে দেখিয়ে সবশেষে সেটা সে তার বড় ছেলের সামনে রাখে, গত ক'দিন যে পরীক্ষাগারে একবারের জন্যেও ঢুঁ মেরেছে কিনা সন্দেহ। শুকনো, হলদে জিনিসটা তার চোখের সামনে তুলে ধরে সে শুধোয়, 'এটা দেখে কী মনে হচ্ছে তোর বল দেখি।' হোসে আর্কাদিও আন্তরিকভাবেই জবাব দেয়:

'কুকুরের গু।'

হাতের উল্টো পিঠের এক চড়ে তার বাবা রক্ত আর চোখের পানি বের করে ছাড়ে তার। সে-রাতে পিলার তারনেরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বোতল আর তুলো খুঁজে নিয়ে আর্নিকার পট্টি লাগিয়ে দেয় ফুলে ওঠা জায়গাটায়, সেই সঙ্গে, ব্যথা না দিয়ে তাকে ভালোবাসার চেষ্টায় তার সঙ্গে যা খুশি তাই করে যায়, যতক্ষণ না বিরক্ত হয়ে ওঠে হোসে আর্কাদিও। অন্তরঙ্গতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় ওরা দু'জন যে পরে, নিজেরা সেকথা উপলব্ধি না করেই, একে অন্যের কানে ফিসফিসিয়ে কথা বলে চলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার সঙ্গে একলা থাকতে চাই আমি,' হোসে আর্কাদিও বলে। 'এই লুকোচুরি খেলাটার যাতে আর কোনো দরকার না পড়ে সেজন্যে সব্বাইকে একদিন কথাটা জানিয়ে দেবো আমি।'

পিলার তারনেরা বলে যেতে দেয় ওকে।

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়,' সে বলে। 'আমরা দু'জন যখন একা হবো তখন বাতিটা জ্বালিয়েই রাখতে পারবো, যাতে দু'জন দু'জনকে দেখতে পাই, তাছাড়া তখন কারো কোনো বাগড়া ছাড়াই চেঁচামেচি করতে পারবো ইচ্ছে মতো, আর তুমিও আমার কানে কানে বলতে পারবে তোমার মনে আসা যে-কোনো আজেবাজে কথা।'

সেই আলাপচারিতা, বাবার ওপরে অসহ্য বিদ্বেষ, আর বুনো প্রণয়ের এক অত্যাসন্ন সম্ভাবনা ওর মধ্যে জাগিয়ে দেয় এক প্রশান্ত সাহস। আগেভাগে কোনো কিছু না ভেবেই, নিজে থেকেই সব কিছু খুলে বলে সে তার ভাইয়ের কাছে।

কিশোর অরেলিয়ানোর কাছে প্রথমে কেবল সেই ঝুঁকিটা, তার ভাইয়ের বেপরোয়া অভিযানটার সঙ্গে জড়িত বিপদের সম্ভাবনাটাই ধরা পড়ে, বিষয়টার আকর্ষণ যে কোথায় সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে। একটু একটু করে উদ্বেগটা সংক্রমিত হয় তার মধ্যেও, উথাল-পাথাল ভাবতে থাকে সে বিপদটার নানান খুঁটিনাটি নিয়ে, নিজেকে এক করে ফেলে সে তার ভাই-এর যন্ত্রণা আর আনন্দের সঙ্গে, শংকিত আর সুখী বোধ করে সে। জলন্ত অঙ্গার হয়ে ওঠা নিঃসঙ্গ শয্যায় ভোর পর্যন্ত জেগে থাকে সে ভাই-এর অপেক্ষায়, আর দু'জনে মিলে আলাপ চালিয়ে যায় বিছানা ছাড়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত, কাজেই শিগ্গিরই তাদের দু'জনকেই পেয়ে বসে একই ঢুলুনিতে। আলকিমিয়া আর তাদের বাবার জ্ঞানগম্যির ওপর একই অনীহা জন্মে তাদের, দু'জনেই তারা আশ্রয় নেয় নিঃসঙ্গতার কাছে। উরসুলা বলে, 'ছোঁড়া দুটোর মাথা বিগড়ে গেছে। পেটে নির্ঘাত কৃমি হয়েছে ওদের।' ঝাঁঝাল একটা দাওয়াই বানায় সে ওদের জন্যে পেষা ওয়ার্মসীড দিয়ে, দু'জনেই তা খেয়ে নেয় এক অদৃষ্টপূর্ব নির্লিপ্তির সঙ্গে, তারপর একই দিনে একই সঙ্গে দু'জন এগারবার বসে গিয়ে নিজের নিজের গামলার ওপর, লাল রঙা কিছু পরজীবী ত্যাগ করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় মহা উল্লাসে, কারণ, তাতে করে তাদের বিক্ষিপ্ত দশা আর ঢুলুনির উৎসের ব্যাপারে উরসুলা ধোঁকা খেয়ে যায়। ততদিনে অরেলিয়ানো যে কেবল ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে তা নয়, সে তার ভাই-এর অভিজ্ঞতার ভেতরেই বাস করে যাচ্ছে, খানিকটা তার নিজেরই অভিজ্ঞতা হিসেবে। কারণ একবার তার ভাই যখন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে চলেছে ভালোবাসার কার্যকারণ, সে বাগড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করে বসে, 'কেমন লাগে রে আসলে ব্যাপারটা?' হোসে আর্কাদিও চটজলদি উত্তর দিয়ে বলে:

'ভূমিকম্পের মতো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানুয়ারি মাসের এক বৃহস্পতিবার রাত দুটোর সময় জন্ম নেয় আমারান্তা, আঁতুড়ঘরে কেউ ঢোকার আগেই উরসুলা তাকে ভালো করে খতিয়ে দেখে। মেয়েটা গিরগিটির মতো হালকা, স্বচ্ছ, কিন্তু তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মানুষের। বাড়িটা লোকে ভরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নতুন ব্যাপারটা খেয়াল করে না অরেলিয়ানো। এগারোটা থেকেই তার ভাই বিছানায় নেই, তার খোঁজে বেরোয় সে হৈ-হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে, আর সিদ্ধান্তটা সে এমনই ঝোঁকের মাথায় নেয় যে পিলার তারনেরার শোবার ঘর থেকে তাকে কিভাবে বের করে আনবে এই কথাটাও ভাবার সময় পায়নি সে। গোপন সংকেতে শিষ বাজিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে পাক খায় সে বাড়িটা ঘিরে, শেষ অব্দি ভোর হয় হয় অবস্থায় বাধ্য হয়ে ফিরে আসে বাড়িতে। হোসে আর্কাদিওকে আবিষ্কার করে সে মায়ের কামরায়, সরলতায় নুয়ে পড়া মুখে খেলছে সে তার নবজাত ছোট বোনের সঙ্গে।

উরসুলা তার চল্লিশ দিনের বিশ্রাম সেরে উঠেছে কি ওঠেনি, এমন সময় ফিরে আসে জিপসিরা। বরফ নিয়ে এসেছিল যারা, সেই একই দড়াবাজ আর ভোজবাজিকর জিপসি এরা। মেলকিয়াদেসের দল যা করেনি, খুব শিগ্‌গিরই ওরা বুঝিয়ে দেয়, প্রগতির ধ্বজাধারী নয়, বরং আমোদ-প্রমোদের যোগানদার তারা। এমনকি যেবার বরফ নিয়ে এসেছিল তখনো কিন্তু মানুষের জীবনে দরকারি বলে সেটার কথা প্রচার করেনি তারা, করেছিল মামুলি সার্কাসী দ্রষ্টব্য হিসেবেই। এবার আরো অনেক কারিগরির সঙ্গে এনেছে ওরা একটা উড়ন্ত গালিচা। কিন্তু সেটাকে তারা যানবাহনের উন্নতির একটা মৌলিক অবদান হিসেবে পেশ করে না, করে চিত্তবিনোদনের একটা বস্তু হিসেবে। গাঁয়ের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে একটা ত্বরিত আকাশভ্রমণের সুযোগ নিতে লোকজন সব একসঙ্গে খুঁড়ে তোলে তাদের শেষ সোনার মোহরগুলো। সম্মিলিত ডামাডোলের আনন্দদায়ক আড়ালের সুরক্ষায় সুখের অগুনতি প্রহর পার করে দেয় হোসে আর্কাদিও আর পিলার তারনেরা। বারোয়ারি লোকজনের মধ্যে সুখী দুই কপোত-কপোতী ওরা, আর তারা এমনকি একথাও ভাবতে থাকে যে তাদের নিভৃত রাত্রির বুনো কিন্তু ক্ষণিক সুখের চেয়ে ভালোবাসা অনেক বেশি সুখকর আর গভীর এক অনুভূতির ব্যাপার হতে পারে। অবশ্য পিলার সে-সম্মোহনটা ভেঙে দেয়। তার সংসর্গে থাকাকালীন হোসে আর্কাদিও যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছে তারই উস্কানিতে গুলিয়ে ফেলে সে স্থান-কাল, আর হঠাৎ করেই গোটা জগতটাকে আছড়ে ফেলে সে তার মাথার ওপর। 'এতোদিনে তুমি সত্যিকারের মরদ হলে,' সে বলে তাকে। কিন্তু হোসে আর্কাদিও তার কথার অর্থ বুঝতে না পারায় ব্যাপারটা ভেঙে বলতে হয় তাকে।

'বাবা হতে যাচ্ছো তুমি।'

বেশ কিছু দিন বাড়ি থেকে বেরোবার সাহস হয় না হোসে আর্কাদিওর। রান্নাঘর থেকে পিলার তারনেরার ঘর-দোলানো হাসি ভেসে এলো তো ওমনি সেই পরীক্ষাগারে গিয়ে আশ্রয় নেবে হোসে আর্কাদিও, যেখানে উরসুলার বদান্যতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলকিমিয়ার কারিগরি আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তার বেপথু পুত্রকে খুশির সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, তারপর দীক্ষা দেয় তাকে পরশপাথর আবিষ্কারের কাজে, যে-কাজটা শেষ পর্যন্ত হাতে নিয়েছিল সে। একদিন বিকেলে, এক জিপসি আর গ্রামের বেশ কিছু শিশুকে নিয়ে পরীক্ষাগারের জানলার উচ্চতা বরাবর উড়ে যাচ্ছিল উড়ন্ত গালিচাটা, জিপসি লোকটাই চালাচ্ছিল সেটা, আর শিশুগুলো হাত নেড়ে যাচ্ছিল মহা উল্লাসে; তো, বাড়ির বাচ্চারা খুব মেতে ওঠে সেটা নিয়ে, কিন্তু হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সেদিকে একবার ফিরেও তাকায় না। সে বলে ওঠে, 'ওরা ওদের স্বপ্ন দেখে যাক। যাচ্ছেতাই এক চাদরের চেয়ে আরো ভালো বৈজ্ঞানিক কারিগরি দিয়ে ওদের চেয়ে জবরদস্ত ওড়া উড়বো আমরা।' হোসে আর্কাদিও তার ছদ্ম আগ্রহ সত্ত্বেও পরশপাথরের ক্ষমতাটা ঠাহর করে উঠতে পারেনি কখনো, তার কাছে ওটাকে যেনতেনভাবে আগুনে গলানো একটা বোতল বলেই মনে হয়েছে। নিজের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি জোটে না তার। বদমেজাজী হয়ে পড়ে সে, ঠিক তার বাবা যেমন হয়েছিল তার প্রকল্পগুলো মাঠে মারা যাওয়ার সময়, আর এমনই মনমরা হয়ে পড়ে সে যে আলকিমিয়া নিয়ে সে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছে ভেবে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া নিজেই তাকে তার পরীক্ষাগারের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে দেয়। অরেলিয়ানো অবশ্য ঠিকই ধরে ফেলে যে তার ভাই-এর দুর্দশার উৎস পরশপাথরের অনুসন্ধানের মধ্যে নেই, কিন্তু আসল কথাটা তাকে তার ভাই খুলে বলে না। আগের সেই স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলেছিল হোসে আর্কাদিও। সহযোগী আর আলাপী এক মানুষ থেকে হয়ে উঠেছে সে উদাসীন আর বৈরী। একাকিত্বের জন্যে হন্যে হয়ে জগতের ওপর তীব্র ঘৃণায় ফুঁসে উঠে একরাতে বরাবরের মতো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে, কিন্তু পিলার তারনেরার বাড়িতে যায় না সে, যায় মেলার তুমুল কোলাহলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। তাবৎ কিসিমের উদ্ভটদর্শন যন্ত্রের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে, কিন্তু সেগুলোর একটাতেও আকৃষ্ট না হয়ে এমন একটা জিনিসে তার চোখ আটকে যায় যেটা আদৌ এসবের অংশ নয়: একেবারে উঠতি বয়েসের এক জিপসি কন্যা, প্রায় বাচ্চাই বলা যায়, রুদ্রাক্ষের মালার ভারে নুয়ে পড়া, আর হোসে আর্কাদিওর জীবনে দেখা সবচেয়ে অপরূপা। বাপ-মায়ের কথার অবাধ্য হওয়ায় সাপ হয়ে যাওয়া এক লোকের করুণ খেলা দেখছে কিছু লোক ভিড় করে, সেই জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েচে মেয়েটা।

খেলার দিকে হোসে আর্কাদিওর মন নেই। সর্প-মানবের করুণ জেরা চলছে, এই সময় সে ভিড় ঠেলে চলে আসে প্রথম সারিতে, যেখানে মেয়েটা আছে, তারপর তার পেছনে গিয়ে থামে। মেয়েটার পিঠে গা ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায় মেয়েটা, কিন্তু আরো জোরে তার পিঠে গা ঠেস দেয় হোসে আর্কাদিও। তখনই তার পুরষাঙ্গের ছোঁয়া পায় মেয়েটো। স্থির হয়ে হোসে আর্কাদিওর গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে সে, থরথর করে কাঁপছে বিস্ময়ে আর ভয়ে, সাক্ষাৎ প্রমাণটাকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, আর শেষ পর্যন্ত সে তার মাথাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরিয়ে কাঁপা কাঁপা একটা হাসি হাসে তার দিকে চেয়ে। ঠিক তখনি দুই জিপসি সর্প-মানবকে খাঁচায় পুরে ফেলে বয়ে নিয়ে যায় তাঁবুর মধ্যে। যে-জিপসি খেলা দেখাচ্ছিল সে ঘোষণা দেয়:

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আমরা আপনাদের দেখাবো সেই রমণীর ভয়ংকর খেলা যার মাথা দেড়শো বছর ধরে প্রত্যেকদিন রাতের বেলা ঠিক এই সময়ে কেটে ফেলা হয় যা তার দেখা উচিৎ নয় তাই দেখার শাস্তি হিসেবে।'

হোসে আর্কাদিও আর জিপসি কন্যা গর্দান নেয়া দেখে না, তারা মেয়েটার তাঁবুতে ঢুকে একে অন্যকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় তীব্র কামনা নিয়ে, খুলে ফেলে গায়ের বসন-ভূষণ। মেয়েটা তার গায়ের মাড়-দেয়া লেসের অন্তর্বাসটা খুলে ফেলে সত্যিকার অর্থেই নেই হয়ে যায়। অবসাদে নেতানো এক ব্যাঙাচি সে, বুকে সদ্য ওঠা স্তন, আর পা দুটো তার এতোই রোগা যে হোসে আর্কাদিওর বাহুর সঙ্গেও তুলনীয় নয়, কিন্তু মেয়েটার এমন একটা জোর আর আন্তরিকতা রয়েছে যে তাতে তার পল্‌কা ভাবটা পুষিয়ে যায়। তারপরেও হোসে আর্কাদিও সিঁটিয়ে থাকে মেয়েটার কাছ থেকে, তার কারণ, ওরা রয়েছে বারোয়ারি এক ধরনের তাঁবুতে, জিপসিরা সেটার মধ্যে দিয়ে সার্কাসের সরঞ্জাম নিয়ে আসা-যাওয়া করছে, তাদের বেচাকেনা চালাচ্ছে, আর এমনকি এক দান পাশা খেলার জন্যে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। মধ্যেখানের খাম্বা থেকে ঝুলে থাকা প্রদীপটা গোটা জায়গাটা আলো করে রেখেছে। জড়াজড়ির এক ফুরসতে, কী করবে ভেবে না পেয়ে, নগ্ন অবস্থায় খাটিয়ায় গিয়ে টান টান হয় হোসে আর্কাদিও, ওদিকে মেয়েটা চেষ্টা চালিয়ে যায় তাকে উত্তেজিত করতে। খানিক পর মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো গা-গতরের এক জিপসি রমণী এমন এক পুরুষ মানুষ সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢোকে যে ক্যারাভানের নয়, এমনকি গাঁয়েরও নয়, আর তারা দু'জনেই বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করে। নিজের অজান্তেই রমণীটি হোসে আর্কাদিওর দিকে তাকায়, তারপর একটা করুণা জাগানো ব্যগ্র ধরনে আয়েশরত তার অপূর্ব জন্তুটা খতিয়ে দেখে।

'ওরেব্বাস!' চেঁচিয়ে ওঠে সে অবাক হয়ে। 'যেমন আছিস তেমনই যেন রাখে তোকে ঈশ্বর।'

হোসে আর্কাদিওর সঙ্গিনী সেই দু'জনকে বলে তারা যেন তাদেরকে একা থাকতে দেয়। কাজেই সেই দু'জন তখন মাটিতে শুয়ে পড়ে। ওদের অনুরাগ হোসে আর্কাদিওর উত্তেজনা জাগিয়ে দেয়। প্রথম সংস্পর্শে মেয়েটার হাড়গোড় যেন এক বাক্স ডমিনো-র আওয়াজের মতো এলোপাথাড়ি এক কড়মড় শব্দে খুলে খুলে আসে, সেই সঙ্গে একটা বিষণ্ণ বিলাপ আর কাদামাটির হালকা গন্ধ নিঃশ্বাসের মতো মেয়েটার সমস্ত শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়তে মেয়েটার গায়ের চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসে পাণ্ডুর ঘাম, আর চোখদুটো ভিজে আসে জলে। কিন্তু স্বভাবের এক দৃঢ়তায় আর সাহসের জোরে ধাক্কাটা সামলে নেয় মেয়েটা। হোসে আর্কাদিও অনুভব করে যে সে শূন্যে, তুরীয় প্রেরণার এক স্তরের দিকে উঠে গেছে, সেখানে তার বুকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেটে পড়ছে আদুরে সব খিস্তির এক ধারাস্রোত নিয়ে, আর সেগুলো মেয়েটার কান দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে মেয়েটার নিজের ভাষায় তরজমা হয়ে। এটা বৃহস্পতিবারের ঘটনা। মাথায় একটা লাল কাপড় জড়িয়ে নিয়ে শনিবার রাতে জিপসিদের সঙ্গে উধাও হয়ে যায় হোসে আর্কাদিও।

সে যে নেই সেটা টের পেয়ে সারা গ্রামে হোসে আর্কাদিওর খোঁজে তল্লাশি চালায় উরসুলা। নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়া ওঠা ছাইগাদার ভেতর একটা আবর্জনার স্তূপ ছাড়া জিপসি ছাউনির অবশেষটুকুতে প্রায় কিছুই নেই তখন। সেই আবর্জনার মধ্যে পুঁতির দানা খুঁজতে থাকা একজন লোক উরসুলাকে জানায়, আগের রাতে সে তার ছেলেকে ক্যারাভানের হৈ-হল্লার মধ্যে সর্প-মানবের খাঁচাটাকে একটা গরুর গাড়িতে ঠেলে ওঠাতে দেখেছে। উরসুলা চেঁচিয়ে স্বামীকে জানায়, 'জিপসি হয়ে গেছে ছেলেটা!' কিন্তু তার উধাও হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে।

হাজারবার গুঁড়ো করা আর বার বার গরম করে আবারো গুঁড়ো করা একটা জিনিস তার হামানদিস্তায় গুঁড়ো করতে করতে সে বলে, 'আমি চাই ব্যাপারটা যেন সত্যি হয়। এভাবেই পুরুষ মানুষ হতে শিখবে ও।'

জিপসিরা কোথায় গেছে তার খোঁজ শুরু করে দেয় উরসুলা। এখনো ওদের নাগাল ধরার সময় আছে ভেবে তাকে দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে হাঁটে আর জিজ্ঞেস করে করে এগোয় সে। কিন্তু গ্রাম থেকে দূরে সরে যেতে যেতে একসময় এতোই দূরে চলে যায় যে শেষে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তার। রাত আটটায় সারের একটা বেড-এ সেই জিনিসটা গরম করার রেখে, কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙে যাওয়া ক্ষুদে আমারান্তার কী হয়েছে সেটা দেখার জন্যে ওঠার আগ পর্যন্ত হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া টেরই পায় না যে তার বৌ লাপাত্তা। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি একদল লোক জোগাড় করে ফেলে সে. নিজে থেকেই আমারান্তাকে মাই দিতে এগিয়ে আসা এক মহিলার হাতে তাকে তুলে দিয়ে অদৃশ্য পথ ধরে উধাও হয়ে যায় উরসুলার খোঁজে। অরেলিয়ানো-ও যায় ওদের সঙ্গে। ইন্ডিয়ান কিছু জেলে--তাদের ভাষা ওরা বুঝতে পারে না--ওদেরকে ইশারায় জানায় যে তারা কাউকে যেতে দেখেনি। তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর ফিরে আসে তারা গ্রামে।

বেশ কয়েক হপ্তা ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে কাটে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার। মায়ের মতো করেই দেখাশোনা করে ছোট্ট আমারান্তার, তাকে গোসল করায়, তার জামা-কাপড় পাল্টে দেয়, দিনে চারবার তাকে নিয়ে যায় মাই খাওয়াতে, আর রাতের বেলা এমন সব গান তাকে গেয়ে শোনায় যেসব গান উরসুলাও কখনো গাইতে পারতো না। উরসুলা ফিরে না আসা পর্যন্ত গেরস্থালি কাজকর্মে হাত লাগাবার জন্যে পিলার তারনেরা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে একবার। এই দুর্ঘটনাটার কারণে অরেলিয়ানোর রহস্যময় স্বজ্ঞাটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, পিলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারনেরাকে ঢুকতে দেখে অলৌকিক ক্ষমতার একটা দীপ্তি অনুভব করে সে। আর তখনই সে কোনো এক অব্যাখ্যাত উপায়ে বুঝে যায় যে এই মেয়েটাই তার ভাইয়ের অন্তর্ধানের জন্যে দায়ী, তখন এক নিঃশব্দ, অপ্রশম্য বৈরিতার সঙ্গে তাকে সে এমনভাবে হেনস্থা করে যে পিলার তারনেরা আর ও-বাড়িমুখো হয় না।

সময়ই সবকিছু ঠিকঠাক করে দেয়। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার ছেলে বলতে পারবে না ঠিক কখন ফিরে যায় তারা পরীক্ষাগারে, ঝাড়মোছ করতে শুরু করে জিনিসপত্র, ভারমুক্ত করতে থাকে পানির পাইপটাকে, আর ফের জড়িয়ে যায় কয়েক মাস ধরে সারের বেড়ে ঘুমিয়ে থাকা জিনিসটাকে বাগে আনার কাজে, এমনকি আমারান্তাও তার বেতের ঝুড়িতে শুয়ে শুয়ে চোখে কৌতূহল নিয়ে তার বাবা আর ভাই-এর একমনে কাজ করে যাওয়া দেখতে থাকে ছোট্ট সেই ঘরে যেখানে বাতাস ভরে উঠেছে পারদের বাষ্পে। উরসুলার প্রস্থানের কয়েক মাস পর একদিন অবাক করা সব কাণ্ড ঘটতে থাকে। একটা আলমারিতে বহুদিন পড়ে থাকা বিস্মৃত একটা খালি ফ্লাস্ক এতো ভারি হয়ে ওঠে যে সেটাকে আর নাড়ানোই যায় না। কাজ করার টেবিলে রাখা এক পাত্র পানি সেটার নিচে কোনো আগুন-টাগুন ছাড়াই আধ ঘণ্টা ধরে ফুটতে ফুটতে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে বাষ্প হয়ে যায়। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার ছেলে অবাক উত্তেজনা নিয়ে ঘটনাগুলো দেখে যায়, যদিও সেসবের কোনো ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করাতে পারে না, ধরে নেয় এসব বুঝি সেই জিনিসটিরই ভবিষ্যদ্বাণী। একদিন আমারান্তার ঝুড়িটা আপনা থেকেই চলতে শুরু করে আর ঘরের মধ্যেই পুরো একটা পাক খায় অরেলিয়ানোকে আঁতকে দিয়ে। হুড়মুড় করে ছোটে সে ওটাকে থামাতে। কিন্তু তার বাবা ঘাবড়ায় না। দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঘটনাটা খুব শিগগিরই ঘটতে যাচ্ছে, এই বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ঝুড়িটা সে জায়গা মতো রেখে দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখে। সেদিনই অরেলিয়ানো তার বাবাকে বলতে শোনে:

'ঈশ্বরকে যদি ভয় না পাস তো ধাতুর ভেতর দিয়ে তাকে ভয় কর।'

হঠাৎ করে, অন্তর্ধানের পাঁচ মাস পর ফিরে আসে উরসুলা। ফিরে আসে সে উচ্ছল আর পুনর্যৌবনা হয়ে, এমন ধরনের নতুন পোশাক-আশাক পরে যার চল সে-গ্রামে নেই। ঘটনাটার অভিঘাতে উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার। 'এই তো!' গলা ফাটিয়ে বলে ওঠে সে। 'জানতাম ব্যাপারটা ঘটবেই ঘটবে।' আসলেই বিশ্বাস করেছিল সে ব্যাপারটা, কারণ তার দীর্ঘ বন্দিদশায় সেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করার সময় বুকের গভীর থেকেই সে চাইছিল যে বহুকাঙ্ক্ষিত অলৌকিক ব্যাপারটা যেন পরশপাথর আবিষ্কার বা ধাতুকে জ্যান্ত করে তোলা নিঃশ্বাসমোচন, কিংবা বাড়ির কব্জা আর তালাগুলোকে সোনায় পরিণত করার ক্ষমতা না হয়, বরং সেটা যেন হয় এই মুহূর্তে যা ঘটল তাই: উরসুলার ফিরে আসা। উরসুলার গায়ে কিন্তু এই উত্তেজনার কোনো আঁচই লাগে না। সাদামাটা একটা চুমো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খায় সে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে, যেন মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্যে কোথাও গিয়েছিল সে, আর তারপর বলে ওঠে:

'দরজার বাইরে তাকাও।'

রাস্তায় বেরিয়ে জটলাটা দেখে হতভম্ব দশাটা কাটতে মেলা সময় লাগে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার। জিপসি নয় এরা। অন্য সবার মতো সাধারণ নারী-পুরুষ, সিধে চুল, গায়ে গতরে কালো, কথা বলে একই ভাষায় আর তাদের অভাব-অভিযোগগুলোও এক। তাদের খচ্চরগুলো নুয়ে পড়েছে খাবার জিনিসের ভারে, গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে আছে আসবাবপত্র আর গেরস্থালি বাসন-কোসনে, নিত্যদিনের ফেরিওয়ালাদের হাঁকাহাঁকি ছাড়াই বিক্রির জন্যে রাখা নিখাদ আর সাদামাটা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রে। এসেছে ওরা মাত্র দু'দিনের দূরত্ব পেরিয়ে, জলাটার ওধার থেকে, বছরের প্রতিমাসেই ডাক পৌছোয় এমন সব শহর রয়েছে সেখানে, তাছাড়া উন্নত জীবনযাপনের উপকরণগুলো সেখানকার লোকজনের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। জিপসিদের নাগাল উরসুলা ধরতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু পেয়ে গিয়েছিল সেই রাস্তাটা যেটা তার স্বামী সেই অসাধারণ আবিষ্কারগুলোর নিষ্ফল অনুসন্ধানের সময় খুঁজে বের করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মানোর দুই হপ্তা পর তার দাদাবাড়িতে নিয়ে আসা হয় পিলার তারনেরার ছেলেকে। স্বামীর একগুঁয়েমির কাছে আরেকবার হার মেনে, বেজার মুখে বিড়বিড় করতে করতে ছেলেটাকে ঘরে তুলে নেয় উরসুলা, তার স্বামীর কাছে এই চিন্তাটাই অসহ্য ঠেকেছিল যে তার রক্তের একটা ধারা বেপথু হয়ে যাবে, তবে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া এই শর্তটাও জারি করে দেয় যে বাচ্চাটাকে কখনোই তার সত্যিকার পরিচয় জানানো যাবে না। তার নাম হোসে আর্কাদিও রাখা হলেও, যাতে কোনো বিভ্রান্তি না হয় সেজন্যে শেষ পর্যন্ত স্রেফ আর্কাদিও বলেই ডাকা হয় তাকে। শহরে সে-সময় এতো কাজ-কর্মের জোয়ার আর বাড়িতে এতো হৈ-হট্টগোল যে বাচ্চাকাচ্চার দেখাশোনাটা নেমে এসেছে গৌণ পর্যায়ে। ওদের রাখা হয়েছে এক গুয়াজিরো ইন্ডিয়ান রমণী ভিসিতাসিওঁর হেফাজতে, সে তার এক ভাইকে সঙ্গে করে এ-শহরে এসেছিল ওদের গোত্রে বেশ কয়েক বছর ধরে উৎপাত চালানো অনিদ্রা রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। ওরা দু'জনেই এমন বাধ্য আর পরোপকারী যে উরসুলা গেরস্থালি কাজকর্মে তার সঙ্গে হাত লাগানোর জন্যে বহাল করে দেয় দু'জনকে। আর্কাদিও আর আমরান্তা যে হিস্পানীর আগেই গুয়াজিরো ভাষায় কথা বলতে শেখে সেটা কেবল এজন্যেই, তাছাড়া, উরসুলার অগোচরেই তারা রপ্ত করে ফেলে গিরগিটির ক্বাথ পান আর মাকড়সার ডিম খাওয়া, কারণ সে তখন মিছরি দিয়ে তৈরি জীব-জন্তুর একটা সম্ভাবনাময় ব্যবসা নিয়ে যারপরনাই ব্যস্ত। ততদিনে বদলে গেছে মাকোন্দো। উরসুলার সঙ্গে আসা লোকজন এখানকার মাটির উর্বরতা আর জলার তুলনায় এর সুবিধেজনক অবস্থানের কথা চাউর করে দিয়েছিল, তাতে করে সাবেক আমলের এক ছোট্ট গ্রাম থেকে বদলে মাকোন্দো হয়ে উঠেছিল দোকানপাট আর কামারশালায় ভরা এক ব্যস্ত শহর আর একটা স্থায়ী বাণিজ্যিক পথ, যে-পথ ধরে আরবদের প্রথম দলটা এসে পৌঁছয় তাদের ঢোলাঢালা প্যান্ট আর কানের মাকড়ি পরে, কাকাতুয়ার বদলে কাচের জপগুটি বিনিময় করতে করতে। এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নেবার ফুসরত নেই হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার। তার কল্পনার বিশাল জগতের চেয়ে ঢের বেশি চমৎকার বলে প্রতিপন্ন হওয়া এক প্রত্যক্ষ বাস্তবতার টানে আকৃষ্ট হয়ে আলকিমিয়াবিদদের পরীক্ষাগারের ওপর থেকে সমস্ত আগ্রহ মিলিয়ে যায় তার, মাসের পর মাস ব্যবহারে কমজোরী হয়ে আসা জিনিসটাকে নিষ্কৃতি দিয়ে ফিরে যায় সেই আগের উদ্যোগী মানুষটাতে যখন রাস্তাঘাটগুলোর বিন্যাস আর নতুন ঘরগুলোর অবস্থান এমনভাবে ঠিক করেছিল সে যাতে কেউ-ই এমন কোনো সুবিধে ভোগ না করে যা সবাই পাচ্ছে না। নতুন আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকজনের মধ্যে সে এতোটাই কর্তৃত্ব বাগিয়ে ফেলে যে তার মতামত না নিয়ে কোনো ভিত্তি বসানো হতো না, হতো না দেয়াল-নির্মাণ, আর তাছাড়া, এ-ও ঠিক করা হয় যে জমি বিলি-বন্দোবস্তের দায়িত্বটা থাকবে তার হাতেই। দড়াবাজ জিপসিদের ভ্রাম্যমাণ উৎসব যখন ভাগ্য আর কাকাতালের খেলাধুলোর বিশাল এক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে, এমন সময় ফিরে আসে তারা, আর মহানন্দে বরণ করে নেয়া হয় তাদের। কারণ ধরেই নেয়া হয় যে হোসে আর্কাদিও ফিরে আসছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু হোসে আর্কাদিও ফিরে আসে না, এমনকি উরসুলা যাকে তাদের ছেলের হদিস দেয়ার একমাত্র লোক বলে ভাবতো সেই সর্প-মানবকেও নিয়ে আসেনি ওরা, কাজেই শহরে আর তাঁবু ফেলতে দেওয়া হয় না জিপসিদের, এমনকি ভবিষ্যতেও সেখানে পা ফেলা বারণ হয়ে যায় তাদের জন্যে, কারণ ভাবা হয় তারা বহুগামিতা আর বিকৃতির বাহক। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া অবশ্য একটা কথা একেবারে পষ্ট করে বলে দেয় যে, যে-লোকটা তার প্রত্ন-প্রাচীন প্রজ্ঞা আর তার আশ্চর্য সব আবিষ্কার দিয়ে গ্রামটার বেড়ে ওঠার পেছনে এতো বিরাট অবদান রেখেছে সেই মেলকিয়াদেসের আদিম গোত্রের জন্যে মাকোন্দোর দরজা অষ্টপ্রহর খোলা থাকবে। কিন্তু পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা বলে মেলকিয়াদেসের গোত্রটাকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, কারণ মানুষের জ্ঞানগম্যির সীমারেখার পরপারে চলে গিয়েছিল তারা।

নিদেনপক্ষে সেই উদ্ভট কল্পনার জ্বালাতন থেকে কিছুদিনের জন্যে মুক্তি পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া শৃঙ্খলা আর কাজকর্মের এমন একটা রীতি দাঁড় করিয়ে ফেলে যেখানে বাড়াবাড়ি বলতে ছিল কেবল ছোট্ট একটাই: শহর পত্তনের সময় থেকেই যে-প্রাণীগুলো মাকোন্দোবাসীদের সময়কে আনন্দমুখর করে রাখতো, সেই পাখিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সেগুলোর জায়গায় প্রতি বাড়িতে সুরেলা ঘড়ি বসানো। খোদাই করা কাঠের তৈরি চমৎকার ঘড়ি সেগুলো, কাকাতুয়ার বদলে ওগুলো বিক্রি করেছিল আরবরা, আর হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া এমনই নিখুঁতভাবে সেগুলোকে মিলিয়ে রাখে যে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর একই সঙ্গীতের ক্রমান্বয়িক উত্থান-পতনের ঐকতানে শহরটা হয়ে ওঠে উল্লাসমুখর, যতক্ষণ না পৌঁছয় সেটা দুপুরের একেবারে উত্তুঙ্গ মুহূর্তে, যে-দুপুরটা ঠিক একটা সম্পূর্ণ ওঅল্জ-এর মতোই নিখুঁত আর সর্বসম্মত। রাস্তার ধারে যে বাবলা গাছের বদলে অ্যালমন্ড গাছ লাগাতে হবে এই সিদ্ধান্তটাও সে-সময়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ারই নেয়া, আর সে-ই বের করেছিল, যদিও কোনোদিনই কথাটা সে কাউকে বলেনি, গাছগুলোকে চিরজীবী করার একটা উপায়। বহু বছর পর মাকোন্দো যখন দস্তার ছাদঅলা কাঠের ঘরের এক মাঠের দশায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনও সবচে' পুরনো রাস্তাগুলোয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল ভেঙে-পড়া, ধুলোময় অ্যালমন্ড গাছগুলোকে, যদিও কেউ-ই জানতো না কে লাগিয়েছিল সেগুলো। তার বাবা যখন শহরটাকে ছিরিছাঁদ দিচ্ছে আর মা ওদের ধন-দৌলত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুলে-ফাঁপিয়ে তুলছে মিছরির ছোট ছোট মোরগ আর মাছের রমরমা ব্যবসা করে—যে-ব্যবসার দরুন হপ্তায় দু'দিন বালসা কাঠের চেলায় ভরে থাকতো বাড়িটা—অরেলিয়ানো সে-সময় অন্তহীন সময় পার করে দিচ্ছে পরিত্যক্ত পরীক্ষাগারটায়, নিজে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে রপ্ত করছে রুপোর কাজ। অল্প দিনের মধ্যেই এমন লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে সে যে ছোট হয়ে গিয়েছে তার ভাইয়ের রেখে যাওয়া জামা-কাপড়, ফলে তার বাবারগুলো গায়ে চাপাতে শুরু করেছে সে, অবশ্য ভিসিতাসিওঁকে তার জামায় কুঁচি আর প্যান্টে পটি সেলাই করে দিতে হতো, কারণ অন্য সবার মতো গায়ে মেদ জমেনি তার। বয়োসন্ধি কেড়ে নিয়েছে তার গলার নরম স্বর, করে তুলেছে তাকে চুপচাপ, একান্ত নিঃসঙ্গচারী, কিন্তু অন্যদিকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে সেই তীব্র অভিব্যক্তি যা তার চোখের তারায় ঠাঁই নিয়েছিল তার জন্মের সময়। রুপোর কাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে এতোটাই মন দেয় যে খাওয়ার জন্যে পরীক্ষাগার ছেড়ে বেরুনো হতো না তার প্রায়ই। ছেলেটার নিভৃত বৈরাগ্যে উতলা হয়ে উঠে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বাড়ির চাবিগুলো আর কিছু টাকা-পয়সা এই ভেবে তার হাতে তুলে দেয় যে হয়ত মেয়েমানুষ চাই তার, কিন্তু অরেলিয়ানো টাকাটা ব্যয় করে অ্যাকোয়া রেজিয়া তৈরি করার জন্যে মিউরিয়াটিক অ্যাসিড কিনে আর চাবিগুলোর চেইন ফিরিয়ে দেয় ওগুলোতে সোনার গিলটি করে। ওর এসব বাড়াবাড়ি অবশ্য আর্কাদিও আর আমারান্তারগুলোর ধারেকাছেও ঘেঁষার যোগ্য নয়, এরিমধ্যে তাদের দ্বিতীয় দাঁত গজাতে শুরু করেছে, আর এখনো তারা দিনভর ইন্ডিয়ানদের আলখাল্লা পরে থাকবে, তাছাড়া তারা ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে হিস্পানীতে কথা বলবে না, বলবে ওয়াজিরো ভাষায়। 'তোমার কিন্তু অনুযোগ করা সাজে না,' উরসুলা তার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বাপ-মায়ের পাগলামি জন্মসূত্রে ছেলেমেয়ের ওপরই বর্তায়।' তার ছেলেগুলোর ক্ষ্যাপাটে আচার-আচরণ যে শুয়োরের লেজের মতোই ভয়ংকর এই ধারণায় নিশ্চিত হয়ে উরসুলা যখন তার বদনসিব নিয়ে আহাজারি করছে, অরেলিয়ানো তখন তার দিকে এমন চোখে তাকায় যে অনিশ্চিতির একটা আবহাওয়া ঘিরে ধরে তাকে।

'কেউ একজন আসছে,' তার ছেলে বলে তাকে। উরসুলা তার গৃহিণীসুলভ যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা খারিজ করে দিতে চায়, আরেলিয়ানো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করলেই যেমনটি সে করে থাকে। কারো আসাটা খুবই মামুলি ব্যাপার। কারো মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়েই গণ্ডা গণ্ডা লোক মাকোন্দোতে আসা-যাওয়া করছে প্রতিদিন। তারপরেও, সব যুক্তি উজিয়ে আরেলিয়ানো তার ভবিষ্যদ্বাণীতে অটল থাকে।

'সে যে কে তা জানি না,' জোর দিয়ে বলে সে বার বার, 'কিন্তু যেই হোক, সে এখন পথে আছে।'

সত্যিই, সেই রোববারে এসে পৌঁছুয় রেবেকা। মাত্র এগার বছর বয়স তার। মানাউর থেকে দুস্তর এক যাত্রায় বের হয়েছিল সে কয়েকজন চামড়ার ব্যাপারীর সঙ্গে, তারা দায়িত্ব নিয়েছিল একটা চিঠিসহ তাকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে পৌঁছে দেবার, কিন্তু কে যে এই সাহায্য চেয়েছিল সেটা তারা ঠিক-ঠাক বলতে পারে না। ছোট্ট একটা তরঙ্গ, হাতে-আঁকা ছোট ছোট ফুলঅলা একটা দোলকেদারা, আর সারাক্ষণ *খটর-খটর* আওয়াজ করে যাওয়া একটা মোটা কাপড়ের থলে, তাতে সে তার বাপ-মায়ের হাড়গোড় বয়ে বেড়ায়, ব্যস, এই হলো তার লটবহর। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে উদ্দেশ করা চিঠিটা খুবই অন্তরঙ্গ সুরে লেখা, লিখেছে এমন একজন যে-লোক সময়ের দূরত্ব সত্ত্বেও এখনো খুব পছন্দ করে তাকে আর এক মৌল মানবিক তাগিদ থেকে দয়াধর্ম দেখাতে বাধ্য হয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে উরসুলার নিরাশ্রয় অনাথা জ্ঞাতি বোনকে—তার মানে, যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ারও পরিজন, যদিও আরেকটু দূরের—কারণ মেয়েটি সেই অবিস্মরণীয় বন্ধু নিকানোর উলোয়া আর তার অতি যোগ্য সহধর্মিণী রেবেকা মাঁতিয়েল-এর (ঈশ্বর তাদের তাঁর পবিত্র রাজ্যে ঠাঁই দিন) কন্যা, আর মেয়েটি তাদেরই দেহাবশেষ বয়ে বেড়াচ্ছে খ্রিস্টিয় মতে সেগুলো গোর দেয়ায় আশায়। চিঠিতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আর যার সই আছে, সেগুলো দিব্যি পড়া যাচ্ছে, কিন্তু এইসব নামের কোনো জ্ঞাতিকুটুম্ব তাদের আছে বলে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বা উরসুলা কেউই মনে করতে পারে না, এমনকি চিঠিটা যে পাঠিয়েছে সেই নামেরও কাউকে চেনে না তারা, মানাউরের সেই দূর গ্রামের কথা তো বলাই বাহুল্য। মেয়েটার কাছ থেকে বাড়তি কোনো খবরই আদায় করা যায় না। গ্রামে পা দেয়ার পর থেকে সেই যে দোলকেদারায় বসে আছে তো আছেই, চুষে যাচ্ছে হাতের আঙুল, আর বড় বড়, ধাঁধা-লাগা চোখে পরখ করে যাচ্ছে সব্বাইকে, তারা যে তাকে কী শুধোচ্ছে তা তার মাথায় ঢুকছে কিনা তাকে দেখে বলে কার সাধ্যি। পরনে আড়াআড়ি ডোরাকাটা, কালো-রঙা একটা পোশাক, বহু ব্যবহারে সেটার বেহাল দশা, আর পায়ে আঁশওঠা, পাকা চামড়ার জুতো। কালো ফিতার ধনুক দিয়ে কানের পেছনে ঠেলে রাখা হয়েছে তার চুল। ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিমূর্তি আঁকা একটা পট্টি পরেছে সে, আর তার ডান কব্জিতে রয়েছে কুনজর ঠেকানোর মাদুলি হিসেবে তামার পটভূমিতে এক শ্বাপদের শ্বদন্ত। তার সবজে গতর, তার ঢাকের মতো গোলগাল টানটান পেট ফাঁস করে দেয় তার বয়সের চেয়েও পুরনো ভগ্নস্বাস্থ্য আর ক্ষুধার কথা, কিন্তু ওকে যখন তারা কিছু খেতে দেয়, কোনো কিছুই মুখে না তুলে থালাটা নিজের হাঁটুর ওপর রেখে বসে থাকে সে। ওরা তো এমনকি তাকে বোবা-কালা বলেও ঠাউরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় ইন্ডিয়ানরা তাদের নিজেদের ভাষায় তাকে শুধোয় সে পানি চায় কিনা, আর তখন সে এমনভাবে চোখ নাড়ায় যেন চিনতে পেরেছে সে তাদের, তারপর সায় দেয় মাথা নাড়িয়ে।

ওরা রেখেই দেয় ওকে, কারণ এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না ওদের। ঠিক হয় মেয়েটাকে ডাকবে ওরা রেবেকা বলে, চিঠি অনুযায়ী যেটা তার মায়ের নাম, কারণ ধৈর্য ধরে আরেলিয়ানো সব ক'জন সন্তের নাম আউড়ে যাওয়ার পরেও সেগুলোর কোনোটাতেই কোনো সাড়া দেয়নি মেয়েটা। তখন পর্যন্ত কারো মৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি বলে মাকোন্দোতে সে-সময় যেহেতু কোনো গোরস্থান ছিল না, তাই কবর দেয়ার একটা যোগ্য জায়গার অপেক্ষায় হাড়গোড়ের থলেটা তুলে রেখে দেয় ওরা, আর দীর্ঘ দিন ধরে সেই থলেটা সব জায়গাতেই একটা ঝামেলা পাকিয়ে তুলতে থাকে, আর সব সময়ই ওটাকে পাওয়া যেত সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায়, সবসময়ই একটা উমে বসা মুরগির মত কক্ কক্ শব্দ নিয়ে। সংসারটার জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে বেশ লম্বা একটা সময় লেগে যায় রেবেকার। বাড়ির একেবারে দূর কোনায় তার ছোট্ট দোলকেদারায় বসে একমনে আঙুল চুষে যায় সে। ঘড়ির বাজনা ছাড়া অন্য কিছুই তার নজর কাড়তে পারে না, আর সেগুলোর খোঁজে ভয় পাওয়া চোখ তুলে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর সে এমন করে তাকায় যেন আশা করছে শূন্যের মধ্যেই ঘড়িগুলো দেখতে পাবে সে। বেশ কিছুদিন কিছুই খাওয়ানো যায় না ওকে। কেন যে মেয়েটা না খেয়ে মরেনি সেটাই ওরা বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু শেষে, বিড়াল-পায়ে সারাক্ষণ বাড়িময় ঘুড়ে বেড়ানোর কারণে সব কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ইন্ডিয়ানরা আবিষ্কার করে যে রেবেকা খেতে পছন্দ করে কেবল উঠোনের স্যাঁতস্যাঁতে মাটি আর নখ দিয়ে দেয়াল থেকে খসিয়ে নেয়া চুনকামের চল্টা। পরিষ্কার বোঝা যায়, তার বাপ-মা কিংবা যারাই তাকে বড় করে থাকুক, তারা এই অভ্যেসটার জন্যে বকা-ঝকা করেছে মেয়েটাকে, কারণ কাজটা করতো সে লুকিয়ে-চুরিয়ে, একটা অপরাধবোধের সঙ্গে, চেষ্টা করতো জোগানটা সরিয়ে রাখতে, যাতে করে সবার চোখের আড়ালে বসে খাওয়ার যায়। এরপর থেকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হয় তাকে। তার এই ভীষণ ক্ষতিকর বদঅভ্যাসটাকে দমানো যাবে ভেবে উঠোনে ছিটানো হয় গোবর, দেয়ালগুলোতে ঘষে দেয়া হয় গরম-করা শুকনো মরিচ, কিন্তু অল্প খানিকটা মাটি জোগাড়ের জন্যে মেয়েটা এমনই গোঁয়াতুর্মী আর চালাকির পরিচয় দেয় যে আরো কড়া পথ বাছতে বাধ্য হয় উরসুলা। খানিকটা কমলার রস আর রেউচিনি লতা একটা কড়াইতে নিয়ে রাতভর শিশিরে ফেলে রাখে সে, আর পরের দিন সেই দাগটুকু খালি পেটে খাইয়ে দেয় তাকে। এটাই যে মাটি-ভক্ষণ রোগের যুতসই নিদান সেটা যদিও কেউ তাকে বাতলে দেয়নি, কিন্তু উরসুলার মনে হয়েছিল যে খালি পেটে তেতো কোনো কিছু পড়লে যকৃতটা হয়ত নড়েচড়ে উঠবে। গায়ে-গতরে রোগাদুবলা হলে কি হয়, এমনই অবাধ্যতা আর একগুঁয়েমী দেখায় রেবেকা যে আরক্টা গেলাবার জন্যে বক্না বাছুরের মতো হাত-পা বেঁধে ফেলতে হয় তার, কিন্তু তারপরেও হিমশিম খেয়ে যায় ওরা তার লাথি ঠেকাতে গিয়ে, বা তার কামড়ানি আর থুথু ছেটানির সঙ্গে পালা করে ছোঁড়া অবোধ্য বর্ণমালার তোড় সহ্য করতে গিয়ে, যা কিনা—কুৎসা-রটানো ইন্ডিয়ানদের কথা অনুযায়ী—মানুষ তার নিজের ভাষায় সবচেয়ে কুৎসিত যেসব খিস্তি-খেউড় কল্পনা করতে পারে তাই। ব্যাপারটা আবিষ্কার করার পর উরসুলা চিকিৎসাটার সঙ্গে চাবকানিও জুড়ে দেয়। কোনটা যে শেষ পর্যন্ত কাজে দেয়, রেউচিনি না ধোলাই, নাকি দুটোই, সেটা আর বের করা যায়নি, তবে আসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা হচ্ছে হপ্তাখানেকের মধ্যেই রোগমুক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে রেবেকার মধ্যে। আর্কাদিও আর আমারান্তা তাকে বড় বোনের মতোই মনে করে, তাদের হাসিখেলায় যোগ দেয় সে, আর দস্তুরমতো বাসনকোসন ব্যবহার করে খাওয়া-দাওয়া সারতে থাকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে। শিগ্‌গিরই জানা যায়, ইন্ডিয়ান বুলির মতো হিস্পানী ভাষাও তরতর করে বলতে পারে সে, গায়ে-গতরে খাটতে পারে অসাধারণ দক্ষতায়, আর নিজের মাথা খাটিয়ে বার করা মজার মজার সব কথা দিয়ে গাইতে পারে সেই ঘড়িগুলোর ওঅলজ্‌টা। সংসারের আরেকজন মানুষ হিসেবে তাকে গ্রহণ করে নিতে খুব বেশি সময় নেয় না ওরা। উরসুলাকে তার ছেলেরা যতটা না ভালোবাসতো তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতো মেয়েটা, আর্কাদিও আর আমারান্তাকে সে ভাই আর বোন বলে ডাকতো, অরোলিয়ানোকে চাচা, আর হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে দাদা। কাজেই শেষ পর্যন্ত অন্যদের মতো, রেবেকা বুয়েন্দিয়া নামটার যোগ্য হয়ে ওঠে সে, এই একটি নাম-ই ছিল তার, আর এই নামটিকেই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বয়ে বেড়ায় সে।

মাটি খাওয়ার অসুখটা থেকে সে তখন সদ্য সেরে উঠেছে আর অন্য সব বাচ্চার ঘরেই তার ঘুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এমন সময় এক রাতে সেই ইন্ডিয়ান রমণী, যে ওদের সঙ্গেই ঘুমোয়, সে হঠাৎ জেগে উঠে ঘরের কোনা থেকে আসা অদ্ভুত, থেমে থেমে হওয়া একটা শব্দ শুনতে পায়। কোনো জন্তু-জানোয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছে ভেবে ভয় পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে, আর তারপরই দেখতে পায় রেবেকাকে, বসে আছে দোলকেদারায়, চুষে চলেছে আঙুল, অন্ধকারে বিড়াল-চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটো। আতঙ্কিত, দৈবের ফেরে রিক্ত ভিসিতাসিওঁ চোখ দুটোর ভেতর সেই রোগটার উপসর্গ দেখতে পায় যে-রোগের ভয়ে সুপ্রাচীন এক রাজ্য থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার ভাই আর সে, রাজ্যটার রাজকুমার আর রাজকুমারী। এ হচ্ছে অনিদ্রা রোগ।

ভোর হতেই দেখা যায় বাড়ি ছেড়ে লাপাত্তা হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান কাতাউর। তার বোন রয়ে যায়, কারণ তার নিয়তিবাদী মন তাকে জানিয়ে দেয় যে, যা কিছুই হোক না কেন, ভয়ংকর এই রোগটা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে বেড়াবে তাকে। ভিসিতাসিওঁর দুশ্চিন্তাটা কিন্তু কেউই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তো খোশ-মেজাজে বলে ওঠে, 'কখনো আর কেউ না ঘুমোলে তো খুবই ভালো হয়। জীবনের কাছ থেকে তাহলে আরো অনেক কিছু পাওয়া যাবে।' কিন্তু ইন্ডিয়ান রমণী ব্যাপারটা ভেঙে বলে যে, ঘুম উবে যাওয়াটা অনিদ্রা রোগের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক নয়, কারণ এ-রোগে শরীরে কোনো ক্লান্তিই বোধ হয় না, বরং সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর তা হল আরো জটিল এক অবস্থার দিকে রোগটার দুর্দম ক্রমযাত্রাঃ স্মৃতিবিলোপ। সে যা বোঝাতে চায় তা হচ্ছে, অসুস্থ লোকটা যখন নিশিজাগরণে ধাতস্থ হয়ে ওঠে ঠিক তখন থেকেই তার স্মৃতি থেকে মুছে যেতে থাকে তার ছেলেবেলা, এরপর তার নাম, জিনিসপত্র সংক্রান্ত ধারণা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষঅব্দি লোকজনের পরিচয়, আর এমনকি নিজের সত্তার ব্যাপারে সচেতনতা পর্যন্তযতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছয় সে এমন এক মূর্খ দশায় যার কোনো অতীত নিদর্শন নেই। ইন্ডিয়ানদের কুসংস্কার অসংখ্য যে সমস্ত রোগ-বালাই উদ্ভাবন করেছে এটাকে তারই একটা বলে ধরে নিয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তো হেসেই আকুল। কিন্তু স্রেফ বিপদের হাত থেকে দূরে থাকতে অন্যসব বাচ্চাকাচ্চার কাছ থেকে রেবেকাকে সরিয়ে নেয় উরসুলা, আগাম সতর্কতা হিসেবে।

বেশ কয়েক হপ্তা পর, ভিসিতাসিওঁর আতংক যখন মরে এসেছে বলে বোধ হচ্ছে, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিায়া একদিন আবিষ্কার করে ঘুম না আসায় শয্যায় এপাশ-ওপাশ করছে সে। ততক্ষণে উরসুলাও জেগে উঠে তাকে জিজ্ঞেস করে সমস্যাটা কী, আর তাতে সে জবাব দেয়: 'আবার প্রুদেনসিও আগিলারের কথা ভাবছি আমি।' এক মিনিটের জন্যেও ঘুমোয়নি তারা, কিন্তু তারপরেও পরদিন নিজেদের তাদের এতোই চনমনে মনে হয় যে সেই বাজে রাতটার কথা ভুলে যায় দু'জন। দুপুরের খাবার সময়, অরেলিয়ানো তাজ্জব বনে গিয়ে মন্তব্য করে যে উরসুলাকে তার জন্মদিনে দেবে বলে একটা ব্রোচ গিলটি করে সারা রাত কাটানোর পরেও দিব্যি আছে সে। তৃতীয় দিন শুতে যাওয়ার সময় যখন কারোরই ঘুম আসে না, তখন টনক নড়ে ওদের, খেয়াল করে দেখে, চল্লিশ ঘণ্টারও বেশি নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছে তারা।

'বাচ্চারাও জেগে আছে,' ইন্ডিয়ান রমণী তাঁর নিয়তিবাদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। 'একবার কোনো বাড়িতে ঢুকল তো সবাইকেই পেয়ে বসবে রোগটা।'

আসলেই অনিদ্রা রোগে ধরেছে ওদের। মায়ের কাছ থেকে গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বিষয়ে দীক্ষা নেয়া উরসুলা কুঁচিলা জাতীয় গুল্মের একটা চোলাই তৈরি করে খাইয়ে দেয় সবাইকে, কিন্তু তারপরেও ঘুমোতে পারে না ওরা, সারা দিন কাটিয়ে দেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে। সেই মতিচ্ছন্ন চনমনে দশাতে ওরা যে কেবল নিজের নিজের স্বপ্নই দেখে চলে তা নয়, কেউ কেউ আবার দেখতে পায় অন্যের দেখা স্বপ্নেরও প্রতিচ্ছবি। যেন বেড়াতে আসা লোকজনে ভরে ওঠে বাড়িটা। রান্নাঘরের এক কোনায় নিজের দোলকেদারায় বসে রেবেকা স্বপ্ন দেখে প্রায় তারই মতো দেখতে এক লোক সোনার বোতাম দিয়ে আটকানো কলারসহ সাদা কাপড়-চোপড় পরে এগিয়ে আসছে তার দিকে এক তোড়া গোলাপ নিয়ে। তার সঙ্গে রয়েছে সুচারু হাতের এক রমণী, সে একটা গোলাপ তুলে নিয়ে বাচ্চাটার চুলে গুঁজে দেয়। উরসুলা বুঝতে পারে সেই পুরুষ আর মহিলা হচ্ছে রেবেকার বাপ-মা, কিন্তু সে তাদের দু'জনকে চেনানোর অনেক চেষ্টা চালালেও রেবেকা স্থির বিশ্বাসে জানায় এদের সে কস্মিনকালেও দেখেনি। এর মধ্যে একটা বেখেয়ালের কারণে, যে-জন্যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি, ঘরে-তৈরি মিছরির জীব-জন্তুগুলো তখনো শহরে বিক্রি হতে থাকে। ছোটবড় সবাই চুষে চলে অনিদ্রার মজাদার ছোট ছোট সবুজ মোরগ, অনিদ্রার নিদারুণ সব গোলাপী মাছ আর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিদ্রার নরম-কোমল টাট্টুঘোড়া, ফলে সোমবার ভোরবেলা দেখা যায় গোটা শহরই জেগে আছে। গোড়ার দিকে কেউই গা করে না ব্যাপারটা, উল্টো খুশিই হয় ঘুমোতে না পেরে, কারণ মাকোন্দোতে তখন এতো কিছু করবার আছে যে যথেষ্ট সময় পাওয়া ভার। এমনই গাধার খাটুনি খাটে ওরা যে শিগ্‌গিরই আর করবার মতো কিছু থাকে না, তখন দেখা যায় রাত তিনটের সময় বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে ঘড়ির ওঅল্‌জ-এর মাত্রা গুণে যাচ্ছে সবাই। অবসাদের কারণে নয়, বরং স্বপ্নের জন্যে স্মৃতিকাতর হয়ে যারা ঘুমোতে চায়, তারা নিজেদেরকে ক্লান্ত করার সবরকমের চেষ্টা করে করে হদ্দ হয়ে যায়। সবাই একসঙ্গে জড়ো হতো তারা অনর্গল কথা বলে যাবার জন্যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একই রঙ-তামাশা বারে বারে করার জন্যে, খাসি-করা মোরগের কাহিনীটাকে চরম বিরক্তিকর জটিল করে তোলার জন্যে; সেটা এক অন্তহীন খেলা, সে-খেলায় যে-লোকটা গল্প বলে সে ওদের জিজ্ঞেস করে ওরা তাকে খাসি-করা মোরগের কাহিনীটা শোনাতে বলেছে কিনা, আর যখন তারা জবাব দেয় হ্যাঁ, লোকটা তখন বলে সে তাদের হ্যাঁ বলতে বলেনি, বলেছে তারা তাকে খাসি-করা মোরগটার গল্প শোনাতে বলেছে কিনা, আর যখন তারা বলে না, লোকটা তখন তাদের বলে সে তাদের না বলতে বলেনি, বরং তারা তাকে খাসি-করা মোরগের কাহিনীটা শোনাতে বলেছে কিনা তাই বলতে বলেছে, আর যখন তারা চুপ করে থাকে তখন লোকটা তাদের বলে সে তাদের চুপ করে থাকতে বলেনি, বরং জানতে চেয়েছে তারা তাকে খাসি-করা মোরগের কাহিনীটা শোনাতে বলেছে কিনা, আর সেই সময়টায় কেউই সেখান থেকে নড়তে পারতো না, কারণ লোকটা তখন বলতো সে তাদেরকে ওখান থেকে নড়তে বলেনি বরং জানতে চেয়েছে তারা তাকে খাসি-করা মোরগের কাহিনীটা শোনাতে বলেছে কিনা, আর এভাবেই রাতভর চলতে থাকতো খেলাটা এক অনন্ত ঘূর্ণিপাকের মতো।

অনিদ্রা রোগ শহরে হানা দিয়েছে টের পেয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া অসুখটা সম্পর্কে সে যা-জানে সব খুলে বলতে প্রত্যেক পরিবারের কর্তাকে এক জায়গায় জড়ো করে, তারপর, আপদটা যাতে জলার বাদবাকি শহরগুলোয় না ছড়ায় সে ব্যাপারে কী কী করা যায় তাই ঠিক করে সবাই মিলে। এজন্যেই, কাকাতুয়ার বদলে আরবদের কাছ থেকে কেনা ঘণ্টিগুলো ছাগলের গলা থেকে খুলে নিয়ে শহরের প্রবেশপথে রেখে দেয় ওরা তাদের জন্যে যারা চৌকিদারদের উপদেশ আর অনুরোধ-উপরোধ ঠেলে গোঁ ধরবে শহরটায় ঢোকার জন্যে। মাকোন্দোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া ভিনদেশী সবাইকে তখন তাদের ঘণ্টি বাজিয়ে চলতে হতো, যাতে অসুস্থ লোকেরা বুঝতে পারে কারা সুস্থ। যতক্ষণ তারা শহরে থাকতো ততক্ষণ কোনো কিছু খেতে বা পান করতে দেয়া হতো না তাদের, কারণ মুখ দিয়েই যে রোগটা ছড়াতো আর সমস্ত খাদ্য-খাবার আর পানীয়ই যে অনিদ্রা রোগে দূষিত হয়ে গিয়েছিল সে-ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ-ই ছিল না। এভাবেই শহরটার গণ্ডির ভেতরেই রোগটাকে বেঁধে রাখে ওরা। এমন-ই কাজে দেয় কোয়ারেন্টিনটা যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সময় আসে যখন জরুরি অবস্থাটাকেই ধরে নেয়া হয় স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে, আর জীবনযাত্রা এমন করে সাজানো হয় যে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে কাজ-কর্মে, ঘুমোনোর মতো অকেজো একটা অভ্যাস নিয়ে কোনো মাথাব্যথা থাকে না কারো আর।

নিজেদেরকে কী করে বেশ কয়েক মাসের জন্যে স্মৃতিভ্রংশ থেকে রক্ষা করা যায় সে-উপায়টা বের করে অরেলিয়ানোই। হঠাৎ করেই ব্যাপারটা আবিষ্কার করে সে। অভিজ্ঞ অনিদ্রা-রোগী, একেবারে প্রথম কয়েকজনের একজন অরেলিয়ানো ততদিনে রুপোর কাজটা শিখেছে ফেলেছে নিখুঁতভাবে। একদিন ধাতু পেটাই করে পাতে পরিণত করার ছোট্ট নেহাইটা খুঁজতে গিয়ে দেখে সেটার নাম মনে করতে পারছে না সে। ওর বাবা তাকে বলে দেয়: 'গৌজ'। এক টুকরো কাগজে অরেলিয়ানো নামটা লিখে আঠা দিয়ে সেটা সেঁটে দেয় নেহাইটার গোড়ায়: *গৌজ*। এভাবেই সে নিশ্চিত হয় ভবিষ্যতে নামটা আর ভুল হবে না তার। এটাই যে স্মৃতিলোপের প্রথম ঘটনা সেটা অবশ্যি তখন তার মনে হয়নি, কারণ জিনিসটার নামটা এতো কঠিন যে মনে রাখা শক্ত। কিন্তু কয়েকদিন পরেই সে আবিষ্কার করে পরীক্ষাগারের প্রায় প্রত্যেকটা জিনিসের নাম মনে করতে কষ্ট হচ্ছে তার। তখন সে ওগুলোতে সেগুলোর নাম লিখে রাখে, যাতে করে স্রেফ লেখাগুলো পড়েই চিনে নিতে পারে সে জিনিসগুলো। তার বাবা যখন তার ছেলেবেলার সবচেয়ে ছাপ-ফেলা ঘটনাগুলোও ভুলে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, অরেলিয়ানো তার কায়দাটির কথা খুলে বলে তাকে, আর তখন হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সেটাকে কাজে লাগায় সারা বাড়িময়, পরে গোটা গ্রামে। কালিতে চোবানো একটা বুরুশ নিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসে লিখে রাখে সেটার নাম: *টেবিল*, *চেয়ার*, *ঘড়ি*, *দরজা*, *দেয়াল*, *বিছানা*, *বাসন*। গোয়ালে গিয়ে নাম লিখে রাখে জীব-জন্তু আর গাছের গায়ে: *গরু*, *ছাগল*, *শুয়োর*, *মুরগি*, *কাসাভা*, *ক্যালাডিয়াম*, *কলা*। স্মৃতিলোপের অনন্ত সম্ভাবনা ধীরে ধীরে খতিয়ে দেখে সে বুঝতে পারে যে এমন একদিন আসতে পারে যেদিন জিনিসগুলোতে লেখা নাম দেখেই কেবল চেনা যাবে সেগুলোকে, কিন্তু সেগুলোর কাজ বা ব্যবহার ভুলে যাবে সবাই। তখন সে লেখাগুলো আরো বিশদ করে।

স্মৃতিলোপ রুখতে মাকোন্দোবাসীরা যে-পথ ধরেছিল তারই একটা আদর্শ নমুনা হচ্ছে গরুর গলায় ঝোলানো তার নিশানাটা: *ইহা গরু। গরুটি যাহাতে দুগ্ধ প্রদান করে। সেই জন্যে প্রতিদিন প্রত্যূষে উহাকে দোহন করিতে হইবে, এবং দুগ্ধ মিশ্রিত কফি তৈরি করিতে হইলে কফির সহিত মিশাইবার জন্যে তাহা গরম করিয়া লইতে হইবে*। এভাবেই ক্ষণিকের জন্য শব্দ-বন্দি হয়ে, পালিয়ে যেতে থাকা একটা বাস্তবতায় দিন কাটিয়ে যায় ওরা, কিন্তু লিখে রাখা অক্ষরগুলোর মূল্য বিস্মৃত হলেই সেই বাস্তবতা এমনভাবে হারিয়ে যেত যা আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

জলার দিকের রাস্তার গোড়াতে 'মাকোন্দো' লেখা একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয় ওরা, আর প্রধান সড়কে তার চেয়ে বড় আরেকটাতে লিখে রাখে 'ঈশ্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন'। নানান জিনিসপত্র আর অনুভব-অনুভূতি মনে রাখার মূলসূত্রগুলো লিখে রাখা হয় সব ক'টা বাড়িতেই। কিন্তু কাজটায় এতোই সজাগ নজরদারি আর নৈতিক শক্তি দরকার হয় যে অনেকেই এক কাল্পনিক বাস্তবের জাদুমন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ে, এমন এক জাদুমন্ত্র যা তাদের নিজেদেরই হাতে গড়া, আর সেটা ততটা বাস্তবানুগ না হলেও অনেক বেশি আরামদায়ক। আগে যেমন করে ভবিষ্যতের কথা বলেছে ঠিক তেমন করে তাস দেখে অতীত বলে দেয়ার ফন্দি বের করে পিলার তারনেরাই এই রহস্যময়তা তৈরির ব্যাপারটাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখে। এই কৌশলের আশ্রয় নেয়াতেই অনিদ্রারোগীরা সব বাস করতে শুরু করে তাসগুলোর অনিশ্চিত বিকল্পের ওপর গড়ে তোলা এক জগতে, যেখানে এক পিতাকে আবছাভাবে মনে রাখা হয় এপ্রিলের গোড়ার দিকে পৌঁছানো এক কালো মানুষ হিসেবে, মাকে মনে রাখা হয় বাঁ-হাতে সোনার আংটি পরা কালো রমণী হিসেবে, আর যেখানে একটা জন্মদিন হয়ে যায় আগের মঙ্গলবার, যেদিন জলপাই গাছে ডেকে উঠেছিল একটা ভরত পাখি। মনকে চোখ ঠেরে চলতে চলতে লবেজান হয়ে গিয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সেই স্মৃতিযন্ত্রটা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় যে-যন্ত্র বানানোর কথা আগেই একবার ভেবেছিল সে জিপসিদের তাক লাগানো এন্তার আবিষ্কারের কথা মনে রাখার জন্যে। একটা মানুষ জীবনে যতো জ্ঞানগম্যি অর্জন করেছে তার একেবারে আদ্যোপান্ত প্রতিদিন সকালে একবার করে জাবর কাটার সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই যন্ত্রটা তৈরি করার কথা ভাবা হয়। জিনিসটাকে সে কল্পনা করে একটা ঘুরন্ত অভিধান হিসেবে, যেটাকে সেটার অক্ষের ওপর বসানো একজন মানুষ একটা লিভার দিয়ে এমন করে চালাতে পারবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাবে জীবনের সবচেয়ে দরকারি ধ্যান-ধারণাগুলো। প্রায় চোদ্দ হাজার এন্ট্রি লিখে সেরে উঠতে পেরেছে সে, এমন সময় একদিন জলা থেকে আসা রাস্তাটা ধরে মনমরা ঘুমুনে-মানুষের ঘণ্টি পরে উদয় হয় এক অদ্ভুতদর্শন লোক, দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা পেটমোটা সুটকেস সঙ্গে নিয়ে, কালো কাপড়ে ঢাকা একটা ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে। সোজা গিয়ে ওঠে সে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার বাড়ি।

দরজা খুলে ভিসিতাসিওঁ তাকে চিনতে পারে না, ভাবে কোনো কিছু বিক্রির মতলবে এসেছে বুঝি লোকটা, তার খেয়ালই থাকে না যে বিস্মৃতির চোরাবালিতে নিশ্চিতভাবে তলিয়ে যেতে থাকা একটা শহরে বেচা-বিক্রির মতো কিছুই থাকে না। একেবারে জরাজীর্ণ দশা লোকটার। যদিও তার গলাটাও অনিশ্চিয়তায় ভাঙা আর তার হাত দুটো যেন জিনিসপত্রের অস্তিত্বে সন্দিহান, তারপরেও এটা দিব্যি বোঝা যায় যে লোকটা এমন এক জগত থেকে এসেছে যেখানে লোকে এখনো ঘুমোয়, এখনো মনে রাখে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া এসে দেখে, তালি-তাপ্পি দেয়া কালো একটা টুপি দিয়ে হাওয়া করে নিজের গা জুড়োচ্ছে লোকটা বৈঠকখানায় বসে, আর করুণাভরা মনোযোগের সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে দেয়ালে সাঁটা নিশানাগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটাকে সে এই ভয়ে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানায় যে, হয়ত এক সময় তাকে চিনতো সে কিন্তু এখন অপরিচিত লাগছে। কিন্তু তার এই হঠকারিতা আগন্তুকের কাছে চাপা থাকে না। তাকে দেখে মনে হয় নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছে, মনের প্রতিকারহীন বিস্মরণশীলতার কারণে নয়, অন্য ধরনের এক বিস্মরণশীলতার জন্যে, যা আরো নিষ্ঠুর, আরো অপ্রত্যাবর্তনীয়, যেটাকে সে খুব ভালো করেই চেনে, কারণ এ হচ্ছে মরণের বিস্মরণশীলতা। এরপরই তার কাছে খোলাসা হয়ে যায় ব্যাপারটা। হিজিবিজি নানান জিনিস-পত্তরে ঠাসা সুটকেসটা খুলে ফেলে সে, তারপর সেগুলোর ভেতর থেকে বের করে আনে অনেকগুলো ফ্লাস্কঅলা একটা বাক্স। ফিকে রঙা একটা পানীয় খেতে দেয় সে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে, আর অমনি জ্বলে ওঠে তার স্মৃতির রোশনাই। তাবৎ জিনিসপত্রের গায়ে লেবেল সাঁটা এক উদ্ভট বৈঠকখানায় নিজেকে আবিষ্কার করার আগেই, এমনকি দেয়ালে লেখা গুরুগম্ভীর অবোলতাবোলগুলোর কারণে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠার আগেই, এমনকি আনন্দের এক চোখ ধাঁধানো দীপ্তি নিয়ে আগন্তুককে চিনে ওঠার আগেই কাঁদতে কাঁদতে চোখ ভিজে আসে তার। লোকটা আর কেউ নয়, মেলকিয়াদেস।

মাকোন্দো যখন তার স্মৃতি ফিরে পাওয়া নিয়ে উৎসবে মত্ত, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর মেলকিয়াদেস সেই অবসরে ঝালাই করে নেয় তাদের সাবেক দোস্তি। জিপসি লোকটার ইচ্ছে শহরেই থেকে যাওয়া। সত্যিকার অর্থেই মরণ দেখে এসেছে সে, কিন্তু সে যে ফিরে এসেছে তার কারণ নিঃসঙ্গতা সহ্য করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। স্বগোত্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, জীবনের ওপর আস্থা রাখার কারণে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা খুইয়ে, সে ঠিক করেছে এক দাগেরোটাইপ পরীক্ষাগারের কাজ-কর্মে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে জগতের এমন এক কোণে আশ্রয় নেবে যার হদিস মরণ পায়নি এখনো। এই আবিষ্কারটার কথা কস্মিনকালেও শোনেনি হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। কিন্তু নিজেকে আর তার গোটা সংসারটাকে চকচকে একটা ধাতব পাতের মধ্যে চিরকালের জন্যে বাঁধা পড়ে যেতে দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে পড়ে সে। এইদিনই তোলা হয় সেই অক্সিডাইজ্ড দাগেরোটাইপ ছবিটা যেটাতে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে দেখা যায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর কাঁচা-পাকা চুলসহ, তার কার্ডবোর্ডের কলারটা একটা তামার বোতাম দিয়ে জামার সঙ্গে আঁটা, আর মুখে একটা চমকে যাওয়া গাম্ভীর্য, যেটাকে উরসুলা হাসতে হাসতে খুন হয়ে গিয়ে 'ভয়-পাওয়া এক সেনাপতি'র মতো বলে বর্ণনা করে। ঝকঝকে সেই ডিসেম্বরের সকালে যখন দাগেরোটাইপ ছবিটা তোলা হয় তখন কিন্তু আসলেই ভয় পেয়ে যায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, কারণ তার কছে মনে হয় ধাতব পাতের ওপর মানুষের প্রতিচ্ছবি ঠাঁই করে নেবার সময় ধীরে ধীরে তাদের আয়ুক্ষয় হতে থাকে। বরাবরের নিয়মটাকে অদ্ভুতভাবে উল্টে দিয়ে এবার উরসুলাই তার স্বামীর ভাবনার ভূতটাকে ছাড়িয়ে দেয় তার মাথা থেকে, আর সেই সঙ্গে নিজের পুরনো তিক্ততা ভুলে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত নেয় মেলকিয়াদেস এ-বাড়িতেই থাকবে, যদিও ওদেরকে সে তার নিজের দাগেরোটাইপ ছবি তুলতে দেয় না, কারণ (তার নিজের কথায়) সে তার নাতিপুতিদের হাসির পাত্রী হয়ে থাকতে নারাজ। সেদিন সকালে উরসুলা বাচ্চাদেরকে সবচেয়ে ভালো পোশাক-আশাক পরিয়ে দেয়, গালে পাউডার বুলিয়ে দেয়, আর প্রত্যেককে খাইয়ে দেয় এক চামচ করে মজ্জার সিরাপ যাতে তারা সবাই মেলকিয়াদেসের আশ্চর্য ক্যামেরার সামনে প্রায় দু'মিনিটের অবস্থানের সময় একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পারিবারিক সেই একমাত্র দাগেরোটাইপে অরেলিয়ানোকে দেখা যায় আমারান্তা আর রেবেকার মাঝে মখমলের কালো পোশাক পরা অবস্থায়। বহু বছর পর ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে তার যে অবসন্ন ভাব আর অলোকদ্রষ্টার চাউনি থাকবে, সেটাই দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। কিন্তু এখনো সে তার নিয়তি সম্পর্কে কোনো পূর্ববোধ পায়নি। এখন সে এক ওস্তাদ রৌপ্যকার, কাজের সূক্ষ্মতার কারণে সারা জলাভূমি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেলকিয়াদেসের ক্ষ্যাপাটে পরীক্ষাগারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়া কামারশালায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও পাওয়া যায় না বলতে গেলে। ফ্লাস্ক আর ট্রে-র খটখটানি, ছলকে পড়া এসিড আর সিলভার ব্রোমাইডের প্রলয়ের মধ্যে তার বাবা আর জিপসি লোকটা যখন উচ্চকণ্ঠে নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চলে, অরেলিয়ানো যেন তখন অন্য একটা সময়ে আশ্রয় খুঁজে নেয়। নিজের কাজের প্রতি তার এই নিবেদন আর যে-সুবিবেচনার সঙ্গে সে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মনোনিবেশ করে, তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অরেলিয়ানোকে বিস্তর টাকা-পয়সা এনে দেয়, সুস্বাদু মিছরির জীব-জন্তুর ব্যবসাতে উরসুলা যা রোজগার করে তার চেয়েও ঢের বেশি, কিন্তু প্রত্যেকেই একটা ব্যাপার ভেবে অবাক হয়ে যেতো যে এখন সে রীতিমতো জোয়ান পুরুষ হলেও কোনো মেয়ের সঙ্গে তার ভাব নেই। সত্যি-ই, কোনো মেয়ের সঙ্গে কখনো ভাব হয়নি তার।

বেশ কয়েক মাস পর ঘটে মরদ ফ্রান্সিসকো-র ফিরে আসার ঘটনা, প্রাচীন এক ভবঘুরে সে, বয়স প্রায় দু'শো বছর, প্রায়-ই সে মাকোন্দো দিয়ে আসা-যাওয়া করে নিজের বাঁধা গান ছড়াতে ছড়াতে। এই গানগুলোতে মরদ ফ্রান্সিসকো মানাউর থেকে জলার প্রান্তসীমা পর্যন্ত তার যাত্রাপথের শহরগুলোর নানান ঘটনা একেবারে খুঁটিনাটিসমেত বর্ণনা করতো, কাজেই কারো যদি কোনো বার্তা দেবার থাকতো বা লোকজনকে কোনো ঘটনা জানানোর থাকতো, তাকে সে দুই সেন্ট দক্ষিণা দিয়ে সেটা জুড়ে নিতো তার ভাঁড়ারে। এভাবেই উরসুলা তার ছেলে হোসে আর্কাদিও-র খোঁজ জানার আশায় সেইসব গান শোনার মতো সামান্য ঘটনার জের ধরে তার মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে যায়। মরদ ফ্রান্সিসকোকে এই নামে ডাকার কারণ সে একবার শয়তানকে উপস্থিতমতো গান বাঁধবার দ্বৈরথে হারিয়ে দিয়েছিল, তাছাড়া তার আসল নামও কেউ জানতো না; অনিদ্রারোগের সময় একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিল সে মাকোন্দো থেকে, আর হঠাৎ করেই একদিন রাতে উদয় হয় সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাতারিনোর দোকানে। জগতে কী ঘটছে না ঘটছে তা শোনার জন্যে গোটা শহর ভেঙে পড়ে তার কাছে। সেবারই, তার সঙ্গেই এসে পৌঁছয় এক মহিলা, সে এমনই বিপুলা যে চার ইন্ডিয়ান তাকে বয়ে আনে দোলকেদারায় করে, আর তার সঙ্গে আসে এক দুঃখী চেহারার মুলাটো কিশোরী, রোদ্দুর থেকে সে ঐ মহিলাকে আড়াল করে রাখছিল তার মাথায় ছাতা ধরে। সেই রাতেই কাতারিনোর দোকানে যায় অরেলিয়ানো। দেখে, বিশাল এক গিরগিটির মতো মরদ ফ্রান্সিসকো দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে তাকে ঘিরে থাকা একদল দর্শকের মধ্যেখানে। নানান খবরাখবর গেয়ে শোনাচ্ছে সে তার চেনা, বেসুরো গলায়, গায়ানাতে তাকে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের দেয়া আদ্যিকালের সেই অ্যাকোর্ডিয়ান বাজিয়ে আর তার হন্টনপটু পা দিয়ে তাল ঠুকে ঠুকে, যদিও সোরা-র কারণে সেই পা-দুটো ফেটে ফেটে গেছে। কোনার একটা দরজা দিয়ে লোকজন আসছে-যাচ্ছে, তার সামনে দোলকেদারার শ্রীমতী বসে আছে আর চুপচাপ হাওয়া করে যাচ্ছে নিজেকে। কানের পেছনে ফেল্টের একটা ফুল গুঁজে, কাতারিনো লোকটা গাঁজিয়ে তোলা আখের রস বিক্রি করছে ভিড়-করা লোকজনের কাছে, আর এই সুযোগে সে লোকের কাছে গিয়ে তাদের সেই সব জায়গায় হাত দিচ্ছে যেখানে হাত দেয়া তার উচিৎ নয়। মাঝরাত্রের দিকে গরমটা অসহ্য হয়ে ওঠে। খবরাখবর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে অরেলিয়ানো, কিন্তু এমন কিছুই তার কানে আসে না যা তার পরিবারসংক্রান্ত। বাড়ি যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে সে এমন সময় সেই শ্রীমতী হাত নেড়ে ইশারা করে তাকে।

বলে, 'তুমিও যাও না। মাত্র বিশ সেন্ট খরচা হবে।'

শ্রীমতীর কোলের ওপরে রাখা চোঙাটার ভেতর একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দেয় অরেলিয়ানো, তারপর কিছু না বলেই ঢুকে পড়ে ঘরটার ভেতর। মুলাটো কিশোরীটি তার কুকুরীর মতো চুঁচি, মিচির নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। সেই রাতে অরেলিয়ানোর আগে তেষট্টি জন পুরুষ এই ঘরে পদধূলি দিয়ে গেছে। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে, ঘাম আর দীর্ঘশ্বাসে চটকাচটকি হয়ে ঘরটার বাতাস কাদাকাদা হওয়ার জোগাড়। ভেজা চাদরটা সরিয়ে ফেলে সেটার একটা প্রান্ত ধরতে বলে মেয়েটা অরেলিয়ানোকে। চাদরটা মোটা কাপড়ের মতো ভারি। দু'জনে দুই প্রান্ত ধরে চাদরটা মোচড়াতে থাকে ওরা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটার স্বাভাবিক ওজন ফিরে আসে। তোষকটা উল্টে দেয় ওরা, আর তাতে ঘাম বেরিয়ে আসে সেটার অন্য দিক দিয়ে। অরেলিয়ানো মনে-প্রাণে চাইছিল কাজটা যেন কোনো দিন শেষ না হয়। প্রণয়ের তাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো তার জানা আছে, কিন্তু তার হাঁটু জোড়া দুর্বল হয়ে আসায় সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, আর যদিও তার শরীরের জ্বলন্ত চামড়ায় ছোট ছোট গুটি উঠে যায়, তারপরেও সে তার পেটের ভারটা নামিয়ে দেবার উদগ্র ইচ্ছেটা কিছুতেই রোধ করতে পারে না। বিছানাটা ঠিক করে মেয়েটা অরেলিয়ানোকে কাপড় খুলতে বললে সে তাকে একটা তালগোল পাকানো ব্যাখ্যা দেয়: 'ওরাই আমাকে ভেতরে পাঠালো। বলল চোঙার মধ্যে বিশ সেন্ট ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকতে।' মেয়েটা তার জড়তার ব্যাপারটা বুঝতে পারে। নরম গলায় সে বলে, 'যাওয়ার সময় আরো বিশ সেন্ট দিতে রাজি থাকলে খানিকটা সময় বেশি থাকতে পারবে তুমি।' লজ্জায় অধোবদন হয়ে অরেলিয়ানো নিজের কাপড় খোলে, একটা কথা কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারে না যে তার নগ্নতা তার ভাইয়ের নগ্নতার তুলনায় কিছুই নয়। মেয়েটা নানান চেষ্টা-চরিত্র করার পরেও নিজেকে ক্রমেই আরো নির্লিপ্ত আর ভয়ংকর একলা বলে মনে হতে থাকে অরেলিয়ানোর। বিষণ্ন গলায় সে বলে ওঠে, 'আরো বিশ সেন্ট দিয়ে যাবো আমি।' নীরবে তাকে ধন্যবাদ জানায় কিশোরী। তার পিঠে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। বুকের খাঁচার সঙ্গে সেঁটে আছে গায়ের চামড়া, আর যারপরনাই ক্লান্তির কারণে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তার। দু'বছর আগে, এখান থেকে মেলা দূর এক স্থানে, মোমবাতি না নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে একদিন, তারপর জেগে উঠে দেখেছিল আগুনের শিখা লক লক করছে চারপশে। তার দাদী-ই তাকে পেলে পুষে বড় করেছিল, আর তার সঙ্গেই একটা বাড়িতে থাকতো সে, তো, সেই আগুনে বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই থেকে দাদী তাকে শহর থেকে শহরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর পুড়ে যাওয়া বাড়িটার দাম উশুল করতে বিছানায় শোয়াচ্ছে বিশ সেন্টের বদলে। কিশোরীর হিসেব মোতাবেক, এখনো আরো দশ বছর প্রতি রাতে সত্তর জন পুরুষের সঙ্গে শুতে হবে তাকে, কারণ দু'জনের সফর আর খাওয়া-খরচা, আর সেই সঙ্গে দোলকেদারা বয়ে বেড়ানো ইন্ডিয়ানগুলোর মজুরির পয়সাটাও তাকেই দিতে হচ্ছে। দরজায় মহিলা দ্বিতীয়বারের মধ্যে টোকা মারতে কিছু না করেই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসে অরেলিয়ানো, ক্ষুধার একটা অস্থির ইচ্ছে নিয়ে। কামনা আর করুণার একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে সে-রাতে ঘুম আসে না তার। মেয়েটাকে আদর করবার, নিরাপত্তা দেবার এক অদম্য ইচ্ছা জন্মায় তার মধ্যে। ভোরে, অনিদ্রা আর জ্বরে কাতর হয়ে, মেয়েটাকে বিয়ে করার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছয় সে, যাতে তার দাদীর অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়া যায় তাকে, আর পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করা যায় সেই রাতগুলো যেগুলো সে দেবে সত্তরজন পুরুষকে। কিন্তু সকাল দশটায় সে কাতারিনোর দোকানে পৌঁছে দেখে শহর ছেড়ে চলে গেছে মেয়েটা।

তার উদভ্রান্ত ইচ্ছেটা সময়ই মিইয়ে দেয় একসময়, কিন্তু এতে তার হতাশা বেড়ে যায়। কাজের মধ্যে ডুব দেয় সে। নিজের অনুপযোগিতার লজ্জা লুকোতে নারীবিবর্জিত জীবন কাটাবার পণ করে। এদিকে, ছবি তোলার যোগ্য এমন কোনো কিছুই মাকোন্দোতে বাকি থাকে না যা কিনা মেলকিয়াদেস তার সেই ধাতব পাতগুলোতে বন্দি করে না; সেই দাগেরোটাইপ পরীক্ষাগারটাকে ছেড়ে দেয় সে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার উদ্ভট খেয়াল-খুশির হাতে, লোকটা পণ করেছে কামরাটা সে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ জোগাড় করতে কাজে লাগাবে। বাড়ির নানান জায়গায় তোলা সুপারইম্পোজড় এক্সপোজারের এক জটিল প্রক্রিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতর দিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আজ নয় তো কাল সে ঈশ্বরের একটা দাগেরোটাইপ পাবেই পাবে, যদি তিনি থেকে থাকেন, আর নইলে সে তাঁর অস্তিত্বের ধারণার শেষ টেনে দেবে চিরকালের জন্যে। নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ব্যাখার গভীর থেকে গভীরে চলে যায় মেলকিয়াদেস। মেলা রাত অব্দি জেগে থাকে সে তার মখমলের রঙচটা গেঞ্জির ভেতর হাঁসফাঁস করতে করতে, আঁকিবুকি কেটে চলে তার সরু লিকলিকে দুই হাতে, সে-হাতদুটোর আংটিগুলোয় এখন আর আগের ঔজ্জ্বল্য নেই। এক রাতে তার মনে হয় মাকোন্দো সম্পর্কে একটা আগাম কথা জেনে গেছে সে। বড় বড় কাচের বাড়িঘরঅলা একটা উজ্জ্বল শহর হয়ে উঠবে মাকোন্দো, যেখানে বুয়েন্দিয়া বংশের কোনো নাম নিশানাই থাকবে না। 'ভুল,' গর্জে ওঠে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। 'কাচের নয়, বাড়িগুলো হবে বরফের, ঠিক যেমনটি আমি স্বপ্নে দেখেছি, আর বুয়েন্দিয়াদের কেউ না কেউ সেখানে নির্ঘাৎ থাকবে, *পার ওমনিয়া সেকুলা সেকুলারাম*।' খামখেয়ালি এই বাড়িটায় কাণ্ডজ্ঞানের প্রচলন বজায় রাখতে লড়াই করে চলে উরসুলা, মিছরিরর ক্ষুদে ক্ষুদে জীব-জন্তুর ব্যবসাটার প্রসার ঘটাতে একটা উনুন যোগ করেছে সে, রাতভর আগুন জ্বলে সেটায়, বেরিয়ে আসতে থাকে ঝুড়ি ঝুড়ি রুটি আর পুডিং-এর আশ্চর্যরকমের সব সংস্করণ, অতি মিষ্টি পিঠা, আর বিস্কিট, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উধাও হয়ে যায় সেগুলো জলার আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে। এখন সে এমন একটা বয়েসে এসে পৌঁছেছে যে জিরোনোর একটা এক্তিয়ার জন্মে গেছে তার, কিন্তু তারপরেও তার ব্যস্ততা যেন বেড়েই চলেছে। তার রমরমা ব্যবসাপাতি নিয়ে সে এতোই ব্যস্ত যে এক বিকেলে এক ইন্ডিয়ান রমণী যখন তাকে মাথার ঘরদার তালটাকে মিঠে করতে সাহায্য করছে, সেই অবসরে গ্রামের দিকটায় অন্যমনে তাকাতে সে দেখে অচেনা, রূপসী দুই কিশোরী অস্তরবির আলোয় ফোঁড়-সেলাই করে চলেছে। আসলে তারা রেবেকা আর আমারান্তা। ওদের দাদীর মৃত্যুর পর এক অনমনীয় দৃঢ়তায় তিনটে বছর ধরে ওরা যে শোক-পোশাক পরে ছিল সেটা খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঝলমলে কাপড়চোপড় ওদের দু'জনকে যেন জগতে একটা নতুন পরিচয়ে হাজির করে। যা ভাবা যায়নি, দু'জনের মধ্যে রেবেকাই বেশি রূপসী হয়েছে। শ্যামলা তার গায়ের রঙ, বড় বড় শান্ত দুটো চোখ, আর তার জাদুভরা হাতগুলো যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারির কাজ করে যায়। বয়সে তার চেয়ে ছোট আমারান্তা খানিকটা মাধুর্যহীন, কিন্তু মেয়েটার একটা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে তার মৃত দাদীর অন্তরের দৃঢ়তা। ওদের পাশে আর্কাদিওকে দেখে মনে হয় যেন বাচ্চা ছেলে, যদিও এরিমধ্যে তার বাবার শারীরিক উদ্যমের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। রুপোর কাজ শিখছে সে অরেলিয়ানোর কাছে, অরেলিয়ানো তাকে লিখতে পড়তেও শিখিয়েছে। হঠাৎ করেই উরসুলা খেয়াল করে, লোকজনে ভরে উঠেছে বাড়িটা, তার ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠেছে বিয়ের বয়েসী, বাপ-মা হওয়ার যোগ্য, জায়গার অভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিগ্‌গিরই তাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে হবে। তখন সে বের করে আনে তার বহু বছরের কঠিন মেহনতে জমানো টাকাটা, তার খদ্দেরদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে পৌঁছয়, আর তারপর হাত দেয় বাড়িটা বাড়ানোর কাজে। বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্যে একটা বৈঠকখানা তৈরি করে, তারপর আরো আরামদায়ক, ঠাণ্ডা আরেকটা তৈরি করে দৈনন্দিন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সেই সঙ্গে বানায় একটা খাবার-ঘর, বারোজনের জায়গা রাখা একটা টেবিলসহ, যাতে পরিবারের সবাই তাদের অতিথি নিয়ে বসতে পারে সেখানে, তৈরি করে উঠোনের দিকে জানলা রেখে ন'টা শোবার ঘর, আর একটা লম্বা বারান্দা, বারান্দাটাকে দুপুরের তাত থেকে আড়াল করেছে একটা গোলাপের বাগান, সেই বাগানের রেলিং-এর ওপর রাখা হয় ফার্ন আর বেগনিয়ার পাত্র। দুটো উনুনের জায়গা করার জন্যে বড় করা হয় রান্নাঘরটা। যে-গোলাঘরে হোসে আর্কাদিওর ভাগ্য গুণেছিল পিলার তারনেরা, সেটা ভেঙে সে-জায়গায় ওটার দ্বিগুণ আকারের একটা গোলাঘর তৈরি করা হয়, যাতে বাড়িতে খাবারের টান না পড়ে কখনো। উঠোনে. চেস্টনাট গাছটার ছায়ায় তৈরি করা হয় স্নানঘর, একটা মেয়েদের জন্যে, আরেকটা পুরুষদের, আর কোনায় সুপরিসর একটা আস্তাবল, মোরগ-মুরগির জন্যে একটা ঘের দেয়া জায়গা, দুধেল গাইগুলোর জন্যে একটা গোয়াল আর চারদিক খোলা একটা পাখিশালা, যাতে ঘুরে বেড়ানো পাখিগুলো তাদের খেয়াল খুশিমতো জিরোতে পারে সেখানে। যেন তার স্বামীর বিভ্রম জাগানো উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগেছে তার গায়ে, এমনিভাবে ডজনখানেক রাজমিস্ত্রি আর কাঠমিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে আলো আর উত্তাপের অবস্থান ঠিক করে উরসুলা, সেগুলোর জন্যে উপযুক্তভাবে জায়গা বরাদ্দ করে। পত্তনকারীদের আদিম ভবনটা ভরে ওঠে নানান যন্ত্রপাতি আর জিনিসপত্রে, ঘেমে হদ্দ হয়ে যাওয়া মজুরে: সবখানেই তাদের ছিঁড়ে নেয়া হাড়গোড়ের একটা একঘেয়ে ঝনৎকার শুনতে শুনতে পেরেশান হয়ে তারা অনুনয়-বিনয় করে চলে যেন দয়া করে ওটার হাত থেকে রেহাই দেয়া হয় তাদের। চুন আর আলকাতরার গন্ধ ছড়ানো সেই অস্বস্তিকর পরিবেশে কেউই ঠিক করে বলতে পারে না পৃথিবীর নাড়িভুঁড়ির ভেতর থেকে কী করে এই বাড়িটা তৈরি হচ্ছে যা কেবল শহরটারই সবচেয়ে বড় বাড়ি নয় বরং গোটা জলা অঞ্চলের মধ্যেই সবচেয়ে অতিথিপরায়ণ আর ঠাণ্ডা। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাছে ব্যাপারটা অবোধ্য থেকে যায় সবচেয়ে বেশি, কারণ সে তখন সেই মহা কর্মযজ্ঞের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানকে চমকে দেয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। নতুন বাড়ি তৈরির কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে, এমন সময় উরসুলা একদিন একথা জানাতে তাকে তার উদ্ভট জগৎ থেকে টেনে বের করে আনে যে ওদের বাড়ির সামনেটা নীল রঙ করার একটা হুকুম এসেছে, যদিও তাদের ইচ্ছা সাদা রঙ করার। সে তাকে সরকারি কাগজটা দেখায়। বউয়ের কথা বুঝতে না পেরে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া স্বাক্ষরটা পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে এই লোক?' শুধোয় সে।

'ম্যাজিস্ট্রেট,' বেজার মুখে জবাব দেয় উরসুলা। 'ওরা বলছে, লোকটাকে নাকি সরকার পাঠিয়েছে।'

একেবারে কোনো জানান না দিয়ে মাকোন্দোতে পা ফেলেছে ম্যাজিস্ট্রেট দন আপোলিনার মসকোত। হেঁজিপেঁজি জিনিসের বদলে ম্যাকও পাখি নিয়ে যাওয়া প্রথমদিককার আরবদের একজনের বানানো হোটেল জ্যাকব-এ উঠেছিল সে, আর তার পরের দিনই বুয়েন্দিয়াদের বাড়ি থেকে দুটো বাড়ি দূরে ভাড়া নিয়েছিল রাস্তার ওপরই দরজাঅলা একটা ছোট্ট কামরা। তারপর সে জ্যাকবের কাছ থেকে কেনা একটা টেবিল আর একটা চেয়ার পেতে সঙ্গে করে আনা প্রজাতন্ত্রের শিল্ডটাকে পেরেক পুঁতে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়, আর দরজায় রঙ দিয়ে লিখে রাখে: *ম্যাজিস্ট্রেট*। জাতীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে তাবৎ ঘরবাড়ি নীল রঙ করতে হবে এই ছিল তার প্রথম হুকুম। হুকুমটার একটা কপি হাতে নিয়ে গিয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া দেখতে পায় সে তার ছোট্ট অফিসে টাঙানো দোলখাটিয়ায় শুয়ে জিরোচ্ছে। 'এ-কথা তুমি লিখেছ?' সে জিজ্ঞেস করে তাকে। অভিজ্ঞ, ভীতু, লাল টসটসে চেহারার দন আপোলিনার মসকোত জবাব দেয় হ্যাঁ। 'কোন অধিকারে?' ফের জিজ্ঞেস করে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। টেবিলের দেরাজ থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়ে তার চোখের সামনে ধরে দন আপোলিনার মসকোত। 'এই শহরের ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে আমাকে।' হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া এক নজর চেয়েও দেখে না নিয়োগপত্রটার দিকে।

'এই শহরে আমরা কাগজের টুকরো দিয়ে হুকুম দিই না,' শান্তভাবটা বজায় রেখে বলে ওঠে সে। 'তোমাকে এই প্রথম আর শেষবারের মতো কথাটা জানিয়ে রাখছি, কোনো হাকিমের দরকার নেই এখানে আমাদের, কারণ, বিচার করার মতো কিছুই নেই এখানে।'

দন আপোলিনার মসকোতের চোখে চোখ রেখে, তখনো গলা না চড়িয়ে, সবিস্তারে বয়ান করে চলে সে কিভাবে গ্রামটার পত্তন করল তারা, কী করে বিলি-বন্দোবস্ত করল জমি-জমা, রাস্তাঘাট বানাল, আর বলে, সরকারের তোয়াক্কা না করে তো বটেই সেই সঙ্গে কারো কোনো উৎপাতের শিকার না হয়েই কী করে দরকারমাফিক নানান শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে তারা এলাকাটার। সে বলে, 'এতোই শান্তিতে আছি আমরা যে স্বাভাবিক মৃত্যুও এখন পর্যন্ত হয়নি কারো। তুমি নিজেই দেখতে পাবে, এখনো কোনো গোরস্থান নেই আমাদের।' সরকার যে কোনোরকম সাহায্যের হাত বাড়ায়নি তাতে কেউ কিছু মনে করেনি, উল্টো তারা খুশি এ জন্যে যে এ যাবৎ নিরুপদ্রবেই তাদের বেড়ে উঠতে দেয়া হয়েছে তাদেরকে, আর সে আশা করে এভাবেই তাদেরকে এগিয়ে যেতে দেবে সরকার, কারণ, কী করতে হবে না হবে সেকথা প্রথম আসা কোনো ভুঁইফোড় তাদের বাৎলে দেবে সেই উদ্দেশ্যে শহরটা গড়ে তোলেনি তারা। দন আপোলিনার তার ট্রাউজার্স-এর মতোই সাদা মোটা সুতোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাকেট পরে আছে, মুহূর্তের জন্যেও সে তার মার্জিত ভাবভঙ্গিতে চিড় ধরতে দেয় না। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আলাপের ইতি টেনে বলে, 'কাজেই সাধারণ কোনো প্রজার মতো যদি থাকতে চাও এখানে, খোশ আমদেদ জানাই তোমায়। কিন্তু লোকজনের বাড়িঘর নীল রঙ করিয়ে ঝামেলা বাধাতে এসেছ তো তোমার জাল-জঞ্জাল গুটিয়ে নিয়ে যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভেগে পড়ো। কেননা আমার বাড়ি হবে ঘুঘু পাখির মতো সাদা ধবধবা।'

শুকিয়ে আমসি হয়ে যায় দন আপোলিনার মসকোতের চেহারা। এক পা পেছন হটে গিয়ে চোয়াল শক্ত করে খানিকটা আহত গলায় সে বলে, 'আমার সঙ্গে কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র আছে, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।'

যে, শক্তি দিয়ে সে ঘোড়াগুলোকে বশ মানিয়ে ছাড়ে, ঠিক কখন যে সেই মোক্ষম শক্তি ফের এসে ভর করেছে তার হাত দুটোয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বলতে পারবে না। কলারের সামনেটা পাকড়ে ধরে দন আপোলিনার মসকোতকে নিজের চোখের সামনে তুলে ফেলে সে।

বলে ওঠে, 'কাজটা আমাকে করতে হচ্ছে তার কারণ সারা জীবন ধরে তোমার লাশ বয়ে বেড়ানোর চাইতে আমি তোমাকে জ্যান্তই বয়ে বেড়াতে চাই।'

ঐ অবস্থাতেই, ল্যাপেল ধরে লটকিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে লোকটাকে বয়ে নিয়ে চলে সে, আর শেষ পর্যন্ত তাকে নামিয়ে দেয় জলার রাস্তাটায়। এক হপ্তা পর ফিরে আসে লোকটা, সঙ্গে শটগানঅলা ছ'জন খালি-পা বিদঘুটে সৈন্য আর একটা গরুর গাড়িতে তার বউ আর সাত মেয়ে নিয়ে। খানিক পর, আরো দুটো গো-শকট পৌঁছয় আসবাবপত্র, ব্যাগ-সুটকেস আর বাসনকোসন নিয়ে। হোটেল জ্যাকবেই পরিবারের সবাইকে রেখে, থাকার জন্যে একটা বাড়ি খুঁজতে থাকে সে, আর সেই ছয় সৈন্যের পাহারায় ফের চালু করে তার অফিসটা। হানাদারগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার নিয়ত করে মাকোন্দোর পত্তনকারীরা তাদের জোয়ান ছেলেদের নিয়ে হাজির হয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাছে। কিন্তু দেখা যায় কাজটায় তার সায় নেই, কারণ, দন আপোলিনার তার বউ-বেটি নিয়ে ফিরে এসেছে, আর, সে বুঝিয়ে বলে, পরিবারের সামনে কাউকে হেনস্তা করাটা পুরুষালি কাজ নয়। কাজেই সুন্দরভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে বলে ঠিক করে সে।

অরেলিয়ানো তার সঙ্গে যায়। সেই সময়টায় মসৃণ ডগাসহ কালো গোঁফ গজাতে শুরু করেছে তার, খানিকটা জোরালো আর ভারি হয়ে উঠছে তার গলাটা, যুদ্ধের সময় এই জিনিসটিই অন্য সবার চেয়ে আলাদা করে তুলবে তাকে। খালি হাতে, রক্ষীদলের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে, ঢুকে পড়ে তারা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসঘরে। দন আপোলিনার মসকোত ধৈর্য হারায় না। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় ঘটনাক্রমে সে-সময় ওখানেই বসে থাকা তার দুই মেয়ের: আমপারো, তার বয়েস ষোল, মায়ের মতোই কালো সে, আর রেমেদিওস, মাত্তরই নয় বছর বয়েস তার, ছোটখাটো ফুটফুটে এক মেয়ে, গায়ের রঙটা লিলিফুলের মতো, আর চোখ দুটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুজ। মেয়ে দুটো চমৎকার, আদব-কায়দা জানে। দুটো লোক ঘরে ঢোকা মাত্র, পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগেই, বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দেয় ওরা। কিন্তু তারা দু'জনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

'তা বেশ, বন্ধু,' বলে ওঠে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। 'এখানেই থাকতে পারো তুমি, তবে সেটা এজন্যে নয় যে শটগান হাতে দরজায় ঐ ডাকাতগুলো পাহারা দিচ্ছে তোমাকে, বরং তোমার বউ আর মেয়েগুলোর জন্যে।'

দন আপোলিনার মসকোতকে অপ্রস্তুত দেখায়, কিন্তু হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তাকে কোনো কথা বলার সময় দেয় না। সে বলে চলে, 'দুটো শর্ত দেবো শুধু। এক: সবাই তাদের খেয়ালখুশি মতো নিজেদের বাড়ি রঙ করবে। দুই: এই মুহূর্তে সৈন্যগুলো দূর হবে। আমরা তোমার হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।' আঙুলগুলো সব টানটান করে ডান হাতটা তোলে ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা।

'কথা দিচ্ছো তুমি?'

'কথা দিচ্ছে তোমার দুশমন,' হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া উত্তর করে। তারপর তিক্ত স্বরে যোগ করে, 'কারণ, একটা কথা তোমাকে বলতেই হচ্ছে: তুমি আর আমি এখনো শত্রুই আছি।'

সেই বিকেলেই সৈন্যরা চলে যায়। কয়েক দিন পর ম্যাজিস্ট্রেট পরিবারের জন্যে একটা বাড়ি ঠিক করে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। অরেলিয়ানো ছাড়া সবার মনেই শান্তি ফিরে আসে। যে তার কন্যাও হতে পারতো, ম্যাজিস্ট্রেটের সেই ছোট মেয়ে রেমেদিওসের ছবিটা তার শরীরের কোনো একটা জায়গায় খোঁচাতে থাকে অনবরত। জুতোর ভেতরে একটা নুড়ি পাথর যেমন অস্বস্তি তৈরি করে হাঁটার সময়, তেমনই একটা শারীরিক যন্ত্রণা এটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা নাচ দিয়ে উদ্বোধন করা হয় ঘুঘু পাখির মতো সাদা বাড়িটা। এক বিকেলে রেবেকা আর আমারান্তাকে বয়োসন্ধিতে পড়তে দেখেই বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল উরসুলার, আর এ-কথাটাতো প্রায় বলাই যায় যে এই বাড়িটা বানানোর উদ্দেশ্য ছিল একটা উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করা যেখানে মেয়েরা তাদের সঙ্গে যারা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে তাদের নিয়ে বসতে পারে। মেরামতির কাজের সময় রীতিমতো কয়েদির মতো খাটে উরসুলা যাতে জাঁকজমকের কিছুই বাদ না পড়ে, তাই ওদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই সে কিনে আনতে বলে রেখেছিল ঘর সাজানোর দামি দামি জিনিসপত্তর, ভোজটেবিলের বাসন-কোসন, আর যা দেখে গোটা শহর তাজ্জব বনে যাবে, কমবয়েসীরা মেতে উঠবে উল্লাসে এমন একটা আবিষ্কার: পিয়ানোলা। কিছু লোক জিনিসটা কয়েকটা বাক্সে আলাদা আলাদা অংশে ভরে পৌঁছে দিয়ে যায়, তারপর ভিয়েনার আসবাবপত্তর, বোহেমিয়ার স্ফটিক, ইন্ডিজ কম্পানির বাসন-কোসন, ওলন্দাজ টেবিল ক্লথ, অগুনতি কিসিমের মোমবাতি আর শামদান, চিক আর পর্দার সঙ্গেই খোলা হয় বাক্সগুলো। পিয়ানোলাটা জোড়া দিয়ে তাতে সুর বেঁধে দেয়ার জন্যে, ক্রেতাপক্ষকে যন্ত্রটার ক্রিয়া-পদ্ধতি দেখিয়ে দিতে আর কাগজের ছ'টা রোলে ছাপা একেবারে হাল সময়ের সুরের সঙ্গে কী করে নাচতে হবে তাই শিখিয়ে দিতে আমদানি অফিস তাদের খরচাতেই পাঠিয়ে দেয় পিয়েত্রো ক্রেসপি নামের এক ইতালিয় বিশেষজ্ঞকে।

পিয়েত্রো ক্রেসপি লোকটার বয়েস অল্প, সোনালী চুল, আর তার মতো আদব-কায়দা-জানা লোক মাকোন্দোতে কখনো দেখা যায়নি, তাছাড়া, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে সে এতোই খুঁতখুঁতে যে দমফাঁসলাগা গরমের ভেতরেও বুটিদার রেশমি গেঞ্জি আর কালো কাপড়ের ভারি কোট পরে কাজ করা চাই তার। ঘেমে নেয়ে, বাড়ির মালিকদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে কয়েকটা হপ্তা যে-নিষ্ঠা নিয়ে সে কাজ করে যায় তা অনেকটা রুপোর কাজে অরেলিয়ানোর একাগ্রতার মতোই। একদিন সকালে, দরজা না খুলেই, অলৌকিক ব্যাপারটা দেখার জন্যে কাউকে না ডেকে, প্রথম রোলটাকে সে পিয়ানোতে চাপিয়ে দিতেই কানফাটানো হাতুড়ির আঘাত আর লেদযন্ত্রের আওয়াজ নীরব হয়ে যায়, আর সে-নীরবতাটা চমকে ওঠে সুরের শৃঙ্খলা আর চমৎকারিত্বে। সবাই ছুটে আসে বৈঠকখানায়। বজ্রাহতের দশা হয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার, সুরের চমৎকারিত্বে নয়, পিয়ানোর চাবিগুলোর স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া-কর্মে, কাজেই চটজলদি সে মেলকিয়াদেসের ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরে অদৃশ্য সেই বাজনদারের একটা দাগেরোটাইপ ছবি তোলার আশায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে সেদিন ওদের সঙ্গেই খায় সেই ইতালিয়। পাণ্ডুর, আংটিবিহীন আঙুলে দেবদূতের মতো লোকটা যেভাবে বাসন-কোসনগুলো নাড়াচাড়া করে তা দেখে খাওয়া তদারকি করার সময় তাজ্জব বনে যায় রেবেকা আর আমারান্তা। বৈঠকখানার পাশে দহলিজ ঘরে সেদিন লোকটা তাদের নাচ শেখায়। ওদের গা না ছুঁয়েই দেখিয়ে দেয় কী করে পা ফেলতে হবে তালযন্ত্রের সঙ্গে সময় মিলিয়ে, প্রীতিভরা চোখে উরসুলা তাকিয়ে থাকে সেদিকে, তবে মেয়েরা পাঠ নেবার সময় এক মুহূর্তের জন্যেও কামরা ছেড়ে বাইরে বেরোয় না সে। সে-সময় পিয়েত্রো ক্রেসপি পরতো বিশেষ ধরনের খুবই নমনীয় আঁটোসাঁটো প্যান্ট আর নাচের চপ্পল। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া উরসুলাকে আশ্বস্ত করে বলে, 'তুমি বেশি চিন্তা কোরো না। লোকটা হিজড়ে ছাড়া কিছু নয়।' কিন্তু তারপরেও, শিক্ষানবিসীর পালা চুকে যাওয়ার পর ইতালিয় লোকটা মাকোন্দো ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত উরসুলা তার হুঁশিয়ার নজরদারি চালিয়ে যায়। এরপর ওরা লেগে পড়ে পার্টির যোগাড়যন্ত্র করতে। আমন্ত্রিতদের একটা ছোট্ট তালিকা তৈরি করে উরসুলা, তাতে কেবল পত্তনকারীদের বংশধরদেরই রাখা হয়, ব্যতিক্রম কেবল অজ্ঞাত দুই জনকের বদৌলতে আরো দুই বাচ্চার জন্ম দেয়া পিলার তারনেরার পরিবার। তালিকাটা ওপরতলার লোকজনের ঠিকই, তবে সেটা তৈরি করা হয়েছে বন্ধুত্বের মমতা দিয়ে, কারণ তাতে যে কেবল তাদেরই রাখা হয়েছে যারা গণ-হিজরত আর মাকোন্দোর পত্তনের আগে থেকেই হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার পরিবারের সবচেয়ে পুরোনো সুহৃদ তাই নয়, সেই সঙ্গে রাখা হয়েছে ছেলেবেলা থেকেই যারা অরেলিয়ানো আর আর্কাদিওর নিত্য সঙ্গী তাদের সেইসব ছেলে আর নাতিদেরও আর সেই সঙ্গে তাদের মেয়েদেরও, রেবেকা আর আমারান্তার সঙ্গে একমাত্র তারাই এ-বাড়িতে এসেছে সেলাইয়ের কাজ করার জন্যে। দন আপোলিনার মসকোতে এক ঠুঁটো জগন্নাথ; পরোপকারী এই শাসকের কাজ-কর্ম বলতে এখন কেবল নিজের সামান্য আয় থেকে কাঠের মুগুরধারী দুই পুলিশের ভরণপোষণ, ব্যস। ঘরের খরচ মেটাতে তার মেয়েরা খুলেছে একটা সেলাইয়ের দোকান, সেখানে তারা পশমী কাপড়ের ফুল আর পেয়ারার আচার-মোরব্বা তৈরি করে, ফরমায়েশ মাফিক প্রেমপত্র লিখে দেয়। কিন্তু তারা নম্রসম্র, পরিশ্রমী, শহরের সবচেয়ে সুন্দরী আর নতুন নাচে কেতাদুরস্ত হলে কী হবে, পার্টির নেমন্তন্ন তাদের পাওয়া হয়ে ওঠে না।

উরসুলা আর মেয়েরা যখন আসবাবপত্তরের মোড়ক খুলছে, রুপোর বাসন-কোসন পালিশ করছে, আর গোলাপভরা নৌকোয় বসে থাকা কুমারীদের ছবি টাঙাচ্ছে, যেসব কিনা রাজমিস্ত্রিদের তৈরি করা ফাঁকা জায়গাগুলোতে এনে দেয় নতুন জীবনের স্পন্দন, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তখন ঈশ্বরের অনস্তিত্বে নিঃসংশয় হয়ে তাঁকে খোঁজার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে পিয়ানোটাকে খুলে ফেলে সেটার সুরের জাদুকরী রহস্যের খোঁজে। পার্টির দু'দিন আগে, কাজে না-লাগা ঘাট আর হাতুড়ির ধারাবর্ষণে অভিভূত হয়ে, একবার একদিকে প্যাঁচ খুলে যাওয়া আরেকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে পেঁচিয়ে যাওয়া তারের জটাজালের ভেতর তালগোল পাকিয়ে ফেলে কোনোরকমে যন্ত্রটাকে আগের দশায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে সে। নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে যখন পিচবাতি জ্বালানো হয় তখন এতোসব অবাক-করা কাণ্ডকারখানা ঘটে আর এতো হুড়োহুড়ি হয় যা আর কখনো হয়নি আগে। তারপর, তখনো রজন আর ভেজা চুনকামের গন্ধ বেরোতে থাকা বাড়িটা খুলে দেয়া হয়, পত্তনকারীদের ছেলেপুলে নাতি-নাতনিরা দেখতে পায় বারান্দটা ভরে আছে ফার্ন আর বেগনিয়া ফুলে, দেখে শান্ত ঘরগুলো, গোলাপের সুবাসে আইঢাই করা বাগান, তারপর জড়ো হয় তারা বৈঠকখানায়, সাদা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা এক অজানা আবিষ্কারের সামনে। জলার অন্যসব শহরে জনপ্রিয় এই পিয়ানো নামের জিনিসটার সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তারা খানিকটা হতাশ হয় বটে, কিন্তু আমারান্তা আর রেবেকা যাতে নাচ শুরু করতে পারে সেজন্যে প্রথম রোলটা চাপানো হলে সেটা যখন কাজ করে না তখন উরসুলার হতাশাটা হয়ে ওঠে আরো তীব্র। প্রায় অন্ধ, বয়েসের ভারে নুয়ে আসা মেলকিয়াদেস যন্ত্রটা ঠিক করতে তার অতি প্রাচীন প্রজ্ঞার কলাকৌশল প্রয়োগ করে দেখে। শেষে, আটকে যাওয়া একটা জিনিস হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ভুল করে নাড়া দিয়ে বসতেই বেজে ওঠে সুর, প্রথমটায় একটা বিস্ফোরণের মতো করে, তারপর জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়া সুরের ধারায়। কোনো ঐকতানে ঠিক না করে যাচ্ছেতাইভাবে বাঁধা তারগুলোয় আঘাত করে হাতুড়িগুলো যেন পাগল হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিম দিক বরাবর সমুদ্রের খোঁজে পাহাড়-পর্বত চষে ফেলা একুশজন বেপরোয়া মানুষের গোঁয়ার-গোবিন্দ বংশধরেরা সুরেলা জগাখিচুড়ির প্রবাল প্রাচীরটাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে নেচে যায় ভোর অব্দি।

পিয়ানোলাটা মেরামত করতে ফিরে আসে পিয়েত্রো ক্রেসপি। রেবেকা আর আমারান্তা তাকে সাহায্য করে তারগুলো ঠিকমতো লাগাতে, আর যখনই পিয়ানোটা বেসুরো আওয়াজ করে ওঠে তাদের সেই সাহায্যটা আসে উচ্চকিত হাসির লহরীর মাধ্যমে। রীতিমতো চমৎকার আর এমন সুচারুভাবে ব্যাপারটা ঘটে যে উরসুলা তার নজরদারি বন্ধ করে দেয়। পিয়েত্রো ক্রেসপি চলে যাওয়ার আগে তার বিদায় উপলক্ষে আয়োজন করা একটা নাচ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে পিয়ানোলাটার কারণে, আর রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে সে দেখায় আধুনিক নাচের এক কুশলী প্রদর্শনী। মাধুর্যে আর দক্ষতায় আর্কাদিও আর আমারান্তা তাদের নাগাল ধরে ফেলে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে বাধা পড়ে সেই প্রদর্শনীতে, কারণ, দর্শকদের সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা পিলার তারনেরা চুলোচুলি আর কামড়াকামড়ির এক লড়াই শুরু করে দেয় এক রমণীর সঙ্গে, তার কত বড় আস্পর্ধা, সে বলেছিল আর্কাদিওর পাছা নাকি মেয়েমানুষের মতো। মাঝরাত্তিরের দিকে এক আবেগঘন বক্তৃতা দেবার পর বিদায় নেয় পিয়েত্রো ক্রেসপি, কথা দেয় শিগ্গিরই ফিরে আসবে। দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেয় রেবেকা, তারপর দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিয়ে সে তার ঘরে চলে যায় কেঁদে বুক ভাসাতে। বেশ ক'দিন ধরে চলে এই সান্ত্বনাহীন কান্না, সে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্নার কারণ এমনকি আমারান্তাও বুঝতে পারে না। অবশ্য তার নির্জনবাসটা কারো কাছে খাপছাড়া বলে বোধ হয় না। তাকে খোলামেলা আর আন্তরিক বলে মনে হলেও, তার একটা নিঃসঙ্গচারী চরিত্র আছে, আর আছে একটা দুর্বোধ্য মন। লম্বা, শক্ত হাড়ের চমৎকার এক কিশোরী সে, কিন্তু কাঠের যে ছোট্ট দোলচেয়ারটা সে তার সঙ্গে করে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, বহুবার মেরামত করার পরেও যেটার হাতা দুটো নেই হয়ে গেছে, এখনো সে সেই চেয়ারটায় বসার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে। কেউ টের পায়নি, কিন্তু এই বয়েসেও আঙুল চোষার সেই অভ্যেসটা বজায় আছে তার। এই জন্যেই গোসলখানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকার সুযোগটা সে কখনো হাতছাড়া করে না, তাছাড়া, দেয়ালের দিকে মুখ করে ঘুমোনোর একটা অভ্যেসও দাঁড়িয়ে গিয়েছে তার। বাদলা দিনের বিকেলে বেগনিয়ায় ছাওয়া বারান্দায় এক দল সখীর সঙ্গে এমব্রয়ডারি করতে করতে কথার খেই হারিয়ে ফেলতে থাকে সে, আর বাগানে কেঁচোকেন্নোর খুঁড়ে তোলা ফালি ফালি স্যাঁতস্যাঁতে মাটি আর কাদার স্তূপ দেখে স্মৃতিকাতরতার এক ফোঁটা অশ্রু তার টাকরাকে করে তোলে নোনা। যখন সে কাঁদতে বসে, কমলালেবু আর রেউচিনি লতার কাছে হার মেনে যাওয়া নিভৃত সেই আস্বাদগুলো এক অপ্রশম্য তাড়না নিয়ে ফের হাজির হয় হঠাৎ করে। ফিরে যায় সে তার মাটি খাওয়ার অভ্যেসে। প্রথমবার কাজটা করে সে কৌতূহলের বশে, এই নিশ্চিত বিশ্বাসে যে সেটার বাজে স্বাদটাই প্রলোভনের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। আর, সত্যি সত্যিই, মাটিটা সে তার মুখে রাখতে পারে না। কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকা উৎকণ্ঠার কারণে কাজটায় সে লেগে থাকে নাছোড়বান্দার মতো, ধীরে ধীরে ফিরে পেতে থাকে তার বংশগত খিদে, আদিম খনিজগুলোর স্বাদ, যা ছিল তার প্রথম খাদ্য সেটার অন্তহীন তৃপ্তি। সবসময় পকেটে কয়েক মুঠ মাটি রাখতো সে, সবার আড়ালে একটু একটু করে খেতো আনন্দ আর ক্রোধের এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে, সেলাইয়ের সবচেয়ে কঠিন ফোঁড়টা তার সখীদের বুঝিয়ে দিতে দিতে আর সেই সঙ্গে অন্য সব পুরুষমানুষের কথা বলতে বলতে, যারা আসলে তাদের কারণে কারোর দেয়ালের চুন খাওয়ার মতো ত্যাগ স্বীকারের যোগ্য নয়। চরিত্রের মর্যাদা নষ্ট করা সেই ব্যাপারটি একটিমাত্র যে-লোকের যোগ্য, এই কয়েক মুঠ মাটি তাকে আরো কাছের, আরো নিশ্চিত করে তুলতো, যেন পাকা চামড়ার চমৎকার জুতো পরে লোকটা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যে-জমিনের ওপর হেঁটে বেড়ায় সেই জমিন এক খনিজ আস্বাদের ভেতর দিয়ে রেবেকার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকটার রক্তের ভার আর উত্তাপ, আর সেই খনিজ তার মুখে রেখে যেতো একটা ঝাঁঝাল রেশ, আর বুকের ভেতর রেখে যেতো শান্তির পলিমাটি। একদিন বিকেলে কোনো কারণ ছাড়াই আমপারো মসকোত সেই বাড়িটা দেখবার অনুমতি চেয়ে বসে। এই হঠাৎ-সফরে অপ্রস্তুত আমারান্তা আর রেবেকা আড়ষ্ট লৌকিকতা নিয়ে মেহমানদারি সারে। তাকে তারা সংস্কার করা বাড়িটাকে দেখায়, পিয়ানোলার বাজনা শোনায়, খেতে দেয় কমলার আচার আর মুচমুচে বিস্কুট। সম্ভ্রম, ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণশক্তি আর আদব- কায়দার এমন একটা সবক দিয়ে যায় আমপারো যে তার সফরের অল্প যে-ক'টা মুহূর্ত উরসুলা সেখানে থাকে তাতেই সে মুগ্ধ হয়ে যায়। দুই ঘণ্টা পর, কথাবার্তা যখন থিতিয়ে এসেছে, আমারান্তার বেখেয়ালের সুযোগে আমপারো একটা চিঠি ধরিয়ে দেয় রেবেকার হাতে। সে দেখে, যে-সূক্ষ্মতা দিয়ে পিয়ানোলাটা চালাবার নিয়ম-কানুন লেখা ছিল সেই একই পরিপাটি হাতে, সেই একই সবুজ কালিতে আর শব্দের সেই একই সূক্ষ্মতায় লেখা রয়েছে মাননীয়া সিনোরিটা রেবেকা বুয়েন্দিয়া নামটা; আঙুলের ডগা দিয়ে চিঠিটা আলতোভাবে ভাঁজ করে কৃতজ্ঞতার এক অন্তহীন, নিঃশর্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে আর আমরণ সহযোগিতার এক নীরব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আমপারো মসকোতের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর সেটা লুকিয়ে রাখে রেবেকা।

আমপারো আর রেবেকার মধ্যে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া বন্ধুত্ব অরেলিয়ানোর আশা জাগিয়ে তোলে। ছোট্ট রেমেদিওসের স্মৃতি তাকে যন্ত্রণা দিয়েই চলেছে, কিন্তু তাকে দেখার কোনোরকম সুযোগ পায়নি সে। তার সবচেয়ে কাছের দুই বন্ধু ম্যাগ্‌নিফিকো আর জেরিনাল্‌দোর সঙ্গে শহরময় টুঁড়ে বেড়ানোর সময় সেলাইয়ের দোকানটার ওপর উদ্বিগ্ন নজর ফেলে সে, কিন্তু দেখতে পায় কেবল মেয়েটার বড় বোনদের। বাড়িতে আমপারো মসকোতের উপস্থিতি যেন একটা পূর্বাভাসবোধের মতো। আপনমনে নিচু গলায় অরেলিয়ানো আওড়ায়, 'আমপারোর সঙ্গে ওকে আসতেই হবে। আসতেই হবে ওকে।' কথাগুলো সে এতোবার আর এমন-ই স্থিরবিশ্বাসের সঙ্গে আওড়ায় যে কামারশালায় এক বিকেলে একটা সোনার মাছ জোড়া দেবার সময় হঠাৎ তার বিশ্বাস জন্মায় যে রেমেদিওস তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। আসলেই, খানিক পর বাচ্চাদের গলার আওয়াজ পায় সে, আর, চোখ তুলে তাকাতেই আতংকে বুকটা জমে যায় তার গোলাপী অরগ্যান্ডি আর সাদা জুতো পরা মেয়েটাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

হলঘর থেকে ভেসে আসে আমপারো মসকোতের গলা, 'ভেতরে যেয়ো না রেমেদিওস। ওঁরা কাজ করছেন।'

কিন্তু অরেলিয়ানো তাকে সে-কথায় সাড়া দেবার ফুরসত দেয় না। মাছটার গলার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা সুতলিটা ধরে ওটাকে তুলে রেমেদিওসের উদ্দেশে সে বলে ওঠে:

'ভেতরে আসুন।'

কাছে গিয়ে মাছটা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে রেমেদিওস, কিন্তু অরেলিয়ানো তার জবাব দিতে পারে না, হাঁপানীর এক হঠাৎ আক্রমণে অসাড় হয়ে পড়ে সে। সারা জীবনের জন্যে লিলি ফুলের মতো সেই শরীরের পাশে, সেই পান্না সবুজ চোখের পাশে থাকার ইচ্ছে হয় তার, যে-সম্মান মেয়েটা নিজের বাবাকে করে ঠিক একই সম্মানের সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের শেষে অরেলিয়ানোকে 'স্যার' বলে সম্বোধন-করা কণ্ঠের সঙ্গে সারাজীবন থাকার ইচ্ছে হয় তার। কোনায় একটা ডেস্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে অবোধ্য সব চিহ্নের আঁকিবুকি কেটে যাচ্ছিল মেলকিয়াদেস। লোকটার ওপর ঘেন্না জন্মায় অরেলিয়ানোর। রেমেদিওসকে সে শুধু এটুকুই বলতে পারে যে তাকে সে একটা ছোট্ট মাছ উপহার দেবে, আর মেয়েটা তাতে এতোই অবাক হয় যে, যত তাড়াতাড়ি পারে কামারশালা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যায় সে। যে-গোপন ধৈর্য নিয়ে মেয়েটার দেখা পাওয়ার সুযোগের অপেক্ষা করছিল অরেলিয়ানো, সেই বিকেলে তা হারিয়ে ফেলে সে। কাজে গাফলতি দেখা দেয় তার। বার কয়েক বেপরোয়া চেষ্টায় সমস্ত মনোযোগ একত্র করে সে কামনা করে রেমেদিওস হাজির হোক, কিন্তু মেয়েটার সাড়া মেলে না। বোনদের দোকানে, ওদের বাড়ির জানালার শেডের পেছনে, তার বাবার অফিসে তাকে খুঁজে বেড়ায় সে, কিন্তু তার দেখা পায় সে কেবল মনের ছবির ভেতরই, সে-প্রতিচ্ছবি ভরিয়ে তোলে তার একান্ত আর ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা। পিয়ানোলার বাজনা শুনে রেবেকার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে বৈঠকখানায়। রেবেকা শোনে কারণ এই সেই বাজনা যার সঙ্গে তাকে নাচতে শিখিয়েছে পিয়েত্রো ক্রেসপি। অরেলিয়ানো শোনে, কারণ প্রতিটি জিনিস, এমনকি বাজনাও তাকে রেমেদিওসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রেমে ভরে ওঠে গোটা বাড়ি। আগামাথাহীন পদ্যের ভেতর দিয়ে অরেলিয়ানো সেটার প্রকাশ ঘটায়। মেলকিয়াদেসের দেয়া খরখরে পার্চমেন্টের কাগজে, গোসলখানার দেয়ালে, তার হাতের চামড়ার ওপর সেই পদ্যগুলো লেখে সে, আর সে-সবের প্রত্যেকটিতে রেমেদিওসের দেখা মেলে আরো সুন্দরভাবে। দুপুর দুটোর ঘুমপাড়ানিয়া গানে রেমেদিওস, গোলাপের কোমল নিঃশ্বাসে রেমেদিওস, প্রজাপতির জল-ঘড়ি রহস্যে রেমেদিওস, সকালের ধোঁয়া-ওঠা রুটিতেও রেমেদিওস, প্রতিটি স্থানে রেমেদিওস, অনন্ত কাল রেমেদিওস। জানলার পাশে বসে এমব্রয়ডারি করতে করতে দয়িতর জন্যে অপেক্ষা করে রেবেকা। তার জানা আছে ডাকহরকরার খচ্চর দুই হপ্তা পরপরই হাজির হয়, কিন্তু সেটার জন্যে সে সারাক্ষণই অপেক্ষায় থাকে, এই নিশ্চিত বিশ্বাসে যে ভুল করে হয়তো অন্য কোনোদিন এসে পড়বে সেটা। কিন্তু ঘটে ঠিক তার উল্টো; যেদিন আসার কথা, একবার সেদিন এসে পৌঁছয় না খচ্চরটা। হতাশায় পাগলপারা হয়ে, মাঝরাত্তিরে বিছানা ছেড়ে উঠে বাগানের কয়েক মুঠো মাটি খেয়ে বসে সে আত্মহত্যার এক তাড়নায়, যন্ত্রণায় আর রাগে কাঁদতে কাঁদতে, নরম-সরম কেন্নো চিবুতে চিবুতে, আর দাঁত দিয়ে ঝিনুকের খোল কুচি কুচি করতে করতে। ভোর অব্দি বমি করে চলে সে। জ্বরাতুর নিষ্প্রাণতার একটা পর্যায়ে এসে ঠেকে সে, লুপ্ত হয়ে যায় তার বাহ্যজ্ঞান, আর নির্লজ্জ প্রলাপ বকতে থাকে তার হৃদয়। কেলেংকারিতে আঁতকে উঠে উরসুলা রেবেকার তোরঙ্গের তালা ভেঙে সেটার নিচে আবিষ্কার করে গোলাপী ফিতে-বাঁধা সুগন্ধি মাখানো ষোলটা চিঠি, পুরোনো বইয়ের পাতার ভেতর রাখা গাছের পাতা, পাঁপড়ির কঙ্কাল আর ছোঁয়ামাত্র গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাওয়া শুকনো প্রজাপতি।

একমাত্র অরেলিয়ানোই বুঝতে পারে এই মরিয়া দশার কারণ। সেই বিকেলে, উরসুলা যখন রেবেকাকে তার প্রলাপ বকার অবস্থা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাগ্‌নিফিকো ভিস্‌বাল আর জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে সঙ্গে নিয়ে কাতারিনোর দোকানে গিয়ে হাজির হয় সে। লম্বা, সরু সরু কাঠের ঘর জুড়ে দিয়ে বাড়ানো হয়েছে বাড়িটা, ফুলের সুবাস ছড়ানো নিঃসঙ্গ রমণীরা থাকে সেখানে। একটা অ্যাকোর্ডিয়ান আর কয়েকটা ঢোল-বাদ্য নিয়ে মরদ ফ্রান্সিসকোর গান গাইছে একটা দল, বেশ কয়েক বছর মাকোন্দোতে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। গাঁজিয়ে তোলা আখের রস খায় তিন বন্ধুতে মিলে। অরেলিয়ানোরই সমান বয়েসী, কিন্তু দুনিয়াদারীর রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ম্যাগ্‌নিফিকো আর জেরিনাল্‌দো তাদের কোলের ওপর বসা রমণীদের সঙ্গে পান করে যায় হিসেব করে। চিমসে চেহারা, দাঁতে সোনার কাজ, এক রমণী অরেলিয়ানোকে এমন এক আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে যে শিউরে ওঠে সে। খেদিয়ে দেয় সে তাকে। আবিষ্কার করে যে যদিও সে যতোই পান করছে ততোই তার রেমেদিওসের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু মেয়েটার স্মৃতির যন্ত্রণা সে আরো ভালোভাবে সহ্য করতে পারছে। কখন যে সে ভেসে বেড়াতে শুরু করে তা বলতে পারে না সে। সে দেখে, তার দুই বন্ধু আর সেই রমণীরা উজ্জ্বল এক দীপ্তি নিয়ে পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোনো ওজনই নেই তাদের, আর তারা এমনসব কথা বলছে যেগুলো তাদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে না, আর তারা এমনসব অদ্ভুত ইশারা-ইঙ্গিত করছে যার সঙ্গে তাদের ভাবভঙ্গির কোনো মিলই নেই। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে কাতারিনো বলে ওঠে, 'এগারো নম্বর চলছে।' মাথা ঘুরিয়ে তাকায় অরেলিয়ানো, দেখে, কানের পেছনে পশমি কাপড়ের ফুল গোঁজা বিকৃত বিশাল মুখটা, আর তারপরই, সেই বিস্মরণের সময়টার মতো, তার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়, আর এই ব্যাপারটার হাত থেকে রেহাই পায় সে এক অদ্ভুত ভোরে, পুরোপুরি অচেনা একটা শোবার ঘরে, পিলার তারনেরা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পেটিকোট পরে খালি পায়ে, তার চুল খোলা, ওর মুখের ওপর একটা বাতি ধরে আছে সে, চোখে মুখে অবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপ।

'অরেলিয়ানো!'

নিজের পা দুটো পরখ করে দেখে মাথা তোলে অরেলিয়ানো। কিভাবে এখানে পৌঁছল সে জানে না। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা খেয়াল আছে তার, কারণ তার শিশুকাল থেকেই সেটা বয়ে বেড়িয়েছে সে, সংগোপনে, তার মনের এক অগম্য দূরস্থানে।

সে বলে ওঠে, 'আমি তোমার সঙ্গে শুতে এসেছি।'

কাদাতে-বমিতে তার কাপচোপড় একাকার। একাই থাকে পিলার তারনেরা তখন তার দুই বাচ্চা নিয়ে, সে তাকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস করে না। নিয়ে যায় বিছানায়। ভেজা একটা ন্যাকড়া দিয়ে ওর মুখটা পরিষ্কার করে দেয়, খুলে ফেলে তার কাপড়-জামা, তারপর নিজে পুরোপুরি নগ্ন হয়ে মশারিটা নিচু করে দেয়, যাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে তার বাচ্চারা দেখতে না পায় তাদের। যে-লোকটা থাকবে, যে-সব লোক আসবে, আর যে-লোকগুলো তার বাড়ির পথ খুঁজে পায়নি তাদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশায় আশায় থেকে হদ্দ হয়ে গেছে সে, বেদিশা হয়ে গেছে তাসগুলোর খেয়ালী আচরণে। পথ চেয়ে থেকে থেকে তার গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে, চিমসে গেছে তার স্তন, তার মনের অঙ্গারগুলো গেছে নিভে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অরেলিয়ানোর গা ছোঁয় সে, হাত রাখে তার পেটের ওপর, আর ঘাড়ে একটা চুমো খায় মাতৃস্নেহে। বিড়বিড় করে সে বলে ওঠে, 'অভাগা বাছা আমার।' শিউরে ওঠে অরেলিয়ানো। এক প্রশান্ত দক্ষতায়, এক চুলও ভুল পা না ফেলে, ঝেড়ে ফেলে সে তার জমে থাকা কষ্ট আর দেখতে পায় দিগন্তবিহীন একটা জলায় পরিণত হয়েছে রেমেদিওস, সেখান থেকে ভেসে আসছে বুনো জন্তু আর সদ্য ইস্তিরি করা কাপড়ের গন্ধ। যখন তার চেতনা ফিরে আসে তখন সে কাঁদছে। কান্নাটা গোড়াতে অস্বতঃস্ফূর্ত আর ভাঙা ভাঙা থাকলেও পরে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে কাঁদতে থাকে সে এক লাগামহীন প্রবাহে, তার মনে হয় ফেঁপে ওঠা, যন্ত্রণাদায়ক একটা কিছু বিস্ফোরিত হয়েছে তার ভেতরে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পিলার তারনেরা, আঙুলের ডগা দিয়ে তার মাথায় বিলি কেটে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অরেলিয়ানো মুক্তি পায় সেই কালো বস্তুটির হাত থেকে যা তাকে বাঁচতে দিতে চায় না। এরপর সে অরেলিয়ানোকে শুধোয়, 'কে সে?' অরেলিয়ানো বলে ফেলে। পিলার তারনেরা তখন এমন এক হাসি হেসে ওঠে যে অন্য সময় হলে তা ঘুঘু পাখিগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতো, কিন্তু এখন তার বাচ্চাদের ঘুম পর্যন্ত ভাঙে না। অরেলিয়ানোকে খোঁচা দেবার জন্যে সে বলে ওঠে, 'আগে তো ওকে তোমার পেলে পুষে বড় করতে হবে।' ঠাট্টা করেই সে কথাটা বলে, কিন্তু সেই ঠাট্টার আড়ালে অরেলিয়ানো আবিষ্কার করে সহৃদয়তার একটা ভাণ্ডার। কেবল তার সক্ষমতা নিয়ে নানান সন্দেহই শুধু নয়, সেই সঙ্গে কয়েক মাস ধরে তার মনটা যে-ভার বয়ে বেড়াচ্ছে সে-সব অব্দি পেছনে ফেলে ঘরটা থেকে সে যখন বেরিয়ে আসে, নিজ থেকেই একটা কথা দেয় পিলার তারনেরা।

সে বলে, 'মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব আমি। আর তখন দেখো ওর পাতে আমি কী দেই।'

কথা রাখে পিলার তারনেরা। কিন্তু তখন দিনকাল খারাপ যাচ্ছে, আগের সেই শান্তি আর নেই বাড়িটায়। রেবেকার প্রবল আসক্তিটা আবিষ্কার করে ফেলার পর—তার চেঁচামেচির কারণে অবশ্য সেটা গোপন রাখাটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে—ভীষণ জ্বরে পড়ে আমারান্তা। এক নিঃসঙ্গ প্রণয়ের কাঁটা তাকেও বিঁধেছে। গোসলখানার দরজা আটকে দিয়ে এক আশাহীন অনুরাগের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে আবেগতপ্ত সব চিঠি লেখে সে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেগুলো সে লুকিয়ে রাখে তোরঙ্গের তলায়। রোগে-পড়া দুটো মেয়ের দেখাশোনা করার শক্তি তখন একেবারেই নেই উরসুলার। টানা, গোপন জেরার পরেও আমারান্তার কাহিল দশার কারণ উদ্ধার করতে পারে না সে। শেষে, ফের আরেক ঝোঁকের মাথায়, তোরঙ্গের তালাটা ভেঙে ফেলে আবিষ্কার করে পিয়েত্রো ক্রেসপির ঠিকানায় লেখা কিন্তু ডাকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না ফেলা চিঠিগুলো, একটা গোলাপী ফিতে দিয়ে বাঁধা সেগুলো, তাজা লিলি ফুলে ফাঁপা আর তখনো চোখের পানিতে ভেজা। রাগে-ক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে উরসুলা সেই দিনটাকেই গালাগাল করতে থাকে যেদিন তার পিয়ানোলাটা কেনার কথা মনে হয়েছিল, বন্ধ করে দেয় এমব্রয়ডারি শেখার আসর, আর, বাড়িতে যদিও কেউ মারা যায়নি, কিন্তু একরকম শোকপালনের কথাই ঘোষণা করে সে, যা চলবে তার মেয়েরা তাদের আশা ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত। পিয়েত্রো ক্রেসপি সম্বন্ধে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তার গোড়ার দিককার ধারণাটা বদলে ফেলেছিল, বাদ্যযন্ত্র নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে তার দক্ষতা দেখে তাকে পছন্দই করতে শুরু করেছিল সে, কিন্তু তার বাগড়াটা বিফলেই যায়। কাজেই পিলার তারনেরা যখন অরেলিয়ানোকে জানায় রেমেদিওস বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অরেলিয়ানো দিব্যি বুঝতে পারে, খবরটা তার বাবা-মাকে বাড়তি কষ্টই দেবে কেবল। একটা আনুষ্ঠানিক আলাপের জন্যে বৈঠকখানায় আমন্ত্রিত হয়ে বজ্রাহতের মতো তাদের ছেলের ঘোষণা শোনে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর উরসুলা। প্রেমিকার নামটা শোনামাত্র অপমানে লাল হয়ে ওঠে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। গর্জে ওঠে সে, 'প্রেম একটা রোগ। চারদিকে এতো সুন্দর সুন্দর নম্র-ভদ্র মেয়ে থাকতে কিনা আমাদের শত্তুরের মেয়েকে বিয়ে করার কথা মনে হলো তোর।' উরসুলা কিন্তু সায় দেয় পছন্দটায়। সে স্বীকার করে, সাত মসকোতে বোনদের পছন্দ হয়েছে তার, পছন্দ হয়েছে তাদের রূপ, তাদের কাজ-কর্ম করার ক্ষমতা, ওদের নম্রতা-ভদ্রতা, আর ওদের চমৎকার আদব-কায়দা; ছেলের বিচক্ষণতার তারিফ করে সে। বৌ-এর অতিআগ্রহে দমে গিয়ে একটা শর্ত জারী করে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া: সে চায় রেবেকা পিয়েত্রো ক্রেসপিকে বিয়ে করুক। ওদিকে, উরসুলা অবসরমতো প্রাদেশিক রাজধানীতে বেড়াতে নিয়ে যাবে আমারান্তাকে, যাতে নানান লোকজনের সান্নিধ্যে এসে তার হতাশাটা কেটে যায়। চুক্তির খবরটা শোনামাত্র স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায় রেবেকার, দয়িতকে একটা উল্লাসভরা চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় যে সে তার বাবা-মার মতে মত দিয়েছে, তারপর, তৃতীয় কোনো লোকের সাহায্য না নিয়েই চিঠিটা ডাকে ফেলে দিয়ে আসে। আমারান্তা ভান করে সিদ্ধান্তটা সে মেনে নিয়েছে, ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠে জ্বর থেকে, কিন্তু মনে মনে সে পণ করেছে তার লাশ ডিঙিয়ে তবেই বিয়ে করতে হবে রেবেকাকে। পরের শনিবার হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তার কালো স্যুট, সেলুলয়েডের কলার আর হরিণের চামড়ার জুতো পরে—যা সে প্রথমবার পরেছিল উৎসবের সেই রাতে—রেমেদিওস মসকোতের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। একই সঙ্গে খুশি আর চিন্তিত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আর তার বৌ অভ্যর্থনা জানায় তাকে, কারণ এই হঠাৎ সফরের কারণ কিছুই জানতো না তারা, আর তারপর তাদের ধারণা হয় সে বোধহয় কনের নামটা গুলিয়ে ফেলেছে। ভুলটা শোধরানোর জন্যে রেমেদিওসকে তার মা ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে আসে বৈঠকখানায়, তখনো ঘুমে ঢলছে সে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে সে বিয়ে করতে চায় এ-কথাটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি কিনা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে রেমেদিওস জবাব দেয় সে চায় তারা কেবল তাকে ঘুমোতে দিক। মসকোতদের বিড়ম্বনাটা বুঝতে পেরে অরেলিয়ানোর সঙ্গে ব্যাপারটা ফয়সালা করতে যায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। যখন সে ফিরে আসে মসকোতরা আনুষ্ঠানিক পোশাক-আশাক পরে নিয়েছে, নতুন করে সাজিয়েছে ঘরের আসবাবপত্র, ফুলদানিতে রেখেছে টাটকা ফুল আর অপেক্ষা করছে তাদের বড় মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। ঘটনাটা আর নিজের বিরক্তিকর শক্ত কলারটার কারণে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া এ-ব্যাপারটা নিশ্চিত করে যে রেমেদিওসই পছন্দের পাত্রী।

চরম বিরক্ত হয়ে আপোলিনার মসকোত বলে ওঠে, 'এর কোনো অর্থই হয় না। বিয়ের যোগ্যা ছ'টি মেয়ে আছে আমাদের, যারা কিনা আপনার ছেলের মতো আন্ত রিক আর পরিশ্রমী ছেলের বৌ হতে পারলে খুশী হবে, অথচ অরেলিয়ানোর চোখ পড়ল কিনা ঠিক তার ওপর যে এখনো বিছানা ভেজায়।' খুবই সংযত চরিত্রের মহিলা তার বৌ বেদনাহত আঁখিপল্লব আর চেহারা নিয়ে আপোলিনারের ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফলের মদ শেষ করার পর আগ্রহভরেই অরেলিয়ানোর প্রস্তাব মেনে নেয় তারা। শুধু সিনোরা মসকোত উরসুলার সঙ্গে একা একটু কথা বলতে চায়। পুরুষ মানুষের ঝামেলায় তাকে জড়ানো হচ্ছে বলে গোড়াতে আপত্তি তুললেও একটা গভীর সহানুভূতি অনুভব করে শেষমেশ তার সঙ্গে দেখা করতে যায় উরসুলা। আধ ঘণ্টা পর সে এই খবর নিয়ে ফিরে আসে যে রেমেদিওস এখনো নাবালিকা। বিষয়টাকে তেমন গুরুতর বাধা হিসেবে দেখে না অরেলিয়ানো। সে এতো দিন অপেক্ষা করেছে, আর এখন তার কনে সন্তানধারণ করার বয়েস পর্যন্ত পৌঁছুনো পর্যন্ত সে স্বচ্ছন্দেই অপেক্ষা করতে পারবে।

নতুন করে তৈরি হওয়া এই ঐকতানটা বাধা পায় মেলকিয়াদেসের মৃত্যুতে। ঘটনাটা আগে থেকে আঁচ করার মতো হলেও আনুষঙ্গিক অবস্থাটা সে-রকম ছিল না। ফিরে আসার মাস কয়েক পরেই বুড়িয়ে যাওয়ার একটা লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে, আর সেটা এতো ঝটিতি আর জটিল রকমের যে শিগ্‌গিরই তাকে সেইসব বাতিল প্রপিতামহদের কাতারে ফেলে দেয়া হয়েছিল যারা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় শোবার ঘরে, পা টেনে টেনে, সেইসব দিনের কথা জোর গলায় আওড়াতে আওড়াতে যখন পৃথিবীটা ছিল আরো অনেক সুখের, আর যাদেরকে নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না বা যাদের কথা সত্যিকার অর্থে কারো মনেও পড়ে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একদিন সকালে বিছানায় পাওয়া যায় তাদেরকে মৃত অবস্থায়। গোড়ার দিকে দাগেরোটাইপ ছবি আর নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর নতুনত্বে অতি-উৎসাহী হয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া মেলকিয়াদেসের কাজে হাত লাগিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তাকে সঙ্গ দেয়া ছেড়ে দিয়েছিল সে, কারণ, দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছিল ভাবের আদান-প্রদান, নিভে আসছিল লোকটার চোখের জ্যোতি, তার শ্রবণক্ষমতা। লোকজনের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদেরকে সে গুলিয়ে ফেলতো মানবসভ্যতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূর অতীতের চেনাজানা মানুষের সঙ্গে, আর কেউ কিছু শুধোলে তার জবাব দিতো এক জগাখিচুড়ি ভাষায়। শূন্যে পথ হাতড়ে হাতড়ে হাঁটাচলা করতো সে, যদিও জিনিসপত্তরের ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে নিতো আশ্চর্যরকমের সাবলীলভাবেই, যেন তাৎক্ষণিক পূর্বধারণা দিয়ে পথ ঠিক করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি দেয়া হয়েছে তাকে। একদিন সে তার নকল দাঁত পরতে ভুলে যায়, রাতের বেলা নিজের বিছানার পাশে এক গ্লাস পানির ভেতর রেখে দিয়েছিল সে জিনিসটা, তারপর আর পরা হয়নি। বাড়ি সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়ে উরসুলা তাকে অরেলিয়ানোর কামারশালার পাশেই বাড়ির হৈ-হট্টগোল থেকে দূরে বিশেষ একটা ঘর তৈরি করে দিয়েছিল, আলোয় উদ্ভাসিত একটা জানলা আর বই-এর র‍্যাক সহ, সে-র‍্যাকে উরসুলা নিজেই সাজিয়ে দিয়েছিল ধুলো আর পোকামাকড়ে প্রায় বরবাদ হয়ে যাওয়া বইপত্তর, অবোধ্য সব চিহ্ন আর আঁকিবুকিতে ভরা টুকরো-টাকরা কাগজপত্রের গাদা আর তার নকল দাঁতসহ গ্লাসটা, সেটায় আবার ক্ষুদে ক্ষুদে হলুদ ফুলঅলা কিছু জলীয় গাছড়া গজিয়ে গিয়েছিল। নতুন জায়গাটা সম্ভবত পছন্দই হয়েছিল মেলকিয়াদেসের, কারণ তাকে আর কখনোই দেখা যায়নি, এমনকি খাবার ঘরেও না। কেবল অরেলিয়ানোর কামারশালাতেই যেতো সে, সঙ্গে নিয়ে আসা ফুলে-ওঠা ময়দার তালের মতো কিছু একটা দিয়ে তৈরি পার্চমেন্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লিখে যেতো রহস্যময় কথাবার্তা। দিনে দু'বার ভিসিতাসিওন-এর নিয়ে আসা খাবার খেতো সে ওখানেই, যদিও শেষ দিনগুলোতে খিদে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার, কেবল শাক-সবজি খেয়েই কাটিয়ে দিতো সে। নিরামিষাশীদের চোখে যে-ধরনের উদাসীন দৃষ্টি দেখা যায়, শিগগিরই সেটা পেয়ে গিয়েছিল সে। পাতলা এক ধরনের শ্যাওলায় শরীর ছেয়ে যায় তার, সেই শ্যাওলা ছিল অষ্টপ্রহর পরে থাকা তার মান্ধাতার আমলের গেঞ্জিতেও, আর তার নিঃশ্বাস দিয়ে বেরুতো ঘুমিয়ে থাকা জন্তুর গন্ধ। অরেলিয়ানোরও শেষ পর্যন্ত খেয়াল থাকে না তার কথা, নিজের কবিতা নিয়েই বিভোর সে, তবে একবার তার মনে হয়, থেমে থেমে মেলকিয়াদেস আপনমনে যা বকে যাচ্ছে তা যেন সে বুঝতে পারছে, তাই সে কান পাতে। আসলে, সেই কাঁপা কাঁপা স্বগতোক্তির ভেতর থেকে একমাত্র যে-জিনিসটা আলাদা করা যায় তা হল *বিষুব, বিষুব, বিষুব* শব্দটা আর আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট নামটার একটানা আওড়ানি। অরেলিয়ানোকে তার রুপোর কাজে সাহায্য করতে এসে আর্কাদিও খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল মেলকিয়াদেসের সঙ্গে। যোগাযোগের সেই প্রচেষ্টায় মেলকিয়াদেস মাঝে মধ্যে সাড়া দিতো বাস্তবের সঙ্গে প্রায় সংশ্রবহীন গোটা কতেক শব্দ-বন্ধ আউড়ে। সে যাই হোক, এক হঠাৎ আবেগের বশে এক বিকেলে তাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর পর, ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর্কাদিওর মনে পড়ে যাবে কিভাবে কাঁপতে কাঁপতে মেলকিয়াদেস তার দুর্বোধ্য রচনার কয়েকটা পাতা শুনিয়েছিল তাকে, যার কিছুই, বলা বাহুল্য তার মাথায় ঢোকেনি, কিন্তু জোরে জোরে যখন তা পড়া হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশপদের কাছে লেখা পোপের চিঠি। এরপর সে মৃদু হাসে অনেকদিন পর, তারপর হিস্পানিতে বলে ওঠে, 'আমি মরলে তিন দিন আমার ঘরে পারদ পোড়াবে।' অরেলিয়ানো কথাটা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে জানালে সে আরো বিশদ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চালায়, কিন্তু একটাই জবাব পায় সে কেবল: 'আমি অমরত্ব খুঁজে পেয়েছি।' মেলকিয়াদেসের নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আর্কাদিও প্রতি বৃহস্পতিবার সকালবেলায় তাকে নদীতে গোসল করাতে নিয়ে যেতো। মনে হয়, অবস্থা একটু ফেরে তাতে। কাপড়চোপড় ছেড়ে ছেলেগুলোর সঙ্গেই নেমে পড়তো সে পানিতে, কোথায় কী আছে না আছে সে-সম্বন্ধে একটা রহস্যময় বোধের অধিকারী হওয়াতে গভীর আর বিপজ্জনক জায়গাগুলো এড়িয়ে যেতো সে। একবার, কোনো এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সে বলে, 'পানি থেকেই আসি আমরা।' এভাবে সবার চোখের আড়ালে বেশ কিছু দিন কাটানোর পর এক রাতে পিয়ানোলাটা ঠিক করার একটা করুণ চেষ্টা চালায় সে, আর তারপর আর্কাদিওর সঙ্গে নদীতে যাওয়ার সময় বগলদাবা করে নিয়ে নেয় একটা লাউয়ের খোল আর তোয়ালে দিয়ে মোড়া তালের তেলের একটা সাবান। এক বৃহস্পতিবার, তখনো তাকে ডাকা হয়নি নদীতে যাওয়ার জন্যে, অরেলিয়ানো তাকে বলতে শোনে, 'সিঙ্গাপুরের বালিয়াড়িতে জ্বরে আমার মৃত্যু হয়েছে।' সেদিন সে নামে নদীর একটা খারাপ জায়গায়, পরের দিন কয়েক মাইল ভাটিতে নদীর একটা চোখা বাঁকে ভেসে উঠলে পর খুঁজে পাওয়া যায় তাকে, তার পেটের ওপর তখন একটা নিঃসঙ্গ শকুন বসে রয়েছে। মেলকিয়াদেসের জন্যে যে-রকম কেঁদে ভাসায় উরসুলা এমনটা সে তার বাবার জন্যেও কাঁদেনি, আর তার লংকাকাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়া আপত্তির মুখে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বাদ সেধে বসে লোকটাকে কবর দেয়ার ব্যাপারে। সে ঘোষণা করে, 'মেলকিয়াদেস অমর, আর সে নিজেই জানিয়ে দিয়ে গেছে তার পুনরুত্থানের মন্ত্র।' বিস্মৃত পানির পাইপটা বের করে আনে সে, তারপর লাশের পাশেই গরম দিতে শুরু করে এক কেতলি পারদ, ক্রমেই নীল বুদবুদে ভরে ওঠে সেটা। দন মসকোত আপোলিনার তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলে কবর না দেয়া ডুবে-মরা মানুষ জনস্বাস্থ্যের জন্যে খুব বিপজ্জনক। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বলে, 'মোটেই না, কারণ লোকটা বেঁচে আছে,' তারপর বাহাত্তরটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে পারদের ধূপের ভেতর, ততক্ষণে লাশটা ফেটে ফেটে উঠেছে নীলচে বাদামী প্রতিপ্রভায় যার শিস্ ধ্বনিতে গোটা বাড়ি ভরে গেছে এক নারকীয় বাষ্পে। কেবল তখনই তাকে কবর দিতে রাজী হয় সে, তবে সাদামাটাভাবে নয়, মাকোন্দোর সবচেয়ে উপকারী বন্ধুর যোগ্য সম্মানের সঙ্গে। শহরের প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেটা, আর মাকোন্দোর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লোক হয় তাতে, একশো বছর পর বড়-মা'র অন্ত্যেষ্টি-উৎসবই কেবল ছাপিয়ে যেতে পেরেছিল সেটাকে। গোরস্থানের জন্যে ঠিক করে রাখা জমির মাঝখানে কবর খুঁড়ে গোর দেয়া হয় তাকে, তার সম্পর্কে একমাত্র যে-জিনিসটা ওরা জানতো সেটাই একটা পাথরে লিখে: **মেলকিয়াদেস**। নয় দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশি-জাগর পালন করা হয় তার জন্যে। কফি খেতে, ঠাট্টা-তামাশা করতে, তাস পেটাতে লোকজন সবাই উঠোনে জড়ো হলে পর আমারান্তা সেই ডামাডোলের ভেতর একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে পিয়েত্রো ক্রেসপিকে জানায় তার অনুরাগের কথা, ওদিকে পিয়েত্রো ক্রেসপি মাত্র কয়েক হপ্তা আগে রেবেকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে তার প্রতিশ্রুতির কথা আর আরবরা যেখানে একসময় তুচ্ছ এটা-ওটার বদলে ম্যাকঅ পাখি কেনার জন্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিল ঠিক সেখানে বাদ্যযন্ত্রের একটা দোকানও দিয়েছে সে, লোকে জায়গাটাকে বলে তুর্কিদের সড়ক। ইতালিয় লোকটা, যার পাকাচামড়ার মতো চুল দেখে মেয়েরা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারে না, সে আমারান্তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন খামখেয়ালি একটা ছোট্ট মেয়ে সে, তার কথায় আমল দেবার কিছু নেই।

পিয়েত্রো ক্রেসপি তাকে বলে, 'আমার একটা ছোট ভাই আছে। দোকানের কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্যে আসছে সে।'

অপমানিত বোধ করে আমারান্তা, রাগে ফুঁসে উঠে পিয়েত্রো ক্রেসপিকে সে জানিয়ে দেয় তার বোনের বিয়ে থামানোর জন্যে লাশ হয়েও যদি নিজেকে দরজার ওপর শুয়ে থাকতে হয় তাহলে তাই করবে সে। হুমকিটার নাটকীয়তা ইতালিয় লোকটাকে এতোটাই অভিভূত করে যে রেবেকাকে সেটা জানানোর লোভ সামলাতে পারে না সে। আর সেই কারণেই উরসুলার কাজে-কর্মের ছুতোয় বারবার মুলতুবি রাখা আমারান্তার সফরটা এক হপ্তারও কম সময়ের মধ্যে ঠিক করে ফেলা হয়। কোনো বাদ-প্রতিবাদ করে না আমারান্তা, কিন্তু রেবেকাকে চুমো খেয়ে বিদায় নেবার সময় কানে কানে সে বলে যায়, 'আশায় মাতিস না বেশি। ওরা আমাকে দুনিয়ার শেষ মাথায় পাঠালেও তোর বিয়ে থামানোর একটা না একটা পথ আমি ঠিকই বের করবো, তা সে যদি তোকে খুন করেও করতে হয় তো তাই সই।'

উরসুলার অনুপস্থিতিতে, আর এখনো যে-মানুষটা চুপিসারে ঘরময় ঘুরে বেড়ায় সেই মেলকিয়াদেসের অদৃশ্য উপস্থিতিতে বাড়িটাকে বিশাল আর ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। সংসার দেখাশোনার ভার নেয় রেবেকা, সেই ইন্ডিয়ান রমণী নেয় বেকারির দায়িত্ব। রাতে যখন ল্যাভেন্ডারের সুবাস ছড়িয়ে আর উপহার হিসেবে সবসময় একটা খেলনা নিয়ে পিয়েত্রো ক্রেসপি আসে, কারো যাতে কোনোরকম সন্দেহ না হয় সেজন্যে তার দয়িতা তাকে বৈঠকখানায় বসায় দরজা-জানলা হাট করে খুলে দিয়ে। অবশ্য এই সতর্কতার দরকার ছিল না। কারণ ইতালিয় লোকটা এমনই ভদ্র যে, যে-মেয়ে এই বছরের ভেতরই তার বৌ হতে যাচ্ছে তার হাতটি পর্যন্ত ছোঁয়নি সে। সেই সব সাক্ষাতের কারণে বাড়িটা ভরে ওঠে আশ্চর্য সব খেলনায়। যান্ত্রিক ব্যালেরিনা, গানের বাক্স, দড়াবাজ বাদর, টাট্টু ঘোড়া, তাম্বুরিন বাজিয়ে ভাঁড়: পিয়েত্রো ক্রেসপির আনা এই উন্নত আর আশ্চর্য যান্ত্রিক সম্ভার মেলকিয়াদেসের মৃত্যুশোক ভুলিয়ে দেয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে, ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাকে সেই সব দিনে যখন সে ছিল এক আলকিমিয়াবিদ। সময়টা কাটে তার নাড়িভুঁড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে ফেলা জন্তু-জানোয়ার আর এমন সব যন্ত্রপাতির এক স্বর্গরাজ্যে যেসব যন্ত্রকে দোলকের নীতির ওপর দাঁড় করানো অনন্ত গতির এক সিস্টেমের সাহায্যে আরো নিখুঁত করার জন্যে খুলে ফেলা হয়েছিল। ওদিকে রেমেদিওসকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে কামারশালার কাজে ঢিল দিতে হয় অরেলিয়ানোকে। গোড়ার দিকে বাচ্চাটা প্রতিদিন বিকেলে আসা মানুষটার চাইতে নিজের পুতুলগুলোকেই পছন্দ করতো বেশি, লোকটির কারণে তাকে তার খেলনাপাতির কাছ থেকে বিদায় নিতে হতো যাতে গোসল সেরে কাপড়জামা পরে বৈঠকখানায় যেতে পারে সে তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অরেলিয়ানোর ধৈর্য আর অধ্যবসায় শেষঅব্দি বশ করে ফেলে রেমেদিওসকে, এতোটাই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে তার সঙ্গে শব্দের মানে বের করে করে, আর একটা আদড়া-খাতায় রঙিন পেন্সিল দিয়ে গোয়ালের গরুসহ বাড়িঘর আর টিলার পেছনে লুকোনো হলুদ রশ্মিসহ সূর্য এঁকে এঁকে।

সুখ নেই শুধু রেবেকার মনে, আমারান্তার সেই হুমকির কারণে। বোনের ধাতটা, তার উচ্চণ্ড মেজাজের কথা তার ভালোই জানা আছে, বিশেষ করে সে ভয় পেয়ে যায় তার রাগের নিদারুণ বিষের কথা ভেবে। আঙুল চুষে চুষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোসলখানায় কাটিয়ে দেয় সে, ইস্পাতকঠিন এক প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিজেকে সামলে রাখে মাটি খাওয়া থেকে। এই অস্থির অবস্থা থেকে খানিকটা নিষ্কৃতির আশায় সে পিলার তারনেরাকে ডেকে আনে তার ভাগ্য গুনে দেখার জন্যে। গৎবাঁধা কিছু আগাডোম-বাগাডোমের পালা শেষ হলে পিলার তারনেরা ভবিষ্যদ্বাণী করে, 'তোমার বাপ-মার যদ্দিন না কবর হচ্ছে তদ্দিন তোমার কপালে সুখ নেই।'

কথাটা শুনে শিউরে ওঠে রেবেকা। একটা স্বপ্নের স্মৃতির মতো দেখতে পায়, নিজে সে খুব ছোট্ট এক মেয়ে হয়ে একটা বাড়িতে ঢুকছে একটা তোরঙ্গ, ছোট্ট দোলখাটিয়া আর থলে হাতে, সে-থলের ভেতর কী আছে তা সে নিজেই জানে না। সুতি কাপড়পরা, একটা সোনার বোতাম দিয়ে কলার আঁটা, টাকমাথা এক ভদ্রলোককে মনে পড়ে তার, সে-লোকের সঙ্গে হরতনের রাজার কোনো সম্পর্ক নেই। মনে পড়ে একেবারে কমবয়েসী আর দুর্দান্ত রূপসী এক রমণীর কথা, উষ্ণ আর সুগন্ধি হাত তার, রুহিতনের গোলাম আর তার বাতগ্রস্ত হাতের সঙ্গে সে-রমণীর কোনো মিলই নেই, চুলে সে গুঁজে রাখতো ফুল, বিকেলবেলা সবুজরাস্তার এক শহরের ভেতর দিয়ে তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতো সে।

রেবেকা বলে, 'বুঝলাম না তো।'

পিলার তারনেরা যেন ভয় পয়ে যায়:

'আমিও না, কিন্তু তাসগুলো সে-কথাই বলছে।'

হেঁয়ালিটা রেবেকাকে এতোটাই ভাবিয়ে তোলে যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে ব্যাপারটা খুলে বলে সে, কিন্তু তাসের ভবিষ্যদ্বাণীতে রেবেকা বিশ্বাস করে বলে উল্টো সে তাকে ধমকে দেয়, যদিও কাউকে কিছু না বলে হাড়গোড়ের সেই থলেটা সে নিজেই খুঁজতে লেগে পড়ে দেয়ালকুঠুরী আর তোরঙ্গগুলোয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবাবপত্র সরিয়ে, বিছানাপত্তর আর মেঝের তক্তা উল্টেপাল্টে। তার মনে পড়ে যায়, বাড়ি সংস্কারের সময় থেকে জিনিসটা নজরে পড়েনি তার। চুপিসারে রাজমিস্ত্রিদের ডেকে আনে সে, আর তাদের একজন জানায় কাজের সময় ঝামেলা পাকাচ্ছিল বলে কোনো এক শোবার ঘরের দেয়ালে থলেটা গেঁথে দিয়েছিল সে। দেয়ালের গায়ে বেশ ক'দিন কান পেতে রেখে অতল থেকে ভেসে আসা একটা ঢক ঢক আওয়াজের হদিস পাওয়া যায়। অতএব ফুটো করা হয় দেয়ালটা, দেখা যায়, হাড়গোড়সহ একবারে অটুট রয়েছে থলেটা। মেলকিয়াদেসের কবরের পাশে, কোনো পাথর না পুঁতে, সেদিনই গোর দেয়া হয় থলেটা, আর প্রুদেনসিও আগিলারের স্মৃতি যেমন চেপে বসেছিল তার বিবেকের ওপর, কিছুদিনের জন্যে তেমনি চেপে বসা একটা ভারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। রান্নাঘর দিয়ে যাওয়ার সময় রেবেকার কপালে একটা চুমো খেয়ে সে বলে:

'ওসব আজেবাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দে। সুখী হতে যাচ্ছিস তুই।'

আর্কাদিওর জন্মের পর এ-বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পিলার তারনেরার জন্যে, রেবেকার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় সে-দরজা খুলে যায়। ছাগলের পালের মতো দিনের যে-কোনো সময় এসে হাজির হবে সে, আর তার উন্মত্ত কর্মশক্তির রাশ ছেড়ে দেবে দুরূহতম কাজকর্মে। মাঝে মধ্যে সে ঢুকে পড়বে কামারশালায়, এমন দক্ষভাবে আর কোমলতার সঙ্গে আর্কাদিওকে সাহায্য করবে দাগেরোটাইপ প্লেটগুলোকে আলোকসংবেদী করতে যে শেষ পর্যন্ত ছেলেটার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে। এই মেয়েটি অস্বস্তিতে ফেলে দিতো তাকে। ডার্ক রুমে তার তামাটে শরীর, তামাকের গন্ধ, আর হাসির নৈরাজ্য আর্কাদিওর মনোসংযোগ নষ্ট করে দিতো, জিনিসপত্রের সঙ্গে ধাক্কা খেতে শুরু করতো সে এলোপাথাড়িভাবে।

একবার অরেলিয়ানো যখন ওখানে রুপোর কাজে ব্যস্ত, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তা দেখছিল পিলার তারনেরা, অরেলিয়ানোর কষ্টকর ধৈর্য দেখে প্রশংসা ঝরে পড়ছিল তার গলায়। হঠাৎই ঘটে যায় ব্যাপারটা। আর্কাদিও ডার্করুমে আছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে চোখ তুলে তাকায় সে পিলার তারনেরার চোখে, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল তার চিন্তাও, যেন দুপুরের রোদ এসে পড়েছে সেটার ওপর।

অরেলিয়ানো বলে, 'তো, এবার বলো ব্যাপারটা কী।'

করুণ একটা হাসি হেসে নিজের ঠোঁটজোড়া কামড়ে ধরে পিলার তারনেরা।

বলে, 'একটা যুদ্ধে অনেক নাম করবে তুমি। যেখানে চোখ রাখবে সেখানেই পুতে দেবে তোমার বুলেট।'

সংকেতটার প্রমাণ পেয়ে ঢিল পড়ে অরেলিয়ানোর পেশীতে। ফিরে যায় সে তার কাজে মন দিতে, যেন কিছুই ঘটেনি, তারপর তার গলায় বেজে ওঠে একটা প্রশান্ত ক্ষমতার সুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে, 'চিনে নেবো আমি ছেলেটাকে। আমার নামে নাম হবে ওর।'

যা খুঁজছিল, শেষ পর্যন্ত তা পেয়ে যায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াঃ ঘড়ির মেকানিজমের সঙ্গে জুড়ে দেয় সে এক যান্ত্রিক ব্যালে নর্তকীকে, তাতে খেলনাটা তার নিজের সুরের ছন্দে নেচে যায় টানা তিন দিন। তার অন্য সব অস্থিরমতি কাজের চেয়ে এই আবিষ্কারটা তাকে উত্তেজিত করে ঢের বেশি। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় সে। ঘুমোনো বন্ধ করে দেয়। স্রেফ রেবেকার নজরদারি আর সতর্কতাই ঠেকিয়ে রাখে তাকে তার নিজের খেয়ালের তাড়ায় উপশমহীন, চিরস্থায়ী বিকারগ্রস্ত অবস্থায় চলে যাওয়া থেকে। গরুর গাড়ি, জমির মই, গতি যোগ হলে কাজে লাগে এমন সব কিছুতে দোলকের নীতি প্রয়োগ করার একটা ফন্দি বের করার চেষ্টায় ঘরময় হেঁটে বেড়াতে থাকে সে রাত্রিবেলা আপন মনে বকতে বকতে। অনিদ্রার জ্বর তাকে এতোটাই অবসন্ন করে তোলে যে একদিন সকালে তার শোবার ঘরে এলোমেলো ভাব-ভঙ্গিতে ঢুকে পড়া সাদা চুলো বুড়ো লোকটাকে চিনতেই পারে না সে। লোকটা প্রুদেনসিও আগিলার। শেষ পর্যন্ত সে যখন চিনতে পারে তাকে, মৃতরাও যে বুড়ো হয় তাই দেখে চমকে গিয়ে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যেন স্মৃতিকাতরতার একটা ধাক্কা খায়। অবাক গলায় সে বলে ওঠে, 'প্রুদেনসিও, নিশ্চয়ই বহু দূর থেকে আসতে হয়েছে তোমাকে।' মরণের বহু বছর পর জীবিতদের জন্যে টানটা এতো তীব্র, সঙ্গীর প্রয়োজনটা এতো প্রচণ্ড, মৃত্যুর ভেতরে থাকা মৃত্যুর সান্নিধ্যটা এতো ভয়ংকর যে প্রুদেনসিও আগিলার শেষ পর্যন্ত ভালোবেসে ফেলেছে তার সবচেয়ে বড় শত্রুকেও। বহুদিন খুঁজেছে তার হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার খোঁজে। রিয়োহাচা থেকে আসা মৃতদের জিজ্ঞেস করেছে তার কথা, 'উপার' উপত্যকার আর জলার মৃতদেরও জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি, কারণ মেলকিয়াদেস পৌঁছে মৃত্যুর বহুরঙা মানচিত্রে ছোট্ট একটা কালো ফুটকি দিয়ে গ্রামটাকে চিহ্নিত না করা পর্যন্ত মৃতদের কাছে মাকোন্দো অচেনাই ছিল। ভোর অব্দি প্রুদেনসিও আগিলারের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। কয়েক ঘন্টা পর, রাত জেগে জেগে হদ্দ হয়ে অরেলিয়ানোর কামারশালায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী বার আজ?' অরেলিয়ানো তাকে জানায় সেদিন মঙ্গলবার। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বলে, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই বুঝলাম এখনো সোমবারই আছে, গতদিনের মতো। আকাশটা দেখ্, দেয়ালগুলো দেখ্। আজো সোমবার।' এ-ধরনের বাতিকগ্রস্ত কথাবার্তায় অভ্যস্ত অরেলিয়ানো তাকে আমল দেয় না। পরের দিন, বুধবার, ফের কামারশালায় এসে হাজির হয় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া। বলে, 'এতো মহা জ্বালা হলো; বাতাসের দিকে তাকা, সূর্যের গুনগুনানি শোন, ঠিক আগের দিনের মতো। আজকেও সোমবার।' সেই রাতে পিয়েত্রো ক্রেসপি বারান্দায় আবিষ্কার করে তাকে, কাঁদছে প্রুদেনসিও আগিলারের জন্যে, মেলকিয়াদেসের জন্যে, রেবেকার বাপ-মায়ের জন্যে, মরে গিয়ে যারা একা আছে তাদের সবার জন্যে। টান টান একটা দড়ির ওপর পেছন-পায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটে এমন একটা ভালুক দেয় তাকে পিয়েত্রো ক্রেসপি, কিন্তু যে-চিন্তাটা তাকে পেয়ে বসেছে সেটা থেকে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে সরাতে পারে না সে। মানুষকে উড়তে সাহায্য করবে এমন একটা দোলকযন্ত্র তৈরি করার সম্ভাবনা দিন কতেক আগে তাকে যে সে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিল সেই প্রকল্পটার কী অবস্থা সেকথা জিজ্ঞেস করায় পিয়েত্রো ক্রেসপি জবাব দেয় সেটা অসম্ভব, কেননা দোলক সবকিছুকেই শূন্যে তুলতে পারে কেবল নিজেকে ছাড়া। বৃহস্পতিবার রাতে চষা জমির করুণ চেহারা নিয়ে ফের কামারশালায় উদয় হয় সে। প্রায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, 'টাইম মেশিনটা ভেঙে গেল। ওদিকে উরসুলা আর আমারান্তা কত দূরে!' বাচ্চাদের মতো তাকে বকাবকি করে অরেলিয়ানো, তখন সে অনুতপ্ত হয়। জিনিসপত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলে সে ছয় ঘণ্টা ধরে, সেগুলোর অবস্থা দেখে আগের দিনের অবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য বের করার চেষ্টায়, সেগুলোর ভেতর এমন কিছু পরিবর্তন আবিষ্কারের আশায় যে-পরিবর্তন সময়ের গতি সম্বন্ধে কিছু জানাবে। গোটা রাত সে চোখ মেলে বিছানায় কাটায় প্রুদেনসিও আগিলার, মেলকিয়াদেস, আর সমস্ত মৃতলোকজনকে ডেকে ডেকে, যাতে তারা তার কষ্টের ভাগ নিতে পারে। কিন্তু কেউই আসে না। শুক্রবার, ঘুম থেকে কেউ জেগে ওঠার আগে ফের প্রকৃতির অবস্থা নিরিখ করে সে, যতক্ষণ না তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে সেদিন সোমবার। তারপর পাকড়ে ধরে একটা দরজার আগল তার অসাধারণ তাকতের বুনো হিংস্রতায়, তারপর ভারিক্কি আর অনর্গল কিন্তু পুরোপুরি অবোধ্য এক ভাষার আছরে পড়া এক লোকের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলে আলকিমিয়া পরীক্ষাগার, দাগেরোটাইপের ঘর, রুপোর কামারশালার যন্ত্রপাতি। সে যখন বাকি বাড়িটারও দফরফা করে দেবার উপক্রম করছে তখন পাড়াপড়শীদের সাহায্য চায় অরেলিয়ানো। দশজন লোকের দরকার পড়ে তাকে বশে আনতে, চৌদ্দ জন তাকে বাঁধতে, কুড়িজন তাকে টেনে উঠোনের চেস্টনাট গাছের কাছে আনতে, তারপর সেখানেই তাকে ফেলে রাখে ওরা, হাত-পা বাঁধা, অদ্ভুত এক ভাষায় চেঁচাতে থাকা, মুখ থেকে সবুজ ফেনা বের হতে থাকা অবস্থায়। উরসুলা আর আমারান্তা যখন ফিরে আসে তখনো তার হাত-পা চেস্টনাট গাছের সঙ্গে বাঁধা, পুরো শরীর বৃষ্টিতে সপসপে ভেজা, চেহারায় একটা সারল্যের ছাপ। ওরা যখন তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ওদেরকে না চিনেই ওদের দিকে তাকায়, এমন সব কথা বলে যা ওরা বুঝতে পারে না। চেপে বসা দড়িতে ক্ষত-বিক্ষত তার কব্জি আর গোড়ালির বাঁধন খুলে দেয় উরসুলা, শুধু কোমরে বাঁধন থাকে তার। পরে, রোদ বৃষ্টির হাত থেকে তাকে বাঁচাতে তালপাতার একটা ছাউনি তুলে দেয় ওরা তার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আর রেমেদিওস মসকোত-এর বিয়ে হয় মার্চের এক রোববার, বৈঠকখানায় পাদ্রী নিকানোর রেইনা-র বসানো একটা বেদীর সামনে। মসকোত পরিবারের জন্যে ঘটনাটা হয়ে দাঁড়ায় টানা চার হপ্তাব্যাপী একটা ধাক্কার চূড়ান্ত পর্যায়, কারণ ছেলেবেলার অভ্যেসগুলো কাটিয়ে ওঠার আগেই সাবালিকা হয়েছে রেমেদিওস। বয়োসন্ধিকালের পরিবর্তনের কথা তার মা তাকে জানিয়ে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু তারপরেও, ফেব্রুয়ারীর এক বিকেলে যখন তার বোনেরা বসার ঘরে অরেলিয়ানোর সঙ্গে গাল-গপ্পো করছিল, তখন সে চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে ওখানে হাজির হয়ে তাদের দেখায় তার বাদামী রঙে মাখামাখি প্যান্টিটা। ঠিক হয়, বিয়েটা হবে এক মাস পরে। কী করে নিজের গা ধুতে হয়, জামা-কাপড় পরতে হয় এসব তাকে শেখানো আর একটা বাড়ির আদি-অকৃত্রিম ব্যাপার-স্যাপারগুলো তাকে বোঝানোর জন্যে সময়টা নেহাতই কম। বিছানা ভেজানোর অভ্যেসটা ছাড়ানোর জন্যে গরম ইটের ওপর পেশাব করানো হয় ওকে। রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হয় বৈবাহিক রহস্যের অলঙ্ঘনীয়তার ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে গিয়ে, তার কারণ, বিষয়টা তার কাছে খোলাসা করে বলার পর সে এতোই বিভ্রান্ত আর তাজ্জব হয়ে যায় যে বিয়ের রাতের খুঁটিনাটি নিয়ে সবার সঙ্গেই কথা বলার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে রেমেদিওস। অভিজ্ঞতাটা ভীষণ ক্লান্তিকর হলেও বিয়ের দিনে দেখা যায় জাগতিক রীতিনীতিগুলোর ব্যাপারে সে তার বোনদের যে-কারো মতোই ওয়াকিবহাল। নানান রকমের ঝালর আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো পথ ধরে দন আপোলিনার মসকোত ওকে হাত ধরে নিয়ে চলেন হাউইবাজি আর নানান বাজনার সুরের ভেতর দিয়ে, আর জানলা থেকে যারা তাকে শুভ কামনা জানায় তাদের সে ধন্যবাদ জানায় হাসিমুখে হাত নেড়ে। বাড়ির দরজায় কনের মুখোমুখি হওয়ার পর তাকে নিয়ে বেদীর দিকে এগোনর সময় অরেলিয়ানোকে রীতিমত শুকনো দেখায়, শক্ত একটা দলা পাকিয়ে ওঠে তার গলায়, আর তার গায়ে তখন কালো পোশাক আর পায়ে ধাতব বন্ধনীসহ পাকা চামড়ার ঠিক সেই জুতো যা পরে কয়েক বছর পর ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াবে সে। এতোই বিচক্ষণতার সঙ্গে এতো স্বাভাবিক ব্যবহার করে রেমেদিওস যে বিন্দুমাত্র অস্থির দেখায় না তাকে, এমনকি আঙটিটা তার হাতে পরাবার সময় অরেলিয়ানো যখন সেটা ফেলে দেয় তখনো না। অতিথিদের গুনগুনানি আর হৈ চৈ-এর মধ্যে রেমেদিওস তার অনামিকা বাড়িয়ে সামনে-খোলা লেসের দস্তানা পরা হাতটা উঁচু করে ধরে রাখে, আর দরজার দিকে আংটিটা গড়িয়ে যাওয়ার আগেই পা দিয়ে সেটাকে থামিয়ে লজ্জায় লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরেলিয়ানো বেদীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক ওভাবেই। বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় মেয়েটা উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেলবে এই ভয়ে রেমেদিওসের মা আর বোনেরা এতোই তটস্থ ছিল যে শেষ পর্যন্ত তারাই কনেকে তুলে ধরে তাকে চুমো খাওয়ার মতো অশোভন কাজটা করে বসে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রেমেদিওস যে দায়িত্ববোধ, স্বাভাবিক মাধুর্য আর নিরুদ্বেগ সংযমের পরিচয় দেবে সেটা সেদিন থেকেই দিব্যি বোঝা যায়। রেমেদিওসই, নিজের উদ্যোগে, বিয়ের কেক থেকে সবচেয়ে বড় টুকরোটা কেটে নিয়ে সরিয়ে রাখে আলাদা করে, তারপর একটা থালায় কাঁটাচামচ সহ সেটা নিয়ে যায় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাছে। চেস্টনাট গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা, তালপাতার ছাউনির নিচে একটা টুলের ওপর জড়ভরত হয়ে বসে থাকা, রোদ-বাদলায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অতিকায় বুড়ো মানুষটা কৃতজ্ঞতার একটা আবছা হাসি হেসে আঙুল দিয়ে ধরে টুকরোটা খেয়ে নেয়, তারপর অবোধ্য একটা স্তোত্র আওড়ায়। সোমবার সকাল পর্যন্ত চলা সেই শোরগোলভরা উৎসবে মনখারাপ থাকে কেবল রেবেকা বুয়েন্দিয়ার। তার নিজের জন্যে উৎসবটা ছিল হতাশাভরা। উরসুলা একটা ব্যবস্থা করেছিল যাতে একই দিনে তার বিয়েটাও সেরে ফেলা যায়, কিন্তু সেই শুক্রবার পিয়েত্রো ক্রেসপির কাছে একটা চিঠি আসে তার মা-র মরণাপন্ন অবস্থার খবর নিয়ে। মুলতুবি রাখা হয় বিয়েটা। চিঠিটা হাতে পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাদেশিক রাজধানীর দিকে রওনা হয়ে যায় পিয়েত্রো ক্রেসপি, পথে মায়ের জন্যে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব করে সে, ওদিকে তার মা ঠিক সময় মতোই পৌঁছে যায় শনিবার রাতে, তারপর অরেলিয়ানোর বিয়েতে গায় বিষণ্ন এক আরিআ, যেটা সে তার ছেলের বিয়েতে গাইবে বলে ঠিক করে এসেছিল। এদিকে পিয়েত্রো ক্রেসপি সময়মতো নিজের বিয়েতে পৌঁছনোর জন্যে পথে পাঁচ পাঁচটা ঘোড়ার জিভ বের করে দিয়ে রোববার মাঝরাতে ফিরে আসে উৎসবের ছাইগাদা ফেলতে। চিঠিটা যে কে লিখেছিল তা রহস্যই থেকে যায়। উরসুলার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে অপমানে কেঁদে ফেলে আমারান্তা, ছুতোর মিস্ত্রিরা এসে তখনো সরিয়ে না নেয়া বেদীটার সামনে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলে সে নির্দোষ।

নিজের যাজকমণ্ডলীর অকৃতজ্ঞতায় মনটা পাষাণ হয়ে যাওয়া এক বুড়ো মানুষ ফাদার নিকানোর রেইনাকে জলা থেকে দন আপোলিনার মসকোত ডেকে নিয়ে এসেছিলেন বিয়ে পড়াবার জন্যে। ফাদারের শরীরের অবস্থা রীতিমত করুণ, হাড়গোড় সব বেরিয়ে পড়েছে, গোলগাল উঁচু পেট, চেহারায় একটা বৃদ্ধ দেবদূতের ছাপ, সেটা যতটা ভালোমানুষির কারণে তারচেয়ে বেশি সরলতার জন্যে। বিয়ের পর নিজের যাজক-পল্লীতেই ফিরে যাবেন বলে ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু মাকোন্দোবাসীদের বর্বরতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, কারণ নানান বেধর্মী কাজ করে বেড়াবার পরেও দিব্যি আয়-উন্নতি করে যাচ্ছে তারা; ছেলেমেয়েদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা না দিয়ে, উৎসব-অনুষ্ঠানের পবিত্রতা বিধান না করে দাস হয়ে রয়েছে আদিম রীতিনীতির। ঈশ্বরের বীজমন্ত্র এদেরই সবচেয়ে বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার ভেবে আরো একটা হপ্তা থেকে যেতে মনস্থ করেন তিনি খৎনাকারী আর ম্লেচ্ছ দু'দলকেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিতে, রক্ষিতা রাখা বৈধ করতে, আর মুমূর্ষুকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার পথ বাতলে দিতে। কিন্তু কেউই আমল দেয় না তাকে। তাদের কথা হচ্ছে, বহু বছর ধরে পাদ্রী ছাড়াই কাজ চলছে তাদের, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগটা ঘটছে সরাসরি, আর তাছাড়া আদি পাপের সেই দুষ্ট প্রভাবটাও কেটে গেছে তাদের। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে উপদেশ বিলিয়ে বিলিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফাদার নিকানোর ঠিক করেন একটা গির্জা তৈরি করতে হবে, তাতে প্রমাণ আকারের সব সাধুসন্ত থাকবে, আর চারদিকে থাকবে ঘষা কাচ, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গির্জা হবে সেটা, যাতে করে অধর্মের একেবারে মধ্যেখানে ঈশ্বরকে সম্মান জানাতে রোম থেকে ছুটে আসে লোকজন। তামার একটা গামলা হাতে প্রত্যেকের কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ান তিনি। মেলা পয়সা দেয় তাঁকে লোকে, কিন্তু তাঁর আরো চাই, কারণ গির্জায় এমন একটা ঘণ্টা থাকতে হবে যা কিনা ডুবে যাওয়া মানুষকেও টেনে তুলবে পানির ওপর। এতো কাকুতি-মিনতি করেন তিনি যে শেষে তার গলাটাই নষ্ট হয়ে যায়। তার হাড়গোড় ভরে উঠতে থাকে শব্দে। এক শনিবার, দরজার টাকাটাও তখনো জোগাড় করতে পারেননি, যারপরনাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন তিনি। উপস্থিতমতো হাতের কাছে যা-ই পান তাই দিয়ে একটা বেদী তৈরি করেন শহরের মধ্যেখানের ফাঁকা জায়গায়, তারপর রোববারে, অনিদ্রার সেই দিনগুলোর মতো, ছোট্ট একটা ঘণ্টা হাতে শহরটা চষে ফেলেন এক উন্মুক্ত মাস্-এর জন্যে লোকজনকে ডেকে ডেকে। অনেকেই যায় কৌতূহলের বশে। কেউ কেউ স্মৃতিকাতরতার কারণে। অন্যেরা এই জন্যে যে, ঈশ্বর যেন তাঁর মধ্যস্থতাকারীর প্রতি অবজ্ঞাটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে না করেন। কাজেই সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই শহরের অর্দ্ধেক লোক এসে হাজির হয় স্কোয়ারে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে ফাদার নিকানোর কাকুতি-মিনতিভরা ভাঙা গলায় আউড়ে যান সুসমাচারগুলো। জটলাটা যখন ভেঙে যেতে শুরু করেছে, সবার মনোযোগ কাড়তে নিজের হাত দুটো উঁচু করে ধরেন তিনি।

বলে ওঠেন, 'এক মিনিট। ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার একটা অকাট্য প্রমাণ দেখবো আমরা এইবার।'

মাস্-এ তাঁকে সাহায্য করতে আসা ছোকরাটি ঘন, ধোঁয়া-ওঠা চকোলেট ভরা একটা পেয়ালা তাঁকে এনে দিতে এক নিঃশ্বাসে সেটা পেটে চালান করে দেন তিনি। আস্তিন থেকে টেনে বের করা একটা রুমাল দিয়ে ঠোঁটজোড়া মুছে নেন, তারপর চোখ দুটো বন্ধ করে বাড়িয়ে ধরেন হাত দুটো। এরপরই মাটি থেকে ছ' ইঞ্চি ওপরে উঠে যায় ফাদার নিকানোরের শরীরটা। লোকজনের বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে আর কী চাই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চকোলেট দিয়ে শূন্যে ওঠার কেরামতিটা বেশ কিছুদিন ধরে বারে বারে দেখাতে থাকেন তিনি, আর এই ফাঁকে তাঁর সঙ্গীর থলেতে এতো এতো পয়সা জমে ওঠে যে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গির্জা তৈরির কাজ শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দেন তিনি। তাঁর এই কেরামতির ঐশ্বরিক উৎসের ব্যাপারে কারোরই কোনো সন্দেহ হয়নি, এক হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ছাড়া; এক সকালে যখন লোকজন সেই আশ্চর্য ঘটনাটা আরেকবার দেখার জন্যে বাদাম গাছটার চারধারে জড়ো হয় সে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্বিকারভাবে। ফাদার নিকানোর যে-চেয়ারটায় বসে ছিলেন সেটা শুদ্ধ যখন তিনি মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে শুরু করেছেন, সেই মুহূর্তে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তার টুলটার ওপর স্রেফ একটু সোজা হয়ে বসে কাঁধ জোড়া ঝাঁকায়।

তারপর বলে ওঠে, '*হক্ এস্ত সিম্‌প্লিসিসিমাস। হোমো ইস্তে স্ট্যাটাম কোয়ার্টাম ম্যাটারিয়ে ইনভেনিট।*'

ফাদার নিকানোর হাত দুটো উঁচু করে ধরেন, আর তখনই চেয়ারের চারটা পায়া ঠিক এক সঙ্গে নেমে আসে মাটিতে।

তিনি বলে ওঠেন, '*নেগো, ফ্যাক্টাম হক একজিস্টেনশিয়াম দেই প্রোব্যাট সাইনে দুবিও।*'

হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার জঘন্য রকমের দুর্বোধ্য বুলিটা যে লাতিন সেটা এভাবেই বোঝা যায়। তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম একমাত্র লোক হওয়ার সুবিধাটা ফাদার নিকানোর গ্রহণ করেন লোকটার দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মনটায় ধর্মবিশ্বাস আরোপের চেষ্টায়। প্রতিদিন বিকেলে এসে বাদাম গাছটার পাশে বসে লাতিন ভাষায় উপদেশ দিয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া নাছোড়ের মতো আলংকারিক সব মারপ্যাঁচ আর চকোলেটের সোনায় রূপান্তরের ব্যাপারটা বাতিল করে দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে দাবি করতো তাঁর দাগেরোটাইপ ছবি। ফাদার নিকানোর তখন নানান মেডেল, ছবি, আর এমনকি ভেরোনিকার একটা অবিকল প্রতিমূর্তি পর্যন্ত নিয়ে আসেন, কিন্তু হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন, শিল্পমণ্ডিত বস্তু বলে উড়িয়ে দেয়। এতোই একগুঁয়েমী দেখায় সে যে শেষ পর্যন্ত ফাদার নিকানোর ক্ষান্ত দেন তাকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টায়, তবে তার সঙ্গে দেখা করাটা চালিয়ে যেতে থাকেন মানবিক বোধ থেকে। তখন হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াই এগিয়ে আসে যুক্তিবাদী কলাকৌশল খাটিয়ে ফাদারের বিশ্বাস নস্যাৎ করতে। পাশা খেলার সাজসরঞ্জাম এনে একবার তিনি তাকে এক দান খেলার আমন্ত্রণ জানালে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া সে-আমন্ত্রণ নাকচ করে দেয়, আর সেটা সে করে এই কারণে যে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলার নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে একমত হয়েছে এমন কোনো প্রতিযোগিতার কোনো অর্থই নেই তার কাছে। অমনভাবে পাশা খেলা হতে পারে তা ফাদার নিকানোর কস্মিনকালেও জানতেন না, তাঁর আর খেলাটা খেলা হয়ে ওঠে না। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মধ্যে পাগলামির কোনো লক্ষণ নেই দেখে আরো তাজ্জব বনে গিয়ে তিনি তাকে শুধোন কেন তাকে এভাবে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া জবাব দেয়, '*হক্ এস্ত্ সিম্‌প্লিসিসিমাস। কারণ, আমার মাথা খারাপ।*'

নিজেরই ধর্মবিশ্বাস নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ে ফাদার মশায় এরপর থেকে তার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়ে মন দেন গির্জা তৈরির কাজে গতি আনতে। রেবেকার মনে হয়, তার আশাগুলো নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। কাজটা শেষ হওয়ার ওপরই নির্ধারিত হয় তার ভবিষ্যৎ, কারণ, এক দুপুরে ফাদার নিকানোর যখন সে-বাড়িতে দুপুরের খাওয়া সারছেন আর টেবিলে বসা গোটা পরিবার গির্জা তৈরি হলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যে কী ভাব-গাম্ভীর্য আর দীপ্তি পাবে তাই নিয়ে আলাপ করছে, তখন আমারান্তা বলে ওঠে: 'সবচেয়ে জোর-কপালে হবে রেবেকা।' সে কী বোঝাতে চাইছে সেটা রেবেকা বুঝতে না পারায় একটা সরল হাসি হেসে সে খোলাসা করে বলে, 'তোর বিয়ের অনুষ্ঠান দিয়ে তুই-ই উদ্বোধন করবি গির্জাটার।'

রেবেকা চেষ্টা করে কোনো মন্তব্য না করার। যে-গতিতে গির্জার কাজ এগোচ্ছে তাতে দশ বছরের আগে তৈরি হবে না ওটা। ফাদার নিকানোর অবশ্য সে-কথা মেনে নেন না। বিশ্বাসীদের ক্রমবর্ধমান উদারতা তাঁকে আরো আশাব্যঞ্জক একটা হিসেবে কষার ফুরসত দেয়। খাওয়াটা শেষ করা হয় না রেবেকার, তার নীরব অপমানের মুখে উরসুলা আমারান্তার কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজটার গতি বাড়াতে মোটা অংকের টাকা দান করে। ফাদার নিকানোর তখন ভাবেন, এরকম আরেকটা দান পেলে বছর তিনেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে গির্জাটা। এ-ঘটনার পর আমারান্তার সঙ্গে আর একটা কথাও বলে না রেবেকা, প্রস্তাবটায় আমারান্তা একটা সরলতার ভাব ফোটাতে চাইলেও আদতে যে তা ছিল না সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত। সে-রাতে দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়ার মুখে আমারান্তা বলে, 'এর চেয়ে কম খারাপ আর কিছু করতে পারতাম না আমি। এতে করে তিন বছরের মধ্যে তোকে খুন করতে হবে না আমাকে।' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে রেবেকা।

বিয়েটা মুলতুবি হওয়ার নতুন খবর পেয়ে হতাশার এক সংকট পেয়ে বসে পিয়েত্রো ক্রেসপিকে, কিন্তু রেবেকা নিজের বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত নজির হাজির করে তার সামনে। সে তার দয়িতকে বলে, 'যখনই বলবে, আমরা দু'জন পালিয়ে যাবো এখান থেকে।' কিন্তু পিয়েত্রো ক্রেসপি আর যাই হোক দুঃসাহসী ধরনের নয়। দয়িতার মতো ঝোঁকের মাথায় কাজ করার স্বভাব নেই তার, আর তাছাড়া কারো প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান দেখানোকে সে এমন-ই এক সম্পদ বলে গণ্য করে যা নয়-ছয় করা যায় না। এরপর আরো বেপরোয়া উপায়ের শরণ নেয় রেবেকা। রহস্যময় একটা হাওয়া বৈঠকখানার বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়, আর চুমু খেতে থাকা কপোত-কপোতিকে আঁতকে উঠতে হয় উরসুলাকে দেখে। হাল আমলের পিচ-বাতিগুলোর নিম্নমান নিয়ে উরসুলাকে তালগোলপাকানো একটা ব্যাখ্যা দেয় পিয়েত্রো ক্রেসপি, এমনকি ঘরটায় ঢের বেশি নিরাপদ আলোর ব্যবস্থা করতে সাহায্য পর্যন্ত করে তাকে। কিন্তু ফের তেল ফুরোয়, বা হয়ত সলতেটাই ধুলোবালিতে অকেজো হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে, আর তখন রেবেকাকে তার দয়িতের কোলের ওপর বসা অবস্থায় আবিষ্কার করে উরসুলা। এবার আর কোনো কৈফিয়ত খাটে না তার কাছে। ইন্ডিয়ান মহিলার হাতে বেকারির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সাক্ষাতের সময়টায় দোলকেদারায় বসে থাকে সে তরুণ জুটিটার ওপর নজর রাখতে, তার নিজের বাচ্চা বয়েসেই সেকেলে হয়ে যাওয়া জারিজুরি ধরে ফেলার জন্যে তৈরি হয়ে। সেই সাক্ষাতের সময়গুলোতে একেঘেয়েমীতে উরসুলাকে হাই তুলতে দেখে ছদ্ম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রেবেকা বলতো, 'বেচারী মা। মরলে ঐ দোলকেদারা চড়েই কবরে যাবে।' নজরদারিতে ভরা তিন মাসের প্রণয়ের পর, প্রতিদিন গিয়ে নির্মাণকাজের ঢিমে তেতালা অবস্থা দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গির্জাটা শেষ করার বাকি টাকাটা ফাদার নিকানোরকে সে নিজেই দিয়ে দেবে বলে ঠিক করে পিয়েত্রো ক্রেসপি। আমারান্তা ধৈর্য হারায় না। প্রতিদিন বিকেলে তার সখীরা যখন এমব্রয়ডারি করতে আসে তখন বারান্দার বসে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিত্য নতুন ফন্দি খুঁজে বার করার চেষ্টা করে সে। যে-ফন্দিটা সবচেয়ে কাজে দেবে বলে ভেবেছিল সে—শোবার ঘরের আলমারীতে নিজের বিয়ের পোশাকটা তুলে রাখার আগে সেটার ভেতরে রেবেকা যে কাপড়-কাটা পোকা মারার ওষুধ রেখেছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলা—সেই ফন্দিটা বরবাদ হয়ে যায় হিসেবের একটা গোলমালের কারণে। গির্জার কাজ শেষ হওয়ার দু'মাস আগে কাজটা করেছিল সে। কিন্তু বিয়ের দিন যতোই এগিয়ে আসতে থাকে রেবেকা ততোই এতো অস্থির হয়ে পড়ে যে আমারান্তা যা ভেবেছিল তার আগেই পোশাকটা তৈরি করে ফেলতে চায় সে। আলমারীটা খুলে প্রথমে মোড়ক তারপর আবরণী কাপড়টা খুলতে রেবেকা দেখে পোশাকটা বানানোর কাপড় আর নেকাবের সেলাইটা, এমনকি কমলা ফুলের মুকুটটা পর্যন্ত ফুটো করে ফেলেছে কাপড়-কাটা পোকাগুলো। মোড়কের ভেতর একমুঠো মথবল যে সে নিজের হাতে রেখেছিল সেটা তার চেয়ে ভালো আর কে জানে, তারপরেও অঘটনটা এতোই স্বাভাবিক ঠেকে তার কাছে যে আমারান্তার ঘাড়ে দোষ চাপাবার সাহস হয় না তার। বিয়ের তখন এক মাসও বাকি নেই, কিন্তু আমপারো মসকোত দিব্যি দিয়ে বলে যায় এক হপ্তার মধ্যে নতুন এক প্রস্থ পোশাক বানিয়ে দেবে সে। রেবেকা যাতে শেষবারের মতো তার পোশাকের মাপ দিতে পারে সে জন্যে এক বাদলা দুপুরে যখন আমপারো মসকোত সূচীকর্মের বুদবুদ জড়ানো অবস্থাতে বাড়িতে এসে হাজির হয়, আমারান্তার তো তখন মুর্ছা যাওয়ার জোগাড়। বাকরোধ হয়ে আসে তার, ঠাণ্ডা ঘামের একটা রেখা নামে তার শিরদাঁড়া বেয়ে। এই সময়টার অপেক্ষাতেই ভীষণ ভয়ে ভয়ে কেটেছে তার দীর্ঘ দিন, কারণ, রেবেকার বিয়েতে সে একটা চূড়ান্ত বাধা সৃষ্টি করতে না পারলে, একেবারে শেষ মুহূর্তে, তার উদ্ভাবন শক্তির একেবারে দেউলিয়া অবস্থায়, রেবেকাকে বিষ খাইয়ে মারতে তার সাহসের অভাব হবে না। সেই বিকেলে, হাজারো পিন আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমপারো মসকোতের পরানো সুতোর বর্মের ভেতর রেবেকা যখন গরমে হাঁসফাঁস করে মরছে, কুরুশ কাঁটার কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কয়েকবার ভুল হয়ে যায় আমারান্তার, বার কয়েক সুচ বিঁধে যায় হাতে, কিন্তু এক ভয়ংকর শীতলতার সঙ্গে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে, দিনটা হবে বিয়ের আগের শেষ শুক্রবার, আর উপায়টা হবে আমারান্তার কফির পেয়ালায় আফিমের আরকের একটা পুরিয়া।

যতোটা দুর্লঙ্ঘ্য, ঠিক ততোটাই অভাবনীয় আরো বড় একটা বাধা নতুন করে অনির্দিষ্ট আরেক মুলতুবি অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করে বিয়েটাকে। যে-তারিখে বিয়ে হবে বলে ঠিক করা হয়েছে তার ঠিক এক হপ্তা আগে ছোট্ট রেমেদিওস মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা একটা উদগিরণের মতো পেটের ভেতর বিস্ফোরিত হওয়া গরম এক সুরুয়ায় জবজবে ভেজা অবস্থায়, আর এর তিন দিন পর, পেটের ভেতর আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকা এক জোড়া যমজ বাচ্চা নিয়ে মারা যায় সে। বিবেকের দংশন কুরে কুরে খায় আমারান্তাকে। রেবেকাকে যাতে তার বিষ খাওয়াতে না হয় সেজন্যে ভয়ংকর একটা কিছু ঘটুক আশা করে ঈশ্বরের কাছে সে এমনই আকুল মিনতি জানিয়েছিল যে রেমেদিওসের মৃত্যুতে অপরাধবোধে ভুগতে থাকে সে। অন্তত এরকম একটা বাধার জন্যে সে আকুতি জানায়নি। বাড়িটাতে রেমেদিওস আনন্দ-উল্লাসের একটা হাওয়া নিয়ে এসেছিল। স্বামীকে নিয়ে কামারশালার কাছেরই একটা ঘরে থিতু হয়ে তার সাম্প্রতিক শৈশবের সমস্ত পুতুল আর খেলনা দিয়ে সেটা সাজিয়ে নিয়েছিল সে, আর তার আনন্দোচ্ছল প্রাণশক্তি তার শোবার ঘরের চার দেয়াল পার হয়ে সুস্বাস্থ্যের দমকা হাওয়ার মতো বয়ে যেতো বেগনিয়াছাওয়া বারান্দা দিয়ে। ভোরবেলাতেই গান গাইতে শুরু করে দিত সে। একমাত্র সে-ই সাহস করতো রেবেকা আর আমারান্তার ঝগড়ার মধ্যে নাক গলাতে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার যত্ন নেবার ক্লান্তিকর কাজেও নেমে পড়েছিল সে। তার খাবার এনে দিতো সে, সাহায্য করতো তার দৈনন্দিন কাজ-কর্মে, সাবান আর গা-ঘষার বুরুশ দিয়ে তাকে গোসল করিয়ে দিতো, উকুন আর উকুনের ডিমের বালাইমুক্ত রাখতো তার চুল-দাড়ি, তাল পাতার ছাউনিটাকে ঠিক ঠাক করে রাখতো, আর ঝড়-বাদলার সময় সেটার ওপর চাপিয়ে দিতো জলনিরোধী মোটা কাপড়। টুকটাক লাতিন শব্দবন্ধ ব্যবহার করে লোকটার সঙ্গে ভাব বিনিময়েও সফল হয়েছিল সে নিজের জীবনের শেষ দিককার মাসগুলোতে। অরেলিয়ানো আর পিলার তারনেরার বাচ্চা জন্মানোর পর তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে যখন অরেলিয়ানো হোসে নাম দিয়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা দেয়া হয় এক গোপন অনুষ্ঠানে, রেমেদিওস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাচ্চাটাকে গণ্য করা হবে তাদের প্রথম সন্তান হিসেবে। তার মাতৃপ্রবৃত্তি অবাক করে ছেড়েছিল উরসুলাকে। প্রত্যেক রাতে মসকোতদের বাড়িতে বেড়াতে যেতো স্বামী-স্ত্রী দু'জন। শ্বশুরের সঙ্গে অন্তহীন ডমিনো খেলায় মেতে উঠতো অরেলিয়ানো আর ওদিকে রেমেদিওস গাল-গপ্পো করতো বোনদের সঙ্গে, বা মায়ের সঙ্গে সেরে নিতো আরো জরুরি কোনো কথাবার্তা। বুয়েন্দিয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক শহরে দন আপোলিনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসকোতের কর্তৃত্বটাকে পাকাপোক্ত করেছিল। প্রাদেশিক রাজধানীতে ঘন ঘন আসা-যাওয়ার সুবাদে সরকারকে দিয়ে একটা স্কুল তৈরি করিয়ে নিতে পেরেছিলেন তিনি, যাতে দাদার শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত আগ্রহটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আর্কাদিও সেটার দায়িত্ব নিতে পারে। জাতীয় স্বাধীনতা দিবস আসার আগেই তিনি বেশিরভাগ লোকজনকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলেন বাড়িগুলোকে নীল রঙ করাতে। ফাদার নিকানোর-এর তাগাদায় পেছনের একটা রাস্তায় সরিয়ে ফেলেছিলেন কাতারিনোর দোকানটা, বন্ধ করে দিয়েছিলেন শহরের মধ্যিখানে গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটা আজে-বাজে দোকানপাট। একবার তিনি জনা ছয় পুলিশ নিয়ে ফিরে এসে তাদেরকে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন, কিন্তু শহরে যে সশস্ত্র লোক রাখা যাবে না সেই প্রাচীন চুক্তিটার কথা খেয়াল থাকে না কারোর। শ্বশুরের দক্ষতাটা উপভোগ করতো অরেলিয়ানো। তার বন্ধুরা তাকে বলতো, 'তুই তোর শ্বশুরের মতোই হোঁৎকা হবি।' কিন্তু তার হনু উঁচু করে দেয়া আর তার চোখের দীপ্তি তীব্র করা নিশাচর জীবন তার ওজন বাড়ায় না, উল্টো বরং সেটা তার ঠোঁটজোড়ার ওপরের নিভৃত মগ্নতা আর অনমনীয় দৃঢ় সংকল্পের রেখাটিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। সে আর তার বৌ দুই পরিবারের মধ্যে এমন এক প্রীতির জন্ম দিয়েছিল যে রেমেদিওস যখন জানায় তার বাচ্চা হবে, তখন এমনকি রেবেকা আর আমারান্তা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিল, ছেলে হলে নীল মেয়ে হলে গোলাপী উলের জিনিসপত্র বুনবার জন্যে। কয়েক বছর পর ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে রেমেদিওসের কথাই সবার শেষে মনে পড়েছিল আর্কাদিওর।

দরজা-জানলা আঁটা এক শোকবর্ষ পালনের ঘোষণা দেয় উরসুলা, খুব বেশি জরুরি না হলে বাড়ির ভেতরে ঢোকার বা বাড়ি থেকে বেরোবার এক্তিয়ার থাকে না কারোর। উঁচু গলায় কথা বলা বারণ করে দেয় সে এক বছরের জন্যে, আর রেমেদিওসকে যেখানে কবর দেয়া হয় সে-জায়গাটার চারদিকে কালো ফিতে পেঁচিয়ে আর অহর্নিশজ্বলা একটা বাতি বসিয়ে সেখানে মেয়েটার একটা দাগেরোটাইপ ছবি রেখে দেয়। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা, যারা কোনোদিন সেই বাতি নিভতে দেয়নি, কুঁচি দেয়া একটা স্কার্ট, সাদা জুতো আর মাথায় একটা অর্গ্যান্ডি ফিতে জড়ানো একটি মেয়েকে দেখে হতবাক হয়ে যাবে, দাদা-দাদীর গৎবাঁধা ধারণার সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারবে না তাকে। অরেলিয়ানো হোসের দেখাশোনার ভার নেয় আমারান্তা। ছেলের মতো বুকে টেনে নেয় সে তাকে, কালে সে-ই ভাগ নেবে আমারান্তার একাকীত্বের, মুক্তি দেবে তাকে সেই অনিচ্ছাজনিত আফিমের আরকের হাত থেকে, তার উন্মত্ত প্রার্থনা যা ফেলে দিয়েছিল রেমেদিওসের কফিতে। পা টিপে টিপে সন্ধেবেলা আসে পিয়েত্রো ক্রেসপি, মাথায় কালো ফিতে বেঁধে, নীরব দর্শন দিয়ে যায় রেবেকাকে; তাকে দেখলে মনে হয় সে তার কব্জিতক নেমে আসা আস্তিনের কালো পোশাকের ভেতর রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছে। বিয়ের একটা নতুন তারিখ ঠিক করার চিন্তাটাই এতো অভব্য বলে বোধ হয় যে বাগদানটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ অব্দি একটা চিরন্তন সম্পর্কে গিয়ে ঠেকে, পরিণত হয় এক অবসাদভরা প্রণয়ে যা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না, যেন একসময় যে-দয়িত আর দয়িতা চুমো খাওয়ার জন্যে ষড়যন্ত্র করে বাতি নিভিয়ে দিতো, তাদেরকে মৃত্যুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নিজের আচার-আচণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, ফের মাটি খাওয়া শুরু করে রেবেকা।

শোকপর্বটা যখন এতোদিন ধরে চলেছে যে সূচীকর্মের আসরগুলো শুরু হয়েছে আবার, এমন সময় হঠাৎ করে একদিন বেলা দুটোর সময় কেউ একজন দাবদাহের ভয়াবহ নীরবতার মধ্যে সদর দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ভিতের জোড়গুলো এমন জোরে কেঁপে ওঠে যে, বারান্দায় সেলাইয়ে ব্যস্ত আমারান্তা আর তার সখীরা, নিজের শোবার ঘরে আঙুল চুষতে থাকা রেবেকা, রান্নাঘরে উরসুলা, কামারশালায় অরেলিয়ানো আর এমনকি নির্জন চেস্টনাট গাছের নিচে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার পর্যন্ত মনে হয় একটা ভূমিকম্প যেন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বাড়িটাকে। দশাসই এক পুরুষ এসে হাজির হয়েছে। তার চওড়া কাঁধজোড়া আরেকটু হলে আটকে যাচ্ছিল দরজায়। তার বাইসনের মতো গলায় ঝুলছে 'আশাদায়িনী কুমারী মেরি'র একটা পদক, তার বাহু আর বুকে ভীষণ জটিলসব উল্কি দাগা, আর তার ডান কব্জিতে *নিনোস-এন-ক্রুজ*-এর কবচ বসানো একটা আঁটোসাঁটো তামার ব্রেসলেট। খোলা হাওয়ার নোনায় পাকা তামাটে শরীর তার, চুল ছোট ছোট, খাড়াখাড়া, খচ্চরের কেশরের মতো চোয়ালজোড়া লোহার মতো শক্ত, আর তার ঠোঁটে একটা বিষাদমাখা হাসি। পরনে তার একটা কোমরবন্ধনী, ঘোড়ায় জিন পরানোর বন্ধনীর দ্বিগুণ পুরু সেটা, পায়ে হাঁটুঅব্দি উঠে থাকা মোজা আর কাঁটাঅলা জুতো, সেটার গোড়ালিতে নাল লাগানো, আর সে যখন কোথাও গিয়ে দাঁড়ায় তখন ঠিক ভূমিকম্পের মতো একটা মাটিকাঁপা দশার সৃষ্টি হয় সেখানে। জিনের পাশে যে-রকম থলে বাঁধা হয় সেরকম কয়েকটা আধ-ময়লা থলে কাঁধে নিয়ে বৈঠকখানা আর বসার ঘর পেরিয়ে আমারান্তা আর তার সখীদের অবশ-বিবশ করে দিয়ে বেগনিয়াভরা বারান্দায় হাজির হয় সে বজ্রপাতের মতো, ওদের সুচগুলো সব লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। ক্লান্ত স্বরে সে বলে, 'কী খবর?' কাজ করার একটা বেঞ্চির ওপর ছুঁড়ে ফেলে সে থলেগুলো, তারপর পা বাড়ায় বাড়ির পেছনদিকে। রেবেকার শোবার ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হতবাক করে দিয়ে সে বলে ওঠে, 'কী খবর?' পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সজাগ করে রৌপ্যকারের বেঞ্চিতে বসে থাকা অরেলিয়ানোকে বলে, 'কী খবর?' কারো সামনেই দাঁড়ায় না সে। সোজা চলে যায় রান্নাঘরে, পৃথিবীর অপর পার থেকে শুরু হওয়া তার সফর শেষে ওখানেই থামে সে প্রথমবারের মতো। বলে ওঠে, 'কী খবর?' সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের জন্যে হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে দাঁড়িয়ে থাকে উরসুলা, তাকায় তার চোখের দিকে, চিৎকার করে ওঠে, আর তারপরই আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে আর চেঁচাতে চেঁচাতে হাত দুটো বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে তার গলা। লোকটা হোসে আর্কাদিও। চলে যাওয়ার সময় যে-রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃস্ব ছিল সে, ফিরেছেও তেমনি নিঃস্ব হয়ে, এতোটাই যে তার ঘোড়ার ভাড়া মেটাতে তাকে দুই পেসো দিতে হয় উরসুলাকে। নাবিকদের খিস্তিতে ভরা এক হিস্পানী বুলি তার মুখে। ওরা যখন তাকে শুধোয় সে কোথায় ছিল, জবাবে সে বলে, 'ওই ওখানে।' তার জন্যে যে-ঘরটা বরাদ্দ করা হয় সেখানে সে নিজের দোলখাটিয়া টাঙিয়ে নিয়ে টানা তিন দিনের এক ঘুম দেয়। জেগে ওঠার পর ষোলটা কাঁচা ডিম খেয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় সে কাতারিনোর দোকানে, তার দানবীয় আকৃতি দেখে এক আতংকভরা কৌতূহল সৃষ্টি হয় মেয়েদের মধ্যে। সবার জন্যে গান-বাজনা আর আখের রসের হুকুম দেয় সে নিজের খরচে। একবারে পাঁচজনের সঙ্গে ইন্ডিয়ান-কুস্তি লড়বে বলে ঘোষণা দেয় সে। ওর হাতটাও যে সবাই মিলে নড়াতে পারবে না সেটা ভালো করে জেনেই ওরা বলে, 'সেটা সম্ভব না। *নিনোস-এন-ক্রুজ* আছে ওর কাছে।' শক্তির জাদুকরী কৌশলে বিশ্বাস নেই কাতারিনোর, সে ওর সঙ্গে এই মর্মে বারো পেসো বাজি ধরে যে কাউন্টারটা নড়াতে পারবে না সে। জিনিসটা যেখানে ছিল সেখান থেকে প্রথমে সেটাকে বের করে আনে হোসে আর্কাদিও, তুলে ধরে মাথার ওপর, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়। এগারোজন লোকের দরকার পড়ে ওটাকে আগের জায়গায় বসাতে। আসরের উত্তেজনা যখন চরমে তখন নিজের অসাধারণ পৌরুষের প্রমাণ দেয় হোসে আর্কাদিও, সারা শরীরে তার নীল আর লাল কালিতে জড়ানো অগুনতি ভাষার নানান শব্দের উল্কি আঁকা। ওর শরীরটার ওপর লোলুপ হয়ে ওকে ঘিরে থাকা রমণীদের সে জিজ্ঞেস করে কে তাকে সবচেয়ে বেশি পয়সা দেবে। সবচেয়ে বেশি টাকাপয়সা যার সে তাকে বিশ পেসো দেবার প্রস্তাব দেয়। তখন সে প্রস্তাব করে প্রতিবারে দশ পেসো করে নিজেকে লটারিতে তোলার। দরটা রীতিমতো চড়া, তার কারণ, সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত রমণীরও রাত প্রতি আয় আট পেসো, তারপরেও রাজি হয়ে যায় ওরা। চৌদ্দ টুকরো কাগজে নিজেদের নাম লিখে একটা টুপির ভেতর রাখে সেগুলো, তারপর প্রত্যেক মেয়ে একটা করে টুকরো তুলে নেয়। মাত্র দুটো টুকরো তোলা বাকি যখন, দিব্যি বোঝা যায় সেগুলো কাদের।

হোসে আর্কাদিও প্রস্তাব রাখে, 'প্রত্যেকে আরো পাঁচ পেসো করে দাও, দু'জনের সঙ্গেই ভাগাভাগি করে থাকবো আমি।'

এই করেই নিজের পেট চালাবার ব্যবস্থা করে সে। যে-সব নাবিকের কোনো দেশ নেই, বাড়িঘর নেই, তাদের দলে নাম লিখিয়ে পঁয়ষট্টিবার দুনিয়াটাকে পাক খেয়েছে সে। কাতারিনোর দোকানে যে-মেয়েরা তার সঙ্গে সে-রাতে বিছানায় যায় তারা ওকে ন্যাংটো অবস্থায় হাজির করে নাচ-ঘরে, যাতে লোকজন সব দেখতে পায় যে তার শরীরের সামনে পেছনে, কাঁধ থেকে পায়ের আঙুল অব্দি এমন এক বর্গ ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই যেখানে উল্কি আঁকা নেই। পরিবারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয় না তার পক্ষে। দিনমান সে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, তারপর রাতটা কাটায় নিষিদ্ধ এলাকায়, নিজের তাকতের ওপর বাজি ধরে। কালেভদ্রে উরসুলা যখন তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলে বসায়, তুখোড় রসবোধের পরিচয় দেয় সে, বিশেষ করে দূর-দেশগুলোয় তার অভিযানের কাহিনী বয়ান করার সময়। একবার জাহাজডুবি হয়েছিল ওর, তখন জাপান সাগরে দুই হপ্তা ভেসে বেড়িয়েছে সে সর্দিগর্মিতে পটল তোলা এক সঙ্গীর গায়ের মাংস খেয়ে, ভীষণ মিষ্টি আর দানা দানা ছিল সেই রোদে পোড়া, বেজায় নোনা মাংস। দুপুরের গনগনে সূর্যের নিচে, বঙ্গোপসাগরে, একদিন তার জাহাজ একটা দরিয়ার দানো মেরে ফেলে, সেটার পেটের ভেতর পাওয়া যায় শিরস্ত্রাণ, বগলস, আর এক ক্রুসেডারের অস্ত্র-শস্ত্র। ক্যারিবিয় সাগরে দেখেছে সে ভিক্তর হিউগ-এর বোম্বেটে জাহাজের ভূত, মৃত্যুর হাওয়ায় সেটার পা ছেঁড়াখোঁড়া, মাস্তুলগুলো খেয়ে ফেলেছে যতো দরিয়ার কীট, কিন্তু তারপরেও এগিয়ে যাচ্ছিল সেটা গুয়াদেলুপের দিকে। টেবিলে বসে উরসুলা কাঁদতে শুরু করে, যেন সে কখনোই সেই না-পৌছুনো চিঠিগুলো পড়ছে যেসব চিঠিতে হোসে আর্কাদিও তার কায়-কারবার আর ব্যর্থ অভিযানগুলোর কথা লিখেছিল। 'অথচ তোর জন্যে কী এক বাড়ি-ই না ছিল এখানে,' বলবে আর কাঁদবে সে, 'আর কত খাবারই না গেছে শুয়োরের পেটে।' কিন্তু এরই সঙ্গে তার আবার ভাবতে কষ্ট হয় যে, তার যে-ছেলেটাকে জিপসিরা নিয়ে গিয়েছিল সে-ই এই বর্বর, যে-কিনা দুপুরে খেতে বসে সাবড়ে দিতে পারে একটা দুগ্ধপোষ্য শুয়োরের আদ্দেকটা, যার ঢেকুরের গন্ধ শুকনো বিবর্ণ করে দেয় ফুলগুলোকে। পরিবারের বাকি সবার মধ্যেও খানিকটা এই ধরনের ব্যাপার ঘটে। টেবিলে বসে আমারান্তা কিছুতেই তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না হোসে আর্কাদিওর জন্তুর মতো ঢেকুর তোলা দেখে। আর্কাদিও, যে-কিনা ওদের মধ্যেকার সম্পর্কটার কথা কখনো জানতে পারেনি, স্পষ্টতই তার সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্যে করা প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তরই দিতো না বলা চলে। অরেলিয়ানো মনে করবার চেষ্টা করে সেই সময়টার কথা যখন তারা একই ঘরে ঘুমোতো, চেষ্টা করে ছেলেবেলাতে দু'জনে যেসব দুষ্টুমী করে বেড়িয়েছে তার স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে, কিন্তু হোসে আর্কাদিও সে-সব ভুলে গেছে, কারণ সমুদ্রের জীবন তাকে মনে রাখার মতো এতো কিছু দিয়েছে যে অন্য কিছুর আর জায়গা হয়নি। কেবল রেবেকাই কাত হয়ে পড়ে প্রথম ধাক্কায়। প্রথম যেদিন তার শোবার ঘরের পাশ দিয়ে হোসে আর্কাদিওকে যেতে দেখেছিল সে সেদিনই তার মনে হয়েছে সারা বাড়িময় যার আগ্নেয়গিরির মতো নিঃশ্বাস শোনা যায় এমন আদিম পুরুষের পাশে পিয়েত্রো ক্রেসপি নেহাতই এক অতি রসালো ফুলবাবু। যে-কোনো ছলছুতোয় তার কাছে ভেড়বার চেষ্টা করে সে। একবার, নির্লজ্জ মনোযোগ নিয়ে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হোসে আর্কাদিও বলে ওঠে, 'তুমি একটা খাসা জিনিস, বুঝলে ছোটো বহিন।' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রেবেকা। শিগগিরই সে আগের মতো উৎসাহ নিয়ে মাটি আর দেয়ালের চুন খাওয়া শুরু করে দেয়, এমনই আগ্রহভরে সে আঙুল চোষায় মত্ত হয়ে পড়ে যে বুড়ো আঙুলের চামড়া শক্ত হয়ে যায় তার। মরা কয়েকটা জোঁকসহ সবুজরঙা বমি করে সে একদিন। ঘুমহীন চোখে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রলাপ বকা ঠেকানোর চেষ্টায় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ভোরবেলায় হোসে আর্কাদিওর প্রত্যাবর্তনে বাড়ি কেঁপে ওঠা অব্দি অপেক্ষায় থেকে থেকে রাত কাটতে থাকে তার। একদিন বিকেলে, সবাই তখন দুপুরের ঘুমে ঢলে পড়েছে, নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে, ঢুকে পড়ে সে হোসে আর্কাদিওর ঘরে। দেখে, খাটো প্যান্ট পরে জাহাজের কাছি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো দোলখাটিয়ায় শুয়ে আছে সে। তার বহুরঙা নগ্নতা দেখে সে এমনই মুগ্ধ হয়ে যায় যে ফিরে যাওয়ার একটা তাড়ায় পেয়ে বসে তাকে। সে বলে ওঠে, 'কিছু মনে কোরো না। আমি জানতাম না তুমি আছো এখানে।' কিন্তু কথাটা সে বলে নিচু গলায়, যাতে কেউ জেগে না ওঠে। হোসে আর্কাদিও বলে, 'এদিকে এসো।' রেবেকা তাই করে। বরফ শীতল ঘামে নেয়ে, অন্ত্রের ভেতর যে একটা গিঠ পাকিয়ে উঠছে তা বেশ বুঝতে পেরে, দোলখাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে, ওদিকে হোসে আর্কাদিও আঙুলের ডগা দিয়ে প্রথমে তার পায়ের গোছ, তারপর পায়ের ডিম, তারপর তার উরুতে ঠোকর দিতে দিতে বিড়বিড় করতে থাকে: 'ইশ্‌শিরে ছোটো বহিন, ছোটো বহিন।' আশ্চর্যরকমের নিয়ন্ত্রিত এক দুরন্ত ঝঞ্ঝার মতো শক্তি তাকে যখন কোমর ধরে তুলে ফেলে আর নখরের তিন আঁচড়ে তাকে তার নিজের কাছ থেকে পুরোপুরি হরণ করে নিয়ে একটা পাখির মতো দোলখাটিয়ায় বসিয়ে দেয়, তখন মরে যাওয়া ঠেকাতে রীতিমত একটা অতিপ্রাকৃত চেষ্টা চালাতে হয় রেবেকাকে, তার রক্তের বিস্ফোরণটাকে একটা চোষ কাগজের মতো শুষে নেয়া দোলখাটিয়াটার বাষ্প-ওঠা জলাভূমিতে জলকাদা ছিটাতে ছিটাতে সেই অসম্ভব আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলার আগ মুহূর্তে পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার জন্যে কোনো এক ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় সে।

তিন দিন পর বিকেল পাঁচটার মাস্‌-এর সময় বিয়ে হয় ওদের। তার আগের দিন পিয়েত্রো ক্রেসপির দোকানে যায় হোসে আর্কাদিও। দেখে, যিথার বাজানো শেখাচ্ছে সে, এক পাশে তাকে ডেকে আনে সে কথা বলার জন্যে।

সে তাকে বলে, 'আমি রেবেকাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।' মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায় পিয়েত্রো ক্রেসপি, এক ছাত্রের হতে যিথারটা ধরিয়ে দিয়ে ক্লাস ভেঙে দেয়। বাদ্যযন্ত্র আর যান্ত্রিক খেলনাভরা দোকানটায় যখন তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই, পিয়েত্রো ক্রেসপি বলে:

'সে তোমার বোন।'

'মারো গুলি।' হোসে আর্কাদিও জবাব দেয়।

ল্যাভেন্ডার-ভেজা রুমাল দিয়ে ভুরু মোছে পিয়েত্রো ক্রেসপি।

'কাজটা প্রকৃতি বিরোধী। আর তাছাড়া, অবৈধও বটে।' আরো বিশদ করে বলে সে।

অধৈর্য হয়ে ওঠে হোসে আর্কাদিও, যুক্তিটার কারণে যতটা না, তার চেয়ে বেশি পিয়েত্রো ক্রেসপিকে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চোদোগে যাও প্রকৃতিকে দুই বার,' খেকিয়ে ওঠে সে। 'তোমাকে আমি এই কথাটা বলতে এসেছি যে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রেবেকাকে বিরক্ত করার দরকার নেই তোমার।'

কিন্তু পিয়েত্রো ক্রেসপির চোখ ভিজে উঠতে দেখে তার পাশবিক মূর্তিটা নরম হয় পড়ে।

গলার স্বর পাল্টে সে বলে, 'তা, আমাদের পরিবারটা যদি তোমার এতোই পছন্দ, তা বেশ তো, আমারান্তা তো রইলোই তোমার জন্যে।'

ফাদার নিকানোর তাঁর রোববারের হিতোপদেশে ঘোষণা করেন হোসে আর্কাদিও আর রেবেকা ভাই-বোন নয়। উরসুলা তার বিবেচনায় এই নিদারুণ ন্যাক্কারজনক কাজটাকে কখনোই ক্ষমা করতে পারেনি, গির্জা থেকে ওরা ফিরে এলে সে এই সদ্য বিবাহিত দম্পতিকে বলে দেয় তারা যেন আর কখনোই এ-বাড়িতে পা না দেয়। ওদের দু'জনকে সে যেন মৃত হিসেবে ধরে নেয়। কাজেই কবরস্থানের ওধারে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে আসবাবপত্র বলতে স্রেফ হোসে আর্কাদিওর দোলখাটিয়াটা সম্বল করে ওরা উঠে পড়ে সেখানে। ওদের বিয়ের রাতে রেবেকার চপ্পলের ভেতর একটা কাঁকড়া বিছে ঢুকে তাকে কামড়ে দিয়েছিল। তাতে তার জিভটা অবশ হয়ে যায়, কিন্তু সেজন্যে এক কেলেংকারিজনক মধুচন্দ্রিমা উদযাপনে বাধা পড়ে না তাদের। এক রাতে আটবার, আর সিয়েস্তার সময় তিনবার গোটা তল্লাট জাগানো চিৎকারে চমকে ওঠে পাড়াপড়শিরা, তারা তখন এই প্রার্থনা করে যে এই বুনো কামুকতা যেন মৃতদের শান্তি নষ্ট না করে।

শুধু অরেলিয়ানোই ওদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হতে পারেনি। সে ওদের কিছু আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দেয়, আর দেয় কিছু টাকা-পয়সা, যদ্দিন পর্যন্ত না বাস্তববোধ ফিরে আসে হোসে আর্কাদিওর আর চাষবাস শুরু করে সে সেই মনুষ্যবিহীন এলাকাটায়। ওদিকে, রেবেকার ওপর থেকে সেই প্রচণ্ড রাগটা কিন্তু যায় না আমারান্তার, যদিও জীবন তাকে এনে দিয়েছে এক স্বপ্নাতীত স্বস্তি: লজ্জাটা কী করে ঢাকবে তা ভেবে না পেয়ে উরসুলা একটা ব্যবস্থা করেছে যাতে পিয়েত্রো ক্রেসপি এক প্রশান্ত মর্যাদাবোধের সঙ্গে তার পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠে দুপুরে এ-বাড়িতে খাওয়া শুরু করেছে। পরিবারটির প্রতি সম্মানের প্রতীক হিসেবে এখনো সে তার টুপিতে সেই কালো ফিতেটা পরে, উরসুলার প্রতি তার ভালোবাসার পরিচয় দেয় তার জন্যে সৃষ্টিছাড়া সব উপহার এনে: পর্তুগীজ সার্ডিন, তুর্কী গোলাপের মার্মালেড, আর একবার এক বিশেষ উপলক্ষে, দুর্দান্ত একটা ম্যানিলা শাল। অনুরাগভরা অধ্যবসায় নিয়ে আমারান্তা যত্ন নেয় তার। তার কী লাগবে না লাগবে সেটা আগেই বুঝে নেয় সে, তার শার্টের আস্তিনের প্রান্তে বেরিয়ে থাকা সুতো ছেঁটে দেয়, আর তার জন্মদিন উপলক্ষে তার নামের আদ্যক্ষর লিখে এক ডজন রুমাল সেলাই করে দেয়। প্রতি মঙ্গলবার, দুপুরের খাওয়ার পর, বারান্দায় আমারান্তা যখন সেলাই করে, পিয়েত্রো ক্রেসপি মজার মজার কথা বলে মাতিয়ে রাখে তাকে। যাকে সে সব সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চা হিসেবেই দেখে এসেছে আর সে-রকমই ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, সেই রমণী এক অবাক করা আবিষ্কার হিসেবে দেখা দেয় পিয়েত্রো ক্রেসপির কাছে। আমারান্তার মেজাজ-মর্জিতে মাধুর্যের অভাব থাকলেও, জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার হৃদয়ঙ্গম করার দুর্লভ এক সংবেদনশীলতা আছে তার, আর আছে এক অন্তশীল কোমলতা। এক মঙ্গলবার, কারো মনেই যখন এনিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ না হয় দু'দিন পর ঘটনাটা ঘটতেই যাচ্ছে, পিয়েত্রো ক্রেসপি বিয়ের প্রস্তাব দেয় আমারান্তাকে।

সে বলে, 'বিলক্ষণ, ক্রেসপি। তবে দু'জনকে আমরা আরো ভালো করে চেনার পর। তাড়াহুড়ো করে কাজ করা কখনোই ভালো না।'

উরসুলা কিন্তু দ্বিধায় পড়ে যায়। ক্রেসপিকে সে ভালো জানলেও, রেবেকার সঙ্গে তার দীর্ঘ আর রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া বাগদানের পরেও লোকটার এই সিদ্ধান্তটা নৈতিক দিক থেকে ভালো না মন্দ তা সে ঠিক করে উঠতে পারে না। তবে শেষ অব্দি ব্যাপারটাকে সে একটা অমূলক ধারণা হিসেবেই মেনে নেয়, কারণ তার খুঁতখুতানিটা অন্য কারো মনে উদয় হয় না। বাড়ির কর্তা এখন অরেলিয়ানো-ই, সে তার রহস্যময় আর চূড়ান্ত মন্তব্য দিয়ে আরো হতবুদ্ধি করে দেয় উরসুলাকে:

'বিয়ে-টিয়ে নিয়ে ভাববার সময় নয় এখন।'

সে-সময় শুধু বিয়েই নয়, যুদ্ধ ছাড়া আর যে-কোনো কিছু সম্পর্কে অরেলিয়ানোর পক্ষে গুরুত্বের সঙ্গে একমাত্র যে-মন্তব্যটি করা সম্ভব ছিল সে তা-ই করেছে, আর এই মন্তব্যটির অর্থ উরসুলার বোধগম্য হতে কয়েক মাস লেগে যায়। সূক্ষ্ম কিন্তু অলঙ্ঘনীয় যে দুর্ঘটনাগুলোর ধারাবাহিক বন্ধন অরেলিয়ানোকে ঐ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল তা এমনকি সে নিজে একটা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারবে না। রেমেদিওসের মৃত্যু তার মধ্যে যে-হতাশার জন্ম দেবে বলে সে ভেবেছিল তা হয়নি। বরং তৈরি হয়েছিল ক্রোধের একটা ভোঁতা অনুভূতি, ধীরে ধীরে যা মিশে গিয়েছিল নিঃসঙ্গ আর অসাড় করা এক পরাজয়ের মধ্যে, যার সঙ্গে মিল রয়েছে তার সেই সময়কার অনুভূতির যখন সে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল নারী সংসর্গহীন জীবনের কাছে। ফের নিজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে, তবে শ্বশুরের সঙ্গে ডমিনো খেলার অভ্যেসটা বহাল রাখে। শোকে মোড়া এক বাড়িতে নৈশ আলাপের মধ্যে দিয়ে দু'জনের মধ্যে এক নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। তার শ্বশুর তাকে প্রায়ই বলতেন, 'ফের বিয়ে করো, অরেলিতো। ছয় ছয়টা মেয়ে আছে আমার পছন্দ করার জন্যে।' হর-হামেশাই দন আপোলিনার মসকোত যে-সব সফরে যেতেন সে-রকমই এক সফর শেষে একবার ভোটের আগে ফিরে আসেন তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মহা উদ্বিগ্ন হয়ে। যুদ্ধ বাঁধাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে উদারপন্থীরা। রক্ষণশীল আর উদারপন্থীদের ব্যাপারে অরেলিয়ানোর ধারণা যেহেতু তখন খুবই ঘোলাটে, তার শ্বশুর তাকে এ-ব্যাপারে গৎবাঁধা একটা পাঠ দেন। তিনি বলেন উদারন্থীরা হল ফ্রিম্যাসন, বদলোকজন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাদ্রীদের তারা ফাঁসীতে ঝোলাতে চায়, প্রবর্তন করতে চায় সিভিল ম্যারেজ আর বিবাহ বিচ্ছেদ, বৈধ সন্তানের সমান অধিকার দিতে চায় জারজ সন্তানকে, আর চায় দেশটাকে একটা ফেডারেল পদ্ধতিতে ভাগ করতে যা কিনা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে। অন্যদিকে রক্ষণশীলরা, যারা ক্ষমতা পেয়েছে সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে, তারা চায় গণশৃঙ্খলা আর পারিবারিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে, তারা খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের কর্তৃত্বের নীতির রক্ষাকর্তা, দেশটাকে স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলতে দিতে রাজি নয় তারা। অরেলিয়ানো তার পরোপকারী স্বভাবের কারণে অবৈধ সন্তানদের অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে উদারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকেই ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু তারপরেও এটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না এমন এক জিনিস নিয়ে মানুষ কী করে হানাহানির চূড়ান্তে পৌঁছে যেতে পারে। ওর কাছে এই ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি ঠেকে যে নির্বাচনের জন্যে তার শ্বশুর মশায় এক সার্জেন্টের আজ্ঞাধীন ছ'জন বন্দুকধারীকে এমন এক শহরে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেছেন যে-শহরের তেমন কোনো রাজনৈতিক আবেগই নেই। এসেই কেবল ক্ষান্ত হয় না তারা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাজেয়াপ্ত করে শিকারের যন্ত্রপাতি, ভারি ছুরি, মায় রান্নাঘরের ছুরি পর্যন্ত, তারপর রক্ষণশীল প্রার্থীদের নাম লেখা নীল ব্যালট আর উদারপন্থী প্রার্থীদের নাম লেখা লাল ব্যালট বিলি করে একুশ বছরের বেশি বয়সের পুরুষদের মাঝে। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে দন আপোলিনার মসকোত স্বয়ং একটা ফরমান পড়ে শোনান সবাইকে, সে-ফরমানের বলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় মদ্যজাতীয় পানীয়ের বেচা-কেনা, আর, এক পরিবারভুক্ত নয় এমন তিনজনের সমাবেশ। কোনোরকম অঘটন ছাড়াই হয়ে যায় নির্বাচনটা। রোববার সকালে ছয় সৈন্যের পাহারায় কাঠের একটা ব্যালট বাক্স রাখা হয় বড় চত্বরটায়। ভোটাভুটি হয় একেবারে অবাধ, অরেলিয়ানো নিজেই তার সাক্ষী, কারণ প্রায় গোটা দিনই সে তার শ্বশুরে সঙ্গে কাটায়, কিন্তু কাউকেই একবারের বেশি ভোট দিতে দেখে না। বিকেল চারটায় চত্বরে একটা ঢোলাই দিয়ে ভোট শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়, তারপর দন আপোলিনার মসকোত তাঁর সই করা একটা লেবেল ব্যালট বাক্সটার গায়ে সেঁটে দিয়ে সেটা সিল করে দেন। সে-রাতে অরেলিয়ানোর সঙ্গে বসে ডমিনো খেলার সময় সার্জেন্টকে হুকুম দেন তিনি ভোট গোনার জন্যে বাক্সের সিল ভাঙতে। বাক্সে লাল আর নীল ব্যালটের সংখ্যা প্রায় সমান, কিন্তু মাত্র দশটা লাল ব্যালট বাক্সে ছেড়ে দিয়ে নীল ব্যালটের সঙ্গে একটা সাজানো ফারাক সৃষ্টি করে সার্জেন্ট। এরপর একটা নতুন লেবেল সেঁটে বাক্সটা ফের সিল করে দেয় তারা, আর পর দিন প্রথম চালানেই নিয়ে যাওয়া হয় সেটাকে প্রাদেশিক রাজধানীতে। অরেলিয়ানো বলে, 'উদারপন্থীরা যুদ্ধে নামবে।' দন আপোলিনার মসকোত নিজের ডমিনো গুটির দিকে নজর দেন। তারপর বলেন, 'ব্যালটের এই কারসাজির জন্যে? তা করবে না। কোনো কথা যাতে না ওঠে সেজন্যেই অল্প ক'টা ব্যালট ছেড়েছি আমরা।' বিরুদ্ধ-পক্ষে থাকার অসুবিধাটা টের পায় অরেলিয়ানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে, 'আমি উদারপন্থী হলে কিন্তু ঐ ব্যালটগুলোর জন্যেই যুদ্ধে নামতাম।' চশমার ওপর দিয়ে অরেলিয়ানোর দিকে তাকান তার শ্বশুর। বলেন, 'কথা কী জানো, অরেলিয়ানো, উদারপন্থী হলে কিন্তু আমার মেয়ে-জামাই হওয়ার পরেও ব্যালটের ঐ কারসাজিটা দেখতে পেতে না তুমি।'

নির্বাচনের ফলাফলে নয়, বরং সৈন্যরা সেই ছুরি-খন্তাগুলো ফেরত না দেয়াতেই মূলত অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে শহরে। অরেলিয়ানো যেন তার শ্বশুরকে বলে-কয়ে তাদের রান্নাঘরের ছুরিগুলো ফেরত পাবার ব্যবস্থা করে সেজন্যে এক দল মহিলা এসে পাকড়াও করে তাকে। দন আপোলিনার মসকোত ভীষণ গোপনীয়তার সঙ্গে তাকে জানান উদারপন্থীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এ-কথা প্রমাণ করার জন্যেই সৈন্যরা নিয়ে গেছে ওগুলো। এমন নির্বিকারভাবে কথাটা তাকে বলা হয় যে রীতিমত সচকিত হয়ে ওঠে অরেলিয়ানো। মুখে সে বলে না কিছুই, কিন্তু একদিন রাতের বেলা জেরিনাল্‌দো মার্কেস আর ম্যাগ্‌নিফিকো ভিস্‌বাল যখন তাদের কয়েকজন ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে সেই ছুরিগুলো নিয়ে আলাপ করছিল তখন তারা জানতে চায় সে উদারপন্থী না রক্ষণশীল। অরেলিয়ানোর মধ্যে বিন্দুমাত্র জড়তা দেখা যায় না।

সে বলে, 'আমাকে যদি কিছু হতেই হয় তো উদারপন্থী-ই হবো আমি। কারণ রক্ষণশীলরা কুচুটে।'

পরদিন, বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে প্লীহার একটা মনগড়া ব্যথার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আলিরিও নগুয়েরার কাছে যায় সে। মিথ্যে অজুহাতটা কেন দেয়া হয় তা-ও বুঝতে পারে না সে। স্বাদহীন কিছু বড়ির একটা ওষুধের ঝোলা আর কারোরই পছন্দ না হওয়া একটা ভুতুড়ে আপ্তবাক্য—*এক পেরেক আরেক পেরেক ডেকে আনে*—এই নিয়ে আলিরিও নগুয়েরা মাকোন্দোতে পা দিয়েছে কয়েক বছর হলো। আসলে লোকটা একটা হাতুড়ে। মান-সম্ভ্রমহীন এক ডাক্তারের নিরীহ চেহারার নিচে তার ঘাপটি মেরে আছে এক সন্ত্রাসী, যে তার পাঁচ বছরের কারাবাসের ফসল তার পায়ের দাগগুলো ঢেকে রাখে খাটো বুটজুতোর আড়ালে। ফেডারেশনপন্থী প্রথম বিপ্লবের সময় বন্দি হলেও, কিউরাসোতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল সে, এমন এক পোষাক গায়ে চাপিয়ে যে-পোশাক সে ঘেন্না করতো সবচেয়ে বেশি: যাজকদের আলখেল্লা। সুদীর্ঘ নির্বাসনের শেষে, কিউরাসোতে গোটা ক্যারিবিয় অঞ্চলের নির্বাসিতদের আনা উত্তেজনাকর সব খবরাখবর শুনে চাঙ্গা হয়ে, চোরাকারবারীদের একটা স্কুনারে চেপে হাজির হয়েছিল সে রিয়োহাচায়, সঙ্গে ছিল কয়েক বোতলভর্তি বড়ি—যেগুলো আসলে স্রেফ পরিশোধিত চিনি ছাড়া আর কিছুই না—আর নিজের হাতে জাল করা লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা। হতাশায় কেঁদে ফেলেছিল সে। নির্বাসিতরা যেটাকে বিস্ফোরণমুখ বারুদের জ্বালা বলে বয়ান করেছিল সেই ফেডারেলিস্ট উত্তেজনা মিইয়ে গিয়েছিল এক বায়বীয় নির্বাচনসংক্রান্ত বিভ্রমে। ব্যর্থকাম হওয়ার তিক্ততা নিয়ে, শেষ বয়সটার জন্যে তিতিক্ষায় থাকার মতো একটা নিরাপদ জায়গার আশায় এই ভূয়া হোমিওপ্যাথ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রয় নিয়েছিল মাকোন্দোতে। চৌরাস্তার এক পাশে ভাড়া নেয়া বোতল-ভারাক্রান্ত কামরায় পার করে দেয় সে বেশ কয়েকটা বছর সেই সব আশাহীন রোগীর সঙ্গে যারা সব কিছুর দ্বারস্থ হয়ে শেষতক চিনির বড়ি দিয়ে স্তোক দিচ্ছে নিজেদের। দন আপোলিনার মসকোত যদ্দিন আপাত হর্তাকর্তা ছিলেন তদ্দিন পর্যন্ত ডাক্তার আলিরিও নগুয়েরার সন্ত্রাসী প্রবৃত্তিগুলো সুপ্তই ছিল। স্মৃতিচারণ করে আর হাঁপানীর বিরুদ্ধে যুঝে সময় পার করেছিল সে। কিন্তু এই নির্বাচনী হাওয়া তাকে ফের টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জটাজালের ভেতর। যোগাযোগ করে সে শহরের কমবয়েসী ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে, যাদের কোনো রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধি নেই, তারপর নেমে পড়ে গোপন উস্কানীমূলক কাজের প্রচারণায়। ব্যালট বাক্সে এতো লাল ব্যালটের উপস্থিতি, দন আপোলিনার মসকোত যেটাকে তরুণদের আগ্রহ আর ঔৎসুক্যের ফল বলে বিবেচনা করেছিলেন, তা ওই ডাক্তারেরই পরিকল্পনারই অংশ: সে তার শিষ্যদের এ-কথাটা বোঝানোর জন্যেই ভোট দেয়ায় যে নির্বাচন একটা প্রহসন মাত্র। তার কথায়, 'একমাত্র কাজের জিনিস হল সন্ত্রাস।' রক্ষণশীল শক্তিকে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে অরেলিয়ানোর বেশিরভাগ বন্ধু-বান্ধবেরই উৎসাহের কোনো কমতি না থাকলেও, সে-সব পরিকল্পনার ভেতর ওকে রাখার সাহস করেনি কেউ, শুধু ম্যাজিস্ট্রেট লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্কের জন্যেই নয়, তার নিঃসঙ্গ আর পলায়নপর চরিত্রের জন্যেও বটে। তার ওপর আবার জানা যায়, শ্বশুরের কথামতো নীল ব্যালটেই ভোট দিয়েছে সে, কাজেই সে যে তার রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করল, সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার আর, অলীক এক ব্যথার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে তার যাওয়াটাও নির্ভেজাল কৌতূহল আর খেয়ালের কারণে। কর্পূরমেশানো মাকড়সার জালের গন্ধে ভরা একটা ডেরায় নিজেকে সে আবিষ্কার করে ধূলিধূসর এক ইগুয়ানার সামনে, যার ফুসফুস শিষ দিয়ে ওঠে শ্বাস নেবার সময়। কোনো কিছু না বলে একটা জানলার কাছে ওকে নিয়ে যায় ডাক্তার লোকটা, ভালো করে দেখে তার চোখের নিচের পাতার ভেতরটা। 'ওখানে নয়,' বন্ধুরা তাকে যা বলেছিল সে-অনুযায়ী বলে ওঠে অরেলিয়ানো। যকৃতের ওপর নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে টিপে ধরে সে বলে, 'যে-ব্যথাটা আমাকে ঘুমুতে দেয় না সেটা এখানে।' ডাক্তার নগুয়েরা তখন বেশি রোদের অজুহাতে জানলাটা বন্ধ করে দেয়, তারপর সাদামাটা ভঙ্গিতে তাকে বোঝাতে লেগে যায় যে, রক্ষণশীলদের খুন করাটা একটা স্বদেশহিতৈষী কাজ। বেশ কিছুদিন শার্টের ভেতর ওষুধের একটা বোতল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অরেলিয়ানো। দুই ঘণ্টা পর পর সেটা বার করে সে, তিনটে বড়ি হাতের চেটোতে নিয়ে একবারে চালান করে দেয় মুখের ভেতর, তার জিভের ওপর ধীরে ধীরে গলে যায় সেগুলো। হোমিওপ্যাথিতে তার এই বিশ্বাসের জন্যে দন আপোলিনার মসকোত তাকে ঠাট্টা করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রের ভেতরের মানুষ যারা তারা তাদের দলের আরেকজনকে ঠিকই চিনে নেয়। মাকোন্দো পত্তনকারীদের ছেলেদের প্রায় সবাইকেই দলে টানা হয়েছে, যদিও তাদের কেউই ঠিক মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেই না ঠিক কীসের ষড়যন্ত্রে মেতে রয়েছে তারা। তারপরেও, ডাক্তার যেদিন সেটা বলে, অরেলিয়ানো পুরো ব্যাপারটাই বের করে আনে তার মুখ থেকে। রক্ষণশীল সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তদ্দিনে সে ওয়াকিবহাল হলেও, ষড়যন্ত্রটার কথা শুনে শিউরে ওঠে সে। ব্যক্তিবিশেষকে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে ডা নগুয়েরা একজন বিশেষজ্ঞ। ইদানিং রক্ষণশীলতার জড়সমেত উপড়ে ফেলতে, সে কৌশল নিয়েছে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটাবার ব্যবস্থা করার, গোটা দেশজোড়া যে-ওস্তাদী মার খেয়ে সরকারের তল্পিবাহকরা সব যার যার পরিবারশুদ্ধ নিকেশ হয়ে যাবে। দন মসকোত, তাঁর স্ত্রী, আর তাঁর ছয় সন্তানের নাম, বলাই বাহুল্য, সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে অরেলিয়ানো বলে, 'আপনি উদারপন্থী বা অন্য কিছু নন। আপনি কসাই ছাড়া আর কিছু নন।'

একই রকম ঠাণ্ডা মেজাজে ডাক্তার বলে, 'সেক্ষেত্রে বোতলটা ফেরত দিয়ে দাও। ওটার আর কোনো দরকার নেই তোমার।'

ছয় মাস পরেই কেবল অরেলিয়ানো জানতে পারে যে, কাজে লাগবে এমন লোকের তালিকা থেকে ডাক্তার তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে, কারণ সে ভাবপ্রবণ, ভবিষ্যৎহীন, উদাসীন, আর নিশ্চিতভাবেই অসামাজিক চরিত্রের। ষড়যন্ত্রটার কথাটা সে ফাঁস করে দিতে পারে এই ভয়ে তাকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে ওরা। অরেলিয়ানো তাদের আশ্বস্ত করে: একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোবে না, কিন্তু মসকোত পরিবারকে যে-রাতে তারা খুন করতে যাবে, দেখবে পাহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে দরজায়। এমনই ধনুর্ভঙ্গ পণ তার যে শেষ পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি রাখা হয় পরিকল্পনাটা। এই সময়েই পিয়েত্রো ক্রেসপি আর আমারান্তার বিয়ের ব্যাপারে তার মত জানতে চেয়েছিল উরসুলা, আর অরেলিয়ানো বলেছিল এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মতো সময় সেটা নয়। এক হপ্তা ধরে শার্টের নিচে একটা সেকেলে পিস্তল বয়ে বেড়িয়েছে সে। নজর রেখেছে তার বন্ধু-বান্ধবের ওপর। বিকেলবেলা গিয়ে কফি খেতো সে হোসে আর্কাদিও আর রেবেকার সঙ্গে, ঘর-দোর গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে ওরা, তারপর সাতটা থেকে ডমিনো খেলতো শ্বশুরের সঙ্গে। দুপুরের খাওয়ার সময় গাল-গপ্পো করতো সে এরই মধ্যে দশাসই এক কিশোর হয়ে ওঠা আর্কাদিওর সঙ্গে, দেখতো, আসন্ন যুদ্ধের আঁচে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে সে। স্কুলেও, যেখানে আর্কাদিওর ছাত্রদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি বয়সের থেকে শুরু করে সবে মুখে বোল ফুটেছে এমন ছেলেমেয়েরাও রয়েছে, সেখানেও উদরপন্থী উত্তেজনা চারিয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে নানান কথাবার্তা—গুলি করা হবে ফাদার নিকানোরকে, গির্জাটাকে বানানো হবে স্কুল, চালু করা হবে অবাধ প্রেম। আর্কাদিওর এসব মাতামাতি থামাতে চেষ্টা করে অরেলিয়ানো। পরামর্শ দেয় বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে। তার এই ঠাণ্ডা মাথার যুক্তি আর বাস্তববুদ্ধিকে আমল না দিয়ে তার এই দুর্বল চরিত্রের জন্যে লোকজনের সামনে তাকে গালমন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে আর্কাদিও। অরেলিয়ানো অপেক্ষা করে। শেষে, ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে একদিন, সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কামারশালায় ঢুকে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে উরসুলা।

'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে!'

যুদ্ধ আসলে শুরু হয়েছে তিন মাস আগেই। সামরিক আইন জারী হয়েছে সারা দেশে। কেবল দন আপোলিনার মসকোতই তাৎক্ষণিক সে-খবর পেয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ-হামলায় যে-সেনাদলটা শহরটাকে দখল করে নেবে সেটা রওনা হয়ে যাওয়ার পরেও কথাটা এমনকি তিনি তার বৌকেও বলেননি। ভোর হওয়ার আগেই, সঙ্গে খচ্চর-বওয়া দুটো হালকা কামান নিয়ে ঢুকে পড়ে তারা শহরে, নিঃশব্দে, তারপর তাদের সদর দফতরটা বসায় স্কুলঘরে। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বলবৎ এক কার্ফু জারি করা হয়। চালানো হয় আগেরবারের চেয়েও কড়া তল্লাশি, বাড়ি বাড়ি, আর এবার তারা নিয়ে যায় এমনকি খেতি-খামারের যন্ত্রপাতিও। হিড় হিড় করে টেনে বের করে আনে তারা ডা. নগুয়েরাকে, বেঁধে ফেলে চৌরাস্তার একটা গাছের সঙ্গে, তারপর, আইনানুগ কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মেরে ফেলে তাকে গুলি করে। সামরিক কর্তৃপক্ষকে শূন্যে ভাসার কেরামতিটা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ফাদার নিকানোর; তার বদলে এক সৈনিকের বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে মাথা ফাঁক হয়ে যায় তার। উদারপন্থী যতো আতিশয্য সব নিভে যায় নীরব এক আতংকের ভেতর। বিষণ্ন, দুর্বোধ্য অরেলিয়ানো তার শ্বশুরের সঙ্গে ডমিনো খেলা চালিয়ে যায়। সে বেশ বুঝতে পারে, শহরের বেসামরিক আর সামরিক নেতার পদবী থাকার পরেও ফের এক ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছেন দন আপোলিনার মসকোত। সিদ্ধান্ত-টিদ্ধান্ত যা নেবার নিচ্ছে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, আর প্রত্যেকদিন সকালে নাগরিক শৃঙ্খলা রক্ষার নাম করে আদায় করছে বেয়াড়ারকমের মোটা টোল। একটা পাগলা কুকুর এক পাগলিকে কামড়ে দিয়েছিল, ক্যাপ্টেনের আজ্ঞাধীন চার সৈন্য একদিন তাকে তার পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বন্দুকের বাঁট দিয়েই পিটিয়ে মেরে ফেলে। শহর দখলের দু'হপ্তা পর এক রোববার জেরিনাল্দো মার্কেস-এর বাড়িতে ঢুকে অরেলিয়ানো তার সহজাত কাঠখোট্টা ধরনে চিনিছাড়া এক পেয়ালা কফি দিতে বলে। রান্নাঘরে যখন ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই, অরেলিয়ানো গলায় এমন এক কর্তৃত্বের ভাব ফোটায় যা আগে কখনো শোনা যায়নি। বলে, 'ছেলেগুলোকে জোগাড় কর। যুদ্ধে যাচ্ছি আমরা।' জেরিনাল্দো মার্কেস-এর বিশ্বাস হয় না তার কথা।

'অস্ত্র কোথায় পাবো?'

'ওদের কাছেই আছে,' অরেলিয়ানো জবাব দেয়।

মঙ্গলবার মাঝরাতে খাওয়ার টেবিলের ছুরি আর শান দেয়া যন্ত্রপাতি সজ্জিত একুশজন পুরুষ, তাদের সবার বয়স তিরিশের নিচে, অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার নেতৃত্বে এক উন্মত্ত হামলা চালিয়ে দখল করে নেয় সেনাছাউনি, কেড়ে নেয় অস্ত্রশস্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আঙিনার ভেতরেই গুলি করে মেরে ফেলে ক্যাপ্টেন আর সেই চার সৈন্যকে যারা খুন করেছিল সেই পাগলিটাকে। সেই একই রাতে ফায়ারিং স্কোয়াডের আওয়াজের মধ্যে আর্কাদিওকে ঘোষণা করা হয় শহরের বেসামরিক এবং সামরিক কর্তা। যার যার বৌকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে বলে বিবাহিত বিদ্রোহীরা কোনোমতে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। আতংকের হাত থেকে রেহাই পাওয়া লোকজনের হর্ষধ্বনির ভেতর ভোরবেলায় চলে যায় তারা বিদ্রোহী জেনারেল ভিক্তোরিও মেদিনার বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্যে, শেষ খবর অনুযায়ী মানাউরের পথে রয়েছেন তিনি। মাকোন্দো ছাড়ার আগে, দন আপোলিনার মসকোতকে একটা দেয়ালকুঠুরির ভেতর থেকে বের করে আনে অরেলিয়ানো। 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই, বাবা,' সে বলে তাঁকে। 'নতুন সরকার আপনার নিজের আর আপনার পরিবারের নিরাপত্তা দিচ্ছে।' যার সঙ্গে তিনি রাত ন'টা পর্যন্ত ডমিনো খেলেছেন তাকে উঁচু বুটজুতো পরা, কাঁধ থকে বন্দুক ঝুলে থাকা এই চক্রান্তকারীর সঙ্গে মেলাতে রীতিমত কষ্ট হয় দন আপোলিনার মসকোতের।

'এ স্রেফ পাগলামি, অরেলিতো,' তিনি বলেন।

'পাগলামি নয়, যুদ্ধ।' অরেলিয়ানো জবাব দেয়। 'আর, আজ থেকে আমাকে অরেলিতো বলবেন না। এখন থেকে আমি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বত্রিশটা সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, কিন্তু তার সব ক'টাতেই হেরে যায় সে। সতেরো জন আলাদা রমণীর গর্ভে সতেরোটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় সে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়জন পঁয়ত্রিশের কোঠায় পৌঁছুবার আগেই সবাইকে এক এক করে মেরে ফেলা হয় একই রাতের মধ্যে। প্রাণের ওপর চোদ্দটা হামলা, তিয়াত্তরটা অ্যামবুশ আর একটা ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে বেঁচে যায় সে। একটা ঘোড়াকে নিকেশ করে দেবার মতো যথেষ্ট স্ট্রিকনাইন তার কফিতে মিশিয়ে দেবার পরেও তাই খেয়ে বেঁচে যায় সে। ফিরিয়ে দেয় তাকে দেয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের 'অর্ডার অভ্ মেরিট' খেতাব। এক সীমান্ত থেকে আরেক সীমান্ত পর্যন্ত আইনগত অধিকার আর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে বিদ্রোহীবাহিনীর সেনাপ্রধান পদ পর্যন্ত পৌঁছয় সে, আর সরকারের চোখে সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক হয়ে উঠলে কী হবে, কখনো কাউকে তার ছবি তোলার সুযোগ দেয়নি সে। যুদ্ধের পর সে তাকে দেয়া আমরণ অবসর ভাতা ফিরিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহ করে যায় মাকোন্দোতে নিজের কামারশালায় ছোট ছোট সোনার মাছ বানিয়ে। যদিও সবসময় তার বাহিনীর সামনের সারিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করেছে সে, তারপরেও একমাত্র যে-আঘাতটা সে পায় সেটা সে নিজেকেই করেছিল নিয়ারলান্দিয়ার চুক্তির পর, যে-চুক্তি ইতি টেনে দিয়েছিল বিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের। নিজের বুক বরাবর গুলি চালিয়ে দিয়েছিল সে একটা পিস্তল দিয়ে, কিন্তু বুলেটটা শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি না করেই বেরিয়ে গিয়েছিল পিঠ দিয়ে। এতো কিছুর পরেও টিকে থাকে মাত্র একটা জিনিসই, আর সেটা হল মাকোন্দোতে তার নামে রাখা একটা রাস্তা। তারপরেও, বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যাওয়ার বছর কয়েক আগে তার বক্তব্য অনুযায়ী, জেনারেল ভিক্তোরিও মেদিনার বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্যে একুশ জনকে নিয়ে যে-সকালে সে মাকোন্দো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন এসবের কোনো কিছুই সে আশা করেনি।

যাওয়ার আগে আর্কাদিওকে স্রেফ এটুকুই বলে যায় সে, 'মাকোন্দোকে তোর জিম্মায় রেখে গেলাম। খুব খারাপ অবস্থায় কিন্তু রেখে গেলাম না। চেষ্টা করিস যেন, যখন ফিরে আসবো তখন এর চেয়ে ভালো অবস্থায় দেখি শহরটাকে।'

নির্দেশটার নিতান্তই এক ব্যক্তিগত অর্থ দাঁড় করায় আর্কাদিও। মেলকিয়াদেসের একটা বইতে দেখা কিছু ছবি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্শালের ব্রেইড আর অ্যাপোলেট লাগানো একটা উর্দি আবিষ্কার করে সে, তারপর নিজের কোমরে বেঁধে নেয় সেই নিহত ক্যাপ্টেনের সোনার ঝালর লাগানো তরবারিটা। শহরের প্রবেশপথে দুটো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামান বসায় সে, তার গা-গরম-করা হুকুমনামা শুনে তেতে ওঠা তার নিজেরই সাবেক ছাত্রদের গায়ে চাপিয়ে দেয় উর্দিগুলো, তারপর অস্ত্র হাতে তাদের ছেড়ে দেয় রাস্তায় রাস্তায়, যাতে বাইরের লোকজন একটা দুর্ভেদ্যতার আভাস পায়। ব্যাপারটা আসলে একটা দু'মুখো ছলনা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ দশ মাসের মধ্যে সরকার হামলা চালাতেই সাহস করে না, আর যখন করে তখন এমনই বিশাল এক বাহিনী পাঠায় যে আধ ঘন্টার মধ্যে গুঁড়িয়ে যায় প্রতিরোধটা। নিজের শাসনামলের পয়লা দিন থেকেই হুকুমনামা জারি করার ওপর একটা দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল আর্কাদিওর। একটা কিছু মাথায় এলেই হলো, তা প্রয়োগ করার জন্যে দিনে কম করে হলেও চারবার সেগুলো পড়ে শোনাতো সে। আঠারোর ওপরের সব পুরুষের জন্যে সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করে দেয় সে। ঘোষণা করে, সন্ধ্যা ছ'টার পর কোনো জীব-জন্তু রাস্তায় পাওয়া গেলে সেটা সরকারী সম্পত্তি হয়ে যাবে, তাছাড়া অতি বৃদ্ধদের সে বাধ্য করে লাল বাজুবন্ধ পরতে। ফাদার নিকানোরকে সে মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে একঘরে করে রাখে যাজকপল্লীতে, সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মাস্-এ যোগ দেয়া আর উদারপন্থীদের বিজয় ছাড়া অন্য কোনো কারণে ঘন্টা বাজানো। তার উদ্দেশ্যের কঠোরতার ব্যাপারে কারো মনে যাতে কোনো সন্দেহ না জন্মে সেজন্যে স্কোয়ারে একটা ফায়ারিং স্কোয়াড বসানোর হুকুম দিয়ে সেটাকে দিয়ে গুলি করায় একটা কাকতাড়ুয়ার গায়ে। গোড়ার দিকে কেউ-ই আমল দেয়নি তাকে। শত হলেও, ওরা পাঠশালার ছেলে, বড় বড় খেলছে। কিন্তু এক রাতে, সে কাতারিনোর দোকানে যাওয়ার পরে উপস্থিত দলটার ভেতরে থাকা এক বাজনদার তূর্যনাদসহ তাকে স্বাগত জানালে সব খদ্দের হেসে ওঠে, আর তখন কর্তৃপক্ষের প্রতি অসম্মান দেখানোর অপরাধে আর্কাদিওর হুকুমে গুলি করে মেরে ফেলা হয় লোটাকে। যারা এর প্রতিবাদ করে তাদেরকে সে স্কুল ঘরে রাখা বেড়ি পায়ে পরিয়ে স্রেফ রুটি-পানি দিয়ে আটকে রাখে। আর্কাদিওর কোনো খামখেয়ালি, উশৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপের খবর শুনলেই উরসুলা তাকে গালি দিয়ে উঠতো, 'ব্যাটা খুনী! অরেলিয়ানো জানতে পারলে গুলি করে মারবে তোকে, আর তখন সবার আগে যে খুশি হবে সে আমি।' কিন্তু এসবে কোনো কাজ হয় না। অপ্রয়োজনীয় কঠোরতার সাঁড়াশী আঁটতে আঁটতে আর্কাদিও হয়ে ওঠে মাকোন্দোর দেখা সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাসক। 'এবার টের পাক ওরা তফাৎটা,' দন আপোলিনার মসকোতে বলে ওঠেন একবার। 'এই হচ্ছে সেই উদারপন্থী স্বর্গ।' আর্কাদিওর কানে পৌছে যায় খবরটা। টহলবাহিনী নিয়ে এসে হামলা চালায় সে বাড়িতে, তছনছ করে ফেলে আসবাবপত্র, মেয়েদের চাবুক দিয়ে পেটায়, তারপর টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে দন আপোলিনার মসকোতকে। আর্কাদিও যখন ফায়ারিং স্কোয়াডকে গুলি করার হুকুম দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন শহরের ভেতর দিয়ে গালির তুবড়ি ফোটাতে ফোটাতে আর মহাক্রোধে পিচ-মাখানো চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে ওদের সদর দফতরের চত্বরে ঝড়ের মতো উদয় হয় উরসুলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বেজন্মা, তোর নিকুচি করি আমি।' চেঁচিয়ে ওঠে উরসুলা।

আর্কাদিও কিছু করে ওঠার আগেই উরসুলার চাবুকের প্রথম বাড়িটা গিয়ে পড়ে তার পিঠের ওপর। চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'খুনী, তোর নিকুচি করি আমি। নষ্টা মায়ের ছেলে, তুই আমাকেও খুন কর। তাতে করে একটা দানবকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করার জন্যে কাঁদতে হবে না আমাকে।' নির্দয়ের মতো চাবকাতে চাবকাতে তাকে উঠোনের একেবারে পেছন পর্যন্ত নিয়ে যায় সে, খোলসের ভেতরে শামুকের মতো সেখানে গুটিয়ে পড়ে থাকে আর্কাদিও। ওদিকে, খেলাচ্ছলে গুলিতে গুলিতে টুটাফাটা করে ফেলা কাকতাড়ুয়াটা যেখানে ছিল সেই খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দন আপোলিনার মসকোত তখন বেহুঁশ। উরসুলা পিছু নেবে ভেবে ফায়ারিং স্কোয়াডে ছেলেগুলো এদিক-সেদিক ছুটে পালিয়েছে। কিন্তু উরসুলা ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। উর্দি ছেঁড়াফাড়া, ব্যথায় আর রাগে গজরাতে থাকা আর্কাদিওকে ফেলে দন আপোলিনার মসকোতের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায় উরসুলা। সদর দফতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ছেড়ে দিয়ে যায় সে বেড়ি পরা বন্দিদের।

এরপর থেকে উরসুলারই কর্তৃত্বে চলে যায় শহরটা। রোববারের মাস্‌টা ফের চালু করে সে, লাল বাজুবন্ধ ব্যবহারের নিয়মটা রদ করে দেয়, আর বাতিল ঘোষণা করে হঠকারী হুকুমনামাগুলো। কিন্তু এই পরাক্রমের পরেও, নিজের মন্দ কপালের কথা ভেবে তার কান্না বিরাম মানে না। এতোটাই নিঃসঙ্গ বোধ করে সে যে চেস্টনাট গাছের তলায় পড়ে থাকা তার স্বামীর নিষ্ফল সান্নিধ্য খোঁজে সে। জুনের বৃষ্টি ছাউনিটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলার হুমকি দিলে সে তার স্বামীকে বলে, 'দেখো, কী দশা হয়েছে আমাদের। আমাদের বাড়িটা দেখো, খাঁ খাঁ করছে, ছেলেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা দুনিয়ায়, আর আমরা দু'জন আবার একা হয়ে গেছি, ঠিক সেই আগের মতো।' নির্লিপ্তির গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কানে উরসুলার এসব আহাজারির কিছুই পৌঁছোয় না। তার পাগলামির গোড়ার দিকে ত্বরিত উচ্চারণে কিছু লাতিন শব্দে সে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা জানাতো। তার ক্ষণস্থায়ী সুস্থাবস্থার পরিষ্কার টলটলে মুহূর্তগুলোয় আমারান্তা যখন খাবার নিয়ে যেতো, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তাকে জানাতো কী কী জিনিস নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা তার, তারপর বাধ্য ছেলের মতো নিয়ে নিতো মেয়ের দেয়া চুষনী গ্লাস আর সরিষার পুলটিশটা। কিন্তু উরসুলা যখন তার কাছে আহাজারি করতে গেছে তখন বাস্তবের সঙ্গে সমস্ত সংসর্গ লুপ্ত তার। টুলে বসে থাকে সে, আর উরসুলা তাকে ধীরে সুস্থে গোসল করানোর ফাঁকে সাংসারিক নানান খবরাখবর দিয়ে যায়। সাবান মাখানো একটা বুরুশ হোসে আর্কাদিওর পিঠে ঘষতে ঘষতে সে বলে, 'চার মাস আগে যুদ্ধে গেছে অরেলিয়ানো, এখন পর্যন্ত তার কোনো খবর নেই। হোসে আর্কাদিও একটা বিশাল মরদ হয়েছে, তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছে মাথায়, আর তার সারা গায়ে উল্কি-দাগা, কিন্তু বাড়ির জন্যে সে লজ্জাই বয়ে এনেছে কেবল।' তার কাছে মনে হয়, তার স্বামী খারাপ খবর শুনে মন খারাপ করে, তাই সে মিথ্যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলবে বলে ঠিক করে। কোদাল দিয়ে তুলে নেবার জন্যে স্বামীর মলের ওপর ছাই ছড়িয়ে দিতে দিতে সে বলে, 'এখন আমি তোমাকে যা বলবো তা তোমার বিশ্বাসই হবে না। ঈশ্বরই চেয়েছিলেন হোসে আর্কাদিও আর রেবেকার বিয়ে হোক, ওরা এখন খুব সুখে আছে।' এই প্রবঞ্চনায় সে এতোটাই একনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে শেষ অব্দি নিজের মিছে কথা দিয়ে নিজেকেই সান্ত্বনা দেয় সে। সে বলে, 'আর্কাদিওর ইদানিং কাজে-কর্মে খুব মন, খুব সাহসী হয়েছে সে, উর্দি আর তলোয়ারসহ বড় সুন্দর জোয়ান লাগে তাকে দেখতে।' এ-যেন মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলা, কারণ, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তখন সব ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বাইরে চলে গেছে। উরসুলা অবশ্য বলেই চলে। লোকটাকে এতো শান্ত, সব কিছু সম্বন্ধে এতোই উদাসীন বলে মনে হয় যে উরসুলা তার শরীরের বাঁধন খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু লোকটা এমনকি তার টুল থেকেও নড়ে না, ওখানেই বসে থাকে রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, যেন দড়ি-দড়াগুলোর কোনো দরকারই নেই, দৃশ্যমান যে-কোনো বাঁধনের চেয়ে বড় কোনো শক্তি বেঁধে রেখেছে তাকে চেস্টনাট গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। অগাস্টের শেষ নাগাদ, শীত যখন চিরস্থায়ী হতে শুরু করেছে, উরসুলা শেষ অব্দি তাকে এমন একটা খবর দিতে পারে যে-খবরটা সত্যি বলেই শোনায়।

সে তাকে বলে, 'তোমার কি বিশ্বাস হয়, ভাগ্যলক্ষ্মী এখনো আমাদের সঙ্গে আছে? আমারান্তা আর সেই ইতালিয় পিয়ানোঅলা বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

উরসুলার ছত্রছায়ায় আমারান্তা আর পিয়েত্রো ক্রেসপি আসলেই তাদের সখ্য গাঢ় করে নিয়েছে, কিন্তু এবার সে আর ওদের সাক্ষাতের সময় পাহারা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। এ হলো গোধূলীবেলার অভিসার। বাটনহোলে একটা গার্ডেনিয়া ফুল পরে, সন্ধ্যার সময় এসে পৌছুবে ইতালিয় লোকটা, তারপর পেত্রার্ক-এর সনেট তর্জমা করে শোনাবে আমারান্তাকে। অরিগ্যানো আর গোলাপের দমবন্ধকরা সুবাসের ভেতর, যুদ্ধের নানান অভিঘাত আর দুঃসংবাদের দিকে ভ্রুক্ষেপহীন দু'জনে বসবে গিয়ে বারান্দায়, পিয়েত্রো ক্রেসপি বই আর আমারান্তা লেস-এর আস্তিন সেলাই নিয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মশক বাহিনী বাধ্য করবে তাদের বৈঠকখানায় আশ্রয় নিতে। আমারান্তার সংবেদনশীলতা, তার বিচক্ষণ অথচ আচ্ছন্ন করা এক কোমলতা তার দয়িতকে ঘিরে তৈরি করেছিল এক অদৃশ্য জাল, সে-জাল আক্ষরিক অর্থেই তাকে সরিয়ে দিতে হোতো তার পাণ্ডুর, অঙ্গুরীয়বিহীন হাত দিয়ে, আটটার সময় ও-বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময়। ইতালি থেকে পিয়েত্রো ক্রেসপি যে পোস্টকার্ডগুলো পেয়েছিল সেগুলো দিয়ে চমৎকার একটা অ্যালবাম তৈরি করেছিল ওরা। নির্জন পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকা বসে আছে, তারই ছবি ওগুলো, সঙ্গে ঘুঘু পাখির ধরে রাখা ফিতে আর তীরবিদ্ধ হৃদয়ের নকশা। কার্ডগুলো দেখতে দেখতে পিয়েত্রো ক্রেসপি বলবে, 'ফ্লোরেন্সের এই পার্কটায় গিয়েছি আমি। ওখানে যে-কেউ হাত বাড়িয়ে দিলেই পাখিরা সেখান থেকে খুটে খুটে দানা খায়।' কখনো কখনো জলরঙ-এ আঁকা ভেনিসের ছবি দেখে দেশের জন্যে একটা মন-কেমন-করা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভূতি খালের কাদা আর পচা শামুকের গন্ধকে রূপান্তরিত করবে নানান সব ফুলের উষ্ণ সুবাসে। আমারান্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, হাসবে, আর স্বপ্ন দেখবে শিশুসুলভ ভাষায় কথাবলা সুদর্শন নর-নারীতে পূর্ণ দ্বিতীয় এক জন্মভূমির জন্যে, যে-দেশের প্রাচীন সব নগরের সাবেক জাঁকজমকের ভেতর অবশিষ্ট আছে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়ানো বেড়ালটাই কেবল। ভালোবাসার খোঁজে সমুদ্র পেরিয়ে, রেবেকার উদ্দীপ্ত হৃৎস্পন্দনকে গভীর প্রণয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার পর শেষ পর্যন্ত সেটাকে খুঁজে পেয়েছে পিয়েত্রো ক্রেসপি। সুখের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সমৃদ্ধি। প্রায় একটা ব্লকই দখল করে নিয়েছে তার ওয়্যারহাউসটা, আর সেই অবাধ কল্পনার উষ্ণঘরে রয়েছে কী-বোর্ডের ঐকতানে সময় জানান দেয়া ফ্লোরেন্সের ঘণ্টা ভবনের অবিকল একটা প্রতিরূপ, সোরেন্তোর মিউজিক বক্স, খুললেই বাজনা বেজে ওঠা চীনা পাউডারের কৌটা, কল্পনার সমস্ত বাদ্যযন্ত্র আর যান্ত্রিক খেলনাপাতি। দোকানটার ভার এখন তার ভাই ব্রুনো ক্রেসপির ওপর, কারণ গানের স্কুলটার নজরদারি করার মতো সময় এখন পিয়েত্রো ক্রেসপির নেই বললেই চলে। তুর্কীদের সড়কটা যে নানান টুকিটাকি যন্ত্রের চোখ ধাঁধানো সমারোহে এক সুরেলা মরুদ্যানে পরিণত হয়েছে, যেখানে আর্কাদিওর স্বেচ্ছাচারী ক্রিয়াকলাপ আর যুদ্ধের দূরবর্তী দুঃস্বপ্নগুলো ভুলে থাকতে পারে যে-কেউ, সে-কৃতিত্বটা তারই। উরসুলা রোববারের মাস্‌টা ফের চালু করার আদেশ দেয়াতে গির্জায় জার্মানীর তৈরি একটা হার্মোনিয়াম দান করে পিয়েত্রো ক্রেসপি, গড়ে তোলে বাচ্চাদের একটা কোরাস আর তৈরি করে একটা গ্রেগরিয় রেপার্টরি, যা কিনা এক উজ্জ্বল দীপ্তি এনে দেয় ফাদার নিকানোরের নীরস ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। সে যে আমারান্তার এক সৌভাগ্যবান জোড়া হবে সে-ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না কারো। নিজেদের আবেগ-অনুভূতির ওপর চড়াও না হয়ে, হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রভাবে নিজেদেরকে ভেসে যেতে দিয়ে ওরা এমন একটি অবস্থানে পৌঁছোয় যেখানে করণীয় থাকে কেবল একটি-ই, আর তা হল বিয়ের একটা তারিখ ঠিক করা। কোনোরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয় না ওদের। বার বার ঝুলিয়ে রেখে রেবেকার নিয়তিটাকে বিগড়ে দেয়ার জন্যে মনে মনে নিজেকেই দোষ দিতো উরসুলা, নতুন করে তাই আর দুঃখ বাড়াতে চায় না সে। যুদ্ধের উৎপীড়ন, অরেলিয়ানোর অনুপস্থিতি, আর্কাদিওর নিষ্ঠুরতা আর হোসে আর্কাদিও-রেবেকার বিতাড়ন, —এসবের কারণে রেমেদিওসের জন্যে শোকপালনের কষ্টটা আড়ালে চলে গিয়েছিল। অরেলিয়ানো হোসেকে পিয়েত্রো ক্রেসপি প্রায় সন্তানের মতো ভালোবাসতে শুরু করেছে, বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসার মুখে সে আভাসে জানায় ছেলেটা তাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। সব কিছু দেখে আমারান্তার মনে হয় নির্ভেজাল এক সুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু রেবেকার মতো এতটুকু অস্থিরতাও দেখায় না সে। যে-ধৈর্য নিয়ে সে টেবিল-ঢাকাগুলো রঙে ছোপায়, সেলাই করে লেসের সব অসাধারণ কাজ, ক্যানভাসের ওপর সুইসুতো দিয়ে ময়ূর আঁকে, ঠিক সেই একই ধৈর্য নিয়ে বসে থাকে সে সেই মুহূর্তটির জন্যে যখন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিয়েত্রো ক্রেসপির পক্ষে আর তার হৃদয়ের আকুতি ধরে রাখা সম্ভব হবে না। তার সেই দিনটি আসে কুলুক্ষণে অক্টোবরের বৃষ্টির সঙ্গে। আমারান্তার কোল থেকে সেলাইয়ের ঝাঁপিটা সরিয়ে রেখে সে বলে, 'সামনের মাসে বিয়ে করছি আমরা।' তার বরফ শীতল হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে ওঠে না আমরান্তা। ভীতু এক ছোট্ট জন্তুর মতো নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে ফের কাজ শুরু করে সে।।

'নিজেকে খেলো কোরো না, ক্রেসপি,' মৃদু হেসে সে বলে। 'মরে গেলেও তোমাকে বিয়ে করছি না আমি।'

একেবারে উন্মাদ হয়ে যায় পিয়েত্রো ক্রেসপি। নির্লজ্জের মতো কেঁদেকেটে একশা হয়ে যায়, হতাশায় আঙুলগুলো প্রায় ভেঙে ফেলে, তারপরেও রাজি করাতে পারে না আমারান্তাকে। 'মিছিমিছি নিজের সময় নষ্ট কোরো না, ক্রেসপি,' আমারান্তার বক্তব্য বলতে স্রেফ এই। 'এতোই যদি ভালোবাসো আমাকে তো এ-বাড়িতে আর পা দিয়ো না তুমি।' উরসুলার মনে হয় মরমে মরে যাবে সে। কাকুতি-মিনতির কোনো রকমফেরই বাকি রাখে না পিয়েত্রো ক্রেসপি। অপমানের অবিশ্বাস্য সব চূড়ান্ত দশার ভেতর দিয়ে যায় সে। উরসুলার কোলে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদে সে একদিন সারা বিকেল ধরে, তাকে সান্ত্বনা দিতে উরসুলা তখন পারে তো নিজের আত্মাটাই বিক্রি করে দেয়। বাদলার রাত্তিরে দেখা যায় ছাতা মাথায় বাড়ির চারদিকে ঘুর ঘুর করছে পিয়েত্রো ক্রেসপি, আমারান্তার শোবার ঘরে কখন বাতি জ্বলে উঠবে তারই অপেক্ষায়। তখনকার মতো ধোপদুরস্ত পোশাকে আর কখনো দেখা যায়নি তাকে। এক যন্ত্রণাদগ্ধ সম্রাটের উঁচু মাথাটা তার অর্জন করে এক অদ্ভুত মহিমা। বারান্দায় বসে যারা সেলাই-ফোঁড়াই করতো, আমারান্তার সেই সখীদের সবার হাতে পায়ে ধরে সে যাতে মেয়েটাকে রাজি করাতে চেষ্টা করে তারা। হেলায় পড়ে থাকে তার ব্যবসা-বাণিজ্য। দোকানের এক ধারে বসে সারা দিন পার করে দিতো সে প্রলাপভরা চিরকুট লিখে লিখে, তারপর ফুলের পাঁপড়ি আর মরা, শুকনো প্রজাপতির সঙ্গে পাঠিয়ে দিতো সেগুলো আমারান্তার কাছে, কিন্তু না খুলেই সেগুলো ফেরত পাঠাতো সে। কখনো ঘন্টার পর ঘণ্টা যিথার বাজাতো সে ঘরবন্দি হয়ে। এক রাতে সে গেয়ে ওঠে গান। অন্য কোনো পৃথিবীর যোগ্য একটা যিথার আর দুনিয়ার অন্য কারো বুকে এতো প্রেম নেই এমন বিশ্বাস লোকের মনে জন্ম দেয়া একটা গলার কারণে সৃষ্টি হওয়া এক ঐশ্বরিক বিহ্বলতা নিয়ে জেগে ওঠে মাকোন্দো। পিয়েত্রো ক্রেসপি দেখতে পায় শহরের প্রতিটি জানলায় জ্বলে উঠেছে আলো, কেবল আমারান্তারটা ছাড়া। দোসরা নভেম্বর, অল সোল'স ডে-তে ক্রেসপির ভাই দোকান খুলে দেখতে পায় সব ক'টা বাতি জ্বলছে, সব ক'টা মিউজিক বক্স খোলা, প্রত্যেকটা ঘড়ি সশব্দে জানান দিচ্ছে এক অন্তহীন সময়ের, আর সেই উদভ্রান্ত ঐকতানের মাঝে পিয়েত্রো ক্রেসপিকে পায় সে কোনার একটা ডেস্কে, ক্ষুর দিয়ে তার কব্জি কাটা, হাত দুটো ঢুকিয়ে দেয়া বেনজয়েন-এর একটা গামলার ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরসুলা ঘোষণা করে, শোক-জাগরটা তার বাড়িতেই পালন করা হবে। ফাদার নিকানোর অবশ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর পবিত্র ভূমিতে লাশ দাফনের অনুমতি দেন না। উরসুলা তখন তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সে বলে, 'আমি-আপনি ঠিক বুঝে উঠতে পারবো না ব্যাপারটা, কিন্তু ঐ লোকটা ছিল এক সন্তের মতো। কাজেই আপনি না চাইলেও, মেলকিয়াদেসের কবরের পাশে ওকে কবর দেবো আমি।' শহরের সব লোকের সায় নিয়ে একটা জমকালো অন্ত্যেষ্টির মধ্যে দিয়ে তাই করে ছাড়ে সে। নিজের শোবার ঘর ছেড়ে এক পা-ও বেরোয় না আমারান্তা। উরসুলার কান্না, বাড়িতে ভেঙে পড়া লোকজনের পায়ের আওয়াজ আর নিচু গলা, শোকার্তদের আহাজারি আর তারপর, পায়ে-দলা ফুলের গন্ধে ভরা এক গভীর নীরবতা, সবই টের পায় আমারান্তা তার বিছানায় বসে। দীর্ঘদিন ধরে সাঁঝবেলায় পিয়েত্রো ক্রেসপির সুগন্ধি শ্বাসের ঘ্রাণ পায় সে, কিন্তু তাতে বিকারগ্রস্ত না হওয়ার মতো শক্তিটুকুর পরিচয় দেয় সে। উরসুলা তার সঙ্গ বর্জন করে। এমনকি যে-বিকেলে আমারান্তা রান্নাঘরে গিয়ে চুল্লীর কয়লার ভেতর নিজের হাতটা ঠেসে ধরে বসে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো ব্যথাই অনুভব হয় না তার, বরং তার বদলে সে নিজের পোড়া মাংসের নারকীয় গন্ধ শোঁকে, সেদিনও তার দিকে করুণার ছলেও চোখ তুলে তাকায় না সে। এই হাত পোড়ানোটা আমারান্তার শোকের এক নির্বোধ নিদান। তার দুঃখ-কষ্ট ভোলার এক নির্বোধ চেষ্টা। ডিমের সাদা অংশভর্তি একটা গামলায় হাত ডুবিয়ে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়ায় সে বাড়িতে, আর পোড়াটা যখন ভালো হয়ে যায় তখন তার মনে হয় সেই সাদা অংশটা তার মনের ক্ষতের ওপরেও দাগ ফেলে গেছে। দুঃখজনক সেই ঘটনার একমাত্র বাহ্যিক চিহ্ন হিসেবে রয়ে যায় পোড়া হাতটায় বেঁধে রাখা সেই কালো পট্টিটা, সেটা সে পরে থাকে তার মৃত্যু অবধি।

পিয়েত্রো ক্রেসপির জন্যে আনুষ্ঠানিক শোক ঘোষণা করে উদারতার এক বিরল নজির রাখে আর্কাদিও। পথভোলা মেষের ফিরে আসা হিসেবে ব্যাপারটাকে দেখে উরসুলা। কিন্তু সে ভুল করে। যেদিন আর্কাদিও সামরিক পোশাক গায়ে চড়িয়েছে সেদিন নয়, বরং গোড়াতেই উরসুলার বেহাত হয়ে গেছে সে। উরসুলা মনে করেছিল নিজের সন্তান হিসেবেই বুঝি সে মানুষ করেছে আর্কাদিওকে, ঠিক যেমনটি করেছিল রেবেকাকে, বাড়তি কোনো সুবিধা বা বৈষম্যের দৃষ্টি ছাড়াই। তারপরেও, সেই অনিদ্রা রোগ, উরসুলার পরহিতৈষীপনার আতিশয্য, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার প্রলাপ বিকার, অরেলিয়ানোর অজ্ঞাতবাস আর আমারান্তা-রেবেকার মধ্যেকার নৈতিক রেষারেষির সময়ে নেহাতই এক নিভৃতচারী, ভীতু শিশু ছিল আর্কাদিও। অন্য সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামোনোর ভেতরেই অরেলিয়ানো তাকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছে, যা সে অজেনা যে-কারোর বেলাতেও করতো। যেসব কাপড়-চোপড় সে আর পরবে না সেগুলো আর্কাদিওকে দিয়ে দিয়েছিল সে, যাতে ভিসিতাসিওঁ সে-সব ছোট করে নিতে পারে। বেঢপ সাইজের জুতো, তালি দেয়া প্যান্ট আর তার মেয়েলী নিতম্ব নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় তাকে। ভিসিতাসিওঁ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাতাউরের সঙ্গে তাদের ভাষাতে সে যতটুকু ভাব বিনিময় করতে পেরেছিল, অন্য কারো সঙ্গে তার চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। মেলকিয়াদেসই একমাত্র লোক যে তার ব্যাপারে সত্যি সত্যিই মাথা ঘামাতো, তাকে সে নিজের দুর্বোধ্য লেখা পড়ে শোনাতো, আর শেখাতো দাগেরোটাইপ ছবির কলা-কৌশল। কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি কী কান্নাটাই না সে গোপনে কেঁদেছিল আর কী মরিয়া হয়েই না সে মেলকিয়াদেসকে তার কাগজপত্তরের বিফল অধ্যয়নের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করতো। যেখানে সবাই তাকে গুরুত্ব দিতো, তাকে সমীহের চোখে দেখতো, প্রথমে সেই স্কুল, তারপর তার সেই অন্তহীন হুকুমনামা আর তার মহিমাময় উর্দিসহ সেই ক্ষমতা তাকে মুক্তি দিয়েছিল এক পুরোনো তিক্ততার জগদ্দল থেকে। এক রাতে কাতারিনোর দোকানে একজন তাকে সাহস করে বলে, 'তুমি তোমার নামের শেষ অংশটার যোগ্য নও।' সবাই যা আশংকা করেছিল তা অবশ্য ঘটে না, আর্কাদিওর হুকুমে গুলি খেয়ে মরতে হয় না লোকটাকে।

বরং সে বলে, 'আমি যে বুয়েন্দিয়া নাই সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।'

তার জন্মরহস্য যাদের জানা, তারা ভাবে উত্তরটির অর্থ হল কথাটা তার নিজেরও অজানা নয়, কিন্তু আসলে সে কখনোই জানতে পারেনি সেটা। পিলার তারনেরা, তার মা, ডার্ক রুমে যে তার রক্তে বলক তুলে দিয়েছিল, সে তার কাছে এমনই এক সার্বক্ষণিক চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে যেমনটি সে প্রথমে ছিল হোসে আর্কাদিওর কাছে, পরে অরেলিয়ানোর কাছে। তার লাবণ্য আর হাসির ঐতিহ্য সে হারিয়ে ফেললে কী হবে, আর্কাদিও তাকে তার ধোঁয়ার গন্ধের সূত্র ধরে ঠিকই খুঁজে বের করে। যুদ্ধের অল্প ক'দিন আগে এক দুপুরে–পিলার তারনেরা সেদিন বরাবরের চেয়ে দেরি করে এসেছে তার ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে–আর্কাদিও একটা ঘরে অপেক্ষা করে থাকে তার জন্যে, এখানেই সাধারণত দুপুরের ঘুমটা ঘুমিয়ে নিতো সে, আর পরে এখানেই লোকজনকে শাস্তি দেবার জন্যে পায়ে পরাবার বেড়ি বসিয়েছিল। বাচ্চাটা উঠোনে খেলা করছে, ওদিকে আর্কাদিও অপেক্ষা করে আছে তার দোলখাটিয়ায়, কাঁপছে উত্তেজনায়, জানে এ-ঘর পেরিয়েই যেতে হবে পিলার তারনেরাকে। আসে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে খপ করে তার কব্জি চেপে ধরে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে সে দোলখাটিয়ায়। ভয়ে তরাসে পিলার তারনেরা বলে ওঠে, 'আমি পারবো না, আমি পারবো না। তুমি জানো না, তোমাকে আমি কতটা সুখী করতে চাই, কিন্তু ঈশ্বর আমার ওপর নজর রাখছেন, আমি পারবো না।' আর্কাদিও তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অসাধারণ শক্তিতে কব্জি ধরে টেনে আনে পিলার তারনেরাকে, তার শরীরের ছোঁয়ায় দুনিয়াটা নাই হয়ে যাবে বলে মনে হয় তার কাছে। 'অতো সতীপনা দেখাস না,' আর্কাদিও বলে ওঠে। 'সবাই জানে তুই একটা বেশ্যা।' নিজের করুণ নিয়তি পিলার তারনেরার মনে যে-বিরক্তির জন্ম দেয় তা অনেক কষ্টে জয় করে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিসফিসিয়ে সে বলে, 'বাচ্চারা দেখে ফেলবে। তার চেয়ে ভালো হয় তুমি যদি রাতে হুড়কোটা আলগা করে রাখো।'

সে-রাতে, একটুও না ঘুমিয়ে, নিজের দোলখাটিয়ায় জ্বরগ্রস্তের মতো কাঁপতে কাঁপতে, ভোর রাতের অন্তহীন ঘণ্টাধ্বনির ভেতর উদ্দীপ্ত ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে শুনতে আর কাদাচোখা পাখিগুলোর অবিশ্রান্ত প্রহর ঘোষণার মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকে আর্কাদিও, সেই সঙ্গে ক্রমেই নিশ্চিত হতে থাকে যে ধোঁকা দেয়া হয়েছে তাকে। উৎকণ্ঠা যখন প্রবল ক্রোধে রূপ নেয়, এমনি সময় হঠাৎ করে খুলে যায় দরজাটা। মাস কয়েক পর, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে আর্কাদিওর মনে পড়ে যাবে ক্লাসঘরের সেই এলোমেলো পদক্ষেপ, বেঞ্চির গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়া, আর শেষ অব্দি, ঘরের ছায়ার মধ্যে একটা শরীরের ভার আর অন্য এক বুকের নেয়া শ্বাস-প্রশ্বাস। নিজের হাতটা সে বাড়িয়ে দিতে একই আঙুলে দুটো আংটি পরা কিন্তু অন্ধকারে বেপথু হতে বসা আরেকটা হাত তার নাগালে আসে। শিরাগুলোর গড়নটা অনুভব করে সে, অনুভব করে সেগুলোর দুর্ভাগ্যের স্বরূপ, আর ভেজা ভেজা একটা তালু, যে-তালুর জীবনরেখাটাকে বুড়ো আঙুলের একেবারে গোড়া থেকেই ছেঁটে দিয়েছে মৃত্যুর থাবা। এরপর সে বুঝতে পারে যার জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে এ-মেয়েলোকটা সে নয়, কারণ তার গায়ে তামাকের গন্ধ নেই, তার বদলে আছে ফুলের আরকের সুবাস, আর আছে চুপসানো পুরুষের স্তনের মতো স্তন, এক পাথুরে গোলগাল যোনি আর উদ্দীপিত অনভিজ্ঞতার এলোমেলো কোমলতা। মেয়েটা কুমারী, নামটা কেমন খাপছাড়া, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ। এই কাজটা করার জন্যে তার হাতে পিলার তারনেরা তার সারা জীবনের সঞ্চয়ের আদ্ধেকটা তুলে দিয়েছে। মেয়েটাকে আর্কাদিও অনেকবার দেখেছে তার বাব-মার ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরে কাজ করতে, কিন্তু ভালো করে কখনো তাকায়নি, কারণ ঠিক দরকারের সময়টা ছাড়া অন্য সময়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে থাকার একটা বিরল গুণ আছে মেয়েটার, কিন্তু সেই দিন থেকে মেয়েটার বগলতলার ওমের ভেতর বেড়ালের মতো সেঁটে থাকে সে। পিলার তারনেরা তার জমানো টাকা-পয়সার বাকি আদ্ধেকটা তুলে দিয়েছে ওর বাপ-মা'র হাতে, তাদের সায় নিয়ে মেয়েটা প্রতি দিন সিয়েস্তার সময় স্কুলঘরে চলে যায়। যেখানে তারা মিলিত হয়েছিল সেখান থেকে পরে সরকারী সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দিলে তারা কাজটা সারে ভাঁড়ার ঘরের পেছনে, শুয়োরের চর্বি ভরা ক্যান আর খাদ্যশস্যের বস্তার মাঝখানের জায়গাটুকুতে। আর্কাদিওকে যখন একই সঙ্গে বেসামরিক ও সামরিক কর্তা ঘোষণা করা হয়, ততদিনে ওদের এক মেয়ে হয়ে গেছে।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ব্যাপারটা জানতো কেবল হোসে আর্কাদিও আর রেবেকা, ওদের সঙ্গেই সে-সময়ে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক আর্কাদিওর, তবে সেটা যতটা না আত্মীয়তার কারণে তারচেয়ে বেশি তারা একই গোয়ালের গরু বলে। সংসারের জোয়াল ততদিনে ঘাড়ে চেপে বসেছে হোসে আর্কাদিওর। রেবেকার দৃঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র, তার পেটের খাই আর বেদম উচ্চাশা শুষে নিয়েছে তার স্বামীর নিদারুণ শক্তি-সামর্থ, আর এরিমধ্যে সে একটা আলসে, মেয়ে-পাগল লোক থেকে একটা প্রকাণ্ড ভারবাহী পশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বাড়িটা ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে ওরা। সকাল হলেই বাড়ির দরজাটা হাট করে খুলে দেয় রেবেকা, গোরস্থানের বাতাস জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে চলে যায়, আসবাবপত্র আর চুনকাম-করা দেয়ালগুলো তামাটে করে রেখে যায় মৃতদের শরীরের যবক্ষার দিয়ে। তার মাটির খিদে, তার বাবা-মায়ের হাড়গোড়ের কড়মড় আওয়াজ, আর পিয়েত্রো ক্রেসপির নির্জীবতা দেখার পর তার রক্তের অস্থিরতা, সবই এখন ঠাঁই করে নিয়েছে রেবেকার স্মৃতির চিলেকোঠায়। যুদ্ধের অস্বাভাবিক দশার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে সারাদিনমান সেলাই করে যাবে সে জানলার ধারে বসে, তারপর যখন আলমারিতে রাখা সিরামিকের পটগুলো কাঁপতে শুরু করবে, উঠে পড়বে খাবার গরম করার জন্যে, তারও বেশ খানিকটা পর উদয় হবে প্রথমে ঘেয়ো কুকুরগুলো, তারপর দোনলা শটগান নিয়ে লেগিং আর নাল লাগানো জুতো পরা সেই বিশালকায় মূর্তিটি, কখনো কাঁধে একটা হরিণ ঝুলিয়ে, আর প্রায় সময়েই এক ছড়া খরগোশ বা বুনো হাঁস নিয়ে। একদিন বিকেলবেলা, হঠাৎ করেই আর্কাদিও এসে হাজির হয় ওদের বাড়িতে, সেটা তার শাসনামলের গোড়ার দিককার কথা। বাড়ি ছেড়ে দু'জনে চলে আসার পর সেটাই ওদের প্রথম দেখা, কিন্তু আর্কাদিওকে তাদের এতোই খোলামেলা আর আপন বলে মনে হয় যে অনায়াসে তাকে ওরা ওদের স্ট্যুতে ভাগ বসানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানায়।

অবশ্য ওরা কফি নিয়ে বসার আগে পর্যন্ত আর্কাদিও তার আগমনের হেতুটা জানায় না: হোসে আর্কাদিওর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ পেয়েছে সে। তাতে বলা হয়েছে, সে তার নিজের জমি চষতে চষতে এক পর্যায়ে সোজা তার পড়শিদের জমিতে উঠে গিয়ে ষাঁড়ের গুঁতোয় বেড়াটেড়া, বাড়িঘর ভেঙে ফেলে আশপাশের সবচেয়ে ভালো ভালো জমি জবরদখল করে নিয়েছে। যেসব চাষীর জমি সে জবরদখল করেনি—কারণ তাদের জমির ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই—তাদের ওপর সে একটা চাঁদা বসিয়েছে, প্রতি শনিবার সে ওই চাঁদা আদায় করতো, সঙ্গে থাকতো তার শিকারী কুকুরের দল আর তার দোনলা শটগান। আর্কাদিওর কাছে ব্যাপারটা সে অস্বীকার করে না। যে-অধিকারে সে কাজটা করেছে তা হল জবরদখল করা জমিগুলো আসলে মাকোন্দো পত্তনের সময় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া বিলি করে দিয়েছিল, আর তার ধারণা তার বাবা যে তখন থেকেই পাগল এই ঘটনাই তার প্রমাণ, কারণ তাদের পরিবারের ন্যায্য পৈতৃক সম্পত্তি সে অন্য লোকজনের নামে বিলি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। অভিযোগের ব্যাপারটা আসলে কোনো কাজের কথা নয়, তার কারণ আর্কাদিও সেটার বিচার করতে আসেনি। সে তাকে স্রেফ একটা রেজিস্ট্রি অফিস বসানোর প্রস্তাব দেয়, যাতে হোসে আর্কাদিও জবরদখলকরা জমিতে তার অধিকার বৈধ করে নিতে পারে। শর্ত হল, চাঁদা তোলার অধিকারটা সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানীয় সরকারকে দিয়ে দেবে। একটা রফায় আসে ওরা। বেশ কয়েক বছর পর, সম্পত্তির স্বত্ত্ব পরীক্ষা করতে গিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া দেখতে পায়, যে-পাহাড়ের ওপর হোসে আর্কাদিওর উঠোন সেখান থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মাঝখানের সমস্ত জমিজমা তার ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রি করা, আর সে আবিষ্কার করে, এগারো মাসের শাসনামলে আর্কাদিও শুধু চাঁদার টাকাই তোলেনি, হোসে আর্কাদিওর জমিতে লাশ দাফন করার অধিকার দেবার জন্যে লোকজনের কাছ থেকে মাশুলও আদায় করে ছেড়েছে।

এরিমধ্যে যা সবাই জেনে গেছে তা-ই জানতে বেশ কয়েক মাস লেগে যায় উরসুলার, কারণ তার কষ্টের বোঝা যাতে আর না বাড়ে সেজন্যে এসব তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল লোকজন। প্রথমটায় কিছু কিছু ব্যাপারে তার সন্দেহ হতে থাকে। স্বামীর মুখে লাউয়ের খোলের এক চামচ সিরাপ তুলে দেয়ার চেষ্টা করতে করতে মিথ্যে গর্ব নিয়ে সে তাকে জানায়, 'আর্কাদিও একটা বাড়ি বানাচ্ছে।' কিন্তু তারপরে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, 'কেন জানি না এসবের মধ্যে একটা বদ গন্ধ পাচ্ছি আমি।' পরে সে যখন জানতে পারে আর্কাদিও শুধু বাড়িই বানায়নি, ভেনিসিয় কিছু আসবাবপত্রেরও ফরমায়েশ দিয়েছে, তখনই তার সন্দেহটা পোক্ত হয় যে আর্কাদিও মানুষের তহবিলে হাত দিয়েছে। এক রোববার আর্কাদিওকে তার নতুন বাড়িতে তার অফিসারদের সঙ্গে বসে তাস পেটাতে দেখে সে তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুই একটা কুলাঙ্গার।' আর্কাদিও কোনো আমল দেয় না তাকে। কেবল তখনি উরসুলা জানতে পারে ছয় মাস বয়েসী একটা মেয়ে আছে আর্কাদিওর, আর যার সঙ্গে সে বিয়ে না করেই থাকছে সেই সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ ফের পোয়াতী হয়েছে। কর্নেল অরলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে হালফিল অবস্থার কথা চিঠি লিখে জানাবে বলে ঠিক করে উরসুলা। কিন্তু দুর্বার বেগে ছুটে চলা তখনকার সেই ঘটনাগুলো তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শুধু যে বাদই সাধে তা নয়, সে যে ওসব ভেবেছিল সেজন্যেই বরং দুঃখ হয় তার। যে-যুদ্ধটা শুধু একটা আবছা আর দূরবর্তী ঘটনা বোঝাবার শব্দই ছিল এতোদিন, তা এখন একটা কঠিন আর নাটকীয় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ বিধ্বস্ত চেহারার এক বুড়ি এসে হাজির হয় মাকোন্দোতে, ঝাড়ুর ভারে নুয়ে পড়া একটা গাধার পিঠে চেপে। এমনই নিরীহদর্শন চেহারা তার যে শহর থেকে জলায় আসা এ-ধরনের অগুনতি ফেরিঅলার একজন ভেবে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাকে ভেতরে যেতে দেয় সেন্ট্রিরা। সোজা সেনাছাউনিতে গিয়ে হাজির হয় সে। আগে ক্লাসঘর ছিল কিন্তু ততদিনে মোটামুটিভাবে সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের একটা শিবিরে পরিণত হওয়া জায়গাটায় তার সঙ্গে দেখা করে আর্কাদিও, সেখানে আংটা থেকে ঝুলে আছে গুটিয়ে রাখা দোলখাটিয়া, কোনায় পড়ে আছে স্তূপাকৃতি মাদুর, আর মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রাইফেল, কারবাইন, এমনকি শিকার করার শটগান। নিজের পরিচয় দেয়ার আগে বুড়ি শিরদাঁড়া সোজা করে সামরিক কেতায় একটা স্যালুট ঠোকে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কর্নেল গ্রেগরিও স্টিভেনসন।'

খারাপ খবর বয়ে এনেছে সে। তার বয়ান অনুযায়ী, উদারপন্থীদের শেষ প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আর্কাদিওর জন্যে একটা খবর পাঠিয়েছে, রিয়োহাচার কাছে যুদ্ধ করতে করতে পিছু হঠতে থাকা অবস্থায় তাকে রেখে এসেছে স্টিভেনসন। উদারপন্থীদের জানমালের প্রতি সম্মান দেখানো হবে এই শর্তে বিনা প্রতিরোধে শত্রুর হাতে শহরটা তুলে দিতে হবে। অচেনা সংবাদবাহককে খুঁটিয়ে দেখে আর্কাদিও, করুণামাখা চেহারার এক পলাতক দাদী হিসেবেই যেন লোকটাকে মানাতো ভালো।

সে বলে, 'স্বভাবতই, লিখিত কিছু নিশ্চয়ই সঙ্গে এনেছেন আপনি।'

বার্তাবাহক জবাব দেয়, 'স্বভাবতই, সে-ধরনের কিছু আমি আনিনি। বুঝতেই তো পারেন, বিপদ ডেকে আনবে এমন কোনো কিছু এই অবস্থায় কারো পক্ষে সঙ্গে রাখা সম্ভব নয়।' কথা বলতে বলতে কাঁচুলীর ভেতর থেকে ছোট্ট একটা সোনার মাছ বের করে আনে সে। বলে, 'আমার মনে হয় এটার পরে আর কিছু দরকার হবে না।' আর্কাদিও দেখে, সত্যিই সেটা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার তৈরি ছোট্ট মাছগুলোর একটা। কিন্তু এমনও হতে পারে যুদ্ধের আগে কেউ কিনেছিল বা চুরি করেছিল ওটা। রক্ষাপত্র পাস হিসেবে ওটার কোনো মূল্যই নেই। নিজের পরিচয় বিশ্বাস করাতে মরিয়া হয়ে উঠে বার্তাবাহক গোপন একটা সামরিক তথ্য পর্যন্ত ফাঁস করে দেয়। সে জানায়, একটা মিশন নিয়ে কিউরাসিও যাচ্ছে সে, আশা করছে, সেখানে সে ক্যারিবিয়ানের সব জায়গা থেকে আসা নির্বাসিতদের রিক্রুট করবে, যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আর খাবারদাবার যোগাড় করবে যাতে বছরের শেষাশেষি একটা ল্যান্ডিং-এর চেষ্টা চালাতে পারে। সেই পরিকল্পনার ওপর বিশ্বাস রেখে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সে সময়ে কোনো অর্থহীন লোকক্ষয় চাইছিল না। কিন্তু আর্কাদিও তার সিদ্ধান্তে অটল। বন্দি যতক্ষণ তার পরিচয় প্রমাণ করতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে সে, তারপর সিদ্ধান্ত নেয় আমৃত্যু শহরটাকে রক্ষা করার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না তাকে। উদারপন্থীদের পরাজয়ের খবর যে মিথ্যে নয় সেটা ক্রমেই আরো ভালো করে জানা যায়। মার্চের শেষ নাগাদ, অসময়ের বৃষ্টির এক সকালের খানিক আগে, একটা শিঙ্গা আর গির্জার চূড়াটা নামিয়ে দেয়া কামানের গোলার প্রচণ্ড আওয়াজে গত কয়েক হপ্তার চাপা উত্তেজনাপূর্ণ শান্ত অবস্থাটা ভেঙে পড়ে। সত্যি বলতে কী, আর্কাদিওর রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। সম্বল বলতে তার জনা পঞ্চাশেক লোক, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা নিতান্তই করুণ, মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র বিশটা কার্তুজ। কিন্তু বড় বড় বুলিভরা ঘোষণা শুনে মহা উত্তেজিত তার সেইসব সাবেক ছাত্র একটা নিশ্চিত ভরাডুবির জন্যে জান কোরবান করার জন্যে সংকল্প নেয়। বুটজুতোর মাড়ানি, উল্টোপাল্টা হুকুম, মাটি কাঁপানো কামানের গোলা, এলোপাথাড়ি গোলাগুলি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিঙ্গার অর্থহীন আওয়াজের ভেতর আর্কাদিওর সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয় সেই কথিত কর্নেল স্টিভেনসন। সে তাকে বলে, 'এভাবে মেয়েমানুষের জামা-কাপড় গায়ে চাপিয়ে, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মরার এই অপমানের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। যদি মরতেই হয় তো যুদ্ধ করে মরতে দাও আমাকে।' শেষ পর্যন্ত আর্কাদিওকে সে বোঝাতে সক্ষম হয়। আর্কাদিও তার লোকদের বলে কর্নেলকে একটা অস্ত্র আর বিশটা কার্তুজ দিতে, তারপর সদরদফতরটা রক্ষা করার জন্যে পাঁচজন লোকসহ তাকে রেখে ছোটে প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে। জলার দিকের রাস্তাটায় যায় না সে। ততক্ষণে ব্যারিকেডটা ভেঙে ফেলা হয়েছে, প্রতিরোধকারীরা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে একেবারে খোলা রাস্তার ওপর প্রথমে বন্দুকের গুলি বরাদ্দ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তারপর পিস্তল দিয়ে বন্দুকের সঙ্গে, আর সবশেষে হাতে হাতে যুদ্ধ করে যায়। পরাজয়টা যখন অত্যাসন্ন, লাঠি আর রান্নাঘরের ছুরি হাতে রাস্তায় নেমে পড়ে কিছু মহিলা। সেই ডামাডোলের ভেতর আমারান্তাকে দেখতে পায় আর্কাদিও, তাকেই খুঁজে চলেছে সে উন্মাদিনীর মতো, গায়ে রাতপোশাক, হাতে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার দুটো পুরনো পিস্তল। নিজের রাইফেলটা এক অফিসারকে দিয়ে--লোকটার অস্ত্রটা যুদ্ধের এক পর্যায়ে খোয়া গিয়েছিল—আমারান্তাকে বাড়ি পৌছে দেবার জন্যে কাছের একটা রাস্তা ধরে চম্পট দেয় সে। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল উরসুলা, পাশের বাড়ির সামনেই কামানের গোলা যে গর্ত করে ফেলেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বৃষ্টি কমে আসছে ঠিকই, কিন্তু রাস্তাগুলো গলে যাওয়া সাবানের মতো পিচ্ছিল আর মসৃণ, অন্ধকারে দূরত্ব আন্দাজ করে নিতে হয়। উরসুলার কাছে আমারান্তাকে রেখে দু'জন সৈন্যের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করে আর্কাদিও, এক কোনা থেকে বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। পুরনো পিস্তল দুটো বহুদিন দেরাজে পড়ে ছিল, সেগুলো কাজ করে না। উরসুলা নিজের শরীর দিয়ে আর্কাদিওকে আড়াল করে তাকে বাড়ির দিকে টেনে আনার চেষ্টা করে।

চিৎকার করে সে তাকে বলে, 'ঈশ্বরের দোহাই, চলে আয়। ঢের পাগলামি হয়েছে।'

সৈন্যরা অস্ত্র তাক করে ওদের দু'জনের দিকে।

তাদের একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'লোকটাকে ছেড়ে দিন, ম্যা'ম, নইলে কিন্তু আমাদের দুষতে পারবেন না।'।

উরসুলাকে বাড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে আর্কাদিও নিজে আত্মসমর্পণ করে। কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি থেমে যায়, ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর গুঁড়িয়ে গেছে প্রতিরোধটা। আর্কাদিওর লোকজনের একজনও বাঁচতে পারেনি এই আক্রমণের হাত থেকে। কিন্তু মরার আগে তিন শো সৈন্য মেরে গেছে তারা। সেনা শিবিরটাই ছিল শেষ ঘাঁটি। আক্রান্ত হওয়ার আগে কথিত কর্নেল স্টিভেনসন বন্দিদের ছেড়ে দিয়ে তার লোকগুলোকে হুকুম দিয়েছিল ওখান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে যুদ্ধ করতে। যে-অসাধারণ গতিময়তা আর নিখুঁত হাতের টিপ দিয়ে সে তার বিশটা গুলি পাঠিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল শিবিরটা খুবই সুরক্ষিত, আক্রমণকারীরা তাই কামান দেগে সেটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। ধ্বংসস্তূপটাতে কোনো লোকজন নেই দেখে আর অন্তর্বাস পরা একজন মাত্র মৃত লোক তার পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন একটা বাহুতে গুলিশূন্য একটা বন্দুক আঁকড়ে পড়ে রয়েছে দেখে অপারেশনের নেতা ক্যাপ্টেন লোকটি অবাক হয়ে যায়। মৃত লোকটার গলার কাছে একটা চিরুণীতে আটকে রয়েছে কোনো রমণীর এক মাথাভর্তি চুল, আর গলায় সোনার মাছঅলা একটা হার। বুটের ডগা দিয়ে লোকটাকে উল্টে তার মুখের ওপর আলো ফেলতেই চমকে ওঠে ক্যাপ্টেন। 'হায় যীশু! অবাক কণ্ঠে বলে ওঠে সে'। অন্য অফিসাররা এগিয়ে আসে।

ক্যাপ্টেন বলে, 'লোকটার শেষ পরিণতি কী দেখো। এ হল ক্যাপ্টেন গ্রেগরিও স্টিভেনসন।'

ভোরবেলা, সংক্ষিপ্ত একটা কোর্টমার্শালের পর, গোরস্থানের দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় আর্কাদিওকে। জীবনের শেষ দুটো ঘণ্টায় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যে, যে-ভয়টা তাকে তার শৈশব থেকে জ্বালিয়ে মেরেছে সেটা হঠাৎ উবে যায় কেন। উদাসীনভাবে, এমনকি তার অতি সাম্প্রতিক সাহসিকতা আরেকবার দেখানোর কথাটা একবারও না ভেবে, সে তার বিরুদ্ধে আনা অগুনতি অভিযোগের ধারা মন দিয়ে শুনে যায়। সে উরসুলার কথা ভাবে, এতোক্ষণে সে নিশ্চয়ই বাদাম গাছের নিচে বসে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে কফি খাচ্ছে। এখনো যার কোনো নামই রাখা হয়নি তার সেই আট মাস বয়েসী মেয়েটার কথা ভাবে সে, আর ভাবে সেই শিশুটির কথা সামনের অগাস্ট মাসে যে পৃথিবীতে আসছে। একটা হরিণের ছাল ছাড়িয়ে লবণ মেখে পরের দিনের দুপুরের খাবারের জন্যে রেখে দিচ্ছিল সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ, সেই সময় তার কাছ থেকে চলে এসেছিল আর্কাদিও আগের রাতে, তার কথা ভাবে সে, কষ্ট হয় তার কাঁধ থেকে নেমে আসা চুল আর দেখলে নকল মনে হওয়া তার চোখের পাঁপড়িগুলোর জন্যে। সব রকমের আবেগ ঝেড়ে ফেলে, জীবনের হিসেবখাতা শেষবারের মতো বন্ধ করে দিয়ে সে তার লোকগুলোর কথা ভাবে, উপলব্ধি করে যে যাদের সে সবচেয়ে ঘৃণা করতো তাদেরকেই সে কী প্রচণ্ড ভালোই না বাসে। হোসে আর্কাদিও যখন বুঝতে পারে দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কোর্ট মার্শালের সভাপতি তখন তার বক্তব্যের ইতি টানতে শুরু করেছে। সে বলে চলেছে, 'প্রমাণিত অভিযোগগুলোর যদি যথেষ্ট গুরুত্ব না-ও থাকে, তারপরেও যে-দায়িত্বজ্ঞানহীন আর অন্যায় দুঃসাহসের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার অধীনস্তদের এক অর্থহীন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তাতেই তার দিব্যি মৃত্যুদণ্ড পাওনা হয়ে যায়।' বিধ্বস্ত সেই স্কুলঘরে, যেখানে প্রথমবারেরর মতো সে ক্ষমতার নিরাপত্তার আস্বাদ পেয়েছিল, যে-কামরায় প্রথমবারের মতো সে প্রণয়ের অনিশ্চয়তার পরিচয় পেয়েছিল, তার থেকে মাত্র মাত্র কয়েক ফুট দূরে মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুষ্ঠানিকতাকে হাস্যকর বলে মনে হয় আর্কাদিওর। মৃত্যু তার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না, করে জীবন, কাজেই ওরা যখন ওদের সিদ্ধান্ত জানায় তখন তার যে-অনুভূতি হয় সেটা ভয়ের নয়, স্মৃতিকাতরতার। ওরা তাকে তার শেষ ইচ্ছার কথা জিজ্ঞেস করার আগ পর্যন্ত কোনো কথা বলে না সে।

চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণ-করা গলায় সে বলে, 'আমার বৌকে বোলো যেন মেয়েটার নাম রাখে উরসুলা।' একটু থেমে ফের বলে সে কথাটা: 'উরসুলা, ওর দাদীর মতো। তাকে আরো বোলো, যে-বাচ্চাটা আসছে সে যদি ছেলে হয় তো তার নাম হোসে আর্কাদিও রাখতে, ওর চাচার নামে না, দাদার নামে।'

যে-দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে ওকে গুলি করা হবে সেখানে আর্কাদিওকে নিয়ে যাওয়ার আগে ফাদার নিকানোর তার বক্তব্য শোনার চেষ্টা করে। আর্কাদিও বলে, 'অনুতাপ করার মতো কিছু নেই আমার,' তারপর এক কাপ কালো কফি খেয়ে স্কোয়াডের আজ্ঞার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রাণদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ স্কোয়াড-নেতার নামটাতে কাকতালীয় ব্যাপারের চেয়ে অতিরিক্ত একটা কিছু রয়েছে: ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারো, যার অর্থ কসাই। একটানা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গোরস্থানে যাওয়ার পথে আর্কাদিও দেখতে পায় উজ্জ্বল এক বুধবার শুরু হচ্ছে দিগন্তের ওপর। কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিকাতরতাও বিদায় নিয়েছে, তার বদলে সেখানে রেখে গেছে এক তীব্র কৌতূহল। ওরা যখন তাকে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে বলে ঠিক তখনই রেবেকাকে দেখতে পায় সে, ভিজে চুল নিয়ে ফুলেল একটা পোশাক পরে জানালা খুলে দিচ্ছে হাট করে। আর্কাদিও চেষ্টা করে যেন সে তাকে চিনতে পারে। আর রেবেকাও আলগোছে একবার তাকায় দেয়ালটার দিকে, তারপরেই নিশ্চল হয়ে যায় বিস্ময়ে, কোনোরকমে নড়ে উঠে বিদায় জানায় তাকে হাত নেড়ে। একইভাবে আর্কাদিও নিজেও তার জবাব দেয়। সেই সময়েই মুখে ধোঁয়া-ওঠা বন্দুকগুলো তাক করা হয় তার দিকে, আর মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে মেলকিয়াদেস পোপের যে-চিঠিটা পড়েছিল সেটা তার কানে আসে এক এক অক্ষর করে, সে আরো শুনতে পায় ক্লাসঘরের মধ্যে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদা নামের এক কুমারীর বেপথু পায়ের আওয়াজ, আর নিজের নাকে অনুভব করে ঠিক সেই বরফশীতল কাঠিন্য যা সে লক্ষ্য করেছিল রেমেদিওসের লাশের নাকের ছিদ্রে। 'এই যাহ্!' কোনোরকমে সে ভেবে উঠতে সক্ষম হয়। 'বলতেই ভুলে গেছি যে মেয়ে হলে ওরা যেন তার নাম রাখে রেমেদিওস।' তারপর, সবকিছু যখন একটা বিন্দুতে এসে ঠেকেছে, যেসব আতংক সারাজীবন তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে সেগুলো সব ফিরে আসে। ক্যাপ্টেন হুকুম দেয় গুলি ছোঁড়ার। কোনোরকমে বুকটা চিতিয়ে দেবার আর মাথাটা তোলার সুযোগ পায় সে, কিন্তু বুঝতে পারে না তার উরু পুড়িয়ে দেয়া গরম তরল পদার্থটা কোত্থেকে আসছে।

চিৎকার করে বলে ওঠে সে, 'বেজন্মার দল! উদারপন্থী দল জিন্দাবাদ!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মে মাসে শেষ হয় যুদ্ধটা। বিদ্রোহটা যারা শুরু করেছিল তাদের কঠিন শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার করে বড় বড় বুলিভরা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবার দুই হপ্তা আগে ধরা পড়ে যায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, অথচ আরেকটু হলেই পশ্চিম সীমান্তে পৌছে যেতো সে এক রেড ইন্ডিয়ান ওঝার ছদ্মবেশে। যে একুশজন লোক তার নেতৃত্বে যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের মধ্যে চোদ্দজন সম্মুখ সমরে মারা পড়ে, আহত হয় ছয় জন, আর চূড়ান্ত পরাজয়ের সময় তার পাশে থাকে মাত্র একজন: কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস। বিশেষ একটা ঘোষণার মাধ্যমে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার গ্রেপ্তারের খবরটা প্রচার করা হয় মাকোন্দোতে। উরসুলা তার স্বামীকে জানায়, 'ও বেঁচে আছে। এসো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওর শত্রুরা যেন দয়া দেখায় ওকে।' তিন দিনের কান্নাকাটির পর একদিন বিকেলবেলা সে যখন রান্নাঘরে খানিকটা মিষ্টি দুধের মিছরি নাড়ছে সেই সময় ছেলের গলার স্বর পরিষ্কার কানে ভেসে আসে তার। স্বামীকে খবরটা দেবার জন্যে চেস্টনাট গাছটার দিকে এক ছুট লাগিয়ে সে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'অরেলিয়ানোর গলা ওটা। অলৌকিক ব্যাপারটা কী করে ঘটল জানি না, কিন্তু ও বেঁচে আছে, শিগ্‌গিরিই ওকে দেখতে পাবো আমরা।' সে ধরেই নেয় ব্যাপারটা সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে। লোক লাগিয়ে সব ঘরের মেঝে ঘষামাজা করে সে, জায়গা বদল করে আসবাবপত্রের। এক হপ্তা পর একটা উড়ো খবরে এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটা নাটকীয় স্বীকৃতি পাওয়া যায়, যদিও কোনোরকম ঘোষণায় তার সমর্থন মেলে না। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, আর সেটা কার্যকর করা হবে মাকোন্দোতেই, লোকজন যাতে একটা শিক্ষা পায়। এক সোমবার, সকাল সাড়ে দশটায়, আমারান্তা তখন অরেলিয়ানো হোসেকে কাপড় পরাচ্ছে, দূর থেকে ভেসে আসে একটা সেনাদলের এগিয়ে আসার আওয়াজ আর একটা শিঙ্গার শব্দ, আর তার এক মুহূর্ত পরই ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢুকে চিৎকার করে ওঠে উরসুলা, 'ওই যে, ওরা নিয়ে আসছে ওকে!' উপচে পড়া লোকজনকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা। মানুষজন ঠেলেঠুলে পথের বাঁকে দৌড়ে যায় উরসুলা আর আমারান্তা, আর তখনই তাকে দেখতে পায় তারা। ভিখিরির মতো লাগছে তাকে দেখতে। পরনে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, চুল-দাড়ি জটপাকানো, পা নগ্ন। গনগনে গরম ধুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে হেঁটে চলেছে সে, হাত দুটো তার পিছমোড়া করে বাঁধা একটা দড়ি দিয়ে, সেটার অন্য প্রান্ত অশ্বারোহী এক অফিসার তার ঘোড়ার মাথার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁধে নিয়েছে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকেও নিয়ে আসছে ওরা, তার গায়েও ছেঁড়াফাড়া পোশাক, তারও পর্যুদস্ত দশা। তবে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে না কাউকেই। বরং সৈন্যদের উদ্দেশে চিৎকার করে গালাগালি আর বিদ্রূপ বর্ষণ করতে থাকা জনতার ওপরই যেন তারা বেশি বিরক্ত বলে মনে হয়।

সেই কোলাহলের ওপর গলা চড়িয়ে উরসুলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাবা আমার!' এক সৈন্য তাকে টেনে ধরবার চেষ্টা করছিল, তাকে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয় সে। অফিসারের ঘোড়াটা থেমে যায়। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াও থেমে যায় তখন, কাঁপতে থাকে তার শরীর, মায়ের বাড়িয়ে দেয়া হাত দুটো এড়িয়ে যায় সে, তারপর কঠিন দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে।

বলে, 'বাড়ি ফিরে যাও মা। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জেলে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

এরপর সে আমারান্তার দিকে তাকায়, উরসুলার দু'পা পেছনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে সে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া হেসে জিজ্ঞেস করে, 'তোর হাতে কী হয়েছে?' কালো পট্টি বাঁধা হাতটা উঁচু করে ধরে আমারান্তা। বলে, 'পুড়ে গেছে,' তারপর ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়া থেকে বাঁচাতে সরিয়ে নিয়ে যায় উরসুলাকে। সৈন্যদল চলতে শুরু করে। বিশেষ এক রক্ষিদল ঘিরে ধরে বন্দিদের, দুলকি চালে নিয়ে যায় তাদের কারাগারে।

সন্ধ্যায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে জেলে দেখা করে উরসুলা। দন আপোলিনার মসকোতের মাধ্যমে অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু প্রবলপ্রতাপ সামরিক শক্তির মুখে নিজের সমস্ত কর্তৃত্ব খুইয়ে বসেছেন তিনি। যকৃতের পীড়ায় ফাদার নিকানোর বিছানায় পড়ে। কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি, তার বাপ-মা তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, বন্দুকের কুঁদো মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। মধ্যস্থতা করবার মতো কাউকে পাওয়া অসম্ভব বুঝতে পেরে, আর সকালেই তার ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে ভেবে, তার জন্যে যেসব জিনিস নিতে চেয়েছিল সে-সব বেঁধে নিয়ে উরসুলা একলাই চলে যায় জেলে।

গিয়ে ঘোষণা করে, 'আমি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মা।'

সেন্ট্রিরা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। উরসুলা তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলে, 'ভেতরে আমি যাবোই, তা সে যেভাবেই হোক। কাজেই তোমাদের যদি গুলি করার হুকুম দেয়া থাকে তাহলে এখুনি করতে পারো।' ওদের একজনকে ঠেলে সরিয়ে সাবেক ক্লাসঘরে গিয়ে ঢোকে সে, অর্ধনগ্ন একদল সৈন্য সেখানে বসে তাদের অস্ত্রশস্ত্রে তেল লাগাচ্ছিল। ফিল্ড য়্যুনিফর্ম পরা, লালমুখো, বেজায় পুরু কাচঅলা চশমাপরা, চালচলনে ভারিক্কি গোছের এক অফিসার ইঙ্গিতে সরে দাঁড়াতে বলে সেন্ট্রিদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফের সেই আগের কথা আওড়ায় উরসুলা, 'কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মা আমি।'

অমায়িক একটা হাসি হেসে তাকে শুধরে দেয় অফিসার। 'আসলে নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন আপনি *মিস্টার* অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মা।'

তার কথা বলার কৃত্রিম ঢং দেখে পাহাড়ি এলাকার নাকউঁচু লোকজনের ঢিলেঢালা ছন্দটা চিনতে পারে উরসুলা।

লোকটার কথা মেনে নিয়ে সে বলে, 'তা তুমি যা বল, মিস্টার। ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলেই হলো আমার।'

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের সঙ্গে দর্শনার্থীদের সাক্ষাতের ব্যাপারে ওপর থেকে নিষেধ জারি করা আছে, কিন্তু উরসুলাকে পনেরো মিনিটের একটা সাক্ষাতের অনুমতি দেয়ার দায়িত্ব নেয় অফিসারটি। বোঁচকায় কী আছে তাকে দেখিয়ে দেয় উরসুলা: কয়েক প্রস্থ পরিষ্কার জামাকাপড়, বিয়ের সময় তার ছেলে যে খাটো বুটজোড়া পরেছিল তাই, আর দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টি মিছরি—এ-জিনিসটা সে তার জন্যে সেই দিন থেকেই রেখে দিয়েছিল যেদিন সে তার ফেরার ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। সেল হিসেবে একটা কামরা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেইখানে সে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে পায়, বগলে ঘা হওয়াতে দু'হাত ছড়িয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছে সে। ওরা তাকে দাড়ি কামাতে দিয়েছে। পাকানো দুই প্রান্তঅলা গোঁফ তার চোয়ালের হাড় প্রকট করে তুলেছে। মাকোন্দো ছেড়ে যাওয়ার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে আরো বেশি পাণ্ডুর আরো খানিকটা লম্বা আর অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় তাকে উরসুলার। বাড়ির খুঁটিনাটি সব খবরই তার জানা: পিয়েত্রো ক্রেসপির আত্মহত্যা, আর্কাদিওর স্বেচ্ছাচারী কাজকর্ম আর ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু, চেস্টনাট গাছের নিচে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার ডাকাবুকোভাব, সব। সে জানে আমারান্তা তার কুমারী বৈধব্য অরেলিয়ানো হোসে-র লালন-পালনের কাজে উৎসর্গ করেছে, আর অরেলিয়ানো হোসে বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া শুরু করেছে, কথা বলতে শেখার সময়ই শিখে ফেলেছে লিখতে পড়তে। ঘরে ঢোকার পর থেকেই ছেলের সাবালকত্ব, তার শাসনের অলৌকিক আভা আর তার গা থেকে ফুটে বেরোনো কর্তৃত্বের দীপ্তির কারণে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে উরসুলার। তাকে এতো ওয়াকেবহাল দেখে অবাক হয়ে যায় সে। কৌতুকের সুরে কর্নেল অরেলিয়ানো বলে, 'তুমি তো আগাগোড়াই জানতে যে আমি জাদু জানি।' গলার স্বর ভারি করে এরপর সে যোগ করে, 'আজ সকালে ওরা যখন নিয়ে আসে আমাকে তখন আমার মনে হয়েছিল আগে কোনো এক সময় যেন এসব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।' সত্যি বলতে কী, লোকজন যখন তার পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল সে তখন নিজের ভাবনা নিয়েই ডুবে ছিল, শহরটা কত বুড়িয়ে গেছে তাই দেখে চমকে উঠেছিল। অ্যালমন্ড গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। প্রথমে নীল, পরে তার ওপর চাপানো লাল রঙ করা বাড়িগুলোর বর্তমান রঙ বোঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উরসুলা বলে, 'কী আশা করেছিলি তুই? সময় বসে থাকে না।'

অরেলিয়ানো স্বীকার করে, 'তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে এতো তাড়াতাড়িও ছোটে না।'

দীর্ঘ প্রতিক্ষিত যে-সাক্ষাতের জন্যে দু'জনেই আগে থেকে প্রশ্ন ঠিক করে রেখেছিল, এমন কি উত্তরও ভেবে রেখেছিল আগাম আগাম, শেষ পর্যন্ত সেটা আরো একবার মামুলি দৈনন্দিন আলাপচারিতায় গিয়ে ঠেকে। রক্ষী যখন জানায় সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে গেছে অরেলিয়ানো তার খাটিয়ার নিচ থেকে ঘামে ভেজা একতাড়া কাগজ বের করে আনে। ওগুলো আসলে তার কবিতা লেখা কাগজ, রেমেদিওসের অনুপ্রেরণায় লেখা, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল যাওয়ার সময়, সেই সঙ্গে অবশ্য সে-সব কবিতাও আছে যেগুলো সে পরে যুদ্ধের সময় হঠাৎ পাওয়া কোনো অবসরে লিখেছিল। সে বলে, 'আমাকে কথা দাও যেন কেউ না পড়ে এগুলো। আজ রাতেই চুলো জ্বালাবে এসব দিয়ে।' উরসুলা কথা দেয়, তারপর চুমো খেয়ে বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

ফিসফিসিয়ে বলে, 'একটা রিভলভার এনেছি তোর জন্যে।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া খেয়াল করে যে সেন্ট্রি দেখতে পায়নি। নিচু গলায় সে বলে, 'ওটা আমার কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু তারপরেও রেখে যাও আমার কাছে। বেরোবার সময় ওরা সার্চ করতে পারে তোমাকে।' কাঁচুলির ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে আনে উরসুলা, রেখে দেয় খাটিয়ার তোষকের নিচে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া দৃঢ়তা মেশানো শান্ত ভাবের সঙ্গে কথার শেষ টেনে বলে, 'আর, বিদায় বোলো না যেন। কারো কাছে অনুরোধ-উপরোধ করতে যেয়ো না বা মাথা হেঁট কোরো না। মনে কোরো, অনেক আগেই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে ওরা।' কান্না ঠেকাতে ঠোঁট কামড়ে ধরে উরসুলা।

সে বলে, 'ঘা-গুলোতে চরম পাথর ঘষিস।'

আধ পাক ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া দরজাটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর ফের শুয়ে পড়ে দু'হাত ছড়িয়ে। বয়োসন্ধির সেই গোড়ার দিক থেকেই, যখন সে তার পূর্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই সে মনে করে এসেছে যে তার মৃত্যু আসবে একটা নির্দিষ্ট, পষ্ট, পিছপাহীন সংকেত দিয়ে, অথচ এখন তার মৃত্যুর আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি, কিন্তু সংকেটা আসেনি। একবার খুব সুন্দরী এক রমণী তুকুরিনকা-য় তার ছাউনিতে এসে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিয়েছিল সেন্ট্রিদের কাছ থেকে। ওরা তাকে যে-কারণে ঢুকতে দিয়েছিল তা হল কিছু কিছু মায়ের অন্ধ গোঁড়ামী সম্পর্কে ভালোই ওয়াকিবহাল ছিল ওরা, এই মায়েরা তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে সবচেয়ে বিখ্যাত যোদ্ধাদের বিছানায় পাঠিয়ে দিতো, যাতে করে, তাদের ভাষায়, আরো ভালো বংশধর পাওয়া যায়। সেই রাতে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে ফেলা লোকটাকে নিয়ে লেখা তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটা শেষ করে আনছে সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিল মেয়েটা। তালা দেয়া একটা দেরাজে কবিতাগুলো রাখতো কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, কাগজটা সেখানে রাখার জন্যে মেয়েটার দিকে পেছন ফিরেছিল সে। আর তখনই ব্যাপারটা টের পায় সে। মাথা না ঘুরিয়েই দেরাজের ভেতরের পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে।

বলে ওঠে, 'দয়া করে গুলি কোরো না।'

নিজের পিস্তলটা হাতে নিয়ে সে যখন মেয়েটার দিকে ফেরে মেয়েটা ততক্ষণে তারটা নামিয়ে নিয়েছে, বুঝতে পারছে না কী করবে। এভাবেই এগারোটা ফাঁদের চারটা এড়িয়ে গিয়েছিল সে। ওদিকে আবার, জ্বর হয়েছিল বলে শুয়ে থাকার জন্যে একবার নিজের খাটিয়াটা দিয়েছিল সে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল ম্যাগ্নিফিকো ভিস্বালকে, একদিন রাতে বিপ্লবীদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ছুরি দিয়ে তাকে মেরে রেখে যায় এক লোক, পরে তাকে আর ধরাই যায়নি। অথচ ওই ঘরেই মাত্র কয়েক গজ দূরে শুয়ে থেকেও কিচ্ছু টের পায়নি সে। নিজের পূর্ববোধগুলো একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে চেয়েও ব্যর্থ হয় সে। হঠাৎ করে, অতিপ্রাকৃত স্বচ্ছতার একটা ঢেউয়ের মধ্যে, একটা পরম আর প্রচণ্ড বিশ্বাসের মতো আসবে সেগুলো, কিন্তু আঁকড়ে ধরে রাখা যাবে না তাদেরকে। মাঝে মাঝে সেগুলো এতো স্বচ্ছন্দে আসে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পরেই কেবল সেগুলোকে চিনতে পারে সে। প্রায় ক্ষেত্রেই সেগুলোকে মামুলি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু ওরা যখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তার শেষ ইচ্ছাটা জানতে চেয়েছিল তখন যে-পূর্ববোধের প্রেরণায় সে উত্তরটা দিয়েছিল সেটাকে চিনতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি:

'আমি চাই মাকোন্দোতেই দণ্ডটা কার্যকর করা হোক,' সে বলে।

কোর্ট মার্শালের কর্তাব্যক্তিটি বিরক্ত বোধ করেন।

তিনি বলেন, 'চালাকি কোরো না, বুয়েন্দিয়া। আরো খানিকটা সময় বাগানোর ছল ছাড়া আর কিছু নয় এটা।'

'পূরণ করা না করা তোমাদের মাথাব্যথা, কিন্তু এটাই আমার শেষ ইচ্ছা,' কর্নেল বলে।

এরপর থেকেই পূর্ববোধগুলোর আর দেখা নেই। উরসুলা যেদিন জেলে এসে দেখা করে যায় তার সঙ্গে সেদিন সে অনেক ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে এবার বোধহয় মৃত্যু জানান দিয়ে আসবে না, কারণ সেটাতো আর দৈবের ওপর নির্ভর করছে না, করছে তার ঘাতকদের ইচ্ছের ওপর। ঘায়ের ব্যথায় জেরবার হয়ে রাতটা সে জেগেই কাটায়। ভোরের সামান্য আগে হলঘরে পায়ের আওয়াজ কানে আসে তার। আপনমনে সে বলে ওঠে, 'ওই যে ওরা আসছে।' তখন কোনো কারণ ছাড়াই হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কথা মনে পড়ে যায় তার, বিষণ্ন সেই সকালে চেস্টনাট গাছের নিচে বসে যে কিনা তারই কথা ভাবছে এই মুহূর্তে। কোনোরকম ভয় বা স্মৃতিকাতরতার অনুভূতি হয় না তার, বরং যতো কিছু সে অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে এসেছে এই কৃত্রিম মৃত্যুটা সে-সবের শেষটা তাকে দেখতে দেবে না এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা মনে হতেই একটা অন্ধ, তীব্র ক্রোধ হয় তার। দরজাটা খুলে যায়, এক মগ কফি নিয়ে এক সেন্ট্রি ঘরে ঢোকে। পরের দিন ঠিক এই সময়ে সে ঠিক এই কাজটাই করতে থাকে, কাতরাতে থাকে বগলের ব্যথায় আর তখনো ঠিক একই ঘটনাই ঘটে। বৃহস্পতিবার সে রক্ষীদের সঙ্গে মিষ্টি দুধের মিছরি ভাগাভাগি করে খায়, গায়ে চাপায় আঁটো, পরিষ্কার জামা-কাপড়গুলো আর পাকা চামড়ার বুটজুতো জোড়া। শুক্রবারেও দেখা যায় ওরা মারে না তাকে।

আসলে মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করার সাহস পাচ্ছিলনা ওরা। শহরটার জঙ্গীভাব দেখে সামরিক বাহিনীর লোকজন বুঝে গিয়েছিল যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করলে শুধু মাকোন্দোতেই নয় জলাভূমির গোটা এলাকা জুড়েই ভয়ানক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, কাজেই প্রাদেশিক রাজানীতে কর্তৃপক্ষের যেসব লোকজন আছে তাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে তারা। শনিবার রাতে ওরা যখন উত্তরের অপেক্ষা করছে, ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারো কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে কাতারিনোর ওখানে যায়। কেবল একটি রমণীই তাদেরকে নিজের ঘরে নিতে সাহস করে, যদিও কাজটা সে করে আসলে ভয় পেয়ে। ক্যাপ্টেনের কাছে সে স্বীকার করে, 'আসলে যে-লোকের ওপর মরণ এসে ভর করেছে বলে তাদের ধারণা তার সঙ্গে বিছানায় যেতে কেউ রাজি নয়। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটবে তা কেউ না জানলেও, প্রত্যেকেই একটা কথা বলে বেড়াচ্ছে যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার গায়ে যে-লোক গুলি চালাবে সে তো বটেই, সেই স্কোয়াডের সব সৈন্য নির্বিচারে খুন হয়ে যাবে এক এক করে, দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে, তা তারা যদি দুনিয়ার শেষ মাথায় গিয়েও লুকোয় তা-ও।' ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারো কথাটা অন্য অফিসারদের কানে তুললে তারা গিয়ে বলে তাদের ওপরওয়ালাদের। মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করার দায়িত্ব এড়াবার জন্যে অফিসাররা যে-কোনো ওজর-অজুহাত দেখাবার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছে এরকম একটা কথা রোববার সারা শহরে চাউর হয়ে যায়, যদিও সেটা কেউ আগে থেকে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়নি বা সামরিক বাহিনীর কোনো অ্যাকশনের কারণে সেই সময়কার চাপা উত্তেজনাভরা শান্ত অবস্থায় কোনো চিড় ধরেনি। সোমবারের ডাকে আসে সরকারি আদেশটা: চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। সেই রাতে একটা টুপির ভেতর সাত টুকরো কাগজ ফেলে অফিসাররা, আর ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারোর অশান্তিভরা ললাটলিখন আগেভাগেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার নাম লেখা কাগজের টুকরোটার মধ্যে। তিতিবিরক্ত গলায় সে বলে ওঠে, 'কপালপোড়ার জীবনে কি আর ভালো কিছু জোটে কখনো! আমি জন্মেছিলাম কুত্তার বাচ্চা হয়ে, মরবোও কুত্তার বাচ্চা হয়ে।' ভোর পাঁচটার সময় লটারি করে ফায়ারিং স্কোয়াডের সদস্যদের বেছে নেয় সে, তাদের এনে দাঁড় করায় উঠোনের মধ্যে, তারপর অপরাধী লোকটাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে আগাম হুঁশিয়ারী দিয়ে।

বলে, 'চল হে বুয়েন্দিয়া, যাওয়া যাক, সময় হয়ে এসেছে আমাদের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্নেল জবাব দেয়, 'ও, ব্যাপারটা তাহলে এই। আমি তো স্বপ্ন দেখছিলাম আমার ফোঁড়াগুলো ফেটে গেছে।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে গুলি করে মারা হবে শুনে রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠে রেবেকা বুয়েন্দিয়া। আধ খোলা জানলা দিয়ে গোরস্থানের দেয়ালটার দিকে চোখ রেখে শোবার ঘরের অন্ধকারে বসে থাকে সে হোসে আর্কাদিওর নাসিকা গর্জনে কাঁপতে থাকা খাটটার ওপর। পিয়েত্রো ক্রেসপির চিঠির আশায় যে-গোপন একাগ্রতা নিয়ে নানান সময়ে সে বসে থাকতো, ঠিক সেইভাবে গোটা হপ্তা অপেক্ষা করেছে সে। হোসে আর্কাদিও তাকে বলেছে, 'ওরা ওকে এখানে মারবে না। মারবে মাঝরাতে ব্যারাকের মধ্যে, যাতে কেউ জানতে না পারে ফায়ারিং স্কোয়াডে কে কে ছিল। আর তারপর ওরা ওকে ওইখানেই গোর দেবে।' কিন্তু রেবেকা অপেক্ষা করেই থেকেছে। বলেছে, 'ওরা এমনই গর্দভ যে এখানেই মারবে।' এতোটাই নিশ্চিত ছিল সে যে দরজা খুলে হাত নেড়ে কিভাবে সে তাকে বিদায় জানাবে সেটাও সে আগে ভাগে দেখতে পেয়েছে। তারপরেও হোসে আর্কাদিও জোর গলায় বলেছে, 'ছয়জন ডরপুক সৈন্য নিয়ে ওরা ওকে রাস্তার ওপর দিয়ে আনবে না, বিশেষ করে যখন ওরা জানে যে লোকজন একটা কিছু বাঁধিয়ে দেয়ার জন্যে একবারে মুখিয়ে আছে।' স্বামীর যুক্তিবিদ্যায় আমল না দিয়ে রেবেকা জানলার পাশেই বসে থাকে।

সে বলেছে, 'তুমি দেখো, ওরা ঠিক অমনই গর্দভ।'

মঙ্গলবার সকাল পাঁচটার সময় রেবেকা যখন জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের পতন রোধ করতে বিছানার সামনের অংশে মাথা ঠেকায়, হোসে আর্কাদিও ততক্ষণে কফি খেয়ে কুকুরগুলো ছেড়ে ফিরেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে ওঠে, 'ঐ যে, ওরা নিয়ে আসছে ওকে। দেখতে যে কী সুন্দর ও।' জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভোরের আলোয় কেমন কাঁপতে থাকা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দেখতে পায় হোসে আর্কাদিও। এরিমধ্যে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে তাকে। বগলের দগদগে ঘায়ের কারণে হাত দুটো নামানো যাচ্ছে না বলে ও-দুটো নিতম্বের ওপর রাখা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে ওঠে, 'মানুষ কী চোদাটাই না চোদে নিজেকে। এমনই চোদা চোদে যে ছয়টা রোগাপটকা হোগা-মারানীও তাকে মেরে ফেলতে পারে, অথচ সে কিচ্ছু করতে পারে না।' এমন রেগেমেগে সে আবার কথাটা বলে যে মনে হয় কথা নয়, গরম হল্‌কা সেটা, আর সে প্রার্থনা করছে মনে করে ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারো-র মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। স্কোয়াডের লোকেরা যখন বন্দুক তাক করে ততক্ষণে তার সেই রাগটা এমনই এক আঠাল আর তিক্ত জিনিসে পরিণত হয় যা কিনা তার জিভটাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, আর চোখ দু'টিকে দেয় বুজিয়ে। আর তখনই ভোরের রুপোলী আভা উবে যায়, নিজেকে সে দেখতে পায় খাটো পাতলুন পরা আর গলায় টাই পরা অবস্থায়, দেখতে পায় এক চমৎকার বিকেলে তার বাবা তাকে নিয়ে যাচ্ছে একটা তাঁবুর ভেতর, আর তারপরই সে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই বরফ। চিৎকারটা যখন তার কানে আসে সে ভাবে ওটা বুঝি স্কোয়াডের উদ্দেশ্যে দেয়া চূড়ান্ত আদেশ। কৌতূহলের একটা শিহরণ নিয়ে চোখ খুলে ফেলে সে বুলেটের ভাস্বর আবক্র পথটার মুখোমুখি হওয়ার আশায়, কিন্তু তার বদলে সে দেখতে পায় শূন্যে হাত তুলে রাখা ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারো আর রাস্তা পার হতে থাকা হোসে আর্কাদিওকে, তার হাতে ভয়ংকর একটা শট গান, গুলি ছোঁড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে।

হোসে আর্কাদিওর উদ্দেশে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, 'গুলি ছুঁড়ো না। ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তোমাকে।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হয়ে যায় আরেক যুদ্ধ। ক্যাপ্টেন রোক কার্নিসারো আর তার ছয় সঙ্গী কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে রওনা হয়ে যায় রিয়োহাচায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী জেনারেল ভিক্তোরিও মেদিনাকে মুক্ত করতে। মাকোন্দো পত্তন করবার সময় হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যে-পথ ধরে গিয়েছিল সেই পথ ধরে গেলে সময় বাঁচাতে পারবে মনে করে তারা, কিন্তু এক হপ্তা পার হওয়ার আগেই ওরা বুঝে যায় যে কাজটা অসম্ভব। পাহাড়ের গায়ে তৈরি হওয়া বাড়তি অংশের ওপর বিপজ্জনক পথ দিয়েই এগোতে হয় তাদের, সঙ্গে গোলাবারুদ বলতে ঐ ফায়ারিং স্কোয়াডের ওগুলোই। শহরের কাছাকাছি ছাউনি ফেলতো ওরা, তারপর তাদের মধ্যে একজন ছোট্ট সোনার মাছ নিয়ে ছদ্মবেশে একেবারে ভর দিনের আলোতেই চলে যেত ঘাপটি মেরে থাকা উদারপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, যারা পরদিন সকালে শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসতো না। একটা শৈলশিরা থেকে যখন রিওহাচা ওদের নজরে পড়ে, তার আগেই জেনারেল ভিক্তোরিও মেদিনাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার লোকেরা তাকে জেনারেল হিসেবে ক্যারিবিয়ান উপকূলের বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া পদটা মেনে নিলেও পদোন্নতিটা ফিরিয়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে স্থির করে রক্ষণশীলরা যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন সে ওটা গ্রহণ করবে না। তিন মাসের মধ্যে হাজারখানেক লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সক্ষম হয় তারা, কিন্তু তাদেরকে নিকেশ করে ফেলা হয়। যারা বেঁচে যায় তারা গিয়ে হাজির হয় পুব সীমান্তে। তাদের সম্পর্কে এরপর যে-খবরটা শোনা যায় তা হল অ্যান্টিলিজ-এর ছোটখাট দ্বীপ থেকে এসে তারা কাবো দে লা ভেলা-য় গিয়ে পৌছেছে, আর ওদিকে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মৃত্যুর একটা খবর সরকারের তরফ থেকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সব জায়গাতে ছড়িয়ে দেয়া হয় আর সেই সঙ্গে এক উল্লাসভরা ঘোষণায় সারা দেশে জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ঠিক দু'দিন পরেই সেই আগের টেলিগ্রামটাকে প্রায় পেছনে ফেলে অগুনতি টেলিগ্রাম দক্ষিণের সমভূমিতে আরেকটা বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। আর এভাবেই সর্বব্যাপী কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কিংবদন্তীর সূত্রপাত ঘটে। একই সঙ্গে আসা কিন্তু পরস্পরবিরোধী খবরগুলোর একটা যদি জানায় ভিলানুভায় সে জয়ী হয়েছে, অন্যটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে গুয়াকামাইয়া-তে সে হেরে গেছে, আরেকটায় বলা হয় সে মাতিলোঁ ইন্ডিয়ানদের পেটে চলে গেছে, বা আরেকটাতে জানানো হয় জলার এক গ্রামে সে মারা গেছে, আবার কোনোটাতে হয়ত খবর আসে উরুমিতায় সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ওদিকে কংগ্রেসে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তখন দরকষাকষিতে ব্যস্ত উদারপন্থী নেতারা, তারা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে স্রেফ এক হুজুগে ভাগ্যান্বেষী আখ্যা দিয়ে জানিয়ে দেয় সে তাদের দলের কেউ নয়। জাতীয় সরকার তাকে ডাকাতের কাতারে ফেলে তার মাথার জন্যে পাঁচ হাজার পেসো দাম ধার্য করে। ষোল বার পরাজয়ের পর অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত দু'হাজার রেড ইন্ডিয়ান নিয়ে গুয়াজিরা ত্যাগ করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, আর সবাই যখন ঘুমিয়ে এ-রকম এক অপ্রস্তুত অবস্থায় দখল করে নেয়া সেনাছাউনির সৈন্যরা পালিয়ে যায় রিয়োহাচা ছেড়ে। ওখানেই নিজের সদরদফতর বসিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে সে। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া প্রথম বার্তায় হুমকি দেয়া হয় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে তার বাহিনী নিয়ে পুব সীমান্তের দিকে চলে না গেলে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। চেহারায় প্রচণ্ড কষ্টের ছাপ নিয়ে তার তখনকার সেনাধ্যক্ষ কর্নেল রোক কার্নিসেরো টেলিগ্রামটা তার হাতে ধরিয়ে দেয়, কিন্তু সেটা পড়ে অভূতপূর্ব খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে।

আনন্দের সঙ্গে সে বলে ওঠে, 'কী চমৎকার! মাকোন্দোতে এখন আমাদের টেলিগ্রাফ অফিস-ও আছে দেখছি।'

রীতিমত এসপার-ওসপার করা ভাষায় জবাব পাঠিয়ে দেয় সে। তিন মাসের মধ্যে মাকোন্দোতে নিজের সদর দফতর স্থাপনের আশা রাখে সে। সেই সময় যদি সে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে জীবিত দেখতে না পায় তাহলে তখন জেনারেল থেকে শুরু করে তার হাতে বন্দি সমস্ত অফিসারকে গুলি করে মেরে ফেলবে সে, আর সেই সঙ্গে সে তার অধীনস্তদেরও একই কাজ করার আদেশ দেবে যুদ্ধের বাকি সময়ের জন্যে। তিন মাস পর বিজয়ীর বেশে মাকোন্দোতে ফিরে জলাভূমির রাস্তাটার ওপর প্রথম যে-আলিঙ্গনে সে ধরা পড়ে সেটা কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস-এর।

বাড়িটা তখন বাচ্চা-কাচ্চায় ভরভরন্ত। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদকে তার বড় মেয়ে আর আর্কাদিও মারা যাওয়ার পাঁচ মাস পরে জন্ম নেয়া দুটো যময বাচ্চাসহ ঘরে তুলে নিয়েছিল উরসুলা আগেই। বেচারার শেষ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই উরসুলা মেয়েটার নাম রেখেছে রেমেদিওস। বলেছে, 'আমি ঠিক জানি, আর্কাদিও ওটাই বোঝাতে চেয়েছিল। ওকে উরসুলা বলে ডাকবো না আমরা, কারণ ওই নাম রাখলে তার ভোগান্তির শেষ থাকে না।' যমজ দু'জনের নাম রাখা হয়েছে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো আর অরেলিয়ানো সেগান্দো। আমারান্তাই ওদের সবার দেখাশোনার ভার নিয়েছে। বসার ঘরে কিছু ছোট ছোট চেয়ার পেতে পাড়া-পড়শিদের বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে একটা নার্সারি স্কুল খুলেছে সে। আতশবাজি আর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘণ্টাধ্বনির ভেতর যখন কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ফিরে আসে, বাচ্চাদের একটা কোরাস তাকে বাড়িতে স্বাগত জানায়। আর তার দাদার মতো লম্বা হয়ে ওঠা অরেলিয়ানো হোসে বিপ্লবী অফিসারের মতো পোশাক পরে সামরিক কেতায় সম্মান জানায় তাকে।

সব খবরই যে ভালো তা অবশ্য নয়। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া উধাও হয়ে যাওয়ার এক বছর পর হোসে আর্কাদিও আর রেবেকা গিয়ে উঠেছিল আর্কাদিওর বানানো একটা বাড়িতে। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার সময় হোসে আর্কাদিও-ই যে বাধা দিয়েছিল সেটা অবশ্যি কেউ জানতো না। উঠোনের সবচেয়ে ভালো জায়গায়, এক কোনায়, একটা অ্যালমন্ড গাছ–তিনটে রেডব্রেস্ট পাখি সেটার কৌলীণ্য বাড়িয়েছে–সেই গাছের ছায়ার নিচে তৈরি করা নতুন বাড়িটায় এক আতিথ্যপরায়ণ নীড় বাঁধে তারা, সে-বাড়িতে অতিথিদের আসা-যাওয়ার জন্যে বরাদ্দ থাকে বড় একটা দরজা আর আলো-হাওয়ার অবাধ যাতায়াতের জন্যে চারটে জানলা। বেগনিয়া ফুলে ভরা বারান্দায় সেলাই-ফোঁড়াইয়ের যে-আসরে বহু বছর আগে বাধা পড়েছিল, সেটাকে ফের চালু করে রেবেকার পুরনো সঙ্গী-সাথীরা, তাদের মধ্যে মসকোত পরিবারের এখনো কুমারী চার বোনও রয়েছে। জবরদখল করা জমিগুলো থেকে হোসে আর্কাদিও লাভ পেতে থাকে, কারণ রক্ষণশীল সরকার তার মালিকানা স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রতিদিন বিকেলবেলা দেখা যেত ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরছে সে, সঙ্গে আছে তার শিকারী কুকুরগুলো আর তার দোনলা শটগানটা, সেই সঙ্গে জিনের সঙ্গে বাঁধা আছে একছড়া খরগোশ। এক সেপ্টেম্বরে বিকেলে, ঝড় আসতে পারে এই ভয়ে অন্যসব দিনের চেয়ে আগে আগেই বাড়ি ফিরে আসে সে। খাবার ঘরে রেবেকার সঙ্গে দেখা হতে তাকে সম্ভাষণ জানায়, আঙিনায় বেঁধে রাখে কুকুরগুলো, নুন মাখানোর জন্যে রান্নাঘরে ঝুলিয়ে রাখে খরগোশগুলোকে, তারপর শোবার ঘরে চলে যায় কাপড় বদলাতে। রেবেকা পরে জানায় তার স্বামী যখন শোবার ঘরে ঢোকে সে তখন ছিটকিনি বন্ধ অবস্থায় গোসলখানার ভেতর, কিছুই তার কানে আসেনি। কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি, আর তাছাড়া যে-লোকটা তাকে সুখেই রেখেছিল তাকে রেবেকা কেন খুন করতে যাবে সেটাও কেউ খুঁজে পায়নি। এটাই সম্ভবত মাকোন্দোর একমাত্র রহস্য কোনোদিন যার জট খোলেনি। তো, হোসে আর্কাদিও শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেবার পরই সারা বাড়ি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে পিস্তলের একটা গুলির শব্দে। দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের একটা ধারা, পার হয়ে যায় বসার ঘর, বেরিয়ে যায় রাস্তায়, উঁচুনিচু চত্বরগুলোর ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলতে থাকে একটা সরলরেখা তৈরি করে, নেমে যায় সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে, উঠে পড়ে বেড়ার ওপর, তুর্কীদের সড়ক ধরে এগিয়ে চলে, এক কোনায় এসে ঘুরে যায় ডান দিকে, তারপর বাঁয়ে, বুয়েন্দিয়াদের বাড়ির কাছে এসে একটা সমকোণ তৈরি করে ভেতরে ঢুকে পড়ে বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে, মাদুরে যাতে দাগ না লাগে সেজন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে বৈঠকখানা পেরিয়ে যায়, পড়ে গিয়ে আরেক বৈঠকখানায়, খাবারঘরের টেবিলটা এড়ানোর জন্যে বেমক্কা রকমের একটা বাঁক নেয়, বেগনিয়াভরা বারান্দা ধরে এগিয়ে চলে গড়িয়ে, অরেলিয়ানো হোসেকে পাটিগণিত শেখানোয় ব্যস্ত আমারান্তার অলক্ষ্যে চলে যায় চেয়ারের নিচ দিয়ে, ভাঁড়ার ঘর পেরিয়ে, তারপর বেরিয়ে আসে রান্নাঘরে, যেখানে রুটি তৈরি করার জন্যে ছত্রিশটা ডিম ভাঙার জন্যে তৈরি হচ্ছিল উরসুলা।

সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'ও মা মেরি!'

রক্তের ধারাটা বেয়ে উল্টো দিক বরাবর হাঁটতে শুরু করে সে, ওটা কোথা থেকে এলো সেই খোঁজে ভাঁড়ার ঘর হয়ে চলে আসে বেগনিয়াভরা বারান্দায়, যেখানে অরেলিয়ানো হোসে আওড়াচ্ছিল তিন যোগ তিন ছয় আর ছয় যোগ তিন নয়, পেরিয়ে আসে খাবার ঘর আর সব ক'টা বসার ঘর, তারপর রাস্তা ধরে চলতে থাকে নাক বরাবর, তারপর প্রথমে ডানে পরে বাঁয়ে ঘুরে পড়ে গিয়ে তুর্কীদের সড়কে, খেয়ালই নেই যে গায়ে তার বেকিং এপ্রন আর পায়ে বাড়িতে পরার চপ্পল, ওদিকে ততক্ষণে সে চলে এসেছে স্কোয়ারে, ঢুকে পড়েছে এমন এক বাড়িতে যেখানে সে কখনো পা দেয়নি, তারপর শোবার ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলতেই তার দমবন্ধ হয়ে আসে পোড়া বারুদের গন্ধে, দেখতে পায় এই মাত্র খুলে রাখা মোজার ওপর মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে হোসে আর্কাদিও, আরো দেখতে পায় সেই রক্তের ধারার উৎস তার ডান কানটা, যদিও ততক্ষণে সেখান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তার শরীরের কোথাও কোনো ক্ষত খুঁজে পায় না, পাওয়া যায় না সেই অস্ত্রটাও। তাছাড়া লাশের গা থেকে বারুদের গন্ধটাও দূর করা সম্ভব হয়না; প্রথমে সাবান আর একটা গা-ঘষার বুরুশ দিয়ে ওকে তিনবার গোসল করানো হয়, তারপর প্রথমে নুন আর ভিনেগার, পরে ছাই আর লেবু দিয়ে শরীরটা ঘষে ওকে ক্ষারজাতীয় একটা কড়া তরল পদার্থের একটা পিপার মধ্যে ভরে ছয় ঘণ্টা রেখে দেয়া হয়। হোসে আর্কাদিওর শরীরটা ওরা এমন ঘষাই ঘষে যে তার গায়ের সেই উল্কির আরবি নকশা পর্যন্ত আবছা হতে শুরু করে। শেষে যখন একটা মরিয়া চেষ্টা হিসেবে ওরা হোসে আর্কাদিওকে মরিচ, জিরা, আর জলপাই পাতা দিয়ে সীজনিং করে অল্প আঁচে দিনভর ওর শরীরটা সিদ্ধ করার কথা ভাবছে, ততক্ষণে তার শরীরে পচন ধরতে শুরু করেছে। ফলে তাড়াহুড়ো করে ওরা তাকে কবর দিতে বাধ্য হয়। বিশেষভাবে তৈরি করা সাড়ে সাত ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া একটা কফিনের ভেতর ওরা ওকে এমনভাবে সীলবন্দি করে রেখে দেয় যাতে ভেতরে এক বিন্দু বাতাসও ঢুকতে না পারে; কফিনটার ভেতর দিকটা লোহার পাত দিয়ে মজবুত করা, আর সেটা লাগানো হয় ইস্পাতের বল্টু দিয়ে, কিন্তু তারপরেও, যেসব রাস্তা ধরে শবযাত্রাটা যায় সে-সব রাস্তায় গন্ধটা ঠিকই টের পাওয়া যায়। পাদ্রী নিকানোরের প্লীহা বড় হয়ে ঢোলের মতো টানটান হয়ে গিয়েছিল, বিছানায় শুয়েই তিনি আশীর্বাদ করেন তাকে। পরের কয়েক মাসের মধ্যেই যদিও কবরটার চারপাশে দেয়াল তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে চাপ চাপ ছাই কাঠের গুঁড়ো আর চুন ফেলে ওরা, কিন্তু তারপরেও বহু বছর ধরে গোরস্থানে বারুদের গন্ধ রয়ে যায়, আর গন্ধটা দূর হয় কেবল তখনই যখন কলা কম্পানির এঞ্জিনীয়াররা কংক্রিটের একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয় কবরটা। লাশটা লোকজন নিয়ে যেতেই রেবেকা তার বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে জ্যান্ত কবর দেয়, ঘৃণার এমন এক পুরু চাদরে নিজেকে ঢেকে রাখে যে ইহজগতের কোনো প্রলোভনই সেটাকে সরাতে পারেনি। একবারই শুধু, তখন তার অনেক বয়েস, বাইরে বেরিয়ে এসেছিল রেবেকা, রং চটা রুপালি জুতো আর ছোট ছোট ফুলের তৈরি একটা টুপি পরে, যেবার সেই ভবঘুরে ইহুদি শহরটার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় এমনই এক তীব্র তাপপ্রবাহ নিয়ে এসেছিল যে পাখিগুলো সব জানলার পর্দা ফুঁড়ে মরতে আসতো শোবার ঘরে। তার বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার কসরত করতে থাকা এক চোরকে যেদিন সে এক গুলিতে খতম করে দেয় সেদিনের পর কেউই আর তাকে জীবিত অবস্থায় দেখেনি। তার চাকরানি আর বিশ্বস্ত সঙ্গী আর্জেনিদা ছাড়া কারো সঙ্গেই তার কোনো যোগাযোগ থাকে না এরপর থেকে। এক সময় জানা যায় বিশপকে নিজের জ্ঞাতি ভাই বলে দাবি করে তাকে চিঠি লিখছে সে, কিন্তু তিনি তার কোনো চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন কিনা সেকথা কোনোদিনই জানা যায়নি। শহরের লোকজন ভুলেই যায় তার কথা।

বিজয়ীর বেশে ফিরে এলে কী হবে, অবস্থাগতিক দেখে খুব একটা উৎসাহ বোধ করে না কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই সরকারপক্ষীয় সৈন্যরা তাদের অবস্থান থেকে হঠে যায়, আর তাতে উদারপন্থী জনসাধারণের ভেতর বিজয়ের একটা বিভ্রমের সৃষ্টি হয় যেটা নষ্ট করাটা সঙ্গত বোধ না হলেও আসল কথাটা বিপ্লবীরা ঠিকই জানতো, আর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া জানতো যে-কারো চাইতে বেশি। তার অধীনে তখন পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক আর দু-দুটো উপকূলীয় রাষ্ট্র থাকলে কী হবে, তার কাছে মনে হতো তাকে বুঝি সমুদ্রের ধারে পিঠ ঠেকিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, আর সে এমন এক হতবিহ্বলকর অবস্থার মধ্যে আটকা পড়ে আছে যে যখন সে সামরিক বাহিনীর কামানের গোলায় ভেঙে যাওয়া গির্জার চূড়াটা মেরামতের আদেশ দেয়, পাদ্রী নিকানোর তখন তাঁর রোগশয্যা থেকে মন্তব্য করেন, 'ব্যাপারটা হাস্যকর। যীশুর বিশ্বাসের যারা রক্ষক তারাই গির্জা ধ্বংস করে, ওদিকে ম্যাসনরা সেটাকে মেরামতের হুকুম দেয়।' পালাবার একটা ফুটো খুঁজে পাওয়ার আশায় টেলিগ্রাফ অফিসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্যসব শহরের কমান্ডারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে সে, আর প্রতিবারই সেখান থেকে এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বের হয় আসে যে যুদ্ধ একটা অচলাবস্থায় এসে ঠেকেছে। যখন উদারপন্থীদের টাটকা সব বিজয়ের খবর এসে পৌঁছুতে থাকে তখন সেগুলো উল্লাসভরা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে উদযাপন করা হয়, কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সে-সব বিজয়ের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করতো মানচিত্র দেখে দেখে, আর তখন সে দেখতে পেতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বাহিনী মশককুল আর ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে, এগোচ্ছে বাস্তবতার উল্টো দিক বরাবর। তার অফিসারদের কাছে সে অনুযোগের সুরে বলতো, 'সময় নষ্ট করছি আমরা। আমরা সময় নষ্ট করছি আর ওদিকে পার্টির হারামজাদাগুলো কংগ্রেসের আসনের জন্যে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।' যে-ঘরটায় বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় একসময় কড়িকাঠ গুনেছিল সে সেখানেই একটা দোলখাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে, রাত জেগে জেগে, পঁচানব্বই ডিগ্রি তাপমাত্রার ভেতর বসে মশা তাড়াতে তাড়াতে, ভয়াবহ যে-সকালে তাকে তার লোকদেরকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিতে হবে সেই সকালের এগিয়ে আসাটা উপলব্ধি করতে করতে মনের চোখে সে দেখতো কালো পোশাক পরা উকিলেরা কোটের কলার কান অব্দি তুলে দিয়ে হাত ঘষতে ঘষতে আর ফিসফিসিয়ে কথা বলতে বলতে ভোরবেলার বরফের মতো ঠাণ্ডার মধ্যে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর তারপর আশ্রয় নিচ্ছে গিয়ে ভোরবেলার নিরস কাফেগুলোয়, যাতে প্রেসিডেন্ট যখন হ্যাঁ বলেছিলেন তখন তিনি কী বুঝিয়েছিলেন বা যখন তিনি না বলেছিলেন তখনই বা কী বুঝিয়েছিলেন সেটা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাববার একটা অবকাশ পাওয়া যায়, এমনকি এটাও কল্পনা করা যায় যে প্রেসিডেন্ট যখন একেবারে ভিন্ন কথা বলেছিলেন তখন তিনি কী ভাবছিলেন।

অনিশ্চয়তাভরা এক রাতে, পিলার তারনেরা যখন উঠোনে বসে গান গাইছে সৈন্যদের সঙ্গে, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাকে তার ভবিষ্যৎ দেখতে বলে তাসের ভেতর। 'নিজের মুখের ব্যাপারে সাবধান থেকো,' বার তিনেক তাসগুলো ছড়িয়ে আর তুলে নিয়ে সাকুল্যে কেবল এইটুকুই বলতে পারে পিলার তারনেরা। 'আমি ঠিক জানি না এর মানে কী, কিন্তু লক্ষণটা খুব পষ্ট। নিজের মুখটার ব্যাপারে সাবধানে থেকো তুমি।' দু'দিন পর এক আর্দালিকে কে যেন এক মগ কালো কফি দেয়, আর্দালি সেটা দেয় আরেকজনকে, আর সে আরেকজনকে যতক্ষণ পর্যন্ত না হাতে হাতে সেটা পৌঁছে যায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার অফিসে। কফি সে খেতে চায়নি, কিন্তু হাতের কাছে পেয়ে যাওয়াতে সেটা খেয়ে ফেলে সে। ওটার মধ্যে এতো নাক্স ভমিকা মেশানো ছিল যে তা একটা ঘোড়ার দফা রফা করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। লোকজন যখন ধরাধরি করে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন তার শরীরটা শক্ত আর বাঁকা হয়ে গেছে, জিভটা বেরিয়ে এসেছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে। তাকে নিয়ে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় উরসুলাকে। বমনোদ্রেককারী ওষুধ খাইয়ে পেটটা সাফ করার পর গরম একটা কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে দেয় সে, আর তারপর পরপর দু'দিন ধরে খাইয়ে যায় ডিমের সাদা অংশটা, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিধ্বস্ত শরীরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ফিরে আসে। চতুর্থ দিনে বিপদমুক্ত হয় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। উরসুলা আর অন্যদের চাপাচাপিতে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আরেক হপ্তা বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয় তাকে। কেবল তখনি সে জানতে পারে তার কবিতাগুলো পোড়ানো হয়নি। উরসুলা তাকে বলে, 'আমি তাড়াহুড়ো করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইনি। সেদিন রাতে চুলো জ্বালাবার সময় আমি নিজেকে বলেছিলাম ওরা ওর লাশটা না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ভালো হবে।' রেমেদিওসের ধুলোপড়া পুতুলগুলোর মাঝে ভালো হয়ে ওঠার ঘোর-লাগা সময়টাতে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো ফিরিয়ে আনে নিজের কবিতা পড়ে পড়ে। আবার লিখতে শুরু করে সে। পরিণতিহীন একটা যুদ্ধের চমকগুলোর প্রান্তসীমায় ভারসাম্য বজায় রাখতে রাখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছন্দোবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে মৃত্যুর তীরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতার একটা ছবি আঁকে সে। তখন তার চিন্তা ভাবনাগুলো এতো স্বচ্ছ হয়ে আসে যে সেগুলো উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখাটা সহজ হয়ে পড়ে তার জন্যে। এক রাতে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে সে জিজ্ঞেস করে:

'একটা কথা পরিষ্কার করে বল তো দোস্ত, কেন যুদ্ধ করছিস তুই?'

'কেন আবার? মহান উদারপন্থী দলের জন্যে।' কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস উত্তর দেয়।

'তুই ভাগ্যবান, কারণ তুই জানিস তুই কেন যুদ্ধ করছিস,' কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে। 'আমার কথা যদি বলিস তো বলবো যে এই মাত্র টের পেলাম আমি যুদ্ধ করছি অহংকারের কারণে।'

'সেটাতো খারাপ কথা,' কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস বলে।

তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে কৌতুক বোধ করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। সে বলে, 'তা তো বটেই। কিন্তু তারপরেও, কেন যুদ্ধ করছি সেটা না জানার চেয়ে তো অন্তত ভালো এটা।' এরপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে যোগ করে:

'কিংবা যে জিনিসটার কোনো অর্থই নেই এমন কিছুর জন্যে তোর মতো যুদ্ধ করার চেয়ে।'

দলের নেতারা যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঘোষণাটা তুলে না নেয় যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া একটা ডাকাত বৈ কিছু নয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মসম্মানবোধ তাকে দেশের ভেতরের সশস্ত্র দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়নি। সে অবশ্যি ঠিকই জানতো যে ওসব খুঁতখুঁতে ভাব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেয়ামাত্র যুদ্ধের দুষ্টচক্রটা ভেদ করতে অসুবিধে হবে না তার। সেরে ওঠার এই সময়টা তাকে চিন্তা-ভাবনা করার একটা সময় দেয়। এরপর সে উরসুলাকে রাজি করায় যাতে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির বাকি যে-অংশটা লুকানো আছে সেটা আর তার সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ তার হাতে তুলে দেয়। জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে সে মাকোন্দোর সামরিক ও বেসামরিক নেতা ঘোষণা করে, তারপর চলে যায় দেশের ভেতরের বিদ্রোহী দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস যে কেবল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ারই সবচেয়ে কাছের মানুষ তা নয়, উরসুলাও তাকে পরিবারের একজন হিসেবে বরণ করে নেয়। কোমলস্বভাব, ভীরু, আচার-ব্যবহারে নম্র-সভ্য এই মানুষটি সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচালনার চেয়ে যুদ্ধের জন্যেই বেশি উপযুক্ত। তার রাজনৈতিক উপদেষ্টারা তাকে খুব সহজেই তত্ত্বীয় গোলকধাঁধায় জড়িয়ে ফেলে। তবে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যে গ্রামীণ শান্তি-স্নিগ্ধ পরিবেশের স্বপ্ন দেখতো, যেখানে বসে সে বুড়ো বয়েসে সোনার মাছ বানাতে বানাতে মরতে পারবে, মাকোন্দোতে সেই পরিবেশটা তৈরি করতে সফল হয় কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস। নিজের বাবা-মা-র সঙ্গে থাকলেও হপ্তায় বার দুই তিন সে উরসুলার ওখানেই দুপুরের খাওয়াটা সারতো। অরেলিয়ানো হোসে যাতে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে সে তাকে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় হাতে খড়ি দেয়, দেয় আগাম সামরিক শিক্ষা, আর উরসুলার অনুমতি নিয়ে ওকে নিয়ে মাস কয়েক কাটিয়ে আসে ব্যারাকে। বহু বছর আগে, জেরিনাল্‌দো মার্কেস-এর তখন নিতান্তই বাচ্চা বয়েস, তখনই আমারান্তার প্রতি সে তার অনুরাগ প্রকাশ করেছিল। আমারান্তা তখন পিয়েত্রো ক্রেসপির জন্যে নিভৃত আসক্তিতে এতোই মোহাচ্ছন্ন যে এক রাশ অবজ্ঞার হাসি ছুঁড়ে দিয়েছিল তার দিকে। জেরিনাল্‌দো মার্কেস অপেক্ষা করেছে। একবার জেল থেকে আমারান্তাকে সে একটা চিরকুট পাঠিয়েছিল তার বাবার নামের আদ্যাক্ষর লেখা এক ডজন বাতিস্তে রুমাল সেলাই করে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে। আমারান্তাকে টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। এক হপ্তা পর এক ডজন রুমাল আর টাকাটা নিয়ে জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে যায় আমারান্তা, দু'জনে কয়েক ঘণ্টা কাটায় পুরোনো দিনের কথাবার্তা বলে। আমারান্তা চলে যাওয়ার সময় জেরিনাল্‌দো মার্কেস তাকে বলে, 'এখান থেকে বেরিয়েই তোমাকে বিয়ে করছি আমি।' আমারান্তা হেসে ফেলে ঠিকই, কিন্তু বাচ্চাদের পড়াবার সময় লোকটির কথা ভাবতে থাকে সে, চেষ্টা করে পিয়েত্রো ক্রেসপির জন্যে তার কৈশোরের ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে। শনিবার বন্দিদের সঙ্গে দেখা করবার দিন, সেদিন সে জেরিনাল্‌দো মার্কেসের বাবা-মা যে-বাড়িতে থাকে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে জেলে যেত। সে-রকমই এক শনিবার উরসুলা অবাক হয়ে দেখে চুল্লী থেকে বিস্কুটগুলো বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে আমারান্তা, যাতে সবচেয়ে ভালোগুলো বেছে নিয়ে সেগুলো সে মুড়ে নিতে পরে এই কাজের জন্যেই আলাদা করে নিজের হাতে সেলাই করা একটা ন্যাপকিনে।

উরসুলা তাকে বলে, 'ওকে বিয়ে করে ফ্যাল। ওর মতো আরেকটা পুরুষ খুঁজে পেতে মেলা কষ্ট হবে তোর।'

আমারান্তা ভান করে যেন কথাটা শুনে খুশি হতে পারেনি সে।

সে জবাব দেয়, 'পুরুষ মানুষ শিকার করে বেড়িয়ে কাজ নেই আমার। জেরিনাল্‌দোর জন্যে আমি এই বিস্কুটগুলো নিয়ে যাচ্ছি তার কারণ আজ হোক কাল হোক লোকটাকে গুলি করে মেরে ফেলবে ওরা।'

কোনো কিছু না ভেবেই কথাটা বলে সে, কিন্তু এই সময়েই সরকার ভয় দেখিয়ে ঘোষণা দিয়েছিল বিপ্লবী বাহিনী রিয়োহাচা ছেড়ে না দিলে জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলি করে মেরে ফেলা হবে। শনিবারের সাক্ষাতপর্বটি বন্ধ হয়ে যায়। রেমেদিওস মারা যাওয়ার সময় যে-অপরাধবোধে দগ্ধ হয়েছিল আমারান্তা, সেই একই অপরাধবোধে তাড়িত হয়ে ঘর বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করে সে, যেন তার মুখ ফসকানো কথা আরেকটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হলো। তার মা সান্ত্বনা দেয় তাকে। সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে মৃত্যুদণ্ডাদেশটা যাতে কার্যকর করা না হয় সেজন্যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বিলক্ষণ একটা কিছু করবে, আর সেই সঙ্গে সে আমারান্তাকে কথা দেয়, যুদ্ধ শেষ হলে জেরিনাল্‌দো মার্কেসের নজর কাড়ার চেষ্টাটা সে নিজেই করবে। ভেবে রাখা সময়ের আগেই উরসুলা তার কথা রাখে। সামরিক এবং বেসামরিক প্রধানের নতুন সম্মান নিয়ে জেরিনাল্‌দো মার্কেস এ-বাড়িতে ফিরে এলে উরসুলা তাকে নিজের ছেলের মতো করে বরণ করে নেয়। বাড়িতে তাকে আটকে রাখার জন্যে ভেবে ভেবে বার করে ছোটখাটো চমৎকার চমৎকার কথাবার্তা আর মনে-প্রাণে প্রার্থনা করে চলে ঈশ্বর যেন জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে মনে করিয়ে দেন আমারান্তাকে তার বিয়ে করার পরিকল্পনাটার কথা। প্রার্থনাটা তার কবুল হয়েছে বলেই মনে হয়। যেদিন কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস এ-বাড়িতে দুপুরের খাবার খায় সেদিন সে বেগনিয়া ফুলে ভরা বারান্দায় বসে আমারান্তার সঙ্গে চাইনিজ চেকার খেলে খানিকটা সময় কাটায়। উরসুলা তাদের জন্যে কফি আর দুধ আর বিস্কুট নিয়ে আসে, বাচ্চাগুলো যাতে ওদের দুজনকে বিরক্ত না করে সেজন্যে সে নিজেই তাদের দেখাশোনার ভার নেয়। আমারান্তা কিন্তু সত্যি সত্যি নিজের মনের ভেতর তার তারুণ্যের সেই গভীর প্রণয়ের ভস্ম আবার জ্বালাবার চেষ্টা চালিয়ে যায়। অসহনীয় হয়ে ওঠা উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই দিনগুলোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে যেসব দিনে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস দুপুরে খেতে আসে, অপেক্ষা করে থাকে চাইনিজ চেকার খেলার বিকেলগুলোর জন্যে, আর, হু হু করে সময় কেটে যায় স্মৃতিকাতরতা তৈরি করা নামের অধিকারী এক যোদ্ধার সাহচর্যে, গুটি সরাবার সময় যার আঙুল কেঁপে কেঁপে ওঠে আবছাভাবে। কিন্তু কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস যেদিন আমারান্তাকে বিয়ে করার ইচ্ছেটা আরেকবার জানায়, আমারান্তা তাকে ফিরিয়ে দেয়।

'কাউকেই বিয়ে করছি না আমি,' সে বলে তাকে, 'তোমাকে তো নয়ই। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে তুমি এতো ভালোবাসো যে তুমি আমাকে স্রেফ এই জন্যে বিয়ে করতে চাও যে তুমি ওকে বিয়ে করতে পারবে না।'

কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস ধৈর্যশীল লোক। সে বলে, 'আমি কিন্তু লেগেই থাকবো। আজ হোক কাল হোক তোমাকে আমি রাজি করাবোই।' বাড়িতে আসা ছাড়ে না সে। আমারান্তা তার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনেক কষ্টে গোপন অশ্রু রোধ করে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকে যাতে উরসুলাকে যুদ্ধের সর্বশেষ খবরাখবর দিতে থাকা তার পাণিপ্রার্থীর গলার স্বর শুনতে না হয় তাকে, আর যদিও তাকে দেখার জন্যে তার বুকটা ফেটে যায়, কিন্তু বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করার মতো দুর্বলতার পরিচয় সে দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়টাতে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সময় করে দুই হপ্তা অন্তর একটা বিশদ বিবরণ পাঠাতো মাকোন্দোতে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র একবারই, সে মাকোন্দো ছাড়ার আট মাস পর, উরসুলাকে চিঠি লেখে সে। বিশেষ এক সংবাদবাহক বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসে সীল করা একটা খাম, সেটার ভেতরে কর্নেলের সুচারু হাতে লেখা একটা সাদা পৃষ্ঠা: *বাবার দিকে বিশেষ যত্ন নিয়ো, তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না*। উরসুলা ভয় পেয়ে যায়। সে বলে, 'অরেলিয়ানো জানে বলেই এ-ধরনের কথা বলে।' কাজেই লোকজনের সাহায্যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে তার শোবার ঘরে নিয়ে আসে সে। সে যে কেবল আগের মতো ভারিই আছে তাই নয়, চেস্টনাট গাছের নিচে তার দীর্ঘ অবস্থানকালে সে নিজের ইচ্ছে মতো নিজের ওজন বাড়াবার ক্ষমতা অর্জন করেছে, আর সেটা এমনই রকম যে সাতজন লোক মিলেও তাকে ওঠাতে পারে না, ফলে তাকে টেনে টেনে তার বিছানায় নিয়ে আসতে হয় তাদের। রোদ আর বৃষ্টিতে পোক্ত হয়ে ওঠা দশাসই বুড়ো মানুষটি শোবার ঘরে ঠাঁই নিতেই সেখানকার বাতাস ছেয়ে যায় কোমল ব্যাঙের ছাতা, বুনো ফুলের ছত্রাক, প্রাচীন আর নিবিড় বহিরঙ্গনের সুবাসে। পরদিন সকালে দেখা যায় সে তার বিছানায় নেই। গায়ের তাকৎ তার অটুট রয়ে গেলে কী হবে, বাধা দেবার মতো অবস্থা ছিল না তার। তার কাছে অবশ্য সবই সমান। সে যদি চেস্টনাট গাছের নিচে ফিরে গিয়ে থাকে তবে সেটা এজন্যে নয় যে সে ওখানেই যেতে চেয়েছে, বরং গিয়েছে তার শরীরের অভ্যাসের কারণে। উরসুলা তার যত্ন আত্তি করে, তাকে খাওয়ায়-দাওয়ায়, খোঁজখবর দেয় অরেলিয়ানোর। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, দীর্ঘদিন ধরে একমাত্র যে-লোকটার সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছে সে হচ্ছে প্রুদেনসিও আগিলার। মৃত্যুর ক্ষয়ের হাতে সে-সময় প্রায় গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে পড়া প্রুদেনসিও আগিলার তার সঙ্গে গালগপ্পো করার জন্যে দিনে দু'বার করে চলে আসতো। লড়িয়ে মোরগ নিয়ে কথা হতো দু'জনের মধ্যে। একে অন্যের কাছে তারা ওয়াদা করে চমৎকার সব মোরগের একটা প্রজননন খামার দেবে দু'জনে, সেগুলোর জেতাটা উপভোগ করার জন্যে ততটা নয়—কারণ, সে-সবের আর তখন দরকার নেই তাদের—যতটা মৃত্যুর রাজ্যের একঘেয়ে রোববারগুলোতেও কিছু একটা করার জন্যে। প্রুদেনসিও আগিলার-ই তাকে সাফ-সুতরো করে দিতো, খাওয়া-দাওয়া করাতো, আর অরেলিয়ানো নামের এক লোকের আশ্চর্য সব খবর শোনাতো, লোকটা নাকি কর্নেল, যুদ্ধ করছে। যখন একা থাকতো, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতো অগুনতি কামরার একটা স্বপ্ন দেখে দেখে। স্বপ্নের ভেতর সে দেখতো বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে সে ঢুকে পড়েছে একই রকম দেখতে আরেকটা ঘরে, সেখানে রট আয়রনের প্রান্তঅলা একই রকমের একটা বিছানা, একই রকমের বেতের চেয়ার, আর পেছনের দেয়ালে 'সাহায্যদাত্রী কুমারী'-র একই রকমের একটা ছোট্ট ছবি। সেই ঘর থেকে ঢুকে পড়তো সে একই রকম আরেকটা ঘরে, সেটার দরজা খুলে যেতো সেই একই রকম দেখতে আরেকটা ঘরে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই চলতে থাকতো অন্তহীনভাবে। প্রুদেনসিও আগিলার এসে তার কাঁধটা আলতো করে না ছোঁয়াঅব্দি সমান্তরালভাবে আয়না বসানো গ্যালারির মতো এক কামরা থেকে আরেক কামরা পর্যন্ত চলত তার বিহার। তারপর সে ফিরে আসতো উল্টো পথ ধরে হেঁটে, এক কামরা থেকে আরেক কামরায়, তার আগের চলার পথ ধরে ধরে, আর তারপর প্রুদেনসিও আগিলারকে খুঁজে পেতো তার বাস্তবের কামরায়। কিন্তু এক রাতে, তাকে বিছানায় নেবার দুই হপ্তা পর, মাঝখানের কোনো এক কামরায় প্রুদেনসিও আগিলার তার কাঁধ ছোঁয়, আর সেই কামরাটিকেই বাস্তবের কামরা ভেবে সেখানেই সে থেকে যায় চিরদিনের জন্যে। পরদিন সকালে তার জন্যে নাশতা নিয়ে আসার সময়, উরসুলা দেখে হলঘর ধরে হেঁটে আসছে এক লোক। ছোটখাট, গাট্টাগোট্টা, পরনে কালো স্যুট, মাথার টুপিটাও কালো, আকারে সেটা বিরাট আর লোকটার মৌনী চোখের ওপর টেনে নামানো। আঁতকে উঠে উরসুলা ভাবে, 'হায় ঈশ্বর, আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারতাম, এ মেলকিয়াদেস।' আসলে সে কাতাউর, ভিসিতাসিওঁর ভাই, সেই অনিদ্রারোগের সময় যে পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে আর তারপর যার আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। ভিসিতাসিওঁ তাকে তার ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করতে সে ওদের গুরুগম্ভীর ভাষায় বলে:

'রাজার শেষকৃত্যে যোগ দিতে এসেছি আমি।'

এরপর তারা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে, তার গায়ে ধাক্কা দেয় প্রাণপণে, কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে, নাকের ফুটোর সামনে একটা আয়না ধরে, কিন্তু তারপরেও জাগাতে পারে না তাকে। খানিক পর ছুতোর মিস্ত্রি যখন কফিনের মাপ নিচ্ছে, ওরা জানলা দিয়ে দেখতে পায় ছোট ছোট হলুদ ফুলের ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। নীরব একটা ঝড় হয়ে গোটা শহরে রাতভর ঝরে পড়ে সেই ফুলগুলো, ছেয়ে ফেলে সব বাড়ির ছাদ, আটকে দেয় সব দরজা, দমবন্ধ করে ফেলে বাইরে শুয়ে থাকা সব জীবজন্তুর। এতো ফুল ঝরে পড়ে আকাশ থেকে যে রাস্তাগুলো ঢেকে যায় নিবিড় একটা গালিচার মতো, আর শবযাত্রাটা যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে সেজন্যে ফুলগুলো ওদেরকে সরিয়ে ফেলতে হয় বেলচা আর আঁচড়া দিয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতের দোলকেদারায় বসে, অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজটা কোলের ওপর রেখে আমারান্তা তাকিয়ে আছে অরেলিয়ানো হোসের দিকে, ফেনায় ঢাকা চিবুক নিয়ে চামাটিতে ক্ষুর শান দিচ্ছে সে জীবনে প্রথমবারের মতো দাড়ি কামাবার জন্যে। গালের তিল কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে তার, সোনালী মিহি রোমের একজোড়া গোঁফ বাগাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওপরের ঠোঁটটা কেটে ফেলে সে, কিন্তু পুরো কাজটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে দেখতে ঠিক সে-রকমই লাগে যে-রকম সে আগে ছিল, তবে আয়াসসাধ্য এই প্রক্রিয়াটা সেই মুহূর্তে আমারান্তার মনে যে-অনুভূতির সৃষ্টি করে তা হল সেই মুহূর্ত থেকে তার নিজের বয়স বাড়তে শুরু করেছে।

সে তাকে বলে, 'তোর বয়েসে অরেলিয়ানো দেখতে যেমন ছিল, এখন ঠিক সে-রকমই লাগছে তোকে। রীতিমতো বেটা ছেলে তুই এখন।'

তা সেটা সে হয়েছে অনেকদিন হল, বহু আগের সেই দিনটি থেকেই যেদিন অরেলিয়ানো হোসে তখনো শিশুই আছে মনে করে বরাবরের মতোই তার সামনে কাপড় ছাড়তে শুরু করেছিল আমারান্তা গোসলখানায়, যেমনটা সে করে আসছিল পিলার তারনেরা ওর লালন-পালনের ভার আর হাতে তুলে দেবার সময় থেকেই। অরেলিয়ানো হোসে প্রথম যেদিন ওকে সেই অবস্থায় দেখে সেদিন একমাত্র যে-জিনিসটা তার নজর কেড়েছিল তা হলো তার দুই স্তনের মাঝের গভীর খাঁজটা। তখন সে এমনই ছেলেমানুষ যে সে জিজ্ঞেস করে বসেছিল আমারান্তার ঐ জায়গায়টায় কী হয়েছে। উত্তরে ফারনান্দা আঙুলের ডগা দিয়ে স্তনদুটোর মাঝখানে একটা রেখা টানার ভঙ্গি করে বলেছে, 'ওরা আমার এখানটা খুব করে কেটে দিয়েছে।' এ-ঘটনার কিছুদিন পর সে যখন পিয়েত্রো ক্রেসপির আত্মহত্যার ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে নতুন করে আবার অরেলিয়ানো হোসেকে গোসল করানো শুরু করেছে, তখন কিন্তু সেই খাঁজটা আর নজর কাড়ে না তার, বরং বাদামী বোঁটাঅলা অসাধারণ সেই স্তনদুটো দেখে অদ্ভুত এক কাঁপুনী অনুভব করে সে। আমারান্তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে, আবিষ্কার করতে থাকে তার সান্নিধ্যের জাদু একটু একটু করে, আর আমারান্তার শরীরে পানি লাগলে সেটা কিভাবে কেঁপে কেঁপে ওঠে তা কল্পনা করতে গিয়ে নিজেও সে কেঁপে ওঠে অদ্ভুতভাবে। সেই শিশুকাল থেকেই নিজের দোলখাটিয়ার বদলে আমারান্তার বিছানায় ঘুম থেকে জেগে ওঠায় অভ্যস্ত সে। কিন্তু যেদিন থেকে নিজের নগ্নতা সম্বন্ধে সে সচেতন হয় সেদিন থেকেই যে-জিনিসটা তাকে আমারান্তার মশারির নিচে গুঁড়ি মেরে ঢুকতে বাধ্য করতো তা অন্ধকারের ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, বরং ভোরবেলা আমারান্তার উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করার একটা সুতীব্র বাসনা। যে-সময়ে আমারান্তা কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই সময় একদিন খুব ভোরে দমবন্ধ করা একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে অরেলিয়ানো হোসে। অনুভব করে, আমারান্তার আঙুলগুলো উষ্ণ আর উৎকণ্ঠিত সব কাঁকড়াবিছের মতো তার পেটের ওপর কী যেন খুঁজে ফিরছে। কাজটা আরো সহজ করে দেবার জন্যে সে ঘুমের ভান করেই নিজের শোবার ভঙ্গিটা পাল্টায়, আর তখন তার মনে হয়, কালো পট্টিবিহীন হাতটা তার উৎকণ্ঠার সমুদ্র-শৈবালের ভেতর ঝাঁপ দিয়েছে অন্ধ একটা শামুকের মতো। যদিও মনে হয় যেন ওরা দু'জনেই যা-জানে আর দু'জনেই যে জানে যে অন্যজন ব্যাপারটা জেনে গেছে সেটাকে তারা কোনো আমলই দেয় না, কিন্তু সেই রাত থেকে এক অলঙ্ঘনীয় ঘনিষ্ঠতায় গেঁথে যায় দু'জনে। বৈঠকখানার ঘড়িতে বারোটা বাজার ওঅল্জ না শোনা পর্যন্ত এখন আর বিছানায় শুতে যায় না অরেলিয়ানো হোসে, আর সেই বয়স্থা কুমারী, যার শরীরের চামড়ায় ঢিল পড়তে শুরু করেছে, সে তো এক মুহূর্তও স্বস্তি পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুভব করে যে তার মশারির ভেতর সেই নিশি-পাওয়া ছেলেটা সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছে যাকে সে একথা না ভেবেই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে যে একদিন এই ছেলে তার নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার একটা উপায় হিসেবে দেখা দেবে। পরের দিকে তারা যে কেবল এক সঙ্গে নগ্ন হয়ে ঘুমাতো, নিজেদের ক্লান্ত করে ফেলতো জড়াড়ড়ি করে তাই-ই নয়, বাড়ির নানান কোনাঘুপচিতেও একে অন্যকে তাড়া করে ফিরতো ওরা, আর দিনের যে-কোনো সময় যে-কোনো শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতো নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার একটা স্থায়ী দশা নিয়ে। একদিন বিকেলে উরসুলা যখন গোলাঘরে যায় তখন তো ওরা প্রায় ধরাই পড়ে যাচ্ছিল চুমু খেতে শুরু করার মুহূর্তে। নিরীহ ভঙ্গিতে অরেলিয়ানো হোসেকে উরসুলা শুধোয়, 'ফুপুকে বুঝি তুই খুব ভালোবাসিস?' অরেলিয়ানো হোসে জবাব দেয়, বাসে। 'তাতে তোর ভালোই হবে,' বলে কথার শেষ টেনে রুটির জন্যে ময়দা মাপা শেষ করে রান্নাঘরে ফিরে আসে উরসুলা। এই ঘটনাটাই আমারান্তার উন্মত্ততা ঘুচিয়ে দেয়। সে যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে স্রেফ চুমোচুমির খেলা খেলছে না, বরং খুবই বিপজ্জনক এক শারদীয় কামনায় ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরে এক ঝটকায় সে ছেদ টেনে দেয় ব্যাপারটার। অরেলিয়ানো হোসে তখন তার সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করছে, সে-ও শেষ পর্যন্ত বাস্তবতাটা বুঝতে পেরে ছাউনিতে চলে যায় শোবার জন্যে। প্রতি শনিবার অন্য সব সৈন্যের সঙ্গে সে-ও যেতে শুরু করে কাতারিনোর দোকানে। তার এই হঠাৎ নিঃসঙ্গতার জন্যে, আর তার উৎকণ্ঠিত কল্পনার সাহায্যে অন্ধকারের ভেতর যাদের সে একটি আদর্শায়িত রূপ দান করে আমারান্তায় পরিণত করেছে সেই প্রাণহীন ফুলের সৌরভ ছড়ানো রমণীদের সঙ্গে কাটানো তার অপরিণত বয়োসন্ধির জন্যে একটা সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর অল্প কিছুদিন পরই আসতে থাকে যুদ্ধের নানান পরস্পরবিরোধী খবরাখবর। খোদ সরকার যেখানে বিদ্রোহের অগ্রগতির কথা স্বীকার করে, সেখানে মাকোন্দার অফিসাররা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে যায় যে দরকষাকষির একটা সন্ধি অত্যাসন্ন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে এক বিশেষ দূত এসে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসের কাছে নিজের পরিচয় দেয়। তার কাছে সে এই সত্যটা কবুল করে যে দলের নেতারা দেশের ভেতরের বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে আসলেই একটা চুক্তিতে পৌঁছেছে, আর তারা উদারপন্থীদের জন্যে কেবিনেটে তিনটে পদ, কংগ্রেসে একটা সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব আর অস্ত্র জমা দেয়া বিপ্লবীদের জন্যে সাধারণ ক্ষমার বিনিময়ে একটা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে যাচ্ছে খুব শিগ্‌গিরই। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যুদ্ধ বিরতির শর্তগুলোর সঙ্গে একমত নয়, তার কাছ থেকে দূত লোকটা একটা অতি গোপনীয় আদেশ নিয়ে এসেছে। পাঁচজন সেরা লোক সঙ্গে নিয়ে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসকে দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। হুকুমটা তামিল করতে হবে যারপরনাই গোপনীয়তার সঙ্গে। চুক্তিটা ঘোষিত হওয়ার এক হপ্তা আগে, পরস্পরবিরোধী সব গুজবের একটা ঝড়ের ভেতর, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার দশজন বিশ্বস্ত অফিসার সঙ্গে নিয়ে, তার মধ্যে কর্নেল রোক কার্নিসারো-ও আছে, মাঝরাতের পর চুপিচুপি এসে হাজির হয় মাকোন্দোতে, গ্যারিসনটাকে বাতিল করে দেয়, অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে পুতে ফেলে, আর তারপর নষ্ট করে ফেলে সমস্ত রেকর্ডপত্র। সকাল হতে না হতে উধাও হয়ে যায় তারা, সঙ্গে নিয়ে যায় কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস আর তার পাঁচ অফিসারকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন এক লোক এসে উরসুলার শোবার ঘরের জানলায় টোকা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে যায়, 'কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দেখতে চাইলে এক্ষুনি দরজার কাছে আসুন,' তার আগে ব্যাপারটা টেরই পায় না বৃদ্ধা, এমনই চটপট আর চুপিচুপি সারা হয় অপারেশনটা। লাফ মেরে বিছানা ছেড়ে উঠে রাত পোশাক পরেই দরজার কাছে চলে আসে উরসুলা, আর কেবল এটুকুই দেখতে পায় যে ধুলোর একটা নিঃশব্দ মেঘের ভেতর দ্রুতবেগে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ঘোড়সওয়াররা। পরদিন সকালেই কেবল সে আবিষ্কার করে অরেলিয়ানো হোসে নেই, সে তার বাবার সঙ্গে চলে গেছে।

সরকার আর বিরোধী দলের একটা যুক্ত বিবৃতিতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার দশ দিন পর পশ্চিম সীমান্তে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের খবর আসে। তার ছোট আর প্রায় নিধিরাম সর্দারের মতো দলটা এক হপ্তার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। উদারপন্থী আর রক্ষণশীলেরা সে-বছর দেশের মানুষকে একটা সমঝোতার খবর বিশ্বাস করাতে চাইলে কী হবে, ওই সময়েই কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আরো সাতটা বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করে। এক রাতে একটা স্কুনার থেকে রিওহাচার ওপর বোমা ফেলে সে, আর তার পাল্টা জবাব হিসেবে সবচেয়ে মুখচেনা চৌদ্দজন উদারপন্থীকে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে গুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মেরে ফেলে গ্যারিসনের সৈন্যরা। দুই হপ্তারও বেশি সময় ধরে সীমান্তে একটা কাস্টমস পোস্ট নিজের অধিকারে রাখে সে আর সেখান থেকে জাতির উদ্দেশে ডাক দেয় সাধারণ যুদ্ধের। রাজধানী শহরের বাইরের দিকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হাজার মাইলেরও বেশি বসতিহীন একটা এলাকা পার হওয়ার এক উন্মত্ত প্রচেষ্টায় তার আরেকটা বাহিনী মাস তিনেকের জন্যে হারিয়ে যায় এক জঙ্গলের মধ্যে। একবারতো মাইল পনেরোরও কম দূরে ছিল সে মাকোন্দো থেকে, সরকারী টহলদারদের জন্যে বাধ্য হয়েছিল পাহাড়ে গিয়ে সেই মোহময় এলাকার একেবারে কাছেই লুকোতে যেখানে বহুদিন আগে স্পেনদেশীয় একটা জাহাজের ভগ্নাবশেষ খুঁজে পেয়েছিল তার বাবা।

এই সময়টাতেই মারা যায় ভিসিতাসিওঁ। অনিদ্রার ভয়ে একটা সিংহাসন পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়ে অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করার সৌভাগ্য হয় তার, আর তার শেষ ইচ্ছে ছিল, বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে-টাকাটা সে বিছানার নিচে জমা করেছে সেটা যেন খুঁড়ে বের করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে সে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেগুলো খুঁড়ে বের করার ব্যাপারে কোনো গা করে না উরসুলা, কারণ সে-সময় একটা গুজব রটে যায় যে প্রাদেশিক রাজধানীর কাছে একটা ল্যান্ডিং-এর সময়ে মারা গেছে কর্নেল। সরকারী ঘোষণাটা—দুই বছরের মধ্যে ওটা দ্বিতীয়—সেটাকে সত্যি বলেই ধরে নেয়া হয় ছ'মাস ধরে, কারণ তার সম্পর্কে এরপর আর কিছু শোনা যায়নি। তারপর হঠাৎ করে, উরসুলা আর আমারান্তা যখন অতীত হয়ে যাওয়া শোকের সঙ্গে নতুন শোক যোগ করেছে, তখনই হঠাৎ করে খবর আসে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বেঁচে আছে। কিন্তু অবস্থা দেখে শুনে মনে হয় সে দেশের সরকারকে হেনস্থা করায় ক্ষান্ত দিয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের বিজয়ী ফেডারেলতন্ত্রের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এরপর থেকে নানান নামে, তার স্বদেশ থেকে ক্রমেই আরো দূর দূরান্তরে নানান জায়গায় দেখা যেতে থাকে তাকে। পরে জানা যাবে, সে-সময় তার মাথায় যে পরিকল্পনাটা কাজ করছিল তা হল আলাস্কা থেকে পাতাগোনিয়া পর্যন্ত রক্ষণশীল শাসকগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মধ্য আমেরিকার ফেডারেলিস্ট বাহিনীগুলিকে একত্রিত করা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বিদায়ের বহু বছর পর সরাসরি তার কাছ থেকে উরসুলা প্রথম যে-খবরটা পায় তা হল সান্তিয়াগো কিউবা ঘুরে আসা একা দলামচা পাকানো মলিন একটা চিঠি।

সেটা পড়ে হাহাকার করে ওঠে উরসুলা, 'চিরদিনের জন্যে ওকে খুইয়েছি আমরা। এই পথ ধরে চলতে থাকলে বড়দিনটা ওকে পালন করতে হবে পৃথিবীর শেষ মাথায় বসে।'

যে-লোকটাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হয় সে রক্ষণশীল দলের জেনারেল হোসে র‍্যাকুয়েল মনকাদা, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে সে-ই মাকোন্দোর মেয়র, আর তার কাছেই প্রথম চিঠিটা দেখায় উরসুলা। জেনারেল মনকাদা মন্তব্য করে, 'ব্যাপারটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী দুঃখজনক যে এই অরেলিয়ানোটা রক্ষণশীল নয়।' কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে সে আসলেই ভালোবাসে। রক্ষণশীল দলের বহু বেসামরিক লোকের মতো হোসে র‍্যাকুয়েল মনকাদাও তার দলকে বাঁচাতে যুদ্ধে গিয়েছিল, সম্মুখ সমরে অংশ নিয়ে অর্জন করেছিল জেনারেল খেতাব, যদিও সামরিক বাহিনীর লোক ছিল না সে। উল্টো বরং অন্যান্য পার্টি সদস্যের মতোই সামরিক বাহিনীর বিরোধী সে। সামরিক বাহিনীর লোকজনকে সে মনে করে নীতিহীন কুঁড়ে, উচ্চাকাঙ্খী ষড়যন্ত্রকরী, আর ডামাডোলের সময় ফায়দা লোটার জন্যে জনগণের সঙ্গে বেঈমানীতে ওস্তাদ। বুদ্ধিমান, হাসিখুশি, লালমুখো, ভোজনরসিক, আর মোরগ-লড়াইয়ের ভক্ত এই লোকটা এক সময়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। উপকূল জুড়ে এক বিরাট এলাকার ক্যারিয়ার অফিসারদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপে সফল হয়েছিল সে। একবার যখন বিশেষ পরিস্থিতির চাপে তার একটা ঘাঁটি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বাহিনীর কাছে ছেড়ে দিতে হয় তাকে, তখন সে তার জন্যে দুটো চিঠি লিখে রেখে এসেছিল। সেই চিঠি দুটোর একটাতে, সেটা অবশ্য খুব লম্বা ছিল, কর্নেলকে সে আহ্বান জানিয়েছিল যুদ্ধটাকে আরো মানবিক করে তোলার অভিযানে যোগ দেয়ার জন্যে। দ্বিতীয় চিঠিটা ছিল তার স্ত্রীর জন্যে, উদারপন্থীদের এলাকায় থাকতেন তিনি। চিঠিটা যাতে জায়গামত পৌঁছোয় সেটা দেখার জন্যে একটা অনুরোধসহ ওটা রেখে যায় সে। এরপর থেকে এমনকি যুদ্ধের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সময়গুলোতেও বন্দি বিনিময়ের জন্যে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করতো দুই কমান্ডার। সেই বিরতিগুলোয় বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকতো, আর এই সুযোগে জেনারেল মনকাদা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দাবা খেলা শেখাতো। শিগ্‌গিরই দারুণ একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দু'জনের মধ্যে। তারা এমনকি এই নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে দেয় যে সামরিক বাহিনীর লোকজন আর পেশাদার রাজনীতিকদের প্রভাব মুক্ত হয়ে দুই দলের জনপ্রিয় উপাদানগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করে একটা মানবতাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা যেখানে দুই মতবাদের সেরা অংশটুকু থাকবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন চিরস্থায়ী পরাজয়ের সংকীর্ণ পথে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জেনারেল মনকাদাকে তখন মাকোন্দোর ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করা হয়। ফলে সে গায়ে বেসামরিক পোশাক চাপায়, সৈনিকদের জায়গায় বহাল করে নিরস্ত্র পুলিশের লোক, বলবৎ করে যুদ্ধাপরাধ ক্ষমা আইন, আর যুদ্ধে মারা যাওয়া জনা কয়েক উদারপন্থীর পরিবারের দিকে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। মাকোন্দোকে একটা মিউনিসিপ্যালিটির স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয় সে, আর তার ফলে হয়ে যায় সেখানকার প্রথম মেয়র, আর সে এমন একটা আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে যে লোকজন যুদ্ধটাকে মনে করতে থাকে অতীতের একটা উদ্ভট দুঃস্বপ্ন। হেপাটিক জ্বরে শেষ হয়ে যাওয়া পাদ্রী নিকানোরের জায়গায় আসেন পাদ্রী করোনেল, প্রথম ফেডারেলিস্ট যুদ্ধের সেই বর্ষীয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটিকে ওরা বলতো 'বুড়ো বাবা'। ব্রুনো ক্রেসপি, যে কিনা আম্পারো মসকোতকে বিয়ে করেছে আর যার খেলনা ও বাদ্যযন্ত্রের দোকানের শনৈ শনৈ উন্নতি হচ্ছে, সে এবার একটা থিয়েটার তৈরি করে, সে-থিয়েটারটি হিস্পানী কম্পানির ভ্রমণসূচীতে ঠাঁই পেয়ে যায়। বিশাল এক উন্মুক্ত থিয়েটার হল সেটা, তাতে আছে কাঠের বেঞ্চি, গ্রীসদেশের মুখোশঅলা মখমলের একটা পর্দা আর তিনটে বক্স অফিস, সেগুলোর আকৃতি সিংহের মাথার মতো, সেটার মুখ দিয়ে টিকিট বিক্রি করা হয়। অনেকটা প্রায় সেই সময়েই আবার গড়ে তোলা হয় স্কুলটাকে, সেটার ভার দেয়া হয় দন মেলকর এসকালোনার হাতে, জলা থেকে আসা সেই বৃদ্ধ শিক্ষক তার আলসে ছাত্রদের চুনের প্রলেপ দেয়া উঠোনে হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটাতেন আর ক্লাসে কেউ কথা বললে তাকে তার বাবা-মা'র সায় নিয়ে ঝাল মরিচ খাইয়ে দিতেন। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ-এর দুই একরোখা যমজ ছেলে অরেলিয়ানো সেগান্দো আর হোসে আর্কাদিও সেগান্দো পেট, চক আর তাদের নাম লেখা এলুমিনিয়ামের জগ নিয়ে সবার আগে গিয়ে বসে পড়ে সেই ক্লাস ঘরে। রেমেদিওস, উত্তরাধিকারসূত্রে যে তার মায়ের নিখুঁত সৌন্দর্য পেয়েছে, সে পরিচিত হতে শুরু করেছে 'সুন্দরী রেমেদিওস' নামে। সময়, একটার পিঠের ওপর চেপে বসা আরেকটা শোকের মুহূর্ত আর তার নিজের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা সত্ত্বেও উরসুলা তার বয়েস ঠেকিয়ে রেখেছে। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের সাহায্য নিয়ে নতুন করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার প্যাস্ট্রির ব্যবসায় আর তার ছেলে যে সম্পদ যুদ্ধে খুইয়েছে সেটা যে সে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তুলে ফেলে তা নয়, শোবার ঘরের লাউয়ের খোলগুলো সে আবার ভরে ফেলে খাঁটি সোনা দিয়ে। তাকে প্রায়ই বলতে শোনা যেতো, 'ঈশ্বর যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন ততদিন এই পাগলাগারদে কখনো টাকা-পয়সার অভাব হবে না।' তো, এই যখন অবস্থা সেই সময় অরেলিয়ানো হোসে নিকারাগুয়ায় ফেডারেল বাহিনী ছেড়ে দিয়ে একটা জার্মান জাহাজে খালাসি হিসেবে কাজ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়, আর তার পর, আমারান্তা াকে বিয়ে করার গোপন বাসনা নিয়ে হাজির হয় বাড়ির রান্নাঘরে, তখন সে ঘোড়ার মতো তাগড়া, আর মাথায় তার ইন্ডিয়ানদের মতো কালো আর লম্বা চুল।

মুখে সে কিছু না বললে কী হবে, ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই আমারান্তা বুঝে ফেলে সে কেন এসেছে। টেবিলে বসে দু'জনে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস করে না। তবে তার ফিরে আসার দুই হপ্তা পর উরসুলার উপস্থিতিতেই আমারান্তার চোখে চোখ রেখে সে বলে ওঠে, 'সারাক্ষণই তোমাকে নিয়ে কত কিছু যে ভেবেছি আমি।' আমারান্তা ওকে এড়িয়ে যেতে থাকে। খেয়াল রাখে যেন হঠাৎ দেখা না হয়ে যায় ওর সঙ্গে। চেষ্টা করে যাতে সবসময় সুন্দরী রেমেদিওসের সঙ্গে সঙ্গে থাকা যায়। তার ভাইপো যেদিন তাকে জিজ্ঞেস করে করেছিল আর কতদিন সে হাতে ওই কালো পট্টিটা পরে থাকতে চায় তখন নিজের চোখমুখ লাল হয়ে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে লজ্জা পেয়ে যায় আমারান্তা, কারণ, সে ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয় কথাটা বলা হয়েছে তার কুমারীত্বকে ইঙ্গিত করেই। ও আসার পর থেকে আমারান্তা তার শোবার ঘরের দরজার খিল লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পাশের ঘরেই অরেলিয়ানো হোসের নাক ডাকার আওয়াজ সে এতোদিন ধরে শুনে যায় যে একসময় সে ভুলেই যায় সাবধান থাকার কথা। অরেলিয়ানো হোসে ফিরে আসার প্রায় দু' মাস পরে একদিন খুব ভোরের দিকে আমারান্তা টের পায় সে শোবার ঘরে আসছে। আমারান্তা তখন পালাবার বদলে, চিৎকার করে ওঠার বদলে, যদিও সবসময় সে ভেবেছে এরকম পরিস্থিতিতে তাই-ই করবে, আয়েশের এক কোমল অনুভূতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। আমারান্তার গা ঘেঁষে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ে অরেলিয়ানো হোসে, ঠিক যেমন সে করতো ছোটবেলায়, যেমনটা সে সবসময়ই করে এসেছে, আর তার গায়ে যে এক রত্তি সুতোও নেই সেটা টের পেয়ে আমারান্তার শরীর বেয়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত বইতে শুরু করে, দাঁতে বাড়ি খেতে থাকে দাঁত, কিছুতেই তা রোধ করতে পারে না সে। কৌতূহলে দমবন্ধ হয়ে আসে তার, ফিসফিসিয়ে সে বলে, 'চলে যা, চলে যা, নইলে কিন্তু চিৎকার করবো আমি।' কিন্তু অরেলিয়ানো হোসে তখন জেনে গেছে তাকে কী করতে হবে, কারণ সে আর তখন শিশুটি নেই, বরং হয়ে উঠেছে একটা ব্যারাকের জন্তু। সেই রাত থেকে ফের শুরু হয়ে যায় ভোর অব্দি চলতে থাকা সেই অযৌক্তিক যুদ্ধ। ক্লান্ত বিধ্বস্ত আমারান্তা বিড়বিড় করে বলতো, 'আমি তোর ফুপু। আমি প্রায় তোর মায়ের মতোই, সেটা শুধু যে বয়েসের জন্যে তা নয়, স্রেফ এই কারণে যে আমি তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।' ভোরের দিকে লেজ গুটাতো অরেলিয়ানো, ফিরে আসতো মাঝরাতের খানিক পরেই, আর আমারান্তা দরজায় খিল দিয়ে রাখেনি এই প্রমাণ পেয়ে প্রতিবারই আগের বারের চেয়ে উত্তেজিত অবস্থায় থাকতো সে। অরেলিয়ানো হোসে আসলে কোনো দিন একটি মুহূর্তের জন্যেও আমারান্তাকে কামনা করা থেকে বিরত হয়নি। অধিকৃত শহরগুলোর অন্ধকার সব শোবার ঘরে, বিশেষ করে সবচেয়ে পরিত্যক্তগুলোতে আমারান্তাকে খুঁজে পেতো সে, আহতদের ক্ষতস্থানে বাঁধা পট্টির শুকনো রক্তের গন্ধের ভেতর, মৃত্যুর বিপদের তাৎক্ষণিক আতংকের ভেতর আমারান্তাকে দেখতে পেতো সে। আসলে, আমারান্তার কাছ থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল তার স্মৃতি উপড়ে ফেলবার জন্যে, শুধু দূরত্ব দিয়েই নয়, সেই সঙ্গে এক হতবুদ্ধিকর ক্রোধের সাহায্যেও বটে, যে-ক্রোধটাকে তার সহযোদ্ধারা সাহস বলে ধরে নিত, কিন্তু আমারান্তার ছবিটা যুদ্ধের গোবর-গাদার ভেতর যতোই সেঁধিয়ে যাচ্ছিল ততোই খোদ যুদ্ধটাকেই আমারান্তার মতো বলে মনে হচ্ছিল তার কাছে। এভাবেই সে কষ্ট পেয়ে মরেছে সেই নির্বাসনের দিনগুলোতে, নিজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমারান্তাকে খুন করার একটা উপায় খুঁজে খুঁজে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক বুড়োর মুখে এক লোকের গল্প শোনে সে যে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল সম্পর্কে যে তার ফুপুও হয় জ্ঞাতিবোনও হয়, ফলে তার ছেলে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নিজের দাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা শুনে চমকে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোনো লোক কি তার নিজের ফুপুকে বিয়ে করতে পারে?'

এক সৈনিক জবাবে তাকে বলেছিল, 'সে তো পারেই, কিন্তু আমরা পাদ্রীদের সঙ্গে এই কারণে যুদ্ধটা করছি যাতে লোকে নিজের মাকে-ও বিয়ে করতে পারে।'

এর দুই হপ্তা পর চম্পট দেয় সে। এসে দেখে, তার স্মৃতিতে যতখানি ছিল তার চেয়ে নির্জীব হয়ে গেছে আমারান্তা, হয়ে গেছে আরো বেশি বিষণ্ন আর লাজুক, সত্যিকার অর্থেই চলে যাচ্ছে পরিপক্কতার শেষ কোণটিতে, তবে শোবার ঘরের অন্ধকারে সে আগের চেয়েও জ্বরতপ্ত, আর প্রতিরোধের উদ্যমে আগের চেয়েও দুঃসাহসিক। অরেলিয়ানোর শ্বাপদগুলোর জ্বালাতনে অস্থির হয়ে আমারান্তা তাকে বলতো, 'তুই একটা জানোয়ার। পোপের কাছ থেকে একটা বিশেষ অনুমতি না নিয়ে আসা পর্যন্ত তোর এই অভাগী ফুপুর সঙ্গে ও-কাজ তুই করতে পারবি না।' অরেলিয়ানো হোসে তখন দিব্যি দিয়ে বলে সে রোমেই যাবে, তারপর এ-ও বলে দিব্যি দিয়ে যে স্রেফ আমারান্তার মন গলাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে য়্যুরোপ পাড়ি দেবে সে পনটিফের চপ্পলে চুমো খাওয়ার জন্যে।

আমারান্তা তখন বলে, 'শুধু তাই নয়, বাচ্চাকাচ্চা হলে সেগুলো জন্মাবে শুয়োরের লেজ নিয়ে।'

কোনো যুক্তিই কানে ঢোকে না আমারান্তার।

কাকুতি মিনতি করে সে বলে, 'ওরা পিপড়েখেকো আর্মাডিলো হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই আমার।'

একদিন মাঝরাতের দিকে, অবদমিত পৌরুষের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাতারিনোর ওখানে চলে যায় সে। ঢলঢল বুক, নরম মন আর সস্তাদরের এক মহিলাকে পায় সে সেখানে, কিছুক্ষণের জন্যে সে ওর ক্ষুধাটাকে শান্ত করে। আমারান্তার ওপর তাচ্ছিল্যের ওষুধ প্রয়োগ করার চেষ্টা করে সে। অরেলিয়ানো হোসে দেখতো, চমৎকার দক্ষতায় চালাতে শেখা সেই সেলাইকল দিয়ে কাজ করে চলেছে আমারান্তা বারান্দার ওপর, কিন্তু একটা কথাও বলতো না তার সঙ্গে। আমারান্তার মনে হতো সে যেন একটা চড়ায় আটকে পড়ার দশা থেকে মুক্তি পেয়েছে, আর সে নিজেও বুঝে উঠতে পারতো না ঠিক এই সময়েই সে কেন আবার চিন্তা করতে শুরু করে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে নিয়ে, কেনই বা এমন স্মৃতিকাতরতা নিয়ে চাইনীজ চেকার খেলার বিকেলগুলোর কথা মনে পড়তে থাকে তার, কেনই বা সে তাকে কল্পনা করতে থাকে তার শোবার ঘরের পুরুষ মানুষ হিসেবে। নির্লিপ্ততার প্রহসনটা আর সহ্য করতে না পেরে অরেলিয়ানো হোসে যে-রাতে আমরান্তার কামরায় ফিরে আসে তখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি তার অবস্থানটা কতটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। অনমনীয় আর সুস্পষ্ট সংকল্প নিয়ে আমারান্তা ফিরিয়ে দেয় তাকে, তারপর শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয় চিরদিনের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরেলিয়ানো হোসে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে, জেসমিনের সুবাসমাখা এক হাসিখুশি রমণী এসে হাজির হয় বাড়িতে পাঁচ বছর বয়েসী একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। সে জানায়, ছেলেটা নাকি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার, উরসুলার কাছে নিয়ে এসেছে তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে। নামহীন সেই শিশুটির জন্ম নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলে না: প্রথমবারের মতো যেদিন বরফ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কর্নেলকে সেদিন সে দেখতে যেমন ছিল, এই ছেলেটাও ঠিক তেমনি দেখতে। রমণীটি জানায় যে খোলা চোখ নিয়েই জন্মেছিল ছেলেটা, বড়দের মতোই সব কিছু পরখ করে নেয়া দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, আর যেভাবে সে পলক না ফেলে নানান জিনিসের দিকে তাকিয়ে ছিল তাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। উরসুলা মন্তব্য করে, 'একদম একই রকম দেখতে। কেবল একটা জিনিসেরই অভাব আছে ছেলেটার। আর সেটা হল স্রেফ চোখ দিয়ে তাকিয়েই চেয়ার-টেবিল নাড়ানোর ক্ষমতাটা।' ওর নাম রাখা হয় অরেলিয়ানো, সেই সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় তার মায়ের শেষ নামটা, কারণ, বাবা ছেলেকে স্বীকার করে নেয়ার আগে তার নামে ছেলের নাম রাখায় আইনের বাধা আছে। ধর্মপিতা হয় জেনারেল মনকাদা। আমারান্তা যদিও জোরাজুরি করে যাতে ছেলেটা থেকে যায় আর তাতে করে সে তার দেখাশোনার ভার নিতে পারে, কিন্তু ওর মা তাতে মত দেয় না।

চমৎকারসব মোরগের সামনে যেভাবে মুরগি ছেড়ে দেয়া হয় ঠিক সেভাবে সৈনিকদের শোবার ঘরেও যে কুমারী মেয়েদের পাঠানো হয় এই রীতিটার কথা তখন জানা ছিল না উরসুলার, কিন্তু সেই বছর নাগাদ সেটা জানা হয়ে যায় তার: কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার আরো নয়টি ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসা হয় খ্রিস্টধর্মে তাদের দীক্ষা দেবার জন্যে। এদের মধ্যে যে সবার বড়, সবুজ চোখের অদ্ভুত একটা কৃষ্ণবর্ণ ছেলে—দেখতে সে মোটেই তার বাবার মতো নয়—তার বয়স দশেরও বেশি। সব বয়সের, সব বর্ণের আর কেবল ছেলে শিশুই নিয়ে আসে ওরা, আর তাদের সবার চেহারাতেই নিঃসঙ্গতার একটা ছাপ, যা দেখে সম্পর্কটা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না। দেখা যায়, শুধু দু'জনই দলটা থেকে আলাদা। একজন—তাকে তার বয়েসের চেয়ে বড় লাগে দেখতে—সে দফা রফা করে সারে ফুলের পাত্র আর চীনা মাটির বাটিগুলোর, কারণ তার হাত দুটো যেন কিছু ছোঁয়ামাত্রই তা ভেঙে ফেলার এক্তিয়ার পেয়ে গেছে। অন্য যে ছেলেটা, তার মাথার চুল সোনালী আর চোখ দুটো ঠিক মায়ের মতো ভাসাভাসা, আর তার চুলগুলো অবাধে বাড়তে দেয়ায় সেগুলো মেয়েদের চুলের মতোই লম্বা আর কোঁকড়া হয়ে উঠেছে। বেশ একটা পরিচিত ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢোকে সে, যেন এখানেই বড় হয়েছে সে, আর ঢুকেই সোজা উরসুলার শোবার ঘরে গিয়ে আব্দার ধরে, 'যান্ত্রিক ব্যালেরিনাটাই চাই আমার।' একেবারে চমকে যায় উরসুলা। সিন্দুকটা খোলে সে, তারপর মেলকিয়াদেসের আমল থেকে পড়ে থাকা প্রাচীন ধুলোমাখা জিনিসগুলো হাতড়ে খুঁজে বের করে পিয়েত্রো ক্রেসপির নিয়ে আসা বিস্মৃত যান্ত্রিক ব্যালেরিনাটা, একজোড়া মোজা দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে সেটাকে। বারো বছরেও কম সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে, অরেলিয়ানো নাম দিয়ে আর মায়ের শেষ নাম জুড়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয় তারা সব ক'টি পুত্র সন্তানকে, যাদেরকে কর্নেল তার যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের এ-মাথা থেকে ও-প্রান্ত অব্দি রোপণ করেছিল: মোট সতেরো জন। প্রথম প্রথম উরসুলা ওদের পকেট ভর্তি করে দিতো টাকা-পয়সা দিয়ে, আর আমারান্তা চেষ্টা করতো ওদের রেখে দিতে। কিন্তু শেষ অব্দি তারা ছেলেগুলোকে উপহার দেয়া আর তাদের ধর্ম মা হিসেবে কাজ করাতেই সীমিত রাখে নিজেদের। একটা জাবেদা খাতায় মায়ের নাম, ঠিকানা, ছেলের জন্ম তারিখ ও স্থান লিখে রেখে উরসুলা মন্তব্য করতো, 'খ্রিস্টধর্মে ওদের দীক্ষা দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। অরেলিয়ানো ফিরে এসে যাতে এসবের একটা গতি করতে পারে সেজন্যে একটা নিখুঁত হিসেব-নিকেশের দরকার হবে ওর।' দুপুরের খাওয়ার সময় এই বিশৃঙ্খল সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে উরসুলা তার মনের কথাটা জানায়, সে চায় ফিরে এসে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া একদিন তার সব ক'টা ছেলেকে এ-বাড়িতে জড়ো করুক।

জেনারেল মনকাদা রহস্য করে বলে ওঠে, 'চিন্তা কোরো না বন্ধু, তুমি যা ভাবছ তার চেয়ে আগেই এসে যাবে ও।'

জেনারেল মনকাদা যে-ব্যাপারটা জানতো কিন্তু বলতে চায়নি তা হল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া এ-পর্যন্ত যতগুলো বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ, মৌলিক আর রক্তাক্তটিতে নেতৃত্ব দেবার জন্যে এরিমধ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে সে।

পরিস্থিতি আবারো উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল প্রথম যুদ্ধের আগের মাসগুলোয়। খোদ মেয়রের প্রবর্তন করা মোরগ লড়াইয়ের আসরগুলো মুলতুবি রাখা হয়। সেনাছাউনির কমান্ডার ক্যাপ্টেন আকুলেস রিকার্দো নিজের হাতে নিয়ে নেয় পৌর ক্ষমতা প্রয়োগের এক্তিয়ার। উদারপন্থীরা তাকে এক উস্কানীদাতা হিসেবেই গণ্য করে নেয়। অরেলিয়ানো হোসেকে উরসুলা বলতো, 'ভয়ংকর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ছয়টার পর রাস্তায় বেরুবি না।' কিন্তু ওসব অনুরোধ-উপরোধে কোনো কাজ হতো না। এর আগে সেই আর্কাদিওর মতো, অরেলিয়ানো হোসে-ও এখন আর উরসুলার নেই। ব্যাপারটা যেন এমন যে, তার বাড়ি ফেরা, নিজের নিত্যদিনের প্রয়োজন সম্পর্কে নিজেই উদাসীন থেকেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তার মধ্যে জন্ম দিয়েছিল তার চাচা হোসে আর্কাদিওর কামুক আর আলসে প্রবণতাগুলোর। আমারান্তার জন্যে তার সুতীব্র কামনার আগুন কোনোরকম ক্ষতচিহ্ন না রেখেই নিভে গেছে। বাজি-টাজি ধরে, অবরে-সবরে মেয়েমানুষ দিয়ে নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে, উরসুলা যেসব গোপন জায়গায় টাকা-পয়সা রেখে ভুলে গেছে সে-সব জায়গা তছনছ করে হালছাড়াভাবে দিন কাটতো তার। শেষমেষ এমন হয়, স্রেফ জামাকাপড় বদলাবার জন্যেই বাড়ি আসতো সে। উরসুলা বিলাপ করে বলতো, 'ওগুলো সব একই গোয়ালের গরু। প্রথম প্রথম সবাই খুব ভালো, বাধ্য আর করিৎকর্মা, মনে হয় কেউ-ই প্রাণে ধরে একটা মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেই না দাড়ি-গোঁফ গজালো, ব্যস, গোল্লায় যেতে শুরু করে সবাই।' আর্কাদিও কখনো তার জন্মরহস্য জানতে পারেনি, কিন্তু অরেলিয়ানো হোসে জেনে ফেলেছে সে পিলার তারনেরার সন্তান; দুপুরের ঘুমটা যাতে সে তার বাড়িতেই সেরে নিতে পারে সেজন্যে পিলার তারনেরা তাকে একটা দোলখাটিয়া টাঙিয়ে দিয়েছে। ওরা যে কেবল মা-বেটা তাই-ই নয়, নিঃসঙ্গতার ভেতর ওরা দু'জন দু'জনের সঙ্গী। পিলার তারনেরার মনে আশা-আকঙ্খার কোনো বালাই আর নেই তখন। তার হাসি হয়ে দাঁড়িয়েছে অরগ্যানের সুর, তার বুক দুটো শিকার হয়েছে নিরন্তর হাতড়ানির, তার পেট আর উরু বরণ করে নিয়েছে বারোয়ারী রমণীর অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি, কিন্তু তার মনে কোনো তিক্ততা জন্ম নেয়নি। পৃথুলা, বাচাল, ভদ্রঘরের কষ্টে-পড়া রমণীর মতো হাবভাবসম্পন্ন পিলার তারনেরা তার তাসের বন্ধ্যা মোহগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অন্যসব লোকের প্রণয়ের ভেতরেই নিজের শান্তি খুঁজে নিয়েছিল। অরেলিয়ানো হোসে যে-বাড়িতে ঘুমাতো, সেই বাড়িতেই আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা তাদের ক্ষণিকের প্রেমিকদের সঙ্গে মিলিত হতো। ওরা এসে স্রেফ বলতো, 'তোমার ঘরটা একটু ধার দাও, পিলার,' অথচ তখন কিন্তু রীতিমত ঢুকেই পড়েছে তারা ঘরে ভেতর। জবাবে পিলার তারনেরা বলতো, 'অবশ্যই, অবশ্যই।' আর, কেউ ঘরে থাকলে সে ব্যাখ্যা করে বলতো:

'লোকে বিছানায় সুখে রয়েছে জেনেই খুশি আমি।'

এই উপকারের বদলে কখনোই টাকা পয়সা দাবি করতো না সে। কাউকেই বঞ্চিত করতো না সে উপকারটা থেকে, ঠিক যেমন ফিরিয়ে দিতো না সে সেই সব অগুনতি লোকের কাউকেই-যারা তার পরিণত বয়েসের গোধূলী লগ্নেও খুঁজে বের করতো তাকে, কিন্তু পয়সা-কড়ি বা প্রেম ভালোবাসা কিছুই দিতো না, মাঝে মধ্যে হয়ত কেবল আনন্দ দিতো খানিক। সেই যন্ত্রণাভরা নিয়তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার পাঁচ মেয়ের প্রত্যেকেই শৈশবেই হারিয়ে গেছে জীবনের নিরালা পথে। যে-ছেলে দুটোকে সে বড় করতে পেরেছিল তাদের একটি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বাহিনীতে যুদ্ধ করতে গিয়ে মরেছে, অন্যটা চৌদ্দ বছর বয়েসে জলাভূমির শহরে এক ক্রেট মুরগির বাচ্চা চুরি করতে গিয়ে আহত হয়ে ধরা পড়েছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে হরতনের সাহেব তাকে যে দীর্ঘদেহী, তাম্রবর্ণ, সুদর্শন ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, এক অর্থে অরেলিয়ানো হোসেই যে সেই লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর, তাসগুলোর পাঠানো সব মানুষের মতো সে-ও ঠিক তখনই পিলার তারনেরার বুকের ভেতর পৌঁছয় যখন বেচারার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। পিলার তারনেরা সেটা পরিষ্কার দেখতে পায় তার তাসের ভেতর।

সে তাকে বলে, 'আজ রাতে বাইরে যাসনে। এখানেই থাকিস আজ, এখানেই ঘুমোস, কার্মেলিয়া মঁতিয়েল ওকে তোর ঘরে পাঠানোর জন্যে আমাকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছে।'

প্রস্তাবটার মধ্যে যে কাঙালপনার এক গভীর অনুভূতি লুকিয়ে আছে সেটা অরেলিয়ানো হোসে টের পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে, 'আজ মাঝ রাতে আমার জন্যে ওকে অপেক্ষা করতে বোলো।'

এরপর সে থিয়েটার দেখতে চলে যায়, সেখানে একটা হিস্পানি কম্পানির *ফক্স-এর ছোরা* চলছিল; নাটকটা জোরিয়ারই[1], তবে ক্যাপ্টেন আকুইলেস রিকার্দোর নির্দেশে নামটা বদলে দেয়া হয়েছে, কারণ উদারপন্থীরা রক্ষণশীলদের গথ বলে ডাকতো। দরজায় সবে সে টিকিটা দেখিয়েছে, তখনই অরেলিয়ানো হোসে টের পেয়ে যায় ক্যাপ্টেন আকুলিস রিকার্দো আর দুই রাইফেলধারী সৈন্য দর্শকদের মধ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে।

অরেলিয়ানো হোসে তাকে শাসানীর সুরে বলে, 'খবরদার, ক্যাপ্টেন, আমার গায়ে হাত দিতে পারে এমন মরদ এখনো পয়দা হয়নি।' ক্যাপ্টেন জোর করে তার শরীর তল্লাশি করার চেষ্টা করে, আর তখন-ই নিরস্ত্র অরেলিয়ানো হোসে দৌড় দেয়। গুলি ছোঁড়ার হুকুমটা কানে তোলে না সৈন্যরা। তাদের একজন আবার ব্যাখ্যা করে বলে, 'ও বুয়েন্দিয়াদের একজন।' রাগে অন্ধ হয়ে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তার মধ্যেখানে চলে আসে ক্যাপ্টেন, তারপর লক্ষ্য স্থির করে।

'কাপুরুষ,' চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'আফসোস, তুই কর্নেল অরলিয়ানো বুয়েন্দিয়া না।'

বছর একুশের কুমারী মেয়ে কার্মেলিতা মঁতিয়েল সবে কমলার সুবাসভরা পানিতে গোসল সেরে পিলার তারনেরার বিছানায় রোজমেরির পাতা ছিটাচ্ছে, এমন সময় শোনা যায় গুলির শব্দটা। আমারান্তা যে সুখ থেকে অরেলিয়ানো হোসেকে বঞ্চিত করছে, সেই সুখ কার্মেলিতার কাছে পাওয়ার, সাত-সাতটা ছেলেমেয়ের বাবা হওয়ার আর বুড়ো বয়েসে ওরই কোলে মাথা রেখে মরার কথা ছিল তার, কিন্তু যে-কার্তুজটা পিঠ দিয়ে ঢুকে তার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিয়ে যায় সেটা এসেছিল তাসগুলোর ভুল ব্যাখ্যার নির্দেশ পেয়ে। ওদিকে, সেই রাতে আসলেই যার মরার কথা ছিল সেই ক্যাপ্টেন আকুইলেস রিকার্দো কিন্তু সত্যিই মরে, আর মরে অরেলিয়ানো হোসের চার ঘণ্টা আগে। গুলির শব্দটা শোনা যেতেই একই সঙ্গে ছুটে আসা দুটো কার্তুজ মাটিতে শুইয়ে দেয় তাকে, কিন্তু কার্তুজ দুটো যে কোথা থেকে আসে সেটা কোনোদিনই জানা যায় না; অনেকগুলো গলার একটা সম্মিলিত চিৎকারে কেঁপে ওঠে রাতটা:

'লিবারেল পার্টি জিন্দাবাদ! কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া জিন্দাবাদ!'

বারোটার সময় অরেলিয়ানো হোসে যখন রক্তক্ষরণে মারা যায় আর কার্মেলিতা মঁতিয়েল আবিষ্কার করে তার ভবিষ্যৎ নির্দেশক তাসগুলো কিছুই বলছে না, চারশোরও বেশি লোক সার বেঁধে থিয়েটারের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে ক্যাপ্টেন আকুইলেস রিকার্দোর প্রাণহীন দেহের ওপর তাদের রিভলভার খালি করে ফেলে। সীসায় সীসায় ভারি হয়ে ওঠা আর পানিতে ভেজা রুটির মতো খুলে খুলে পড়া

১ হোসে জোরিয়া (১৮১৭-৯৩): হিস্পানি নাট্যকার, কবি, যাঁর মুখ্যত জাতীয় কিংবদন্তী-নির্ভর নাটকগুলোর সবচেয়ে বিখ্যাতটির নাম *দন হুয়ান তেনেরিও* ১৮৪৪ – অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি যোগাড় করে আনতে হয় টহলদারদের।

নিয়মিত বাহিনীর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটায় জেনারেল র‍্যাকুয়েল মনকাদা, ফের নিজের উর্দি গায়ে চাপায়, তারপর হাতে তুলে নেয় ম্যাকোন্দোর বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্ব। সে অবশ্য আশা করেনি যে, যে-ব্যাপারটিকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছিল সেটাকে তার এই নিরোধমূলক পদক্ষেপ ঠেকিয়ে দিতে পাবে। সেপ্টেম্বরে যে-খবর আসে তা পরস্পরবিরোধী। একদিকে সরকারের তরফ থেকে বলা হয় তারা সারাদেশে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, অন্যদিকে উদারপন্থীরা দেশের ভেতর সশস্ত্র বিদ্রোহের গোপন খবর পেতে থাকে। একটা ডিক্রি দিয়ে ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত সরকার যুদ্ধাবস্থার কথা স্বীকার করে না, আর এর পরেই একটা কোর্ট মার্শালে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার অনুপস্থিতিতেই তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। হুকুম জারি হয়, যে-ইউনিটই তাকে প্রথম বন্দি করুক তারাই যেন দণ্ডাদেশটা কার্যকর করে। উরসুলা খুশিতে লাফিয়ে উঠে জেনারেল মনকাদাকে বলে, 'তার মানে ও ফিরে এসেছে।' কিন্তু মনকাদা নিজেই এসবের কিছুই জানতো না।

আসল ব্যাপারটা হল, একমাসেরও বেশি সময় ধরে দেশে রয়েছে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। সে এসে পৌঁছুবার আগে নানান উল্টোপাল্টা গুজব শোনা যাচ্ছিল, একই সময়ে সে সবচেয়ে দূরবর্তী দুটো জায়গায় রয়েছে বলেও ধরে নেয়া হচ্ছিল, তাছাড়া যতদিন পর্যন্ত না সরকারিভাবে ঘোষণা দেয়া হয় যে উপকূলে দুটো রাজ্য দখল করে নিয়েছে সে ততদিন এমনকি জেনারেল মনকাদা পর্যন্ত তার ফিরে আসার খবরটা বিশ্বাস করে না। টেলিগ্রামটা দেখিয়ে উরসুলাকে সে বলে, 'শুভেচ্ছা নাও, বন্ধু। শিগ্‌গিরই ওকে দেখতে পাবে তুমি এখানে।' এই প্রথমবারের মতো বিচলিত হয় উরসুলা। 'কিন্তু তখন তুমি কী করবে বলো তো?' ঠিক একই প্রশ্ন জেনারেল মনকাদা নিজেও নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে বহুবার।

সে জবাব দেয়, 'ও যা করতো ঠিক তাই করবো আমি, বন্ধু। আমি আমার কর্তব্য পালন করবো।'

অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার লোক নিয়ে পয়লা অক্টোবরের ভোরবেলা মাকোন্দোয় হামলা চালায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, ওদিকে সেনাছাউনির ওপর হুকুম হয় শেষ অব্দি লড়ে যাওয়ার। দুপুরবেলা, জেনারেল মনকাদা যখন উরসুলার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া সারছে, বিদ্রোহীদের কামানের একটা গোলা শহরময় প্রতিধ্বনি তুলে পৌর খাজাঞ্চিখানার সামনেটা গুঁড়িয়ে দেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনারেল মনকাদা বলে, 'ওদের হাতে আমাদের মতোই গোলাবারুদ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল ওরা লড়ছে ওদের নিজেদের ইচ্ছেয়।' দুপুর দুটোর সময় দু'পক্ষেরই কামানের গোলার শব্দে যখন মাটি কাঁপছে, উরসুলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে সে, মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে-লড়াই সে করছে তাতে জেতার কোনো আশাই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আজ রাতে যেন অরেলিয়ানো বাড়িতে তোমার কাছে না আসে। তবে যদি আসে, আমার হয়ে ওকে একবার জড়িয়ে ধোরো। ওর সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হবে এমন আশা করি না।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে একটা চিঠি লিখে সেই রাতে মাকোন্দো থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যায় সে, তাদের দু'জনের উদ্দেশ্যই যে এক–যুদ্ধটাকে মানবিক করে তোলা–সে-কথাটা চিঠিতে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সে, আর সেই সঙ্গে তার বিজয় কামনা করেছিল সামরিকতন্ত্রীদের দুর্নীতি আর দুই দলেরই রাজনীতিকদের উচ্চাকাঙ্খার বিরুদ্ধে। পরদিন, উরসুলার বাড়িতে, যেখানে একটা বিপ্লবী কোর্ট মার্শাল তার ভাগ্য নির্ধারণ করার আগ পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, সেখানে তার সঙ্গে দুপুরের খাওয়া সারে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। খাওয়ার আসরটা বেশ খোলামেলা হয় ঠিকই, কিন্তু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যখন যুদ্ধের কথা ভুলে স্মৃতিরোমন্থনে মগ্ন হয়, উরসুলার মনে তখন বিষাদমাখা যে-অনুভূতিটা জন্মে তা হল তার কাছে মনে হয় তার ছেলে একজন অনুপ্রবেশকারী। কথাটা তার প্রথম মনে হয়েছিল তখন যখন হৈ-হল্লা করতে করতে এগোনো একটা সামরিক দলের প্রহরায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দেখেছিল সে, বাড়ির শোবার ঘরগুলো তছনছ করে ফেলেছিল ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হয়েছিল যে বিপদের কোনো আশংকা নেই। ব্যাপারটা যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া কেবল মেনেই নিয়েছিল তা নয়, সেই সঙ্গে সে কড়া হুকুম জারি করে দিয়েছিল যে-কেউ-ই তার দশ ফুটের কাছে আসতে পারবে না, এমনকি উরসুলাও না, আর ওদিকে তাকে এসকর্ট করে নিয়ে আসা দলটা বাড়ির চারপাশে পাহারা বসানোর কাজটা সেরে ফেলেছিল। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার পরনে তার পদমর্যাদাসূচক তকমাবিহীন সাদাসিধে ডেনিমের উর্দি আর নাল লাগানো উঁচু বুট, তাতে রক্ত আর কাদা লেগে শক্ত হয়ে আছে। কোমরে রয়েছে পিস্তল রাখার ফ্ল্যাপখোলা খাপ, আর তার যে-হাতটা সারাক্ষণ পিস্তলের বাঁটে ওপর রাখা তাতে ফুটে উঠেছে সেই একই সতর্ক আর স্থিরসংকল্প উৎকণ্ঠার ভাব যা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতেও। তার মাথাটা যেন অল্প আঁচে চুল্লীতে সেদ্ধ করা হয়েছে, চুলের সীমা ঢুকে গেছে গহীন ভেতরে। ভূমধ্যসাগরের লোনায় জারিত তার মুখটায় এসেছে একটা ধাতব কাঠিন্য। আসন্ন বার্ধক্যের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে একটা প্রাণশক্তি, যার সঙ্গে তার অন্তরের শীতলতার কোথায় যেন একটা সম্পর্ক রয়েছে। আগের চেয়ে লম্বা মনে হচ্ছে তাকে, আরো বেশি ম্লান, আরো বেশি কৃশকায়, আর, স্মৃতিকাতরতা প্রতিরোধের প্রাথমিক লক্ষণগুলো পরিষ্কার ফুটে রয়েছে তার মধ্যে। আপনমনে উরসুলা বলে ওঠে, 'হায় প্রভু, দেখে মনে হচ্ছে ও এখন যে-কোনো কিছু করতে পারে।' আসলেই তাই। আমারান্তার জন্যে অ্যাজটেকদের যে-শালটা সে নিয়ে এসেছে, দুপুরে খাওয়ার সময় অতীতের যে-সব স্মৃতি রোমন্থন করেছে, মজার মজার যেসব গল্প শুনিয়েছে সেগুলো এক অন্য সময়ের রসবোধের মামুলি অবশিষ্টাংশ। একটা গণকবরে মৃতদেহগুলো গোর দেয়ার হুকুম তামিল হওয়ার পরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্নেল রোক কার্নিসারোকে কোর্ট মার্শাল বসাবার দায়িত্ব দিয়ে সে নিজে লেগে পড়ে আমূল সংস্কার-সাধনের ক্লান্তিকর কাজে, যে-সব সংস্কার ফের ক্ষমতায় বসা রক্ষণশীল সরকারের একটা পাথরও যথাস্থানে রাখবে না। সে তার সহযোদ্ধাদের বলে, 'দলের রাজনীতিবিদদের চাইতে এগিয়ে থাকতে হবে আমাদের, ওরা যখন চোখ খুলবে তখন দেখতে পাবে সব কাজ সাঙ্গ হয়ে আছে।' এই সময়টাতেই শত বছরের পুরনো ভূমির স্বত্ব পরীক্ষা করে দেখবে বলে ঠিক করে সে, যার ফলস্বরূপ সে আবিষ্কার করে তার ভাই হোসে আর্কাদিওর বৈধ করে নেয়া কুকর্মগুলো। কলমের এক খোঁচায় রেজিস্ট্রেশনগুলো খারিজ করে দেয় সে। সৌজন্যের শেষ নিদর্শন হিসেবে এক ঘণ্টার জন্যে কাজ মুলতুবি রেখে, যা সে করবে বলে মনস্থির করেছে সে-সম্বন্ধে সর্বশেষ খবরাখবর রেবেকাকে জানাতে তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করে।

এক সময় যে ছিল তার অবদমিত ভালোবাসার সব কথার অংশভাগী, যার নাছোড় মনোভাব তার জীবন বাঁচিয়েছিল, সেই নিঃসঙ্গ বিধবা এখন নিজের বাড়ির অন্ধকারের ভেতর অতীতের এক অপচ্ছায়া মাত্র। পায়ের গাঁট অব্দি কালো কাপড়ে ঢাকা, অন্তরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া রেবেকা যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু জানেই না বলা চলে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কাছে মনে হয় মেয়েটার হাড়ের অনুপ্রভা তার চামড়া ভেদ করে দেখা যাচ্ছে, আর সে ঘুরে বেড়াচ্ছে আলেয়ার আলোতে, বদ্ধ বাতাসে, যেখানে এখনো যে-কেউ বারুদের লুকানো গন্ধ পাবে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আলাপটা শুরু করে নিশান উপদেশ দেয়ার ছলে, রেবেকা যেন তার শোকপালনের কাঠিন্যটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে, বাড়িতে আলো-হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা করে আর হোসে আর্কাদিওর মৃত্যুর জন্যে পৃথিবীকে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু রেবেকা ততদিনে সব অহমিকার বাইরে চলে গেছে। মাটির স্বাদের মধ্যে, পিয়েত্রো ক্রেসপির সুগন্ধি চিঠিতে, স্বামীর উত্তাল শয্যায় বৃথাই সেই বস্তুটির খোঁজ করার পর শেষ পর্যন্ত জিনিসটা সে পেয়েছে ওই বাড়িটার মধ্যে, যেখানে তার স্মৃতিগুলো মূর্ত হয়ে উঠতো অপ্রশম্য আহ্বানের শক্তির মধ্যে দিয়ে, আর বদ্ধ ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে চলে-ফিরে বেড়াতো মানুষের মতো। তার বেতের দোলকেদারাটায় পিঠ ঠেস দিয়ে, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার দিকে তাকিয়ে, যেন উল্টো তাকেই অতীতের আবছায়ার মতো দেখাচ্ছে, রেবেকা এ-কথা শুনে এমনকি বিন্দুমাত্র বিচলিত পর্যন্ত হয় না যে হোসে আর্কাদিও যেসব জমি জবরদখল করেছিল সেগুলো ন্যায্য মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, 'তুমি যা ঠিক করবে তা-ই হবে, অরেলিয়ানো। আমার সব সময়ই মনে হতো, আর এখন প্রমাণও পেয়ে গেলাম যে তুমি আসলে একটা বেঈমান।'

দলিল সংশোধনের কাজ চলার সময়ই কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস-এর তত্ত্বাবধানে সংক্ষিপ্ত কোর্ট মার্শাল অনুষ্ঠিত হয়, আর সেটার সমাপ্তি ঘটে বিপ্লবীদের হাতে বন্দি হওয়া নিয়মিত বাহিনীর সমস্ত অফিসারের প্রাণদণ্ডের মাধ্যমে। শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোর্ট মার্শালটা হোসে র‍্যাকুয়েল মনকাদার। এবার আর চুপ থাকতে পারে না উরসুলা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে সে বলে, 'মাকোন্দোতে আমরা যতগুলো সরকার পেয়েছি তার মধ্যে ওরটাই ছিল সবচেয়ে ভালো। আর তোকে নিশ্চয়ই আমার বলে দেয়ার দরকার নেই যে ও কত ভালো, আমাদের ও কতটা ভালোবাসে, কারণ তুই নিজেই তা অন্য যে-কারোর চেয়ে ঢের ভালো জানিস।' চোখে অসন্তুষ্টি ফুটিয়ে উরসুলার দিকে তাকায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।

সে জবাব দেয়, 'বিচারের ভারটা আমি নিজের ওপর নিতে পারি না। তোমার কিছু বলার থাকলে কোর্ট মার্শালকে বলো।'

উরসুলা যে শুধু তা-ই করে তা নয়, সব ক'জন বিপ্লবী অফিসারের মা-কে, যারা ম্যাকোন্দোতে থাকতো, তাদের নিয়ে আসে সে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে। শহরটার যারা গোড়াপত্তন করেছিল, যাদের অনেকেই আবার পাহাড় উজানোর সেই ভয়ংকর অভিযানেও অংশ নিয়েছিল, সেই বৃদ্ধাদের সবাই একে একে এসে জেনারেল মনকাদার গুণকীর্তন করে যায়। উরসুলা আসে সবার শেষে। তার বিষাদ-করুণ গাম্ভীর্য, তার নামের মাহাত্ম্য, আর তার জবানবন্দির বিশ্বাস জাগানোর প্রচণ্ডতা ন্যায় বিচারের নিক্তিটাকে মুহূর্তের জন্যে বেদিশা করে ফেলে। কোর্টের সদস্যদের লক্ষ্য করে সে বলে, 'এই ভয়ংকর খেলাটাকে তোমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছো, আর তোমরা ভালোই দেখিয়েছো, কারণ তোমরা তোমাদের কর্তব্য করছো, কিন্তু একটা কথা যেন ভুলে যেয়ো না, আর সেটা হল, যদ্দিন ঈশ্বর আমাদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখছেন তদ্দিন আমরা তোমাদের মা-ই থাকবো, আর তোমরা যত বড় বিপ্লবী-ই হও না কেন বেয়াদবীর পয়লা নিশানাটুকু তোমাদের মধ্যে দেখামাত্র প্যাতলুনটা খুলে চাবকানি দেয়ার এক্তিয়ারটা আমাদের আছে।' ভাবনা-চিন্তা করার জন্যে আদালত মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পরেও, সেনাছাউনিতে পরিণত করা সেই স্কুলঘরে কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মাঝরাতে জেনারেল হোসে র‍্যাকুয়েল মনকাদাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ক্ষিপ্তভাবে উরসুলা উল্টো কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বিরুদ্ধেই নানান অভিযোগ করার পরেও শাস্তি কমাতে রাজি হয় না সে। ভোরের আলো ফোটার খানিক আগে, সেল হিসেবে ব্যবহার করা একটা ঘরে সাজাপ্রাপ্ত লোকটাকে দেখতে যায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।

সে তাকে বলে, 'একটা কথা মনে রেখো, প্রাণের বন্ধু আমার, আমি কিন্তু তোমার বুকে গুলি চালাচ্ছি না, বিপ্লবই গুলি চালাচ্ছে তোমার বুকে।'

তাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জেনারেল মনকাদা এমনকি শয্যা ছেড়েও ওঠেনি।

সে জবাব দেয়, 'জাহান্নামে যাও।'

ফিরে আসার পর থেকে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া নিজের অন্তর দিয়ে জেনারেল মনকাদার দিকে তাকানোর সুযোগ নিজেকে দেয়নি। সে যে কত বুড়িয়ে গেছে, কিভাবে তার হাত কাঁপছে, আর যে সযত্ন বাধ্যতা নিয়ে সে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে তা দেখে চমকে যায় সে, আর তখন নিজের ওপর বিষম বিরক্ত হয়ে ওঠে সে, সেই বিরক্তির সঙ্গে সে মিশিয়ে দেয় করুণার সূচনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে, 'আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো যে সব কোর্ট মার্শালই প্রহসন, আসলে অন্য লোকজনের কুকীর্তির দাম দিতে হচ্ছে তোমাকে, কারণ, এবার যে-কোনো মূল্যেই হোক যুদ্ধটা জিততে যাচ্ছি আমরা। আমার জায়গায় থাকলে তুমিও কি ঠিক একই কাজ করতে না?'

শার্টের খোটে শিং-এর চশমা মোছার জন্যে উঠে বসে জেনারেল মনকাদা। বলে, 'তা হয়ত করতাম। কিন্তু তুমি যে আমায় গুলি করছ সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না, কারণ, শত হলেও, আমাদের মতো মানুষের জন্যে ওটাই স্বাভাবিক মৃত্যু।' চশমাটা বিছানার ওপর রাখে সে, খুলে রাখে ঘড়ি আর গলার হার। তারপর বলে চলে, 'আসলে আমাকে যা ভাবিয়ে তুলছে তা হল মিলিটারিকে এতো ঘেন্না করে, ওদের বিরুদ্ধে এতো যুদ্ধ করে, ওদের নিয়ে এতো মাথা ঘামানোর পর, শেষমেষ তুমি কিন্তু ওদের মতোই বদ হয়ে দাঁড়িয়েছো। আর, জীবনের কোনো আদর্শই এই পরিমাণ নীচতার যোগ্য নয়।' নিজের বিয়ের আংটি আর আশাদায়িনী কুমারী-র মেডালটা খুলে তার ঘড়ি আর চশমার কাছে রাখে সে।

তারপর কথার সমাপ্তি টেনে বলে, 'এই ধারায় এগোলে তুমি শুধু আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে অত্যাচারী আর জঘন্য ডিক্টেটরই হবে না, বরং তোমার বিবেককে শান্ত রাখতে তুমি আমার প্রিয় বন্ধু উরসুলাকেও পর্যন্ত গুলি করে মারবে।'

নিশ্চল হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। জেনারেল মনকাদা এরপর তাকে তার চশমা, মেডাল আর চাবিটা দেয়, তারপর গলার স্বর পাল্টে বলে:

'কিন্তু আমি তোমাকে গালমন্দ করার জন্যে ডেকে পাঠাইনি, ডেকেছি কেবল এই জিনিসগুলো আমার বৌয়ের কাছে পৌছে দেবার উপকারটুকু করার কথা বলার জন্যে।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ওগুলো নিজের পকেটে ঢোকায়।

'উনি কি এখনো মানাউরেই আছেন?'

জেনারেল মনকাদা সায় দিয়ে বলে, 'ও এখনো মানাউরেই আছে, গির্জার পেছনের সেই বাড়িতেই, যেখানে তুমি চিঠিটা পাঠিয়েছিলে।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে, 'কাজটা আমি খুশি হয়েই করবো, হোসে র‍্যাকুয়েল।'

বাইরের কুয়াশাভরা সুনীল হাওয়ায় সে বেরিয়ে আসতে অতীতের অন্য সব দিনের মতোই তার মুখটা আর্দ্র হয়ে ওঠে, আর তখনই কেবল তার খেয়াল হয় মৃত্যুদণ্ডাদেশটা গোরস্থানের দেয়ালে নয় উঠোনে কার্যকর করার আদেশ দিয়েছে সে। দরজার ওপাশে দাঁড়ানো ফায়ারিং স্কোয়াডটা তাকে রাষ্ট্রপতির সম্মান জানায়।

সে আদেশ দেয়, 'ওকে এখন বের করে আনা যেতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসের কাছেই যুদ্ধটার অসারতা ধরা পড়ে সবার আগে। মাকোন্দোর বেসামরিক ও সামরিক অধিকর্তা হিসেবে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে হপ্তায় দু'বার কথা হতো তার টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। গোড়ার দিকে সে-সব কথাবার্তাই গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দিতো একটা জ্বলজ্যান্ত যুদ্ধের, যে-যুদ্ধের নিখুঁতভাবে নির্ণীত কাঠামো যে-কোনো সময় ওদের জানিয়ে দিতো কখন ঠিক কোথায় যুদ্ধটা হচ্ছে, আর কোনদিকেই বা সেটা মোড় নেবে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যদিও কখনোই কাউকে বিশ্বাস করেনি, এমনকি তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকেও নয়, কিন্তু সে-সময় তার মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গতার সুর ছিল যে-কারণে তারের ওপাশে তাকে সহজেই চেনা যেতো। এরকম অনেকবারই হয়েছে যে কাঙ্ক্ষিত সময়ের চেয়েও বেশিক্ষণ ধরে আলাপ করেছে সে, প্রসঙ্গ বদলে চলে গেছে ঘরোয়া ধরনের আলাপচারিতায়। কিন্তু ধীরে ধীরে, যুদ্ধটা ক্রমেই আরো তীব্র হয়ে উঠতে আর বহুদূর ছড়িয়ে পড়তে তার ছবিটা অবাস্তবতার রাজ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। খাপছাড়া হয়ে পড়তে থাকে তার কথাবার্তার ধরন, সেগুলো এসে জড়ো হয়ে যে-সব বক্তব্যে রূপ নিতো ক্রমেই সেগুলো হতে থাকে নিতান্তই অর্থহীন। কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস নিজেকে তখন কেবল শ্রোতার ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ রাখতো, তার বদ্ধমূল ধারণা হতে থাকে যে টেলিগ্রাফের সাহায্যে যার সঙ্গে সে কথা বলছে সে এক ভিনগ্রহের আগন্তুক। কথার শেষ টেনে চাবি টিপে সে বলতো, 'বুঝতে পারছি, অরেলিয়ানো। লিবারেল পার্টি জিন্দাবাদ।'

শেষ অব্দি সমস্ত সংযোগ হারিয়ে ফেলে সে যুদ্ধের সঙ্গে। অন্যসময় যা ছিল এক বাস্তব কর্মকাণ্ড, তার যৌবনের এক অপ্রতিরোধ্য আবেগ, সেটা তার জন্যে হয়ে ওঠে এক অনেক দূরের একটা উল্লেখবিন্দু: একটা শূন্যতা। তার একমাত্র আশ্রয়স্থল আমারান্তার সেলাইঘর। প্রতিদিন বিকেলবেলা তার ওখানে যাবে সে। আমারান্তা যখন সুন্দরী রেমেদিওসের হাতে ঘুরতে থাকা সেলাইকলটাতে ফোলা ফোলা পেটিকোটের কাপড়ে কুঁচি দিতো তখন তার হাত দুটো দেখতে পছন্দ করতো সে। চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতো তারা, দু'জনে দু'জনের পারস্পরিক সাহচর্যে তৃপ্ত, কিন্তু আমারান্তা যখন লোকটার গভীর অনুরক্তির আঁচটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরে ভেতরে ভেতরে খুশি, জেরিনাল্‌দো মার্কেস কিন্তু সেই তল না পাওয়া হৃদয়ের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ থেকে যায়। তার ফিরে আসার খবর যখন আমারান্তার কাছে এসে পৌঁছেছিল, উৎকণ্ঠায় তখন তার দমবন্ধ অবস্থা। কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার শোরগোলে-ভরা এসকর্টের সঙ্গে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে ঢুকতে দেখে, নির্বাসনের কঠোরতা তাকে কিভাবে ভেঙেচুরে দিয়েছে, বয়স আর বিস্মৃতি তাকে কতটা বুড়িয়ে দিয়েছে, ঘাম আর ধুলোয় নোংরা করে ফেলেছে, পশুর পালের মতো দুর্গন্ধময় আর কুৎসিৎ করে তুলেছে পিং-এর সঙ্গে আটকে রাখা বাম হাতটা সহ, তা দেখে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় মুর্ছা যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল তার। সে ভেবেছিল, 'হায় ঈশ্বর, আমি তো এই লোকের জন্যে পথ চেয়ে থাকিনি।' পরদিন অবশ্য দাড়িটাড়ি কামিয়ে, সাফসুতরো হয়ে গোঁফজোড়া ল্যাভেন্ডারে সুবাসিত করে বাড়িতে আসে সে রক্তমাখা পিংটা খুলে রেখে। আমারান্তাকে উপহার দেয় শুক্তি দিয়ে বাঁধানো একটা প্রার্থনা-পুস্তক।

বলার মতো আর কিছু খুঁজে না পেয়ে আমারান্তা বলে ওঠে, 'পুরুষগুলো কী অদ্ভুত। সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অথচ কিনা উপহার দেয় প্রার্থনা-পুস্তক।'

এরপর থেকে, এমনকি যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় সময়েও, প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা আমারান্তাকে দেখতে আসতো সে। এমন বহুবার হয়েছে যে সুন্দরী রেমেদিওসের অনুপস্থিতিতে সে-ই ঘুরিয়েছে সেলাইকলের চাকা। যে-মানুষটা এতো কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও নিরস্ত্র অবস্থায় সেলাইঘরে যাওয়ার জন্যে বৈঠকখানায় তার সাইডআর্মস খুলে রাখতো, তার অধ্যবসায়, বিনম্রতা, আনুগত্য আমারান্তাকে বিচলিত করে তুলতো। তারপরেও, চার বছর ধরে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস বার বার তাকে প্রেম নিবেদন করে যায়, অথচ প্রতিবারই আমারান্তা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার একটা না একটা উপায় ঠিকই খুঁজে নিতো তার মনে কষ্ট না দিয়ে, কারণ তাকে সে ভালোবেসে উঠতে না পারলেও, তাকে ছাড়া বেঁচে থাকা আর সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। যাকে কিনা সব কিছু সম্পর্কেই উদাসীন বলে মনে হোতো, এমনকি মানসিকভাবে অপরিণত বলেও মনে করা হতো, সেই সুন্দরী রেমেদিওস পর্যন্ত এমন গভীর আনুগত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসে সে। আমারান্তা হঠাৎ করে আবিষ্কার করে, যে-মেয়েটাকে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, এখন যে-কিনা মাত্র বয়োসন্ধিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, এরিমধ্যে সে এমন সুন্দরী হয়ে উঠেছে যে মাকোন্দোতে তার মতো সুন্দরী রমণী এর আগে কখনো দেখা যায়নি। আমারান্তা টের পায়, তার মনের ভেতর ঠিক সেই হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে যা আগে একবার জ্বলে উঠেছিল রেবেকার বিরুদ্ধে, আর তাই ওর মৃত্যু কামনা করার মতো চরম অবস্থায় পড়তে ঈশ্বর তাকে যেন বাধ্য না করেন সেজন্যে তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করার পর সে তাকে সেলাইঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই সময়টাতেই যুদ্ধের একঘেয়েমীতে ভুগতে শুরু করে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস। যে-গৌরবের জন্যে তাকে জীবনের সেরা সময়টা উৎসর্গ করতে হয়েছে সেটাকে পর্যন্ত আমারান্তার কারণে বিসর্জন দিতে মনস্থ করে সে শরণ নেয় তার সেই শক্তি-ভাণ্ডারের যা দিয়ে সে মানুষজনকে সম্মত করে, শরণ নেয় তার উদার ও অবদমিত কোমলতার। কিন্তু তারপরেও মন গলাতে পারে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারান্তার। অগাস্টের এক বিকেলে নিজের জেদের গুরুভারে অতিষ্ঠ হয়ে আমারান্তা তার নাছোড়বান্দা প্রেমিককে নিজের শেষ জবাব দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজার খিল লাগিয়ে দেয়, যাতে মরণ না আসা পর্যন্ত কেঁদেকেটে পার করে দিতে পারে সে তার নিঃসঙ্গতাটুকু।

সে তাকে বলে, 'চলো আমরা এক অন্যকে ভুলে যাই। এ-ধরনের ব্যাপার-স্যাপার আমাদের বয়েসে মানায় না।'

সেই বিকেলে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কাছ থেকে টেলিগ্রাম মারফত একটা ডাক পায় কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস। আলাপটা গৎবাঁধা, থম মেরে থাকা যুদ্ধটায় কোনো পরিবর্তন আনার মতো কিছু নয়। আলাপের শেষ দিকে, ফাঁকা রাস্তা আর অ্যালমন্ড গাছের স্ফটিকজলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে হারিয়ে ফেলে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস।

বিষণ্ন মনে চাবি টিপে সে বলে, 'অরেলিয়ানো, মাকান্দোতে এখন বৃষ্টি হচ্ছে।'

লাইনে দীর্ঘ নীরবতা। হঠাৎ কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার তরফ থেকে নির্দয় কিছু অক্ষর নিয়ে প্রাণ পেয়ে ওঠে যন্ত্রটা।

সিগনালে লেখা ফুটে ওঠে, 'গাধার মতো কথা বলিস না, জেরিনাল্‌দো। অগাস্ট মাসে বৃষ্টি হবে সেটাইতো স্বাভাবিক।'

এতো দীর্ঘদিন দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও নেই যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার প্রতিক্রিয়ার উগ্রতায় আহত বোধ করে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস। দু'মাস পর যখন কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া মাকোন্দোয় ফিরে আসে তখন তার সেই আহত দশা পরিণত হয় হতবুদ্ধিকর বিস্ময়ে। এমনকি উরসুলা পর্যন্ত চমকে যায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া কতটা বদলে গেছে তাই দেখে। কোনো শোরগোল না তুলে, কোনো এসকর্ট না নিয়ে, গরমের মধ্যেও গায়ে একটা আলখাল্লা চাপিয়ে হাজির হয় সে, সঙ্গে তিন রক্ষিতা, তাদেরকে সে একই বাড়িতে রাখে, আর দিনের বেশিরভাগ সময় সেখানেই একটা দোলখাটিয়ায় শুয়ে দিন কাটাতে থাকে। রুটিন অপারেশনের খবরাখবর নিয়ে আসা টেলিগ্রাফিক ডিসপ্যাচগুলো সে পড়তো না বললেই চলে। কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস একবার একটা জায়গা থেকে লোকজন সরিয়ে নেবার ব্যাপারে তার নির্দেশ চাইতে যায়, সীমান্তের ওই জায়গায় যুদ্ধ বেঁধে গেলে ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ানোর আশংকা ছিল। তো, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাকে হুকুমের সুরে বলে, 'ছোটখাটো ব্যাপারে আমাকে জ্বালাতন করিস না। ঐশ্বরিক বিধানে কী বলা আছে দেখে নে।'

অথচ তখন সম্ভবত যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত। উদারপন্থী দলের ভূ-স্বামীরা, প্রথমে যারা বিপ্লবের পক্ষ নিয়েছিল, তারা রক্ষণশীল ভূ-স্বামীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছে, যাতে সম্পত্তির মালিকানা বদলটা থামানো যায়। নির্বাসন থেকে যেসব রাজনীতিবিদ যুদ্ধের জন্যে টাকা-পয়সা পাঠাতো তারা প্রকাশ্যেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার দুরূহ লক্ষ্যের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু তাদের এই অনুমোদন ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারটিও তাকে বিচলিত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তার লেখা কবিতার পাঁচ পাঁচটা ভল্যুম বিস্মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল একটা তোরঙ্গের তলায়, সেগুলো পড়ারও কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি তার মধ্যে। রাতে বা সিয়েস্তার সময় সে তার তিন রমণীর একজনকে দোলখাটিয়ায় ডেকে নিয়ে আদিম ক্ষুধা মিটিয়ে একেবারে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতো পাথরের মতো। সেই সময় কেবল তারই জানা ছিল যে তার এলোমেলো মনটা চিরদিনের জন্যে অনিশ্চয়তার অভিশাপ-লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। গোড়ার দিকে, তার প্রত্যাবর্তনের গৌরব, তার অসাধারণ সব বিজয়ে মদালস হয়ে সে উঁকি মেরেছিল মহত্ত্বের অতল গহ্বরে। যার চামড়ার পোশাক আর বাঘের থাবা বয়স্কদের সম্মান আর ছোটদের ভীতি মেশানো শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল, সমরকৌশলের ব্যাপারে তার সেই মহান শিক্ষক মার্লবোরোর ডিউককে নিজের ডান পাশে রাখতে পেরে সুখ অনুভব করেছিল সে। এই সময়টাতেই সে সিদ্ধান্ত নেয় কোনো মানুষ, এমনকি উরসুলাও তার দশ ফুটের বেশি কাছে আসতে পারবে না। তার সহকারীরা যে-বৃত্তটা এঁকে দিতো, যে-বৃত্তে সে ছাড়া আর কেউ-ই ঢুকতে পারতো না, সেই বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত হুকুমের মাধ্যমে সে ঠিক করতো বিশ্বের বরাতে কী ঘটবে, সে-কথার ওপর আর কোনো কথা চলতো না। জেনারেল মনকাদাকে গুলি করে মারার পর প্রথমবারের মতো মানাউরে গিয়েই সে ছোটে লোকটার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে, কিন্তু বিধবা মহিলা চশমা, মেডাল, ঘড়ি আর আংটিটা গ্রহণ করলেও তাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয় না। সে বলে, 'তোমাকে আমি ভেতরে আসতে দিচ্ছি না, কর্নেল। যুদ্ধ তোমার হুকুমে চলতে পারে, কিন্তু আমার বাড়ি চলে আমার হুকুমে।'

চেহারায় রাগের কোনো চিহ্ন ফোটে না কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার, কিন্তু তার দেহরক্ষীরা বিধবা মহিলার বাড়িতে লুটতরাজ চালিয়ে সেটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার পরেই কেবল মনটা শান্ত হয় তার। কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস তখন তাকে বলে, 'নিজের দিকে একটু তাকিয়ে দেখো, কর্নেল। জীবিত অবস্থাতেই পচন ধরেছে তোমার মধ্যে।' এই সময়েই প্রধান প্রধান বিদ্রোহী কমান্ডারের দ্বিতীয় সমাবেশ ডাকে সে। সব ধরনের চরিত্রেরই দেখা পায় সে ওখানে: আদর্শবাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দুঃসাহসী, সমাজের ওপর ক্ষুব্ধ, এমনকি মামুলি অপরাধী পর্যন্ত। ওখানে সে এমনকি এক সাবেক রক্ষণশীল কর্তাব্যক্তিকেও পেয়ে যায়, লোকটা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তহবিল তছরুপের অভিযোগের বিচারের হাত থেকে রেহাই পেতে। এদের অনেকেই জানে না তারা কেন যুদ্ধ করছে। এই বারোয়ারি ভিড়ের মধ্যে, যেখানে মূল্যবোধের ফারাকগুলো প্রায় একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে আলাদা করে তার নজর কাড়ে এক বিষণ্ন লোক: জেনারেল তিওফিলো ভার্গাস। গায়ে তার নিখাদ ইন্ডিয়ান রক্ত, অবাধ্য, নিরক্ষর, তাছাড়া লোকটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ধূর্তামী আর মানবজাতির ত্রাণকর্তাসুলভ একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোভাবও রয়েছে যা তার লোকজনের মধ্যে একটা উন্মত্ত গোঁড়ামী জাগিয়ে তুলতো। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সম্মেলনটা ডাকে রাজনীতিবিদদের ছলা-কলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কমান্ডারদের এক করার উদ্দেশ্যে। এদিকে জেনারেল তিওফিলো ভার্গাস এগিয়ে আসে তার উদ্দেশ্য নিয়েঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপেক্ষাকৃত যোগ্য কমান্ডারদের কোয়ালিশনটা ভেঙে দিয়ে নিজের হাতে নিয়ে নেয় সে আসল কর্তৃত্বটা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার অফিসারদের বলে, 'লোকটা একটা বুনো জানোয়ার, ওকে চোখে চোখে রাখা উচিত। যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের জন্যে যতটা না, তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক ও আমাদের জন্যে।' সেই মুহূর্তেই, ভীরুতার জন্যে বিখ্যাত একেবারে তরুণ এক অফিসার একটা সতর্ক তর্জনী উঁচু করে। সে বলে, 'ব্যাপারটা খুব সরল, ক্যাপ্টেন। লোকটার লাশ ফেলে দিতে হবে।' প্রস্তাবটা যে কী রকম ঠাণ্ডাভাবে দেয়া হয় তা দেখে নয় বরং সেকেণ্ডের ভগ্নাংশমাত্র আগেই সেটা কী করে তার নিজের চিন্তাটা আগাম বলে দেয় তাই দেখে রীতিমত চমকে ওঠে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।

সে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই আশা করো না যে এমন একটা আদেশ আমি দেবো।'

তা সে দেয় না ঠিকই, কিন্তু দুই হপ্তা পর এক চোরা-গোপ্তা হামলায় মেশেটি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয় জেনারেল তিওফিলো ভার্গাসকে, আর তখন কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া প্রধান কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেয়। বিদ্রোহী কমান্ডাররা যে-রাতে তার কর্তৃত্ব মেনে নেয় সেই রাতেই ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে একটা কম্বল চায় সে চিৎকার করে। তার হাড়গোড় গুঁড়োগুঁড়ো করে দেয়া, এমনকি সূর্যের তাপের ভেতরেও তাকে জেরবার করে ফেলা একটা আভ্যন্তরীণ হিম বেশ ক'মাস তাকে ঘুমোতে দেয় না, যদ্দিন পর্যন্ত না অনিদ্রাটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। অস্বস্তির ঢেউগুলোর নিচে পড়ে ক্ষমতার মাদকতা টুটে যেতে শুরু করে। তরুণ যে-অফিসার জেনারেল তিওফিলো ভার্গাসকে খুন করার প্রস্তাবটা পেড়েছিল তাকে গুলি করে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করে সে, হিমটার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। সে এমনকি হুকুম দেয়ার আগেই সেগুলো তামিল হয়ে যেতে থাকে, এমনকি সেগুলোর কথা সে চিন্তা করার আগেই, আর সেগুলো দিয়ে সে যেসব কাজ করাতে চাইতো তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে ফেলতো তারা। নিজের অগাধ ক্ষমতার নিঃসঙ্গতায় ডুবে গিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া পথ হারাতে শুরু করে। পাশের সব গ্রামের লোকেরা যখন তাকে দেখে হর্ষধ্বনি দিতো, বিরক্ত হতো সে, ভাবতো, ঐ একই হর্ষধ্বনি তারা তার শত্রুকেও দেয়। সবখানেই তার সঙ্গে দেখা হতো বয়োসন্ধির কিশোরদের, তারা তার দিকে চেয়ে থাকতো তার নিজের চোখ দিয়ে, কথা বলতো তার নিজের কণ্ঠ দিয়ে, সে নিজে যে-অবিশ্বাস নিয়ে তাদের সম্ভাষণ জানাতো ঠিক একই অবিশ্বাস নিয়ে তারাও তাকে সম্ভাষণ জানাতো, আর তারা বলতো তারা তার ছেলে। তার মনে হতো সে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, হয়ে গেছে সংখ্যায় বহু, অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গ। তার স্থির বিশ্বাস জন্মায় তার অফিসাররা তার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। মার্লবোরোর ডিউকের সঙ্গে পর্যন্ত যুদ্ধ হয় তার। এ-সময় সে বলতো, 'মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হচ্ছে সে যে এই মাত্র মারা গেছে।' অন্তহীন এই যুদ্ধের অনিশ্চয়তা আর দুষ্টচক্র তাকে তিতিবিরক্ত করে তোলে, আর এই যুদ্ধটা তাকে সব সময়ই আবিষ্কার করতো ঠিক একই জায়গায়, কিন্তু প্রতিবারই আগেরবারের চেয়ে বুড়োটে, ক্লান্ত, এমনকি আরো বেশি করে এমন এক অবস্থায় যেখানে সে কিছুই জানে না, কেন, কিভাবে, এমনকি কখন। চকখড়ি দিয়ে আঁকা বৃত্তটার বাইরে কেউ না কেউ সবসময়ই দাঁড়িয়ে থাকতো। এমন কেউ যার হয়তো টাকা দরকার, যার ছেলের হুপিং কাশি হয়েছে, অথবা এমন কেউ যে রণে ভঙ্গ দিয়ে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়তে চায়, কারণ তার মুখের ভেতরে যুদ্ধের বিষ্ঠার গন্ধ সে আর সহ্য করতে পারছে না, কিন্তু তারপরেও সটান খাড়া হয়ে থাকতো তারা তাকে একথা জানাবার জন্যে যে 'সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছে, কর্নেল।' আর সব কিছুর এই স্বাভাবিকভাবে চলাটাই অন্তহীন যুদ্ধটার সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার: কিছুই ঘটছে না কখনো। তার মৃত্যু পর্যন্ত যে-হিমটা তার সঙ্গী হয়ে থাকবে সেটার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার সবচেয়ে পুরনো স্মৃতিগুলোর উষ্ণতার ভেতর শেষ আশ্রয় খুঁজে নেয়, কারণ তখন সে নিঃসঙ্গ, তার পূর্ববোধগুলো তাকে ছেড়ে গেছে। তার আলসেমি এমনই ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছোয় যে যুদ্ধের অচলাবস্থা নিয়ে আলাপ করার জন্যে তার দল থেকে একটা কমিশন এসে পৌঁছুবার খবর তার লোকেরা তাকে জানাতে সে এমনকি ঘুম থেকে পুরোপুরি না উঠেই পাশ ফিরে শুয়ে বলে ওঠে:

'ওদেরকে বেশ্যাগুলোর কাছে নিয়ে যাও।'

ওরা বলতে ফ্রক কোট আর টপ হ্যাট পরা জনা ছয় উকিল, নভেম্বরের সূর্যের রুদ্ররোষ কঠোর নিস্পৃহতার সঙ্গে সহ্য করে যায় তারা। উরসুলা তার বাড়িতে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই কাটায় তারা শোবার ঘরের ভেতর রুদ্ধদার বৈঠক করে, আর সন্ধ্যা হতেই পথ দেখানোর মতো একজন আর জনা কয়েক অ্যাকোর্ডিয়ানবাদক চেয়ে নিয়ে কাতারিনোর দোকানটায় গিয়ে আসর জমায়। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আদেশ করে, 'ওদের একা থাকতে দাও। শত হলেও আমিতো জানি ওরা কী চায়।' ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকারপর্বটা এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, অথচ অনেকেই ভেবে রেখেছিল সেটা হবে একটা অন্তহীন বিতর্কের আসর।

গরম সেই বৈঠকখানায়, সাদা চাদরে ঢাকা পিয়ানোলার অপচ্ছায়াটার পাশে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া কিন্তু এবার আর তার লোকজনের আঁকা চকখড়ির বৃত্তটার ভেতর বসে না। বসে তার রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের মাঝে একটা চেয়ারে, চুপচাপ শুনে যায় দূতদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবগুলো উলের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে। প্রথমে তারা বলে, সে যদি সম্পত্তির পুনর্বন্টন বন্ধ করে তাহলে উদারপন্থী ভূস্বামীরা তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থন দেবে। এরপর তারা বলে, সে যাজকদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করলে ক্যাথলিক সম্প্রদায় তার পেছনে থাকবে। আর সবশেষে তারা বলে, সে যেন পরিবারের পবিত্রতা বজায় রাখার স্বার্থে অবৈধ আর জারজ সন্তানদের সম অধিকারের কথা ভুলে থাকে।

দাবিগুলো পড়ে শোনানো হয়ে যাওয়ার পর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া মুচকি হেসে বলে, 'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, যে-জিনিসটার জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি তা হল ক্ষমতা।'

প্রতিনিধি দলের একজন জবাবে বলে, 'এগুলো হল কৌশলগত পরিবর্তন। এই মুহূর্তে আসল কাজ হচ্ছে যুদ্ধের জনসমর্থনটা বাড়ানো। এরপর আবার নজর দেয়া যাবে এদিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার এক রাজনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'এটা কিন্তু পরস্পরবিরোধী কথা হলো। এই পরিবর্তনগুলো যদি ভালো হয় তার মানে দাঁড়ায় রক্ষণশীল সরকার ভালো। আপনাদের কথা মতো আমরা যদি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জনসমর্থন বাড়াতে সফল হই তার অর্থ দাঁড়ায় সরকারের একটা ব্যাপক জনমর্থন রয়েছে। সংক্ষেপে তার অর্থ হল, বিশ বছর ধরে আমরা জাতির সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।' তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ইঙ্গিতে থেমে গেলেন তিনি।' সে বলে, 'সময় নষ্ট কোরো না ডাক্তার। মোদ্দা কথা হল, এখন থেকে আমরা কেবল ক্ষমতার জন্যেই যুদ্ধ করে যাবো।' হাসতে হাসতেই প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দেয়া কাগজ-পত্রে সই করার জন্যে তৈরি হয় সে।

AMARBOI.COM

শেষে বলে, 'ব্যাপারটা যখন এই, তাহলে তা মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই আমাদের।'

তীব্র কষ্ট নিয়ে একে অন্যের দিকে তাকায় তার লোকজন।

কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস নিচু গলায় বলে ওঠে, 'ক্ষমা করবেন, কর্নেল, কাজটা কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া শূন্যে তুলে ধরে কালিভরা কলমটা, তারপর তার কর্তৃত্বের গোটা ভারটা নামিয়ে আনে সেটার ওপর।

'তোমরা তোমাদের অস্ত্র জমা দাও।' হুকুমের সুরে সে বলে।

উঠে দাঁড়ায় কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস। তার সাইড আর্মস রেখে দেয় টেবিলের ওপর।

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাকে হুকুম করে, 'ব্যারাকে গিয়ে রিপোর্ট করো। তারপর বিপ্লবী আদালতের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করো।'

এরপর ঘোষণাটায় সই করে দেয় সে, তার কাগজগুলো দূতদের কাছে দিয়ে বলে, 'এই যে তোমাদের কাগজপত্র। আশা করি এসব তোমাদের কিছু সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দেবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ক্ষমাপ্রদর্শনের অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত না করে দোলখাটিয়ায় শুয়ে থাকে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগের রাতে, তাকে বিরক্ত করার আদেশ পায়ে দলে, শোবার ঘরে তার সঙ্গে দেখা করে উরসুলা। কালো কাপড়ে নিজেকে মুড়ে, দুর্লভ এক গাম্ভীর্য নিয়ে, সাক্ষাৎপর্বের পুরো তিনটি মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে সে। 'আমি জানি জেরিনাল্দোকে তুই গুলি করে মারতে যাচ্ছিস,' শান্ত গলায় বলে ওঠে সে, 'আর সে-ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারবো না। কিন্তু তোকে একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি আমি। ওর লাশটা দেখামাত্র, আমার বাপ-মার মরা হাড়গোড়ের কসম, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার স্মৃতির কসম, ঈশ্বরের কসম, যেখানেই লুকিয়ে থাকিস না কেন, তোকে খুঁজে বের করে আমি আমার এই দুই হাত দিয়ে খুন করব তোকে।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে উরসুলা এই বলে শেষ করে: 'শুয়োরের লেজ নিয়ে জন্মানোর সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই।' কোনোমতেই ফুরোতে না-চাওয়া সেই রাতে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস যখন আমারন্তার সেলাই-ঘরে তার নির্জীব বিকেলগুলোর কথা ভাবছে, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া নিজের নিঃসঙ্গতার কঠিন খোলসটা ভাঙার জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরে আঁচড় কেটে যায়। তার বাবার সঙ্গে গিয়ে যেদিন সে বরফ দেখেছিল, সেই দূর বিকেলের পর থেকে তার একমাত্র সুখের মুহূর্তগুলো কেটেছে তার রুপোর কাজ করার কামারশালায়, যেখানে সে সময় কাটিয়েছে ছোট ছোট সোনার মাছি জোড়া লাগিয়ে। বত্রিশটা যুদ্ধের সলতেয় আগুন ধরাতে হয়েছে তাকে, মৃত্যুর সঙ্গে করা তার চুক্তিগুলোর সব ক'টাকে ভাঙতে হয়েছে, আর প্রায় চল্লিশ বছর পর গৌরবের গোবরগাদায় পশুর মতো গড়াগড়ি দিতে হয়েছে সরলতার সুবিধেগুলো কী তা জানার জন্যে।

ভোরবেলা, পীড়াদায়ক রাত-জাগার ফলে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার এক ঘণ্টা আগে সেলে গিয়ে হাজির হয় সে। কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসকে বলে, 'প্রহসনের পালা শেষ, দোস্ত। ভেতরের মশাগুলো তোর দফারফা করার আগে চল, বেরিয়ে পড়া যাক।' নিজের ভেতরে তৈরি হওয়া অবজ্ঞাটাকে চেপে রাখতে পারে না কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস।

সে জবাব দেয়, 'না, অরেলিয়ানো। তোকে একটা রক্তখেকো স্বৈরাচারীতে পরিণত হতে দেখার চাইতে আমি বরং মরতেও রাজি আছি।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে, 'তা তোকে দেখতে হবে না। জুতোজোড়া পরে নে, তারপর এই জঘন্য যুদ্ধের শেষটা দেখতে হাত লাগা আমার সঙ্গে।'

কথাটা বলার সময় সে জানতো না যে যুদ্ধ শুরু করা যতো সহজ, শেষ করা তার চাইতে অনেক কঠিন। বিদ্রোহীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন শান্তির শর্তের প্রস্তাব দেয়াতে সরকারকে বাধ্য করতে তার প্রায় এক বছরের হিংস্র আর রক্তাক্ত প্রয়াসের দরকার পড়ে। তারপর, ওগুলো মেনে নিলে কী কী সুবিধা হবে সেই কথা তার নিজের লোকদের বোঝাতে চলে যায় আরো একটা বছর। তার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসারদের বিদ্রোহ দমাতে গিয়ে নিষ্ঠুরতার এমন চূড়ান্তে পৌঁছে যায় সে যা চিন্ত াও করা যায় না, প্রতিরোধ গড়ে তোলা আর বিজয়ের ঘোষণা দেয়া এইসব অফিসারদের পক্ষে আনতে শেষতক শত্রুবাহিনীর শরণ নিতে হয় তাকে।

এত বড় যোদ্ধা আগে কখনো ছিল না সে। শেষ পর্যন্ত যে সে তার নিজের মুক্তির জন্যেই লড়ছে, কোনো বিমূর্ত আদর্শের জন্য নয়, রাজনীতিবিদরা যেসব স্লোগান পরিবেশ-পরিস্থিতি-মোতাবেক ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফেলে সে-সবের জন্য নয়, এই নিশ্চয়তা তাকে এক প্রবল উদ্দীপনায় ভরে দেয়। কর্নেল জেরিনালদো মার্কেস, যে-কিনা এর আগে সে যে দৃঢ় বিশ্বাস আর আনুগত্য নিয়ে বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করেছে ঠিক সেই পরিমাণ বিশ্বাস আর আনুগত্য নিয়ে এবার পরাজয়ের জন্য যুদ্ধ করছে, সে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে তার অর্থহীন হঠকারিতার জন্যে ভর্ৎসনা করতো। উত্তরে মৃদু হেসে সে বলতো, 'ঘাবড়াস্‌না। লোকে যা ভাবে মরাটা তার চেয়ে ঢের কঠিন।' তার বেলায় কথাটা সত্যি। তার মৃত্যুর দিন যে নির্দিষ্ট করা আছে এই নিশ্চয়তা তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অব্দি একটা রহস্যজনক নিরাপত্তা, একটা অমরতা দেয়, আর সেটা যুদ্ধের নানান ঝুঁকির হাত থেকে নিরাপদ রাখে তাকে, আর শেষ অব্দি এমন এক পরাজয় অর্জনের অনুমতি দেয় যে-পরাজয় বিজয়ের চেয়ে আরো অনেক কঠিন, আরো অনেক রক্তাক্ত আর মূল্যবান।

যুদ্ধের এই প্রায় বিশ বছরে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বহুবার বাড়িতে এসেছে, কিন্তু যে-তাড়াহুড়োর মধ্যে সে সবসময় পৌঁছুতো, সামরিক যে-দলবল ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকতো, তার চারপাশে কিংবদন্তীর যে প্রভা জ্বলতো যা এমনকি উরসুলাও টের পেতো, এ-সমস্ত কিছু শেষ পর্যন্ত একটা আগন্তুকে পরিণত করে ফেলে তাকে। শেষ যে-বার সে মাকোন্দোতে ছিল, আর তার তিন রক্ষিতার জন্যে ঘর নিয়েছিল একটা, সেবার তাকে তার নিজের বাড়িতে দেখা গেছে মাত্র দু'-তিনবার, যখন সেখানে খাওয়ার দাওয়াত কবুল করার মতো সময় মিলেছে তার। সুন্দরী রেমেদিওস আর যুদ্ধের মাঝামাঝি জন্ম নেয়া দুই যমজ ভাই তাকে চেনেই না বলতে গেলে। তার যে-ভাইটি ছোট ছোট সোনার মাছ তৈরি করে বয়োসন্ধিকাল পার করেছে তার ছবির সঙ্গে পৌরাণিক সেই যোদ্ধার ছবি আমারান্তা কিছুতেই মেলাতে পারে না যে-যোদ্ধা কিনা তার নিজের আর বাকি মানবতার মধ্যে দশ ফুটের একটা দূরত্ব তৈরি করেছিল। কিন্তু যুদ্ধবিরতির সময় ঘনিয়ে আসার খবরটা যখন জানাজানি হয়ে যায় আর ওরা ভাবে যে সে বুঝি শেষ পর্যন্ত তার নিজের লোকজনের অন্তরের কাছে আবার মানুষ হয়ে ফিরে আসবে, তখন এতো দীর্ঘ সময় ধরে সুপ্ত থাকা পারিবারিক অনুভূতিগুলো আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে।

উরসুলা বলে ওঠে, 'বাড়িতে শেষ পর্যন্ত একজন পুরুষ মানুষ পাবো আমরা।'

তাকে যে তারা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে সে-সন্দেহটা যার মনে প্রথম জাগে সে আমারান্তা। যুদ্ধ বিরতির এক হপ্তা আগে, কোনোরকম এসকর্ট ছাড়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিন সে বাড়িতে আসে—আগে আগে খালি-পা দুই আর্দালী নিয়ে, তারা বারান্দায় খচ্চরের পিঠ থেকে নামিয়ে রাখে জিন আর তার কবিতার খাতা ভর্তি তোরঙ্গটা, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সাবেক কালের রাজকীয় লটবহরের অবশিষ্টাংশ—সেদিন তাকে সেলাই ঘরের পাশ দিয়ে যেতে দেখে ডেকে ওঠে আমারান্তা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কষ্টই হয় তাকে চিনতে।

'আমি আমারান্তা,' খোশ-মেজাজে বলে ওঠে সে, খুব খুশি হয়েছে লোকটা ফিরে আসায়; তারপর কালো পট্টি-বাঁধা হাতটা দেখায় তাকে। 'এই দেখো।'

মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে মাকোন্দোতে ফিরে এসে অনেক আগের সেই সকালে হাতে পট্টি বাঁধা অবস্থায় প্রথমবারের মতো আমারান্তাকে দেখে সে যেভাবে হেসেছিল ঠিক সেই রকম একটা হাসি হাসে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।

সে বলে, 'কী ভয়ংকরভাবেই না চলে যায় সময়।'

নিয়মিত বাহিনীকে বাড়িটার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নিতে হয়। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া পৌঁছয় বিস্তর অপমানের মধ্যে, লোকের থুথু গায়ে নিয়ে, আরো ভালো একটা দামে বিক্রি করে দেয়ার জন্য যুদ্ধটাকে লম্বা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। জ্বরে ঠাণ্ডায় কাঁপছিল সে, আর তার বগলতলায় ফের দগদগ করছিল ঘা। ছয় মাস আগে, যুদ্ধ বিরতির কথা কানে আসায় বিয়ের ঘরটা খুলে ঝাড়পোছ করেছিল উরসুলা, এই ভেবে ঘরের কোনায় কোনায় মস্তকি জ্বালিয়েছিল যে রেমেদিওসের ধুলো পড়া পুতুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে বুড়ো হওয়ার জন্যে হয়তো ফিরে আসবে সে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, গত দু'বছর ধরে জীবনের কাছে তার পাওনা শোধ করেছে সে, এই বুড়ো হওয়ার ব্যাপারটাও সেটার অন্তর্ভুক্ত। উরসুলা বিশেষ যত্ন নিয়ে সাফসুতরো করে রেখেছিল রুপার দোকানটা, সেটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া খেয়ালও করে না যে চাবিগুলো তালার সঙ্গে ঝুলছে। সময় যে কী সূক্ষ্ম আর ভীষণভাবে বাড়িটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে সেটা তার নজরে পড়ে না, অথচ নিজের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে এমন যে কারো তা নজরে পড়তো, এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরেও। দেয়ালের চুনকাম খসে পড়া বা কোনায় কোনায় ময়লা, তুলোর মতো মাকড়সার জাল কিংবা বেগনিয়া ফুলগুলোর ওপর জমা ধুলো অথবা উইপোকা অধ্যুষিত কড়িকাঠে রেখে যাওয়া ফাটল, বা কব্জার ওপর জমা শেওলা বা স্মৃতিকাতরতা তার জন্যে যেসব ছলনাভরা ফাঁদ পেতে রেখেছে তার একটিও তাকে পীড়িত করতে পারে না। গায়ে কম্বল জড়িয়ে, পায়ের কালো বুট জোড়া না খুলেই বারান্দায় বসে পড়ে সে, ভাবখানা যেন বৃষ্টি থামলেই উঠে পড়বে, কিন্তু সারাটা বিকেলই বেগনিয়াফুলগুলোর ওপর ঝরে পড়া বৃষ্টি দেখে যায় সে। উরসুলা তখন বুঝে ফেলে বেশিক্ষণ সে বাড়িতে থাকছে না। সে ভাবে, 'এর কারণ যদি যুদ্ধ না হয়ে থাকে তাহলে তা নির্ঘাৎ মরণ।' অনুমানটা এমনই নিখুঁত আর বিশ্বাসযোগ্য যে এটাকে তার একটা পূর্ববোধের মতোই মনে হয়।

যাকে অরেলিয়ানো সেগান্দো বলে মনে করা হয় সে, সেই রাতে খাওয়ার সময়, ডান হাতে তার রুটি ছেঁড়ে আর স্যুপটা খায় বাঁ হাতে ধরে। তার যমজ ভাই, যাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসে আর্কাদিও সেগান্দো বলে মনে করা হয় সে তার রুটি ছেঁড়ে বাঁ হাতে আর স্যুপটা খায় ডান হাতে ধরে। তাদের এই সমন্বয় এমনই নিখুঁত হয় যে তাদেরকে মুখোমুখি বসে থাকা দুই ভাই মনে না হয়ে বরং আয়নার খেলা বলে মনে হয়। যমজ দু'জন যখন বুঝতে পেরেছিল তারা একই রকম তখনই এই খেলাটার কথা মাথায় এসেছিল তাদের। এবার সদ্য আগত লোকটির সম্মানে সেটা আবার করে দেখায় তারা। কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সেটা খেয়াল করে না। সবকিছু থেকেই তাকে এতো দূরের মনে হয় যে এমনকি সুন্দরী রেমেদিওস গোসলখানায় যাওয়ার সময় যখন তার পাশ দিয়ে নগ্ন হয়ে হেঁটে যায় সে খেয়াল করে না। তার এই আত্মমগ্নতাতে বাগড়া দিতে সাহস করে উঠতে পারে কেবল উরসুলাই।

রাতের খাবারের মাঝপথে সে বলে ওঠে, 'তোকে যদি আবার যেতেই হয় তাহলে অন্তত আজ রাতে আমরা কেমন ছিলাম সেকথা মনে রাখার চেষ্টা করিস।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তখন বিন্দুমাত্র অবাক না হয়েই উপলব্ধি করে উরসুলাই একমাত্র মানুষ যে তার দুঃখ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। আর তখন, বহু বছর পর সে তার মুখের দিকে তাকায়। উরসুলার মুখটা চামড়ার মতো শক্ত, দাঁত ক্ষয়ে গেছে, চুলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে গেছে, চোখে ভয়-পাওয়া দৃষ্টি। উরসুলা সম্পর্কে তার সবচেয়ে পুরনো স্মৃতির সঙ্গে তাকে তুলনা করে দেখে সে, সেই বিকেলের স্মৃতির সঙ্গে যেদিন সে আগে থেকেই বুঝতে পারছিল যে এক গামলা গরম স্যুপ টেবিল থেকে পড়ে যাবে, আর তখন তার মনে হয় উরসুলা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের দৈনন্দিন জীবন উরসুলার উপর যে ঘা, ক্ষত আর দাগ রেখে গেছে, এক মুহূর্তের মধ্যে তা ধরা পড়ে যায় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কাছে, আর তখন সে অনুভব করে সে-সব ক্ষতি তার মনে কোনো করুণার অনুভূতিও জন্ম দিতে পারছে না। তখন সে একটা শেষ চেষ্টা চালায় তার মনের সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার যেখানে তার ভালোবাসা পচে-গলে গিয়েছে, কিন্তু বৃথাই। আরেকবার তার নিজের গায়ে উরসুলার গন্ধ পেয়ে অবশ্য খানিকটা লজ্জার একটা তালগোল পাকানো অনুভূতি হয় তার মধ্যে, আর বেশ কয়েকবার তার মনে হয় যে, তার নিজের চিন্তাভাবনার মাঝখানে উরসুলার চিন্তা ঢুকে পড়ছে। কিন্তু ওগুলোর সবই যুদ্ধ ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকি তার বৌ রেমেদিওস-ও সে-সময় এমন একজন মানুষের ঝাপসা ছবিতে পরিণত হয়েছে যে কিনা তার মেয়েও হতে পারতো। প্রেমের মরুভূমিতে অগুনতি যে-মেয়েলোকের সঙ্গে তার চেনাজানা হয়েছিল, যারা তার বীজ উপকূল বরাবর ছড়িয়ে দিয়েছে, তারা তার অনুভূতিতে কোনো দাগই রেখে যেতে পারেনি। তাদের বেশিরভাগই অন্ধকারে তার কামরায় ঢুকে ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছে, আর তার পরদিন তার শরীরি স্মৃতিতে তারা স্রেফ একটা অবসাদের ছায়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সময় আর যুদ্ধ উজিয়ে একমাত্র যে-ভালোবাসাটা টিকে গেছে সেটা তার ভাই হোসে আর্কাদিওর জন্য তার ভালোবাসা, যখন তারা দু'জনেই ছিল শিশু, তবে সেই অনুরাগটার ভিত্তি কিন্তু ভালোবাসা নয়, সাহচর্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছু মনে করো না। ব্যাপারটা স্রেফ এই যে যুদ্ধ সব কিছু বিনাশ করে দিয়ে গেছে।' উরসুলার অনুরোধটা এড়িয়ে যায় সে এই বলে।

পরের দিনগুলোতে সে ব্যস্ত থাকে পৃথিবীতে তার পরিক্রমার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার কাজে। রুপোর কামারশালাটা সে এমনভাবে ভেঙে ফেলে যে যা রয়ে যায় সেগুলোর কোনো ব্যক্তিমালিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না, নিজের কাপড়গুলো দিয়ে দেয় আর্দালীদের, আর তারপর, তার বাবা প্রায়শ্চিত্তের যে-বোধ নিয়ে প্রুদেনসিও আগিলারের জান কেড়ে নেয়া বর্শাটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল ঠিক সেই ধরনের বোধ নিয়ে উঠোনে নিজের অস্ত্রগুলো মাটি চাপা দেয় সে। গুলিভরা একটা পিস্তল কেবল রেখে দেয় সে। বাইরের একটা বাতির আলোয় আলোকিত বৈঠকখানায় রাখা রেমেদিওসের দাগেরোটাইপ ছবিটা যখন সে নষ্ট করে ফেলতে যাচ্ছে, কেবল তখনই তাকে নিরস্ত করে উরসুলা। সে বলে, 'অনেক আগেই ছবিটা তোর হাতছাড়া হয়ে গেছে। এটা এখন একটা পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন।' যুদ্ধবিরতির আগের দিন, যখন তাকে মনে করিয়ে দেয়ার মতো একটা জিনিসও আর ঘরে নেই, কবিতার তোরঙ্গটা নিয়ে বেকারিতে চলে আসে সে, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ তখন চুলোটা ধরাতে যাচ্ছে।

হলদেটে কাগজের প্রথম রোলটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে তাকে বলে, 'এটা দিয়ে ধরাও। এগুলো পুরনো জিনিস, অন্য জিনিসের চেয়ে ভালো জ্বলবে।'

নিঃশব্দচারিণী, প্রসন্নময়ী সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ, যে-কিনা কাউকে কোনোদিন না বলেনি, এমনকি তার সন্তানদেরকেও নয়, তার কাছেও মনে হয় যে কাজটা করা উচিত হবে না।

'ওগুলো দরকারি কাগজ,' সে বলে।

'সে-রকম কিছু নয়,' কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে। 'ওগুলো হচ্ছে সেই সব জিনিস যা লোকে নিজেকেই লেখে।'

'তাহলে তুমি নিজেই পোড়াও, কর্নেল,' সে বলে।

সে যে কেবল তাই-ই করে তা নয়, ছোট একটা কুড়াল দিয়ে তোরঙ্গটাও ভেঙে টুকরোগুলো ফেলে দেয় আগুনে। কয়েক ঘণ্টা আগে পিলার তারনেরা এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। সে যে কতটা বুড়িয়ে গেছে, মোটা হয়েছে, কতটা ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দেখে এতো বছরের অদর্শনের পর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া চমকে উঠেছিল, কিন্তু তাস দেখে ভবিষ্যৎ গণনায় সে যে কতটা গভীরতা অর্জন করেছে সেটা দেখেও চমকে গিয়েছিল সে। পিলার তারনেরা তাকে বলেছিল, 'নিজের মুখের ব্যাপারে সাবধান থেকো,' আর তখন তার মনে হয় এর আগে সে তার গৌরবের শীর্ষে থাকাকালীন রমণীটি যে তাকে আরেকবার কথাটা বলেছিল সেটা তার নিয়তির ব্যাপারে একটা আশ্চর্য রকমের আগাম ভাবনা ছিল কিনা। এর খানিক পর তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক যখন তার ফোঁড়াগুলো দূর করে দেয়া শেষ করেছে, তেমন কোনো ঔৎসুক্য না দেখিয়ে সে তাকে জিজ্ঞেস করে হৃৎপিণ্ডটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের ঠিক কোন জায়গায়। ডাক্তার তখন স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনে, আয়োডিনে চোবানো এক খণ্ড তুলো দিয়ে তার বুকে একটা বৃত্ত এঁকে দেয়।

মঙ্গলবার, যুদ্ধ বিরতির সেই দিনটি শুরু হয় উষ্ণ আর বৃষ্টিস্নাত ভোরবেলা দিয়ে। পাঁচটার আগেই রান্নাঘরে এসে হাজির হয় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, বরাবরের মতোই খেয়ে নেয় তার চিনিছাড়া কালো কফি। উরসুলা তাকে বলে, 'এরকমই একটা দিনে দুনিয়াতে এসেছিলি তুই। সবাই একেবারে অবাক বনে গিয়েছিল তোর খোলা চোখ দেখে।' এসব কথা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কানে যায় না, তার মনোযোগ সৈন্যদের জমায়েত, শিঙ্গার আওয়াজ আর ভোরটাকে খান খান করে দেয়া কমান্ডের শব্দের দিকে। যদিও এতো বছরের যুদ্ধের পর এসব শব্দ তার কানে পরিচিত ঠেকার কথা, কিন্তু যৌবনে এক উলঙ্গ নারীর সামনে নিজের হাঁটুতে সে যে দুর্বলতা অনুভব করেছিল, তার গায়ের ত্বকে যে শিরশিরে ভাব বয়ে গিয়েছিল, এখনো ঠিক সে-রকম লাগে তার। শেষ পর্যন্ত, স্মৃতিকাতরতার ফাঁদে বন্দি হয়ে হতবিহ্বলের মতো সে ভাবে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে সে হয়তো এমন একটা মানুষ হতো যার অভিজ্ঞতায় যুদ্ধ বলতে কিছু থাকতো না, থাকতো না কোনো গৌরব বা সম্মান, সে হতো এক অখ্যাত শিল্পী, একটা সুখী জন্তু। সেই অপ্রত্যাশিত ধীরুজ শিহরণ তার সকালের নাশতাটা বিস্বাদ করে তোলে। সকাল সাতটায় কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস যখন একদল বিদ্রোহী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তাকে নিতে আসে, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে আগের চাইতে অনেক মিতবাক, আরো গম্ভীর আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় তার কাছে। একটা নতুন চাদর তার কাঁধে জড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে উরসুলা। বলে, 'সরকার কী ভাববে বল দেখি। ওরা মনে করবে, একটা আলোয়ান কেনার পয়সাও তোর পকেটে নেই, আর সেজন্যেই আত্মসমর্পণ করেছিস তুই।' কিন্তু চাদরটা সে নেয় না। তবে সে যখন দরজার কাছে পৌঁছয়, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার একটা ফেল্ট হ্যাট উরসুলা তার মাথায় পরিয়ে দিতে সে আর আপত্তি করে না।

তখন উরসুলা তাকে বললো, 'অরেলিয়ানো, দিব্যি করে বল, যদি দেখিস ওখানে সময়টা তোর জন্যে সুবিধের হবে না, তখন তুই তোর মায়ের কথা ভাববি?'

সব ক'টা আঙুল ছড়ানো একটা হাত তুলে উরসুলাকে নিস্পৃহ একটা হাসি উপহার দেয় সে, তারপর একটাও কথা না বলে বেরিয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি হয় চিৎকার, বিদ্রূপ আর গালাগালির, শহর ছাড়ার আগ পর্যন্ত সে-সব তার পিছু ছাড়ে না। দরজায় আগল দিয়ে দেয় উরসুলা, ঠিক করে ফেলেছে তার বাকি জীবনে আর কখনো সেটা খুলবে না। সে ভাবে, 'এখানেই পচে মরবো আমরা। পুরুষহীন এই বাড়িতে ছাই হয়ে যাবো সবাই, কিন্তু তারপরেও এই হতচ্ছাড়া শহরটাকে আমাদেরকে কাঁদতে দেখার মজা পেতে দেবো না।' তার ছেলের একটা স্মৃতির খোঁজে সবচেয়ে গোপন কোনাঘুপচিতে গোটা সকাল কাটিয়ে দেবার পরেও সে-রকম কিছুই খুঁজে পায় না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানটা হয় মাকোন্দো থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে বিরাট একটা সেইবা গাছের ছায়ায়, এই গাছকে ঘিরেই পরে পত্তন হবে নিয়ারলান্দিয়া শহরের। সরকার আর পার্টির ডেলিগেটদের আর অস্ত্র জমাদানকারী বিদ্রোহীদের কমিশনটার সামনে খাবার-দাবার পরিবেশন করে সাদা পোশাকপরা কোলাহলপূর্ণ একদল নবদীক্ষিত, তাদের দেখে মনে হয় যেন বৃষ্টি দেখে ভয় পাওয়া এক ঝাঁক ঘুঘু পাখি। সারা গায়ে কাদামাখা একটা খচ্চরের পিঠে চড়ে হাজির হয় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। দাড়ি কামায়নি সে, ফোঁড়ার ব্যথাতে যতো বেশি কষ্ট পেয়েছে, তার বিশাল স্বপ্নভঙ্গেও তা পায়নি, তার কারণ সব আশা-ভরশার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে সে, পৌঁছেছে এসে গৌরব আর গৌরবের স্মৃতিকাতরতার অপর পারে। তার ইচ্ছে অনুসারেই, কোনো সঙ্গীত, আতশবাজি, কানফাটানো ঘণ্টাধ্বনি, বিজয়ের শ্লোগান কিংবা অন্য কোনো শোভাযাত্রা যা যুদ্ধবিরতির শোকাবহ চরিত্রটা বদলে দিতে পারে সে-রকম কোনো কিছুর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারতো এরকম একমাত্র যে-ফটোটা এক ভ্রাম্যমাণ ফটোঅলা তুলেছিল তাকে বাধ্য করা হয় ডেভলপ না করেই প্লেটগুলো ভেঙে ফেলতে ।

দলিলপত্রগুলোতে সই করতে যতটা সময় লাগে, ঠিক ততক্ষণই স্থায়ী হয় অনুষ্ঠানটা। ডেলিগেটরা যেখানে বসেছে, সেই তালিমারা সার্কাসের তাঁবুর মাঝখানে রাখা যেনতেনপ্রকারে তৈরি টেবিলের চারপাশের অফিসাররাই কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার প্রতি বিশ্বস্ত শেষ লোকজন। সই দেয়ার আগে আত্মসমর্পণের ধারাটা পড়ে শোনাতে চেয়েছিল রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট-এর ডেলিগেট, কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাতে সায় দেয় না। সে বলে, 'আনুষ্ঠানিকতায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' তারপর, না পড়েই সই করতে উদ্যোগী হয়। তার এক অফিসার তাঁবুর ঘুম ধরানো নীরবতা ভঙ্গ করে।

সে বলে, 'কর্নেল, আমাদেরকে যেন প্রথমে সই না করতে হয় দয়া করে এই উপকারটুকু করুন।' কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাতে আপত্তি করে না। সই করা আর কাগজের ওপর কলমের অর্থহীন আঁকিবুকি কাটার মধ্যে তফাৎটা পর্যন্ত বলে দেয়া যাবে এমনই নিখাদ এক নীরবতার ভেতর কাগজপত্রগুলো যখন টেবিল ঘুরে আসছে তখনো প্রথম লাইনটা ফাঁকা, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সেই শূন্যস্থানটা পূরণের প্রস্তুতি নেয়।

তার আরেক অফিসার এই সময় বলে ওঠে, 'কর্নেল, এখনো কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার সময় আছে।'

মুখের অভিব্যক্তির এতটুকু বদল না ঘটিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া প্রথম কপিতে সই করে। শেষ কপিতে সই করা শেষ হয়নি তার, এমন সময় এক বিদ্রোহী কর্নেল দোরগোড়ায় হাজির হয় দুটো সিন্দুক ব'য়ে আনা একটা খচ্চর নিয়ে। যদিও বয়েসে নির্ভেজাল তরুণ সে, কিন্তু তার চেহারায় একটা শুকনো ভাব, চোখে-মুখে শান্ত অভিব্যক্তি। মাকোন্দো এলাকার বিপ্লবের কোষাধ্যক্ষ সে। যুদ্ধ বিরতির অনুষ্ঠানে সময়মত পৌঁছানোর জন্যে ছয় দিনের এক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে সে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়ে মরতে বসা খচ্চরটাকে টানতে টানতে। অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ সতর্কতার সঙ্গে সিন্দুক দুটো নামায় সে, খোলে সেটা, আর তারপর একটা একটা করে বাহাত্তরটা সোনার ইট টেবিলের ওপর রাখে। এই সম্পদের কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। আগের বছরের বিশৃঙ্খল অবস্থার সময় যখন সেন্ট্রাল কমান্ড ভেঙে পড়েছিল আর বিপ্লবটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নেতাদের একটা রক্তাক্ত রেষারেষি, সে-সময় দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গলিয়ে ইটের মতো বানিয়ে আগুনে পোড়ানো কাদামাটির প্রলেপ দেয়া সেই বিপ্লবের সোনার ওপর কারোরই নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেই বাহাত্তরটা সোনার ইট কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আত্মসমর্পণের সেই বিশদ তালিকায় ঢোকানোর ব্যবস্থা করে, তারপর কাউকে কোনো বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ না দিয়েই ইতি টেনে দেয় অনুষ্ঠানটার। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই নোংরা ছোকরা তার শান্ত সিরাপ-রঙা চোখে।

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাকে শুধোয়, 'আর কিছু?'

তরুণ কর্নেল-এর মুখটা এঁটে আসে।

সে বলে, 'রসিদ।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া নিজ হাতে সেটা লিখে দেয়। তারপর, নবদীক্ষিতদের পরিবেশন করা করা এক গ্লাস লেমোনেড আর একটা বিস্কুট খেয়ে একটা তাঁবুতে আশ্রয় নেয়, সে বিশ্রাম নিতে চাইতে পারে মনে করে তার জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল সেটা। ওখানে গিয়ে শার্টটা খুলে ফেলে সে, খাটের একপ্রান্তে গিয়ে বসে, আর তারপর বিকেল তিনটে-পনেরোয় পিস্তলটা নিয়ে, তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তার বুকে আয়োডিনের যে-বৃত্তটা এঁকে দিয়েছিল সেইখানটায় গুলি করে দেয়। দুধ জ্বাল হতে কেন এতো সময় লাগছে সেকথা ভাবতে ভাবতে মাকোন্দোতে সেই সময় উরসুলা চুলোর ওপর রাখা দুধের পাত্রটার ঢাকনা সরিয়ে নিয়ে দেখতে পায় সেটা পোকামাকড়ে কিলবিল করছে।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'অরেলিয়ানোকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

তার নিঃসঙ্গতার অভ্যাশবশত উঠোনের দিকে তাকায় সে, দেখতে পায় বৃষ্টিতে জবজবে হয়ে যাওয়া আর মারা যাওয়ার সময়ের চেয়েও বুড়োটে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াকে। আরো খেলাসা করে উরসুলা বলে, 'ওরা ওকে পেছন থেকে গুলি করেছে, এমনকি দয়া দেখিয়ে ওর চোখটা পর্যন্ত বুঁজে দেয়নি কেউ।' সন্ধ্যার সময়, আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা ধোঁয়া নিঃসৃত করে চলে যাওয়া দ্রুতগামী আর জ্বলজ্বলে কয়েকটা চাকতি দেখতে পায় সে তার অশ্রু ভেদ করে, তার কাছে সেগুলোকে মৃত্যুর ইশারা বলেই মনে হয়। চেস্টনাট গাছটার নিচে তার স্বামীর হাঁটুর কাছে বসে কেঁদে যাচ্ছে সে তখনো এমন সময় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে নিয়ে আসে লোকজন, গায়ে কম্বল মোড়া, শুকিয়ে আসা রক্তের কারণে শক্ত হয়ে আছে সেটা, কিন্তু তার চোখ দুটো খোলা, রাগে জ্বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপদ কেটে গেছে তার। গুলিটা এমনই একটা চমৎকার পথ ধরে গেছে যে ডাক্তার আয়োডিনে চোবানো একটা কর্ড তার বুকের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে সেটা পেছন দিক দিয়ে বের করে আনতে পেরেছিল। 'এটা আমার একটা সেরা কাজ,' আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলে উঠেছিল লোকটি। 'ওটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যেখান দিয়ে একটা গুলি কোনো ভাইটাল অর্গানের ক্ষতি না করে বেরিয়ে যেতে পারে।' কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আবিষ্কার করে, নবদীক্ষিতরা ঘিরে আছে তাকে, উন্মত্তের মতো স্রোত আউড়ে যাচ্ছে তার আত্মার শান্তির জন্যে, আর তখনই তার আফসোস হয় কেন সে যা করবে বলে ভেবেছিল তা করেনি, স্রেফ পিলার তারনেরার ভবিষ্যদ্বাণীকে বিদ্রূপ করার জন্যে হলেও টাকরায় গুলিটা চালায়নি।

ডাক্তারের উদ্দেশে সে বলে ওঠে, 'আমার হাতে যদি এখনো কর্তৃত্ব থাকতো তো আমি গুলি করে মারতাম তোমাকে। না, আমার জীবন বাঁচানোর জন্য না, আমাকে একটা বোকা সাজানোর জন্যে।'

তার মৃত্যুর এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনে। যে-লোকগুলো গপ্পো ফেঁদেছিল যে সে সোনার ইটের দেয়ালঅলা একটা ঘরের জন্যে যুদ্ধটা বেঁচে দিয়েছিল, ঠিক তারাই তার আত্মহত্যার চেষ্টাটাকে সম্মানজনক একটা কাজ হিসেবে ব্যাখ্যা করে তাকে শহীদ বলে ঘোষণা দেয়। তারপর, সে যখন তাকে দেয়া রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের অর্ডার অভ্ মেরিট খেতাব প্রত্যাখান করে, তখন তো তার সবচেয়ে ঘোরতর শত্রুরাও সার বেঁধে ঘরে ঢুকে যুদ্ধ বিরতিটা অস্বীকার করে নতুন একটা যুদ্ধ শুরু করতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে তাকে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া উপহারে ভরে যায় বাড়ি। শেষ পর্যন্ত তার প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের ব্যাপক সমর্থনে মুগ্ধ হয়ে তাদের খুশি করার সম্ভাবনাটা আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, বরং মাঝে মধ্যে একটা নতুন যুদ্ধের ধারণার ব্যাপারে তাকে এতোটাই উৎসাহী বলে মনে হয় যে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস ভাবে সে বোধহয় কেবল যুদ্ধটা ঘোষণা করার একটা ছুতোর অপেক্ষায় বসে আছে। সত্যি বলতে কি, ছুতো একটা পাওয়া-ও যায়, যখন রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট সাবেক যোদ্ধাদের, তা তারা উদারপন্থী-ই হোক বা রক্ষণশীল, তাদের কাউকেই কোনো ধরনের সামরিক অবসরভাতা বরাদ্দ দিতে অস্বীকার করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কমিশন সেটা পরীক্ষা করে দেখছে আর কংগ্রেস বরাদ্দটা অনুমোদন করছে। শুনে গর্জে ওঠে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। 'একি দৌরাত্ম্য? সেই চিঠিটা আসার অপেক্ষায় থেকে থেকে বুড়ো হয়ে মারা যাবে তো সবাই।' সে যাতে সেরে উঠতে পারে সেজন্যে উরসুলা যে-দোলখাটিয়া কিনে এনেছিল সেটা ত্যাগ করে এই প্রথমবার উঠে পড়ে সে, শোবার ঘরে পায়চারী করতে করতে রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের কাছে একটা কড়া চিঠি ডিক্টেট করে যায়। কখনোই জনসমপক্ষে প্রচার না করা সেই টেলিগ্রামে নিয়ারলান্দিয়া চুক্তি লংঘনের এই প্রথম ঘটনাটির নিন্দা জানায় সে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মর্মে হুমকি দেয় যে, দুই হপ্তার মধ্যে পেনশন বরাদ্দের ব্যাপারটার একটা সুরাহা না করলে আমৃত্যু যুদ্ধের ঘোষণা দেবে সে। তার অবস্থানটা এতোই যুক্তিসঙ্গত যে সেটা তাকে এমনকি তার প্রাক্তন রক্ষণশীল প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থনেরও আশা করতে সাহস যোগায়। কিন্তু জবাব হিসেবে সরকারের তরফ থেকে সাকুল্যে যা পাঠানো হয় তা হচ্ছে তার নিরাপত্তার অজুহাতে তার বাড়ির দরজায় বসানো সামরিক প্রহরা আরো জোরদার করার জন্যে বাড়তি সৈন্য, আর তার সঙ্গে কারোর দেখা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। সারা দেশে অন্যান্য যেসব নেতা প্রহরাধীন ছিলো তাদের বেলাতেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পদক্ষেপটা এতোটাই সময়োচিত, কঠোর আর কার্যকর বলে প্রমাণিত হয় যে যুদ্ধ বিরতির দুই মাস পর, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন সেরে উঠেছে, দেখা যায় তার সবচেয়ে নিবেদিত ষড়যন্ত্রকারীরাই হয় মৃত, নয় নির্বাসিত আর নয় চিরদিনের জন্য গণ প্রশাসনে অঙ্গীভূত।

ডিসেম্বরে কামরা ছেড়ে বেরোয় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, বারান্দাটার দিকে তাকাতেই যুদ্ধ নিয়ে আর কোনো ভাবনা-চিন্তা করার দরকার পড়ে না তার। উরসুলার এখন যা বয়েস সে বয়সে যে-প্রাণশক্তি অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে, তাই নিয়ে পুরো বাড়িটার যৌবন ফিরিয়ে এনেছে সে। সে যখন বুঝে গিয়েছিল তার ছেলে বেঁচে যাবে তখন সে বলে উঠেছিল, 'এবার ওরা দেখবে আমি কে। এই পাগলাগারদটাই হবে দুনিয়ার সবচাইতে খোলামেলা বাড়ি।' তারপর বাড়িটা ধোয়ামোছা করিয়েছে সে, রং করিয়েছে, বদলে ফেলেছে আসবাবপত্র, পুনরুদ্ধার করেছে বাগানটা, লাগিয়েছে নতুন নতুন ফুলের গাছ, আর গ্রীষ্মের চোখ ধাঁধানো আলো যাতে এমনকি শোবার ঘরেও ঢুকতে পারে সেজন্যে দরজা-জানলা সব দিয়েছে হাট করে খুলে। একটা শেষ না হতেই আরেকটা শোকপর্বের অগুনতি সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে সে, আর নিজে তার চিরাচরিত পুরনো গাউন ছেড়ে তারুণ্যের উজ্জ্বলতা ভরা কাপড়চোপড় গায়ে চাপিয়েছে। পিয়ানোলার সুর বাড়িটাকে নতুন করে আনন্দমুখর করে তোলে। সেটা শোনার পর আমারান্তার মনে পড়ে পিয়েত্রো ক্রেসপির কথা, তার সান্ধ্য গার্ডেনিয়ার কথা, আর তার ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধের কথা, তখন তার বিশীর্ণ হৃদয়ের গভীর তলদেশে ঘনিয়ে ওঠে এক নতুন ঈর্ষা, সময়ের হাতে বিশুদ্ধ হয়ে। এক বিকেলে বৈঠকখানাটা গোছগাছ করার জন্যে বাড়ি প্রহরারত সৈন্যদের সাহায্য চায় উরসুলা। রক্ষীদলের নবীন কমান্ডার অনুমতি দেয় তাদের। আস্তে আস্তে উরসুলা তাদের ওপর নিত্য নতুন কাজের ভার চাপাতে থাকে। তাদেরকে খেতে আমন্ত্রণ জানায় সে বাড়িতে, দেয় জামাকাপড় আর জুতো, শেখায় কী করে লিখতে-পড়তে হয়। সরকার যখন প্রহরা উঠিয়ে নেয়, ওদের একজন সেই বাড়িতেই থেকে যায়, তারপর উরসুলার খেদমত করে যায় বহু বছর ধরে। নববর্ষের দিন, সুন্দরী রেমেদিওসের প্রত্যাখানে উন্মাদ হয়ে তার জানলার নিচে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় রক্ষীদলের তরুণ কমান্ডারকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু বছর পর, নিজের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দোর মনে পড়ে যাবে জুন মাসের সেই বৃষ্টিস্নাত বিকেলটির কথা যখন সে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিল তার প্রথম পুত্রের মুখদর্শন করার জন্যে। বুয়েন্দিয়াদের কোনো লক্ষণবিহীন বাচ্চাটা অবসন্ন আর রোদন-প্রবণ হলেও, তার নাম রাখা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি তাকে।

সে বলেছিল, 'আমরা ওকে হোসে আর্কাদিও বলে ডাকবো।'

তার আগের বছর সুন্দরী যে-রমণীকে সে বিয়ে করেছিল সেই ফারনান্দা দেল কার্পিও তাতে অমত করেনি। অন্যদিকে অবশ্য উরসুলা সন্দেহের একটা আবছা অনুভূতি লুকোতে পারেনি। পরিবারটার দীর্ঘ ইতিহাসে নামগুলোর নাছোড় পুনরাবৃত্তি তাকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে যেগুলো অভ্রান্ত বলেই মনে হয়। অরেলিয়ানোরা উদাসীন ধরনের হলেও মনটা তাদের নির্মল, অন্যদিকে হোসে আর্কাদিওরা আবেগপ্রবণ, উদাসী আর সাহসী, যদিও তারা সবাই দুঃখজনক ঘটনার পূর্বলক্ষণ চিহ্নিত। কেবল হোসে আর্কাদিও সেগান্দো আর অরেলিয়ানো সেগান্দোর ব্যাপারটাকেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় ওদের দু'জনের চেহারায় এতো মিল ছিল আর ওরা দু'জনেই এমন হাড়-জ্বালানে ছিল যে এমনকি সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদও ওদেরকে আলাদা করতে পারতো না। ওদের নাম রাখার দিন আমারান্তা ওদের যার যার নাম লেখা ব্রেস্টপ্লেট গায়ে লাগিয়ে প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে চিহ্ন দেয়া ভিন্ন রঙের জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ওরা যখন স্কুলে যেতে শুরু করে তখন ওরা নিজেরাই ঠিক করে জামাকাপড় বদলাবদলি করে একে অন্যকে ওরা উল্টো নামে ডাকবে। ওদের শিক্ষক মেলকিয়র এস্‌কালোনা হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে তার সবুজ শার্ট দিয়েই চিনতেন, তিনি যখন আবিষ্কার করলেন সে অরেলিয়ানো সেগান্দোর ব্রেসলেট পরে আছে, আর তারপরেও অন্যজন বলছে যে তার নাম অরেলিয়ানো সেগান্দো, যদিও তার গায়ে সাদা শার্ট আর তাতে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর ব্রেসলেট লাগানো, তখন তার মাথা গুলিয়ে গেল। তখন থেকে তিনি আর কোনোদিনুই নিশ্চিত হতে পারেননি কার নাম কী। এমনকি ওরা যখন বড় হয় আর জীবন তাদের দু'জনকে দু'রকমভাবে গড়ে তোলে, তখনো উরসুলা ভাবতো বিভ্রান্তির জটিল খেলার কোনো মুহূর্তে ওরা নিজেরা কোনো ভুল করে চিরদিনের জন্যে বদলে গিয়েছিল কিনা। বয়োসন্ধি শুরুর আগ পর্যন্ত ওরা ছিল দুটো সমলয়বিশিষ্ট যন্ত্র। একই সময় ঘুম থেকে উঠতো, একই সময়ে বাথরুমে যাওয়ার তাড়া অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতো, একই অসুখে ভুগতো, এমনকি স্বপ্নও দেখতো একই বিষয় নিয়ে। বাড়িতে ভাবা হতো, স্রেফ বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্যেই ওরা যুক্তি করে কাজগুলো করছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারেনি আসল ব্যাপারটা কী, যতদিন পর্যন্ত না সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ একদিন ওদের একজনকে এক গ্লাস লেমোনেড খেতে দিলে সেটা সে চেখে দেখতেই অন্যজন বলে ওঠে সেটায় চিনি লাগবে। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ আসলেই ভুলে গিয়েছিল লেমোনেডে চিনি দিতে, তাই ঘটনাটা সে উরসুলাকে জানায়। বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে উরসুলা বলে, 'ওরা ঠিক এমনই, জন্ম থেকেই ক্ষ্যাপাটে।' ধীরে ধীরে এই বিশৃঙ্খল অবস্থাটা কমে আসে। বিভ্রান্তির খেলাটা থেকে যে অরেলিয়ানো সেগান্দো নাম নিয়ে বেরিয়ে আসে সে হয় তার পিতামহদের মতো বিশালদেহী, আর যে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো নামটা বজায় রাখে সে হয় কর্নেলের মতো কৃতী, তবে বংশের ধারার একটা জায়গায় মিল থেকে যায় দু'জনেরই, আর সেটা হল তাদের বংশগত নিঃসঙ্গচারী ধরন। দৈহিক উচ্চতা, নাম আর স্বভাব-চরিত্রের এই অদল-বদলের কারণেই খুব সম্ভবত উরসুলার এই সন্দেহ হয় যে ছোটবেলা থেকেই ওরা এক তাড়া তাসের মতো ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল।

চরম পার্থক্যটা অবশ্য বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধের মাঝখানে, যখন হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসকে বলে সে যেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার একটা ঘটনা তাকে দেখাতে নিয়ে যায়। উরসুলার আপত্তি সত্ত্বেও তার ইচ্ছে পূরণ করা হয়। অন্যদিকে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার একটা ঘটনা দেখার কথা চিন্তা করতেই ভয়ে শিউরে ওঠে অরেলিয়ানো সেগান্দো। সে বরং ঘরেই বসে থাকে। বারো বছর বয়েসে সে একদিন উরসুলার কাছে জানতে চায় তালামারা ঘরটায় কী আছে। উরসুলা জবাব দেয়, 'কাগজপত্র। মেলকিয়াদেসের বইপত্তর আর সে যে-সব অদ্ভুত জিনিস লিখেছে তাই।' উত্তরটা অরেলিয়ানো সেগান্দোর কৌতূহল না মিটিয়ে বরং বাড়িয়ে দেয়। এমনই পীড়াপীড়ি শুরু করে সে, কোনো জিনিস নষ্ট করবে না এই ওয়াদা করে এমনই নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে যে শেষমেষ উরসুলা তাকে চাবিটা দিয়ে দেয়। মেলকিয়াদেসের লাশটা বের করে নিয়ে দরজায় একটা তালা ঝুলিয়ে দেয়ার পর থেকে ওই ঘরে কেউ ঢোকেনি, আর এতোদিনে সেই তালার বিভিন্ন অংশ আর মরিচা একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে। কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন জানলাগুলো খুলে দেয়, ভেতরে এমন একটা পরিচিত আলো প্রবেশ করে যেন সেটা প্রতিদিনই ঘরটায় আলো দেয়, আর তাছাড়া ধুলো কিংবা মাকড়সার জাল কিছুরই কোনো চিহ্ন দেখা যায় না ঘরে, সবকিছু ঝকঝকে তকতকে, জিপসি লোকটাকে কবর দেয়ার দিনের চেয়ে বেশি ঝকঝকে তকতকে, দোয়াতের কালিও শুকোয়নি, ধাতব জিনিসগুলোর ঔজ্জ্বল্য মরিচা পড়ে নষ্ট হয়নি, এমনকি হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যেখানে পারদ গরম করতো সেখানকার পানির পাইপের নিচের জ্বলন্ত অঙ্গারও নেভেনি। তাকগুলোয় কার্ডবোড জাতীয় কিছু দিয়ে বাঁধাই করা কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই, মানুষের রোদেপোড়া চামড়ার মতো পাণ্ডুর, কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলো অক্ষত। বহু বছর বন্ধ থাকার পরেও বাড়ির বাকি অংশের চেয়ে এখানকার বাতাস যেন বেশি পরিষ্কার। প্রতিটি জিনিসই এতো সাম্প্রতিক যে হপ্তা কয়েক পর উরসুলা যখন মেঝেটা ধোয়ার জন্য এক বালতি পানি আর একটা বুরুশ হাতে ঘরের ভেতরে ঢোকে তখন তাকে কিছুই করতে হয় না। অরেলিয়ানো সেগান্দো একটা বইয়ের ভেতর ডুবে আছে। সেটার কোনো মলাট না থাকলেও আর বইটার নাম-ও কোথাও লেখা না থাকার পরেও, একটা টেবিলে বসে একটা কাঁটা দিয়ে খুঁটে খুঁটে চালের শাঁস খেতে থাকা এক মহিলা আর প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিজের জালের জন্য একটা ওজন ধার নিয়ে পরে তার কাছে পেটে হীরেঅলা একটা মাছ বিক্রি করা এক জেলে, আর ইচ্ছে পূরণ করা একটা চেরাগ আর উড়ন্ত গালিচার গল্পগুলো ছেলেটার খুব ভালে লেগে যায়। অবাক হয়ে সে উরসুলাকে জিজ্ঞেস করে এগুলো সব সত্যি কিনা, তখন সে জবাব দেয় সব সত্যি, বলে, অনেক অনেক বছর আগে জিপসিরা মাকোন্দোতে যাদুই চেরাগ আর উড়ন্ত মাদুর নিয়ে এসেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উরসুলা মন্তব্য করে, 'হয়েছে কী, দুনিয়াটার আয়ু ফুরিয়ে আসাতে ওসব জিনিস আর আসে না এখন।'

বইটা পড়া হয়ে গেলে—যদিও কিছু কিছু পাতা না থাকায় অনেক গল্পেরই শেষটা জানা যায় না—অরেলিয়ানো সেগান্দো পাণ্ডুলিপির অর্থোদ্ধারে লেগে যায়। কিন্তু বৃথাই। অক্ষরগুলো দেখতে দড়ির ওপর শুকোতে দেয়া কাপড়ের মতো বলে মনে হয়, আর সেগুলোকে যতটা না অক্ষর বলে মনে হয় তার চেয়ে বেশি মনে হয় সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো। বেশ গরমে পড়া এক দুপুরবেলা সে যখন পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে, তার মনে হয় ঘরটায় সে ছাড়াও অন্য কেউ রয়েছে। জানলা দিয়ে আসা আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে, হাঁটুর ওপর দুই হাত রেখে বসে আছে মেলকিয়াদেস। চল্লিশের কম হবে বয়স। সেই মান্ধাতার আমলের গেঞ্জি আর দাঁড়কাকের ডানার মতো টুপিটা পরে আছে সে, আর তার কপালের দুই পাণ্ডুর পাশ বেয়ে গরমে গলে যাওয়া তেল নেমে আসছে চুল থেকে, ঠিক যেমনটা অরেলিয়ানো আর হোসে আর্কাদিও দেখেছিল তাকে ছোটবেলায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনে ফেলে অরেলিয়ানো সেগান্দো, কারণ সেই বংশগত স্মৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চারিয়ে গিয়ে তার দাদার স্মৃতির মাধ্যমে তার কাছে আগেই চলে এসেছিল।

অরেলিয়ানো সেগান্দো বলে, 'কী খবর?'

মেলকিয়াদেস বলে, 'কী খবর, নবীন যুবক?'

সেদিন থেকে কয়েক বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন বিকেলে দেখা হতে থাকে দু'জনের। মেলকিয়াদেস তার সঙ্গে জগত-সংসার নিয়ে কথা বলে যেতো, চেষ্টা করতো অরেলিয়ানো সেগান্দোর ভেতর প্রাচীন প্রজ্ঞা ঢেলে দিতে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা অনুবাদ করে দিতে রাজি করানো যায় না তাকে। কারণ হিসেবে তার বক্তব্য হলো, 'বয়স একশো বছর না হলে ওগুলোর মানে কারো জানতে নেই।' এসব সাক্ষাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা কাউকে কোনোদিন জানায়নি অরেলিয়ানো। মেলকিয়াদেসের উপস্থিতিতে একবার উরসুলা ঘরে ঢুকে পড়াতে অরেলিয়ানোর মনে হয় তার একান্ত বিশ্বটা বুঝি ছত্রখান হয়ে গেল। উরসুলা কিন্তু লোকটাকে দেখতে পায় না।

'কার সঙ্গে কথা বলছিলি তুই?' উরসুলা শুধোয় তাকে।

'কারো সঙ্গে না।' অরেলিয়ানো সেগান্দো বলে।

'তোর দাদার বাবাও এরকম করতো,' উরসুলা বলে। 'সে-ও নিজের সঙ্গে কথা বলতো।'

হোসে আর্কাদিও সেগান্দো এরিমধ্যে একটা শুটিং দেখার খায়েস মিটিয়ে ফেলেছে। বাকি জীবনভর সে মনে রাখবে একই সময়ে ছোঁড়া সেই ছয়টি গুলির নীলবর্ণ আলোকচ্ছটা, পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে আসা বন্দুক-দাগার প্রতিধ্বনি, সেই সঙ্গে, যাকে গুলি করা হচ্ছিল তার হতবিহ্বল চোখ আর মৃদু হাসি; রক্তে শার্ট ভিজে যাওয়ার পরেও সটান দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, আর তাকে খুঁটি থেকে খুলে এনে চুনভরা একটা বাক্সে ঢুবানোর সময়ও হাসছিল সে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর মনে হয়েছিল, 'লোকটা মরেনি। ওরা লোকটাকে জ্যান্ত কবর দিতে যাচ্ছে।' ব্যাপারটা তার ওপর এমন একটা প্রভাব ফেলে যায় যে সেই মুহূর্ত থেকে সামরিক মহড়া আর যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা জন্মে যায় তার, কিন্তু সেটা মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যাপারটার জন্য নয়, বরং অপরাধীকে জ্যান্ত কবরে দেয়ার ভয়ংকর প্রথার কারণে। ঠিক কবে থেকে যে সে গির্জার টাওয়ারের ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে, 'বাবা'-র উত্তরাধিকারী আন্তোনিও ইসাবেলকে সাহায্য করতে আরম্ভ করে মাস্-এর সময়, আর দেখাশোনা করতে থাকে যাজকবাড়ির উঠোনের লড়িয়ে মোরগগুলোর তা কেউ জানতে পারেনি তখন। ব্যাপারটা জানতে পেরে উদারপন্থীরা যেসব কাজ ভালোবাসে না তাই শেখার জন্য ভীষণ বকাঝকা করে তাকে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো জবাব দেয়, 'আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমার মনে হয় আমি রক্ষণশীল হয়ে পড়েছি।' সে মনে করতো, যেন ভাগ্যই ব্যাপারটা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। শিউরে উঠে উরসুলাকে সব খুলে বলে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস।

উরসুলা অবশ্য সায় দিয়ে বলে, 'সে-ই বরং ভালো। ও যেন পাদ্রী হয় সেই আশা-ই করা যাক বরং, যাতে শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতে ঈশ্বরের আগমন ঘটে।'

শিগ্‌গিরই জানা যায় যে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল তাকে তার প্রথম কমিউনিয়নের জন্য তৈরি করছেন। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো যখন তার মোরগগুলোর গলায় ক্ষৌরি করে তিনি তখন তাকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মীয় তত্ত্ব শেখান। সে যখন ওমে বসা মুরগিগুলোকে খোপে পোরে, তিনি তাকে সহজ সরল উদাহরণ দিয়ে বোঝান কিভাবে সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বরের মাথায় এই চিন্তা খেলে গিয়েছিল যে মুরগির বাচ্চা ডিমের ভেতরেই তৈরি হবে। সেই সময় থেকেই বার্ধক্যের চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে যাজকপল্লীর পাদ্রী ভদ্রলোকটির মধ্যে, কয়েক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর পরেই তা এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে যে তিনি বলবেন, শয়তান সম্ভবত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে গিয়েছিল, আর স্বর্গীয় আসনে আসলে সে-ই বসেছে, কিন্তু অসাবধানীদের যাতে ফাঁদে ফেলা যায় সেজন্যে সে তার নিজের পরিচয় ফাঁস করেনি। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তার বিজ্ঞ পরামর্শদাতার প্রবল আগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই শয়তানকে বিভ্রান্ত করা ঈশ্বরতত্ত্বীয় জারিজুরি সম্পর্কে ঠিক ততটাই পটু হয়ে ওঠে যতটা পটু সে মোরগ লড়াইয়ের আসরের অন্ধিসন্ধির ব্যাপারে। কলার আর টাইসহ ক্ষৌমবস্ত্রের একপ্রস্থ স্যুট বানিয়ে দেয় তাকে আমারান্তা, কিনে দেয় এক জোড়া সাদা জুতো, আর মোমবাতির রিবনে গিলটি করা অক্ষরে মিনে করে লিখে দেয় ওর নাম। প্রথম কমিউনিয়নের দুই রাত আগে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল তাকে নিয়ে গির্জার পোশাক রাখার ঘরে ঢোকেন ওর স্বীকারোক্তি শোনার জন্যে, সঙ্গে নেন পাপাচারের একটা অভিধান। তালিকাটা এতোই লম্বা যে পুরোটা শোনার আগেই সন্ধ্যা ছ'টায় ঘুমোতে অভ্যস্ত বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েন। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর জন্য এই জেরাটা হয়ে দাঁড়ায় চোখ খুলে দেয়ার মতো একটা অভিজ্ঞতা। পাদ্রী যে তার কাছে জানতে চান কোনো মেয়েলোকের সঙ্গে সে খারাপ কাজ করেছে কিনা তাতে সে অবাক হয় না, বরং আন্তরিকভাবেই উত্তর দেয় যে করেনি, কিন্তু কাজটা সে কোনো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে করেছে কিনা এই প্রশ্নে রীতিমত মুষড়ে পড়ে সে। মে মাসের প্রথম শুক্রবার কৌতূহলে জর্জর অবস্থায় কমিউনিয়ন গ্রহণ করে সে। পরে, যার সম্পর্কে মানুষের ধারণা লোকটা বাদুড় খেয়ে বাঁচে, ঘণ্টাঘরের সেই বাসিন্দা, গির্জার ঘণ্টাবাদক, রোগাদুবলা পেত্রোনিওকে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন করলে সে জবাব দেয়: 'কিছু কিছু পাপী খ্রিস্টান আছে যারা মাদী গাধার সঙ্গে এই কাজটা করে।' কিন্তু এরপরেও হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর কৌতূহল যায় না, পোত্রোনিওকে সে এতো প্রশ্ন করতে শুরু করে যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে লোকটার।

শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করে, 'আমি মঙ্গলবার রাতে যাই। তুমি যদি কথা দাও কাউকে বলবে না তাহলে আসছে মঙ্গলবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি।'

সত্যিই সত্যিই পরের মঙ্গলবার পোত্রোনিও নেমে আসে তার টাওয়ার থেকে, সঙ্গে একটা কাঠের টুল, সেটা কী কাজে লাগে সেদিন পর্যন্ত কেউ তার কোনো হদিস পায়নি; তো, এরপর হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে সে নিয়ে যায় কাছেরই একটা পশুচারণ ভূমিতে। সেই নৈশ অভিজ্ঞতাগুলো হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে এমনই মুগ্ধ করে রাখে যে একটা দীর্ঘ সময় কাতারিনোর আখড়ায় যাওয়া থেকে বিরত থাকে সে। হয়ে ওঠে মোরগ লড়াই অন্তপ্রাণ এক মানুষ। প্রথম দিন তাকে সুন্দর সেই লড়িয়ে পাখিগুলোকে নিয়ে আসতে দেখেই উরসুলা হুকুমের সুরে বলে ওঠে, 'জীবগুলো অন্য কোথাও নিয়ে যা। এমনিতেই ওগুলো যথেষ্ট তিক্ততা বয়ে এনেছে এই বাড়িতে, তোর আর নতুন করে কিছু আনার দরকার নেই।' কোনো বাক-বিতন্ডায় না গিয়ে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো মোরগগুলো সরিয়ে নেয় বটে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তার দাদীমা পিলার তারনেরার বাড়িতে সেগুলো প্রজনন করা শুরু করে সে, আর পিলার তারনেরাও তাকে বাড়িতে রাখার জন্য ওর যা যা দরকার সবই দিয়ে দেয়। পাদ্রী আন্তোনিও ইসাবেল তাকে যে-প্রজ্ঞা দান করেছিলেন, মোরগ লড়াইয়ের আসরে খুব শিগ্‌গিরই তার প্রতিফলন দেখাতে শুরু করে সে, আর কেবল ছানাগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির মতোই শুধু নয়, একটা পুরুষ মানুষের তৃপ্তি মেটাবার মতো টাকা-পয়সাও করে ফেলে সে। উরসুলা তখন হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর সঙ্গে তার ভাই-এর তুলনা করে ভেবেই আকুল হয়ে যায় যে, দুই যমজ ভাই, ছোটবেলায় যারা দেখতে ঠিক একই রকম ছিল, তারা কিভাবে শেষ পর্যন্ত এমন ভিন্ন হয়। তবে তার সেই বিহ্বলতা বেশিদিন থাকে না, কারণ খুব শিগ্‌গিরই কুঁড়েমি আর থিতানোভাব ফুটে ওঠে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাজকর্মে। মেলকিয়াদেসের ঘরের ভেতর বন্দি অবস্থায় সে আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছিল, নিজের ভেতর গুটিয়ে গিয়েছিল, ঠিক যেমনটা হয়েছিল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বেলায় তার যৌবনে। কিন্তু নিয়ারলান্দিয়া চুক্তির অল্প ক'দিন পরে একটা আকস্মিক ঘটনা তাকে তার আত্মমগ্ন সত্ত্বা থেকে বের করে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। একটা অ্যাকোর্ডিয়ান-এর লটারির টিকেট বিক্রি করছিল এক কম বয়েসী রমণী, সে তাকে ভীষণ পরিচিতের মতো অভ্যর্থনা জানায়। অরেলিয়ানো সেগান্দো অবাক হয় না, কারণ তার ভাই-এর সঙ্গে তাকে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতো লোকে। কিন্তু তাই বলে ভুলটা ধরিয়েও দেয় না সে, এমনকি মেয়েটা যখন ফোঁপানো কান্না কেঁদে তার মন ভজাতে চেষ্টা করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে তার শোবার ঘরে গিয়ে ওঠে তখনো না। সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই মেয়েটা তাকে এমন পছন্দ করে ফেলে যে সে এমন ব্যবস্থা করে যাতে লটারির ড্রতে সে-ই অ্যাকোর্ডিয়ানটা জেতে। দুই হপ্তা পর সে টের পায় যে দু'জনকে একই লোক মনে করে রমণীটি পালাক্রমে তার ভাই আর তার সঙ্গে বিছানায় গেছে, আর তখন বিষয়টা খোলাসা করে দেয়ার বদলে অবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা করে সে। মেলকিয়াদেসের কামরায় আর ফিরে যায় না সে। বিকেলটা সে উঠোনে কাটায় শুনে শুনে অ্যাকোর্ডিয়ান বাজানো শেখার কাজে, উরসুলা অবশ্য তাতে আপত্তি তোলে, কারণ, শোকপালনের জন্যে বাড়িতে সে গানবাজনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সে-সময়ে, আর তাছাড়া অ্যাকোর্ডিয়ান যন্ত্রটা মরদ ফ্রান্সিসকোর ভবঘুরে উত্তরাধিকারীদের হাতেই মানায় মনে করে ওটাকে একরকম ঘৃণাই করতো সে, কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দো সে-সব আপত্তি কানে তোলে না। উরসুলা যাই বলুক, অরেলিয়ানো সেগান্দো শেষ পর্যন্ত অ্যাকোর্ডিয়ান বাজানোতে ভীষণ দক্ষ হয়ে ওঠে, আর বিয়ে করে ছেলেমেয়ের বাপ হওয়ার পর সে যখন মাকোন্দোর সবচেয়ে সম্মানিত লোক তখনো তার সেই দক্ষতা অক্ষুণ্ন রয়ে যায়।

প্রায় দু'মাস ভাই-এর সঙ্গে সে-ও রমণীটিকে ভোগ করে যায়। ভাইকে চোখে চোখে রাখতো সে, তার পরিকল্পনা তালগোল পাকিয়ে দিতো, আর যখন নিশ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কোনো রাতে তাদের দু'জনের এজমালি রক্ষিতার কাছে যাচ্ছে না, তখনই সে গিয়ে মেয়েটার সঙ্গে শুতো। এক সকালে সে আবিষ্কার করে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দু'দিন পরে আবিষ্কার করে তার ভাই গোসলখানার একটা কড়িকাঠের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে, সারা শরীর ঘামে ভেজা, অঝোরে পানি ঝরছে তার দু'চোখ বেয়ে, আর তখনই সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। তার ভাই তার কাছে স্বীকার করে মেয়েলোকটা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ তার-ই কারণে তার, মেয়েটির ভাষায়, ইতর প্রাণীর অসুখ হয়েছে। পিলার তারনেরা কিভাবে তাকে সারাবার চেষ্টা করেছে সে-কথাও হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তার ভাইকে বলে। পারমাঙ্গানেট আর মূত্রবর্ধক জলের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া গোসলের কাছে গোপনে নিজেকে সমর্পণ করে অরেলিয়ানো সেগান্দো, তারপর তিন মাসের গোপন কষ্টভোগের পর দু'জনেই আলাদাভাবে সেরে ওঠে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো সেই মেয়েলোকের ছায়াও মাড়ায় না আর। ওদিকে অরেলিয়ানো সেগান্দো ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার সঙ্গেই থেকে যায়।

তার নাম পেত্রা কোতেস। লটারি করে জিনিস বেচে পেট চালাতো এক লোক, তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিয়ে হয়েছিল তার, আর তারই সঙ্গে যুদ্ধের মাঝামাঝি মাকোন্দোতে এসেছিল সে, লোকটা পটল তোলার পর সে-ই হাল ধরে ব্যবসাটার। সহজ-সরল এক মুলাটো তরুণী সে, তার বাদাম-আকৃতির চোখ দুটো তার চেহারায় চিতার মতো একটা হিংস্র ভাব এনে দিলেও বেশ দরাজ একটা মন আছে তার, আর রয়েছে প্রেমপিরীতির ব্যাপারে অসাধারণ রকমের এক আত্মনিবেদন। উরসুলা যখন বুঝতে পারে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো হচ্ছে মোরগ লড়াই অন্তপ্রাণ আর অরেলিয়ানো সেগান্দো তার রক্ষিতার শোরগোলভরা পার্টিগুলোতে অ্যাকোর্ডিয়ান বাজিয়ে বেড়ায়, তার মনে হয় সে বুঝি এই যুগলবন্দিটা দেখে পাগলই হয়ে যাবে। ব্যাপারটা যেন এই যে, এই বংশের যেসব দোষ আছে তার সবগুলোই দু'জনের মধ্যে এসে জুটেছে, কিন্তু গুণগুলো জোটেনি একজনেরও। তখনই সে ঠিক করে এরপর থেকে কাউকেই আর অরেলিয়ানো বা হোসে আর্কাদিও নাম দেয়া হবে না। তারপরেও কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দোর প্রথম ছেলে হওয়ার পর সে তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করে না। 'ঠিক আছে,' উরসুলা বলে, 'তবে শর্ত একটাই: ওকে আমি মানুষ করব।'

যদিও তার বয়স তখন একশো, চোখে ছানি পড়ে অন্ধ হওয়ার জোগাড়, তারপরেও কিন্তু তার শারীরিক সক্রিয়তা, তার চরিত্রের দৃঢ়তা আর তার মানসিক ভারসাম্য অটুট রয়ে গেছে। তার চেয়ে ভালোভাবে কেউই সদ্‌গুণ সম্পন্ন সেই লোকটিকে গড়ে তুলতে পারবে না যে একদিন পরিবারটার হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করবে, এমন এক লোক যে যুদ্ধ, লড়িয়ে মোরগ, মন্দ মেয়েমানুষ আর বেপরোয়া কাজকর্ম, এসবের কথা শুনবে না কোনোদিন, আর উরসুলার ধারণা এই চারটি সর্বনেশে জিনিসই তার বংশের ভরাডুবি ডেকে এনেছে। গম্ভীরভাবে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গীকার করে, 'ও হবে পাদ্রী, আর ঈশ্বর যদি আমায় হায়াত দেন তো একদিন ও পোপ হবে।' সবাই হেসে ওঠে তার কথা শুনে, শুধু যে শোবার ঘরে তাই নয়, সারা বাড়িতেই, এমনকি ওখানে এসে জড়ো হওয়া অরেলিয়ানো সেগান্দোর হুল্লোড়ে বন্ধুরা পর্যন্ত। মন্দ স্মৃতির চিলেকোঠায় ঠাঁই নেয়া যুদ্ধকে কিছুক্ষণের জন্যে স্মরণ করা হয় শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার মধ্যে দিয়ে।

'পোপের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে,' টোস্ট করে অরেলিয়ানো সেগান্দো।

সমস্বরে টোস্ট করে অতিথিরাও। এরপর বাড়ির কর্তা অ্যাকোর্ডিয়ান বাজনা শুরু করে, জ্বলে ওঠে আতশবাজি, আর সারা শহরে ড্রাম বাজিয়ে উদযাপন করা হয় ঘটনাটা। ভোরবেলায় শ্যাম্পেনস্নাত অতিথিরা ছ'টা গরু জবাই দিয়ে রাস্তায় ভিড় করা লোকজনের হাতে তুলে দেয় সেগুলো। কেউই মর্মাহত হয় না এসব কাণ্ডকীর্তি দেখে। অরেলিয়ানো সেগান্দো বাড়ির কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকে এসব আনন্দ-ফূর্তি একটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি কোনো পোপের জন্মের মতো কোনো বিশেষ উপলক্ষ যখন থাকে না তখনো। কয়েক বছরের মধ্যে, কোনোরকম চেষ্টা-চরিত্র ছাড়াই, স্রেফ বরাতজোরে, এই জলাভূমির সবচেয়ে বড় সম্পদের মালিক হয়ে গেছে সে তার জীবজন্তুগুলোর অলৌকিক সংখ্যাবৃদ্ধির বদৌলতে। তার মাদী ঘোড়াগুলো একেক বারে তিনটে করে বাচ্চা বিয়োয়, তার মুরগিগুলো ডিম দেয় দিনে তিন বার, আর তার খাসি-করা শুয়োরগুলো এমন গতিতে মোটাতাজা হয়ে ওঠে যে ডাকিনীবিদ্যা ছাড়া এই সৃষ্টিছাড়া প্রজনন ক্ষমতার অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। 'এখন থেকেই কিছু সঞ্চয় কর,' উরসুলা তার নাতির বুনো ছেলেকে মাঝে মাঝে পরামর্শ দিয়ে বলতো। 'এই সৌভাগ্য তোর সারা জীবন থাকবে না।' কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দো তার কথায় কোনো আমলই দেয় না, তার ইয়ার-দোস্তদের ভিজিয়ে দিতে সে যত বেশি শ্যাম্পেনের বোতল খোলে, ততোই লাগামছাড়াভাবে বিয়োতে থাকে তার জীব-জন্তুগুলো, আর ততটাই সে নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে তার কাজকর্মের সঙ্গে তার সৌভাগ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এসব ঘটছে তার রক্ষিতা পেত্রা কোতেসের প্রভাবে, যার প্রেমের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনাসৃষ্টিকারী গুণ আছে। সেটাই যে তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এ-ব্যাপারে সে এতোটাই নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে পেত্রা কোতেসকে সে কখনোই তার প্রজননস্থান থেকে দূরে রাখতো না, আর এমনকি সে যখন বিয়ে করে, বাবা হয়, তখনও ফারানান্দার অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে থাকা চালিয়ে যায় সে। বলিষ্ঠ, বাপ-দাদাদের মতো বিশালদেহী, কিন্তু তাদের যা ছিল না সেই উচ্ছল প্রাণ-প্রাচুর্য আর অপ্রতিরোধ্য রসবোধের অধিকারী অরেলিয়ানো সেগান্দো তার জন্তু-জানোয়ারগুলোর দেখাশোনার সময় পেতো না বললেই চলে। তাকে স্রেফ যা করতে হতো তা হল তার প্রজননক্ষেত্রে পেত্রা কোতেসকে নিয়ে যাওয়া আর মাঠের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো, যাতে করে তার প্রত্যেকটা মার্কা-মারা জন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির আরোগ্যহীন রোগের শিকার হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দীর্ঘ জীবনে যেসব শুভ ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর মতোই তার এই ভয়ংকর সৌভাগ্যের সূত্রপাতটাও ঘটেছিল হঠাৎ করেই। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পেত্রা কোতেস লটারির মাধ্যমেই পেট চালাতো, আর অরেলিয়ানো সেগান্দো প্রায়ই হানা দিতো উরসুলার সঞ্চয়ে। ওরা দু'জন লঘুচিত্ত এক জুটি; প্রতিরাতে, এমনকি নিষিদ্ধ দিনগুলিতেও, বিছানায় যাওয়া আর ভোররাত পর্যন্ত জড়াজড়ি করা চাই তাদের। স্বপ্নচারীর মতো তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে উরসুলা তার নাতির উদ্দেশে গলা ফাটিয়ে বলে উঠতো, 'ওই মেয়েটাই তোর শনি। ও তোকে এমনই জাদুটোনা করেছে যে একদিন দেখবো পেটের মধ্যে একটা ব্যাঙ নিয়ে ব্যথায় গড়াগড়ি যাচ্ছিস তুই।' হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর এটা টের পেতে অনেক দিন লেগে যায় যে তার জায়গায় অন্য একজন এসেছে, কিন্তু সে তার ভাইয়ের প্রবল আসক্তির ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না। পেত্রা কোতেসকে তার আর দশটা মেয়েমানুষের মতোই মনে হয়েছিল, বিছানায় বরঞ্চ কুঁড়েই ছিল সে বলা যায়, সহবাসের কলাকৌশল সম্পর্কে একেবারে বকলম। উরসুলার চেঁচামেচি আর তার ভাইয়ের উপহাস সত্ত্বেও অরেলিয়ানো সেগান্দোর তখন একমাত্র ভাবনা কী করে এমন একটা ব্যবসা দাঁড় করানো যায় যা দিয়ে পেত্রা কোতেসকে একটা আলাদা বাড়িতে রাখা যায়, কী করে এক রাতের জ্বরতপ্ত লাগামছাড়া কাণ্ডকারখানার মুহূর্তে তার ওপরে থেকে আবার তার নিচে থেকে তার সঙ্গেই ইহধাম ত্যাগ করা যায়। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়েসের শান্তিপূর্ণ মায়ায় প্রলুব্ধ হয়ে ফের তার কামারশালা চালু করে, অরেলিয়ানো সেগান্দো ভাবে ছোট ছোট সোনার মাছ তৈরির ব্যবসায় সে নিজে লেগে পড়লে সেটা একটা ভালো ব্যবসা হতো। ধাতুর শক্ত শক্ত পাত কী করে কর্নেলের হাতে মোহমুক্তির অচিন্তনীয় রকমের ধৈর্যের পরশে ধীরে ধীরে সোনালী আঁশে পরিণত হয় তাই দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে গরম সেই ঘরে বসে। কাজটা তার কাছে এতোই পরিশ্রমের বলে মনে হয়, আর পেত্রা কোতেসের চিন্তা এমনই নাছোড়ভাবে তার মনজুড়ে থাকে যে তিন হপ্তা পর কামারশালায় আর দেখা যায় না তাকে। ঠিক এই সময়টাতেই খরগোস লটারি করার কথা মাথায় আসে পেত্রা কোতেসের। খরগোসগুলো এমনই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় আর গায়ে গতরে বেড়ে ওঠে যে লটারির টিকেট বিক্রি করার সময় পাওয়াই ভার হয়ে ওঠে বলতে গেলে। বংশবৃদ্ধির এই আশঙ্কাজনক হার গোড়ার দিকে খেয়াল করেনি অরেলিয়ানো সেগান্দো। কিন্তু এক রাতে, শহরের কেউই যখন খরগোস লটারির বিষয়ে আর একটা কথাও শুনতে রাজি নয়, উঠোনের পাশের দরজায় একটা শব্দ শুনতে পায় সে। পেত্রা কোতেস তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলে, 'ভেবো না। স্রেফ খরগোস ওগুলো, অন্য কিছু নয়।' প্রাণীগুলোর শোরগোলে সে-রাতে আর ঘুম হয় না তাদের। সকালে অরেলিয়ানো সেগান্দো দরজা খুলে দেখে গোটা উঠোন ভরে গেছে খরগোসে, ভোরের আলোর দীপ্তিতে নীল হয়ে আছে একেবারে। দমফাটানো হাসি হাসতে হাসতে পেত্রা কোতেস ওকে খোঁচা মারার লোভটা সামলাতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলল, 'কাল রাতেই জন্মেছে এগুলো।'

আঁৎকে উঠে সে বলে উঠে, 'হায় ঈশ্বর! তুমি তাহলে গরুর লটারি করছো না কেন?'

দিন কতেক পর, উঠোনটা সাফ করবে বলে একটা গরুর বদলে খরগোসগুলো দিয়ে দেয় পেত্রা কোতেস, আর দু'মাস পরেই সেই গরুটা একসঙ্গে তিনটে বাছুর বিয়োয়। এভাবেই শুরু হয় ব্যাপারটা। রাতারাতি জমিজমা আর গবাদিপশুর মালিক বনে যায় অরেলিয়ানো সেগান্দো, বলতে গেলে সময়ই পায় না সে তার উপচে পড়া গোলা আর শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো আরো বড় করার। রীতিমত উন্মত্ত এই সমৃদ্ধি দেখে তার নিজেরই হাসি পেয়ে যায় আর তার এই ফূর্তির প্রকাশ ঘটাতে বাধ্য হয়ে পাগলের মতো আচরণ করতে হতো তাকে। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে বলে উঠতো, 'ক্ষান্ত দাও, গরুর দল, জীবন বড়ো ছোট।' উরসুলা ভেবে পেতো না কীসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে অরেলিয়ানো সেগান্দো, চুরি করছে, নাকি গরু চোরদের দলে নাম লিখিয়েছে, তাছাড়া যখন সে দেখতো স্রেফ শ্যাম্পেনের ফেনা মাথায় ঢালার মজা পাওয়ার জন্যে বোতলের ছিপি খুলছে অরেলিয়ানো সেগান্দো, তখন এই অপচয়ের জন্যে চিৎকার করে তাকে বকাঝকা করতো সে। অরেলিয়ানো সেগান্দো তাতে এমনই বিরক্ত হয়ে ওঠে যে একদিন খোশমেজাজে ঘুম থেকে উঠে এক সিন্দুক ভর্তি টাকা, এক ক্যানভর্তি আটা, আর একটা বুরুশ নিয়ে একেবারে দরাজ গলায় মরদ ফ্রান্সিসকোর পুরনো গানগুলো গাইতে গাইতে পুরো বাড়িটার ভেতর-বাহির, আগাপাশতলা এক পেসোর ব্যাংকনোট দিয়ে মুড়ে দেয় সে। পিয়ানোলাটা আনার পর সাদা রঙ করা পুরনো বাড়িটা একটা মসজিদের অদ্ভুত চেহারা লাভ করে। গোটা পরিবারের উত্তেজনা, উরসুলার মর্মাহত দশা, আর খোলামকুচির মতো সেই টাকা ওড়ানোর মহোৎসব দেখতে রাস্তা ভর্তি হয়ে যাওয়া লোকজনের মধ্যে, অরেলিয়ানো সেগান্দো বাড়িটাকে টাকা দিয়ে মোড়ানোর কাজ শেষ করে সামনে থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে, গোসলখানা আর শোবার ঘরসহ, তারপর বাকি টাকাগুলো ছুঁড়ে দেয় উঠোনের মধ্যে।

তারপর ইতি টানার সুরে বলে ওঠে, 'আশা করি এ-বাড়ির কেউ আর আমার সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে কোনোদিন কোনো কথা বলতে আসবে না।'

আর তাই-ই হয়। চুনকামের শক্ত হয়ে আসা অংশের সঙ্গে লেগে থাকা নোটগুলো লোক লাগিয়ে উঠিয়ে নেয় উরসুলা, আর তারপর পুরো বাড়িটা আবার চুনকাম করায়। অনুনয়ের সুরে সে বলে, 'হে প্রিয় ঈশ্বর, শহরটা যখন পত্তন করেছিলাম আমরা সেইসব দিনের মতো ফের গরীব বানিয়ে দাও আমাদের, যাতে করে পরকালে এই অপব্যয়ের কৈফিয়ত দেবার জন্যে তোমার সামনে দাঁড়াতে না হয়।' তার প্রার্থনার জবাব আসে উল্টো দিক দিয়ে। একজন মজুর ঐ নোটগুলো সরিয়ে নিচ্ছিল, সে হঠাৎ যুদ্ধের শেষ দিককার কোনো এক বছরে বাড়িতে রেখে যাওয়া সন্ত জোসেফের একটা পেল্লায় প্লাস্টারের মূর্তির গায়ে ধাক্কা খায়, ওমনি সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁপা মূর্তিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। সেটার পেট স্বর্ণমুদ্রায় ঠাসা। সন্ত জোসেফের সেই প্রমাণ আকারের মূর্তিটা কে যে নিয়ে এসেছিল তা কেউ মনে করতে পারে না। আমারান্তা বিশদ করে বলে, 'তিনটে লোক নিয়ে এসেছিল মূর্তিটা, বৃষ্টিটা না থামা পর্যন্ত রেখে দিতে বলেছিল। আমি ওদের বলেছিলাম ওটা ওখানে ঐ কোনায় রাখতে, যাতে কেউ ওটার গায়ে ধাক্কা না খায়, তাই ওখানেই খুব সাবধানে রেখে গিয়েছিল ওরা মূর্তিটা, তারপর থেকে ওটা ওখানেই ছিল, কারণ পরে ওরা কেউই আর নিতে আসেনি ওটা।'

পরে উরসুলা মূর্তিটার ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছে সেটাকে, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে এক সন্তের বদলে সে আসলে পুজো করছে চারশো পাউন্ড সোনা। তার অনিচ্ছাকৃত মূর্তিপূজার এই বিলম্বিত প্রমাণ পেয়ে আরো মুষড়ে পড়ে সে। স্বর্ণমুদ্রার সেই অসাধারণ স্তূপের ওপর থুথু ছেটায় সে, তিনটে কাপড়ের বস্তায় ভরে সেগুলো এই আশায় একটা গোপন জায়গায় মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেয় যে আজ হোক কাল হোক সেই তিন অজ্ঞাতপরিচয় লোক ফের ওগুলো দাবি করতে আসবে। আরো অনেক পরে, তার জরাগ্রস্ত অবস্থার একেবারে কষ্টকর দিনগুলোতে, বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়া ভ্রমণকারীদের কথায় ঝগড়া দিয়ে উরসুলা জানতে চাইতো বৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেখে শুনে রাখার জন্য সন্ত জোসেফের একটা প্লাস্টারের মূর্তি তারা ওখানে রেখে গিয়েছিল কিনা।

উরসুলাকে যন্ত্রণায় ফেলা এ-ধরনের ব্যাপারে সে-সময়ের খুবই মামুলি ঘটনা। এক অলৌকিক সমৃদ্ধিতে তখন পেয়ে বসেছে মাকোন্দোকে। পত্তনকারীদের রোদে পোড়ানো ইটের বাড়িগুলোর জায়গা নিয়েছে কাঠের ঝুল-পর্দা আর সিমেন্টের মেঝেঅলা ইটের দালান, ফলে দুপুর দুটোর দমবন্ধ করা উত্তাপ অনেক বেশি সহনীয় হয়েছে আগের চেয়ে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার সেই প্রাচীন গ্রামের যা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে, দুঃসহতম পরিস্থিতিতেও টিকে থাকাই যাদের নিয়তি সেই সব ধুলিধূসর অ্যালমন্ড গাছ আর স্বচ্ছ জলের সেই নদীটা যে-নদীর প্রাগৈতিহাসিক পাথরগুলো হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর উন্মত্ত হাতুড়ির আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল যখন সে একটা নৌ-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জলপথটা চালু করার চেষ্টা করেছিল। সেটা ছিল এক অসম্ভব স্বপ্ন, যার তুলনা চলে তার দাদার বাবার সেই স্বপ্নগুলোর সঙ্গে, কারণ সেই পাহাড়ী নদীর তলদেশ আর সেই নদীগর্ভের অসংখ্য দুরারোহ উৎরাই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল মাকোন্দো থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নৌচালনা। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব এক হঠকারিতার বিস্ফোরণে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো গোঁয়ার-গোবিন্দর মতো তার কাজ চালিয়ে যায়। তখনো পর্যন্ত কল্পনার লেশমাত্র দেখা যায়নি তার কাজকর্মে। পেত্রা কোতেসের সঙ্গে তার বিপজ্জনক অভিযান ছাড়া অন্য কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। উরসুলা তাকে ধরে নিয়েছে তাদের বংশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তশিষ্ট প্রাণীর উদাহরণ হিসেবে, যার এমনকি লড়িয়ে মোরগের ব্যবসায়ী হিসেবেও নজরে পড়ার মতো কিছু করার ক্ষমতা নেই, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সময় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তাকে সমুদ্র থেকে আট মাইল দূরে চড়ায় আটকে যাওয়া স্পেনের সেই জাহাজটার গল্প বলে যে-জাহাজের অঙ্গারে পরিণত হওয়া কাঠামোটা সে নিজে দেখেছিল যুদ্ধের সময়। বহুদিন ধরে বহু মানুষের কাছে রীতিমত দুর্দান্ত বলে মনে হওয়া এই গল্পটা হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর চোখ খুলে দেয়, সবচেয়ে যে বেশি দাম হাঁকে তার কাছে মোরগগুলো নিলামে বিক্রি করে দেয় সে, লোকজন নিয়োগ করে, যন্ত্রপাতি কেনে, আর তারপর লেগে পড়ে পাথর ভাঙার, খাল কাটার, নদীগর্ভের দুরারোহ উৎরাই পরিষ্কার করার, আর এমনকি জলপ্রপাত পর্যন্ত বেঁধে ফেলার ভয়ংকর কাজে। উরসুলা চেঁচিয়ে উঠতো মাঝে মাঝে, 'এর সবই আমার মুখস্থ। ব্যাপারটা যেন আমরা সবাই সেইখানে ফিরে গেছি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সব কিছু।' হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর কাছে যখন মনে হয় নদীটা নাব্য হয়ে উঠেছে, ভাইয়ের কাছে তার পরিকল্পনার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করে সে, আর অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন সেই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা ওর হাতে তুলে দেয়। বহু দিনের জন্যে লাপাত্তা হয়ে যায় সে। লোকে যখন বলাবলি করছে যে নৌকা কেনার পরিকল্পনাটা আসলে ভাই-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চম্পট দেয়ার একটা ফন্দি ছাড়া আর কিছুই না, তখনই একদিন খবর ছড়িয়ে পড়ে যে একটা অদ্ভুত নৌকা এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞের কথা ততোদিনে ভুলে গেছে মাকোন্দোবাসীরা, তারা নদীর তীরে দৌড়ে গিয়ে অবিশ্বাসে ছানাবড়া চোখ নিয়ে শহরের ডকে ভিড়তে দেখে নৌকাটিকে, যদিও সেটাই প্রথম আর সেটাই শেষ। অবশ্য ওটা আর কিছু না, স্রেফ গাছের গুঁড়ির একটা ভেলা, মোটা দড়ি দিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তীর ধরে হাঁটতে থাকা জনা বিশেক লোক। ভেলার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে তৃপ্তির দীপ্তি নিয়ে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো এই দুরূহ কাজের তদারকিতে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আসে চোখ ধাঁধানো সব রমণীর এক চমৎকার দল, তাতানো সূর্যের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে মাথার ওপর রঙচঙা ছাতা ধরে রেখেছে তারা, তাদের কাঁধের ওপর সিল্কের মিহি বস্ত্রাবরণ, মুখে রঙিন ক্রিম, চুলে তাজা ফুল, বাহুতে সোনালী সাপ, আর দাঁত হীরে দিয়ে বাঁধানো। গাছের গুঁড়ির সেই ভেলাটাই একমাত্র নৌযান যেটাকে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো মাকোন্দোতে আনতে পেরেছিল, তা-ও মাত্র একবারের জন্য, কিন্তু তার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা কখনো স্বীকার করেনি সে, বরং তার কাজটাকে ইচ্ছাশক্তির এক বিজয় হিসেবেই ঘোষণা করেছে। ভাই-এর কাছে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দাখিল করার পর ফের মোরগ লড়াইয়ের রুটিনে ফিরে যায় সে। দুর্ভাগ্যজনক সেই দুঃসাহসিক কাজটির একমাত্র যে-চিহ্নটি রয়ে যায় তা হচ্ছে ফ্রান্সের সেই রমণীদের নিয়ে আসা পরিবর্তনের হাওয়া, কারণ তাদের অসাধারণ শিল্পকৌশল প্রণয়ের গতানুগতিক পদ্ধতিগুলো পাল্টে ফেলে, আর সমাজ সম্পর্কে তাদের শুভাশুভ বোধ কাতারিনোর সেকেলে আস্তানাটিকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেয়, সেই সঙ্গে রাস্তাটাকে বানিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়ে জাপানি লণ্ঠন আর স্মৃতিকাতর হ্যান্ড অর্গানের একটা বাজার। মাকোন্দোকে তিন দিনের প্রবল ঘোরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া দুর্দান্ত এক উৎসবের ওরাই হলো গিয়ে উদ্যোক্তা, আর এই উৎসবের একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব হল অরেলিয়ানো সেগান্দোকে ফারনান্দা দেল কার্পিও-র সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়া।

সুন্দরী রেমেদিওসকে রানী ঘোষণা করা হয়। নাতনির আশঙ্কাজনক সৌন্দর্য দেখে কেঁপে ওঠা উরসুলাও এই নির্বাচনটা ঠেকাতে পারে না। তখন পর্যন্ত তাকে রাস্তায় বেরুতে না দেয়ার ব্যাপারে সফলই হয়েছিল উরসুলা, শুধু আমারান্তার সঙ্গে মাস্-এ যাওয়া ছাড়া, যদিও তখনো একটা কালো শাল দিয়ে মুখ ঢেকে নিতে তাকে বাধ্য করেছিল সে। সবচেয়ে যারা অধার্মিক, কাতারিনোর দোকানে ধর্মবিরুদ্ধ মাস্ গাওয়ার জন্যে যারা পাদ্রীর ছদ্মবেশ নিয়ে ঢুকে পড়তো, তারাও গির্জায় গিয়ে হাজির হতো সুন্দরী রেমেদিওসের মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে হলেও দেখার উদ্দেশ্যে নিয়ে, আর তার কিংবদন্তীসম সুন্দর চেহারার কথা তখন গোটা জলাভূমি জুড়ে রীতিমতো বিপজ্জনক উচ্ছ্বাস নিয়ে আলোচিত হতো। তো, অনেক দিন সময় লেগে যায় তাদের কাজটাতে সফল হতে, যদিও তা না হলেই ভালো হতো তাদের জন্যে, কারণ তাদের বেশিরভাগই ঘুমানোর সেই শান্তিদায়ক অভ্যাসটি আর কখনোই ফিরে পেতো না। কাজটা যে সম্ভব করে, এক বিদেশী, সে লোক চিরদিনের জন্যে তার সুস্থতা হারিয়ে ফেলে দুর্দশা আর যন্ত্রণার জলাভূমিতে হাবুডুবু খেতে থাকে, আর বহু বছর পর রেলপথের ওপর ঘুমিয়ে পড়ায় কাটা পড়ে ট্রেনের তলায়। যখন থেকে তাকে সবুজ মখমলের এক প্রস্থ স্যুট আর এমব্রয়ডারি করা একটা গেঞ্জি পরা অবস্থায় গির্জায় দেখা গিয়েছিল, কারোরই এই নিয়ে সন্দেহ হয়নি যে সুন্দরী রেমেদিওসের জাদুকরী মোহে আকৃষ্ট হয়ে বহু দূর থেকে এসেছে সে, সম্ভবত দেশের বাইরের কোনো শহর থেকে। লোকটা এমনই সুদর্শন, মার্জিত, আর চলাফেরায় এমনই ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ যে, তার পাশে সেই পিয়েত্রো ক্রেসপিকেও স্রেফ এক ভুঁইফোঁড় ছাড়া কিছু মনে হতো না, আর মেয়েদের মধ্যে অনেকেই হিংসুটে হাসি হেসে ফিসফিসিয়ে বলতো যে মুখে কালো শালটা আসলে পরার দরকার ছিল সেই লোকটিরই। মাকোন্দোর কারো সঙ্গে সে কথা বলতো না, রূপকথার এক রাজপুত্রের মতো রুপোর রেকাব আর মখমলের কম্বল চাপানো একটা ঘোড়ায় চড়ে রোববার এসে হাজির হতো সে, তারপর মাস্ শেষে চলে যেতো শহর ছেড়ে।

তার উপস্থিতির এমনই তেজ যে গির্জায় তাকে প্রথমবারের মতো দেখা যেতেই সবাই এটা ধরেই নেয় যে তার আর সুন্দরী রেমেদিওসের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটা নীরব আর উত্তেজনাপূর্ণ দ্বৈরথ, এক গোপন চুক্তি, এক অমোচনীয় চ্যালেঞ্জ যার শেষ হবে কেবল ভালোবাসাতেই নয়, মৃত্যুতেও। ষষ্ঠ রোববার হাতে একটা হলুদ গোলাপ নিয়ে হাজির হয় ভদ্রলোক। বরাবরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাস্টা শোনে সে, তারপর সেটা শেষ হতে সুন্দরী রেমেদিওসের সামনে গিয়ে একমাত্র গোলাপটা তার হাতে তুলে দেয়। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেটা গ্রহণ করে সে, যেন এই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রদ্ধার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল সে, তারপর তার মুখের আবরণটা সরিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা মৃদু হাসি হাসে। স্রেফ এটুকুই করে সে। শুধু সেই ভদ্রলোকের জন্যে নয়, তাকে দেখার দুর্ভাগ্যজনক সুযোগ যাদের হয়েছে তাদের সবার জন্য সেটা একটা অনন্ত মুহূর্ত।

এরপর থেকে সেই ভদ্রলোক সুন্দরী রেমেদিওসের জানলার কাছে একদল বাজনাদার নিয়ে বাজনা বাজিয়ে যায়, কখনো কখনো একেবারে ভোর পর্যন্ত। অরেলিয়ানো সেগান্দোই একমাত্র মানুষ যার তার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, কাজেই সে তার অধ্যবসায়টা ভাঙার চেষ্টা করে। এক রাতে সে তাকে বলে, 'খামোখা সময় নষ্ট করো না আর। এই বাড়ির মেয়েরা খচ্চরেরও অধম।' লোকটির দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় সে, আমন্ত্রণ জানায় তাকে শ্যাম্পেন-স্নানে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে তার বংশের মেয়েদের ভেতরটা পাথর দিয়ে তৈরি, কিন্তু লোকটার একগুঁয়েমিতে চিড় ধরাতে পারে না। গান-বাজনার অন্তহীন রাতগুলোর দাপটে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া হুমকি দেয়, পিস্তলের কয়েকটা গুলি দেগে সে লোকটার জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু নিজের শোচনীয় মনোবলহীনতা ছাড়া আর কিছুই লোকটাকে বিরত রাখতে পারে না। সুবেশী আর ধোপদুরস্ত এক মানুষ থেকে নোংরা আর চীরবাসপরা এক লোকে পরিণত হয় সে। গুজব ওঠে, তার দূর মাতৃভূমিতে ক্ষমতা আর সৈনিকদের পাহাড় পায়ে ঠেলে চলে এসেছে সে, যদিও আসলে তার ঠিকুজি-কুষ্ঠির কিছুই জানা সম্ভব হয় না। ক্রমেই লোকজনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তে থাকে সে, শুঁড়িখানায় গোলমাল পাকাতে থাকে যখন তখন, আর নিজের নোংরার মধ্যে গড়াগড়ি খেতে দেখা যেতে থাকে তাকে কাতারিনোর আখড়ায়। তার এই নাটকের করুণতম অংশ হলো সুন্দরী রেমেদিওস তার দিকে আর ফিরেও তাকাতো না, এমনকি সে যখন রাজপুত্তুরের মতো সেজে গির্জায় যেতো তখনো না। বিন্দুমাত্র বিরূপভাব না দেখিয়েই হলুদ গোলাপটা গ্রহণ করতো সে, ব্যাপারটার মধ্যে যে বাড়াবাড়ি আছে সেটা দেখে মজা-ই পেতো, আর যখন সে তার শালটা তুলতো, সেটা তার মুখটা ভালো করে দেখার জন্যে, নিজেরটা দেখাতে নয়।

সত্যি বলতে কি, সুন্দরী রেমেদিওস মর্তের কোনো প্রাণী নয়। সে তার বয়োসন্ধিতে পড়ার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত তাকে গোসল করিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দিতে হতো সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদকে, আর সে যখন নিজের কাজ নিজেই করতে শিখে যায় তখনো তার ওপর নজর রাখার দরকার ছিল, যাতে কাঠির ডগায় নিজের মল লাগিয়ে দেয়ালে দেয়ালে ছোট ছোট প্রাণী আঁকতে না পারে সে। লেখাপড়া না শিখেই বিশ বছরে পা দেয় সে, তখনো জানে না টেবিলে বসে কী করে চামচ দিয়ে খেতে হয়, আর তার স্বভাব সব ধরনের গতানুগতিকতার বাইরে বলে বাড়িতে ন্যাংটো হয়ে চলাফেরা করতো সে। রক্ষীদলের তরুণ কমান্ডার তার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করলে সে তাকে স্রেফ এই কারণে প্রত্যাখ্যান করে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটার ছেলেমানুষি দেখে চমকে গিয়েছিল সে। আমারান্তাকে সে বলেছিল, 'লোকটা কী বোকা দেখো, বলছে সে নাকি আমার জন্যে মরে যাচ্ছে, ভাবখানা আমি খুব বদ একটা শূল-বেদনা।' সত্যিই যখন তার জানলার পাশে লোকটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, সুন্দরী রেমেদিওস তখন হাতে হাতে তার ধারণার প্রমাণ দিয়ে দেয়।

সে মন্তব্য করে, 'কী, বলেছিলাম না? দেখলে তো, লোকটা আসলেই একটা বুদ্ধু।'

মনে হতো যেন, যে-কোনো বাহ্যিক ঘটনার সত্যিকার অবস্থা বুঝতে পারার এক মর্মভেদী স্বচ্ছতা ছিল তার। অন্তত কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি তাই, সুন্দরী রেমেদিওসকে সবাই মানসিকভাবে অপরিণত ভাবলেও সে ঠিক তার উল্টাটাই মনে করতো। কর্নেল বলতো, 'ও যেন বিশ বছরের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে।' অন্যদিকে, অসাধারণ সুন্দরী একটি মেয়েকে তার পরিবারে উপহারস্বরূপ পাঠানোর জন্যে ঈশ্বরকে শুকরিয়া জানাতো উরসুলা, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সৌন্দর্য তাকে চিন্তাতেও ফেলে দিতো, কারণ ওটা তার একটা স্ববিরোধী গুণ বলে মনে হতো তার কাছে, মনে হতো যেন গুণটা তার সৌন্দর্যের মাঝখানে একটা শয়তানীভরা ফাঁদ। ঠিক এই কারণেই জগৎসংসার থেকে তাকে আড়াল করে রাখতে চাইতো সে, রক্ষা করতে চাইতো সমস্ত পার্থিব প্রলোভন থেকে, কিন্তু এ-কথাটা তার জানা ছিল না যে সুন্দরী রেমেদিওস, খোদ তার মায়ের পেটে থাকার সময় থেকেই সবধরনের আবিলতার সংক্রমণের ঝুঁকিমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। উরসুলা ভাবতেই পারেনি যে সুন্দরী রেমেদিওসকে ওরা কার্নিভাল নামের হৈ-হট্টগোলের রানী বানাবে। কিন্তু বাঘের ছদ্মবেশ নেবার খামখেয়ালি আনন্দের সম্ভাবনায় মহা উত্তেজিত অরেলিয়ানো সেগান্দো উরসুলাকে এই কথা বোঝাবার জন্যে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলকে বাড়িতে নিয়ে আসে যে কার্নিভালটা মূর্তিপূজারিদের উৎসব নয়, বরং ক্যাথলিক রীতিরই অংশ। নিমরাজিভাবে হলেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টা বুঝতে পেরে অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজি হয়ে যায় উরসুলা।

রেমেদিওস বুয়েন্দিয়া যে উৎসবের রানী হতে যাচ্ছে সে-খবরটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে জলাভূমির ওধারে ছড়িয়ে পড়ে, পৌছে যায় এমন সব জায়গাতেও যেখানে তার রূপের খ্যাতি পৌছোয়নি, আর তার নামের শেষ অংশটা যাদের কাছে তখনও নাশকতামূলক তৎপরতার প্রতীক, তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে। কিন্তু চিন্তাটা অমূলক। সে-সময় যদি নখদন্তহীন বলতে কেউ থেকে থাকে তো সে হচ্ছে বুড়ো হতে থাকা, দেশের বাস্তবতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হারিয়ে ফেলতে থাকা, মোহভ্রষ্ট কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। নিজের কামারশালায় বন্দি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সঙ্গে বাকি দুনিয়ার একমাত্র সংযোগ হচ্ছে ছোট্ট সোনার মাছের কারবারটা। শান্তিস্থাপনের প্রথম দিনগুলোয় তার বাড়ি পাহারা দিতো এরকম এক সৈন্য জলার গ্রামগুলোয় গিয়ে সেগুলো বিক্রি করে ফিরে আসতো টাকা-পয়সা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরাখবরে ভারি হয়ে। সে জানাতো, উদারপন্থীদের সমর্থনে রক্ষণশীল সরকার এমনভাবে ক্যালেন্ডারের সংস্কার করছে যাতে প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট একশো বছর ক্ষমতায় থাকে। জানাতো, হোলী সী-র সঙ্গে চুক্তিটা শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে আর রোম থেকে একজন কার্ডিনাল এসেছেন হীরের একটা মুকুট আর খাঁটি সোনার একটা সিংহাসন নিয়ে, আর উদারপন্থী মন্ত্রীরা হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর আংটি চুম্বনরত অবস্থার ছবি তুলিয়ে রেখেছে। জানাতো, স্পেনের একটা কোম্পানির প্রধান অভিনেত্রীকে মুখোশ পরা একদল ডাকাত অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর তার পরের রোববার সে রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে নগ্নাবস্থায় নাচ দেখিয়েছে। কর্নেল তাকে বলতো, 'রাজনীতির কথা আর বোলো না আম্যর কাছে, আমাদের কাজ হচ্ছে ছোট ছোট মাছ বিক্রি করা।' কামারশালায় কাজ করে কাড়িকাড়ি টাকা বানাচ্ছে বলেই সে আর ইদানীং দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু কানে তুলতে চায় না, এই গুজব শুনে উরসুলার হাসি পেয়ে যায়। তার প্রখর বাস্তববুদ্ধি দিয়েও সে কর্নেলের ব্যবসার ব্যাপারটা বুঝতে পারতো না, কারণ ক্ষুদে মাছগুলোর বদলে সে স্বর্ণমুদ্রা নেয় আর তারপর সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েই আবার ক্ষুদে ক্ষুদে মাছ তৈরি করে, এটাই চলতে থাকে বারবার, আর তার ফলে এক ক্লান্তিকর দুষ্টচক্র পূর্ণ করার জন্যে সে যতো বিক্রি করতো ততো বেশি খাটতে হতো তাকে। সত্যি বলতে কী, ব্যবসাটার ব্যাপারে যতটা না, তার চেয়ে বেশি আগ্রহ তার কাজটার ব্যাপারে। আঁশগুলো জোড়া দিতে, চোখে ছোট ছোট রুবি লাগাতে, কানকোগুলো স্তরে স্তরে সাজাতে আর ডানা লাগাতে এতো বেশি মনোযোগ দিতে হতো তাকে যে এতটুকু অবসরও সে পেতো না যা সে ভরে দিতে পারে যুদ্ধের ব্যাপারে তার মোহমুক্তিটা দিয়ে। তার ঐ কারুকাজের সূক্ষ্মতার জন্যে যে মনোযোগের দরকার হতো তা তাকে এমনভাবে শুষে নিতো যে অল্প সময়ের মধ্যেই তার বয়স বেড়ে গিয়েছিল, এতোটাই যে যুদ্ধের অতগুলো বছরেও তা হয়নি, আর যেভাবে বসে সে কাজ করতো তাতে তার শিরদাঁড়া গিয়েছিল বাঁকা হয়ে, আর অতি সূক্ষ্ম কাজটা তার চোখের জ্যোতি দিয়েছিল কমিয়ে, কিন্তু সেই গভীর মনোসংযোগ তাকে এনে দিয়েছিল একটা মানসিক প্রশান্তি। যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কোনো ব্যাপারে শেষবারের মতো তাকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায় তখন যখন দুই দলেরই কিছু প্রবীণ সদস্যের একটি দল আজীবন অবসরভাতার ব্যাপারে তার সমর্থন চায়, সে-ব্যাপারে অবশ্য সব সময়ই কেবল কথা দেয়া হতো আর বলা হতো এই তো ওটা কাজে পরিণত হলো বলে। সে তাদের বলে, 'ভুলে যান ওসব, দেখতেই তো পাচ্ছেন, মরার আগ পর্যন্ত ওটার জন্যে অপেক্ষা করার যন্ত্রণা থেকে নিজেকে রেহাই দিতে আমি আমার পেনসন কিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি।' প্রথম প্রথম সন্ধ্যের সময় কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস দেখতে আসতো তাকে, আর তখন রাস্তার পাশের দরজায় বসে দু'জনে স্মৃতিচারণ করতো। কিন্তু একটা টেকো-মাথা যাকে অকাল বার্ধক্যের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে সেই মানুষটা আমারান্তার মনে যে-সমস্ত স্মৃতি উস্কে দিতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা সে সহ্য করতে পারতো না, ফলে বাঁকা বাঁকা মন্তব্য ছুঁড়ে তাকে নিপীড়ন করে যেতো সে, যদ্দিন পর্যন্ত না কেবল বিশেষ বিশেষ কোনো উপলক্ষেই শুধু দেখা মিলতো লোকটার; আর শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতে শেষ হয়ে গিয়ে লোকটার আর কোনো চিহ্নই থাকে না। মিতবাক, নীরব, আর বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দেয়া প্রাণশক্তির নতুন প্রশ্বাসের দিকে ভ্রুক্ষেপহীন কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া কেবল এটুকুই বুঝতো যে একটা চমৎকার বার্ধক্যের মূল কথা হচ্ছে নিঃসঙ্গতার সঙ্গে স্রেফ একটা সম্মানজনক চুক্তি। হালকা একটা ঘুমের পর ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়তো সে, রান্নাঘরে বসে পান করতো তার সেই চিরাচরিত তেতো কফি, দিনভর নিজেকে আটক রাখতো কামারশালায়, আর তারপর বিকেল চারটায় একটা টুল টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে যেতো, ফিরেও তাকাতো না গোলাপ ঝাড়ের আগুন বা সেই সময়টার উজ্জ্বলতা বা আমারান্তার জেদের দিকে—যে-জেদের শোকতাপ সিদ্ধ হতে থাকা পানির পাত্রের মতো শব্দ করতো, আর সন্ধ্যেবেলা যা পরিষ্কার বোঝা যেতো—আর তারপর, মশাগুলো যতক্ষণ বসতে দিতো ততোক্ষণ বসে থাকতো রাস্তার পাশের দরজায়। কেউ একজন হয়ত মাঝে মাঝে সাহস করে তার নিঃসঙ্গতায় বাগড়া দিতো।

'কেমন আছেন, কর্নেল?' পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করতো সে।

'এই তো,' জবাব দিতো কর্নেল।। 'আমার শবযাত্রা কখন এ-পথ দিয়ে যায় সে-অপেক্ষায় বসে আছি।'

কাজেই, সুন্দরী রেমেদিওসের অভিষেকের কারণে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বংশ আবার প্রকাশ্যে আসবে বলে যে-উদ্বেগ দেখা দেয় তার কোনো ভিত্তি ছিল না। অনেকেই অবশ্য ও-রকম করে ভাবল না। ঘনিয়ে আসা দুঃখজনক ঘটনাটার হুমকি সম্পর্কে কিছুই টের না পেয়ে পুরো শহরটা স্কোয়ারে ভেঙে পড়ে আনন্দ-উৎসবের তুমুল কোলাহলভরা বিস্ফোরণে। কার্নিভাল যখন উন্মত্ততার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছোয় আর অরেলিয়ানো সেগান্দো শেষ পর্যন্ত বাঘের সাজে সাজার খায়েশ পুরো করে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় বিষম চেঁচামেচিতে ভেঙে যাওয়া গলা নিয়ে, ঠিক সে-সময় কল্পনার সবচেয়ে মোহনীয় রমণীকে সোনার মিনে করা একটা পালকিতে চড়িয়ে অগুনতি লোকের এক মিছিল এগিয়ে আসে জলাভূমির রাস্তা দিয়ে। পান্নার মুকুট আর নকুলের চামড়ার হাতাছাড়া কোট পরা, চোখ ধাঁধানো এই প্রাণীটি কেবল বালাচুড়ি আর আর ক্রেপ কাপড়ের রানী নয় বরং পুরোপুরি বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারিণী, তাকে আরো ভালো করে দেখার জন্য কিছুক্ষণের জন্যে মুখোশ খুলে ফেলে মাকোন্দোবাসীরা। এমন লোক ওখানে নেহাত কম ছিল না যারা ঘটনাটার মধ্যে একটা উস্কানিমূলক ব্যাপার দেখতে পায়, কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দো নিমেষেই তার হতবুদ্ধি অবস্থা কাটিয়ে উঠে সদ্য আসা লোকজনকে তার বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘোষণা দেয়, আর তারপর রীতিমত সোলায়মানের মতো প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে সুন্দরী রেমেদিওস আর অনাহুত রানীকে একই মঞ্চে বসিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। বেদুইনের ছদ্মবেশধারী আগন্তুকরা মাঝরাত পর্যন্ত সেই মত্ততায় মেতে থাকে, এমনকি চোখ ঝলসানো আতশবাজি আর দড়াবাজির নানান কসরত দিয়ে এমনভাবে সেটাকে আরো জমজমাট করে দেয় যে জিপসিদের কথা মনে পড়ে যায় সবার।। হঠাৎ, উৎসবের উন্মত্ততার মধ্যে, কে যেন নষ্ট করে দেয় সূক্ষ্ম ভারসাম্যটা।

'লিবারেল পার্টি জিন্দাবাদ,' চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা। 'কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া জিন্দাবাদ!'

রাইফেলের গুলিতে ঢাকা পড়ে যায় আতশবাজির চোখ ধাঁধানো দীপ্তি, গান-বাজনার শব্দ চাপা পড়ে যায় প্রচণ্ড ভয়ের আর্তচিৎকারে, আর হাসি-আনন্দটা পরিণত হয় একটা আতংকে। বহু বছর পরেও কিছু লোক ছিল যারা তখনো জোর গলাতেই বলতো রহস্যময়ী রানীর রাজরক্ষীরা ছিল আসলে পেশাদার সৈন্যদের একটা স্কোয়াড, সরকারের দেয়া রাইফেল তারা লুকিয়ে রেখেছিল তাদের মূরদেশীয় দামি আলখাল্লার তলায়। বিশেষ একটা ঘোষণায় সরকার অভিযোগটা অস্বীকার করে, কথা দেয় এই রক্তাক্ত ঘটনাটার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের। কিন্তু আসল কথাটা কোনোদিনই আর জানা যায় না, আর এই কথাটাই লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে যে রয়্যাল গার্ড কোনোরকমের উস্কানি ছাড়াই তাদের কমান্ডারের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে কমব্যাট পজিশনে চলে গিয়ে কোনো দয়ামায়া না করে ভিড়ের ওপর গুলি চালিয়েছিল। সব কিছু যখন ফের শান্ত হয়ে আসে, ভুয়া বেদুইনদের একজনেরও দেখা মেলে না শহরে, আর দেখা যায় হতাহত হয়ে অনেকেই পড়ে আছে স্কোয়ারে: ন'জন ক্লাউন, চারজন কলম্বিয়, সতেরজন তাসের রাজা, একজন শয়তান, তিনজন চারণ কবি, ফ্রান্সের দুই পিয়ার আর জাপানী তিন সম্রাজ্ঞী। আতংকের সেই ডামাডোলের মধ্যে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কোনোরকমে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সুন্দরী রেমেদিওসকে, আর অরেলিয়ানো সেগান্দো পাঁজাকোলা করে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে রহস্যময়ী রানীকে, রানীর কাপড় ছিঁড়ে তখন ফালা ফালা, নকুলের চামড়ার হাতাছাড়া কোট রক্তে সয়লাব। ফারনান্দা দেল কার্পিও নাম তার। দেশের পাঁচ হাজার সেরা সুন্দরীর একজন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল তাকে, আর তাকে মাদাগাস্কারের রানী বানানো হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওরা মাকোন্দোতে নিয়ে এসেছিল তাকে। উরসুলা এমনভাবে তার সেবা-যত্ন করে যেন সে তার নিজের মেয়ে। শহরের লোকজন তার সরলতাকে সন্দেহের চোখে না দেখে বরং তার অকপটতাকে করুণাই করে। নির্বিচার এই গণহত্যার ছ'মাস পর, আহতরা যখন সেরে উঠেছে আর গণকবরের শেষ ফুলগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে আনতে যায় সেই দূর নগরে যেখানে সে তার বাবার সঙ্গে থাকে, তারপর, বিশ দিন স্থায়ী এক হট্টগোলভরা উৎসবের মধ্যে মাকোন্দোতে বিয়ে করে তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস দু'-এক পরেই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় বিয়েটা, কারণ পেত্রা কোতেসকে শান্ত করার জন্য তাকে মাদাগাস্কারের রানীর সাজে সাজিয়ে তার একটা ছবি তুলেছিল অরেলিয়ানো সেগান্দো। ঘটনাটা জানতে পেরে, ফারনান্দা তার বিয়ের বাক্স-প্যাঁটরা ফের গুছিয়ে নিয়ে কাউকে কিছু না বলেই চলে যায় মাকোন্দো ছেড়ে। জলাভূমির রাস্তায় গিয়ে তার নাগাল ধরে অরেলিয়ানো সেগান্দো। এন্তার কাকুতি-মিনতি আর ভালো হয়ে যাবার ওয়াদার পর তবেই তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারে সে, আর তারপর সম্পর্ক চুকিয়ে দেয় তার রক্ষিতার সঙ্গে।

নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পেত্রা কোতেসের মধ্যে তাড়াহুড়োর কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। লোকটাকে পুরুষ মানুষ বানিয়েছে সে-ই। মেলকিয়াদেসের ঘর থেকে সে যখন অরেলিয়ানো সেগান্দোকে বের করে নিয়ে এসেছিল তখনো রীতিমত একটা বাচ্চা সে, মাথাভর্তি আজগুবি সব চিন্তাভাবনা, বাস্তবের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, আর তখন এই দুনিয়াতে ওকে একটা ঠাঁই করে দিয়েছিল সে-ই। প্রকৃতিই ওকে গম্ভীর আর উদাসীন হিসেবে গড়ে তুলেছিল, দিয়েছিল একা একা বসে ভাবনায় ডুবে যাওয়ার একটা প্রবণতা, অন্য দিকে পেত্রা কোতেস তার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এর বিপরীত একটা চরিত্র, এমনই একটা চরিত্র যা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা, অকপট, খোলামেলা, তাছাড়া তার মধ্যে সে ঢুকিয়ে দিয়েছিল বেঁচে থাকার আনন্দ, খরচ করার আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠার সুখ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একেবারে আগাপাশতলা বদলে তাকে এমন একটা মানুষে পরিণত করে ফেলেছিল যে-মানুষের কথা নিজের জন্যে সব সময় ভেবে এসেছে সে তার বয়োসন্ধির সময় থেকেই। আর তারপরেই বিয়ে করেছিল অরেলিয়ানো সেগান্দো, যেমনটা সব ছেলেরাই করে কিছু আগে আর পরে। খবরটা পেত্রা কোতেসকে জানাবার সাহস হয়নি তার। সে বরং এমন একটা ভাব করেছে যা কিনা ঐ পরিস্থিতিতে একেবারে ছেলেমানুষী বলে মনে হয়েছে, রাগ আর কাল্পনিক বিরক্তির এমন এক ভান করেছে যাতে পেত্রা কোতেস-ই ভাঙনটার সূচনা করে। একদিন অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে অন্যায়ভাবে বকাঝকা করলে পেত্রা কোতেস ফাঁদটায় ধরা না দিয়ে বরং এমন ভাব করে যেন কিছুই হয়নি।

সে বলে, 'এসবের মানে হচ্ছে, তুমি সেই রানীকে বিয়ে করতে চাও।'

লজ্জা পেয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো ভান করে যেন ভীষণ রেগে গেছে সে কথাটা শুনে, বলে, আসলে পেত্রা কোতেস ভুল বুঝছে তাকে, অপমান করছে, আর তারপর তার ওখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয় সে। পেত্রা কোতেস একটা সুযোগের অপেক্ষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধৈর্য ধরে থাকা তার বুনো জন্তুর ধৈর্যে চিড় না ধরিয়ে শুনে যায় বিয়ের অনুষ্ঠানের গান-বাদ্য আর আতশবাজি পোড়ানোর শব্দ, সেই উৎসবের উন্মত্ত শোরগোল, ভাবখানা যেন পুরো ব্যাপারটা আর কিছু না, স্রেফ অরেলিয়ানো সেগান্দোর নতুন কোনো দুষ্টুমী। পেত্রা কোতেসের নিয়তি যাদের করুণার উদ্রেক করে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয় মৃদু এক হাসি দিয়ে। সে তাদের বলে, 'চিন্তা করো না। রানীরা আমার ফুট-ফরমায়েশ খাটে।' সে যাতে তার হারানো প্রেমিকের ছবিটা পোড়াতে পারে সেজন্য এক তাড়া মোমবাতি নিয়ে আসা এক প্রতিবেশিনীকে সে এক রহস্যময় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে:

'একটা মোমবাতিই ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আর সেটা সব সময়ই জ্বলছে।'

ঠিক যেমনটা সে আগেভাগেই বুঝতে পেরেছিল, মধুচন্দ্রিমা শেষ হতে না হতেই অরেলিয়ানো সেগান্দো ফিরে আসে তার কাছে। সঙ্গে নিয়ে আসে তার বরাবরের পুরনো ইয়ার-দোস্তদের, এক ভ্রাম্যমাণ ফটোঅলা, আর কার্নিভালের সময় ফারনান্দা যে-রক্তমাখা গাউন আর নকুলের চামড়ার হাতাছাড়া কোটটা পরেছিল সেটা। সেই সন্ধ্যাতেই শুরু হয়ে যাওয়া আনন্দোল্লাসের প্রচণ্ডতার মধ্যে পেত্রা কোতেসকে রানীর সাজে সাজায় সে, মাদাগাস্কারের পরম আর আজীবন শাসকের উপাধিতে ভূষিত করে তাকে, আর তারপর ছবির কপিগুলো বিলি করে দেয় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে। খেলাটা যে শুধু চালিয়েই যায় পেত্রা কোতেস তাই নয়, সেই সঙ্গে এই ভেবে ভেতরে ভেতরে অরেলিয়ানো সেগান্দোর জন্যে তার খারাপও লাগে যে বিরোধ-নিষ্পত্তির এমন একটা ব্যয়বহুল উপায় ঠাওরাবার জন্য সে নিশ্চয়ই ভয়ে ভয়ে আছে। সন্ধ্যা সাতটায়, তখনো রানীর সাজে সাজা সে, পেত্রা কোতেস তাকে বরণ করে নেয় বিছানায়। দু'মাসও হয়নি বিয়ে করেছে অরেলিয়ানো সেগান্দো, কিন্তু পেত্রা কোতেস মুহূর্তের মধ্যে বুঝে যায় যে বৌ-এর সঙ্গে বিছানায় খুব একটা সুখী নয় সে। শোধ নিতে পারার তৃপ্তিদায়ক আনন্দে বুকটা ভরে যায় তার। দু'দিন পর অবশ্য অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন তার কাছে ফিরে আসার সাহস না পেয়ে বরং আলাদা থাকার শর্ত ঠিক করার জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী পাঠিয়ে দেয় তখন পেত্রা কোতেস বুঝে যায় যে সে যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি ধৈর্য ধরতে হবে তাকে, কারণ, অরেলিয়ানো সেগান্দোর ভাব দেখে তার মনে হয় বাইরের ঠাঁট বজায় রাখতে নিজেকে বলি দেবে বলে-ই ঠিক করেছে সে। এমনকি মন খারাপও করে না পেত্রা কোতেস। আরো একবার সব কিছু মেনে নিয়ে ব্যাপারটাকে সহজ করে নেয় সে, যা কিনা সবার ধরে নেয়া সেই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল করে দেয় সে যে আসলে এক হতভাগী, আর অরেলিয়ানো সেগান্দোর একমাত্র যে-স্মৃতিচিহ্ন সে নিজের কাছে রেখে দেয় সেটা হচ্ছে পাকা চামড়ার একজোড়া বুট জুতো, এই জুতোজোড়া পরেই অরেলিয়ানো সেগান্দো নিজের কফিনে শোবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল একবার। কাপড়ে মুড়ে একটা তোরঙ্গের নিচে রেখে দেয় সে ও-দুটো, তারপর তৈরি হয় হতাশ না হয়ে অপেক্ষায় থেকে স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে সে বলে, 'আজ হোক কাল হোক, আসতে ওকে হবেই। এমনকি স্রেফ ওই বুটজুতো জোড়া পরার জন্যে হলেও।'

যতটা ভেবেছিল ততদিন কিন্তু পথ চেয়ে থাকতে হয় না তাকে। সত্যি বলতে কি, বিয়ের রাতেই অরেলিয়ানো সেগান্দো বুঝে গিয়েছিল যে পাকা চামড়ার বুট জোড়া পরার সময় হওয়ার অনেক আগেই পেত্রা কোতেসের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে তাকে, তার কারণ ফারনান্দা এই পৃথিবীতে একেবারেই অচল। ফারনান্দার জন্ম, বেড়ে ওঠা, সবই ছয়শো মাইল দূরের এক শহরে, বিষণ্ন সেই শহরে ভূতুড়ে সব রাত্তিরে রাজপ্রতিনিধিদের কোচগুলো নুড়ি বিছানো পথ ধরে এখনো ঘর্ঘর শব্দে ছুটে যায়। বিকেল ছ'টায় গির্জার জনা বত্রিশেক ঘণ্টাবাদক এক শোক সঙ্গীতের মাতম তোলে। সমাধিপ্রস্তরের মতো ফলক দিয়ে বাঁধানো জমিদারবাড়ি থেকে সূর্য দেখা যায় না কখনো। উঠোনের সাইপ্রেস গাছে, শোবার ঘরগুলোর কারুকার্যময় ম্লান সাজ-সজ্জায়, চিরজীবী গাছের বাগানে ফোঁটায় ফোঁটায় পানিঝরা খিলানঢাকা পথে বাতাস মরে এসেছে। বছরের পর বছর ধরে সিয়েস্তার ঘুম ঘুমানোর কোনো তাড়া অনুভব করে না এমন একজনের কাছে পাশের এক বাড়িতে পিয়ানো শেখার বিষণ্ন পাঠ ছাড়া বাইরের দুনিয়ার কোনো খবরই জানতো না ফারনান্দা তার বয়োসন্ধির আগ পর্যন্ত। জানলার শার্সির ভেতর দিয়ে আসা মিহিদানার মতো সবুজ আর হলুদ আলোর নিচে তার অসুস্থ মায়ের ঘরে বসে সে নিয়মবদ্ধ, একগুঁয়ে, নিষ্করুণ সুর শুনতো আর ভাবতো দুনিয়াতে এমনতরো সঙ্গীতও আছে অথচ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে শেষ হয়ে যাচ্ছে সে। পাঁচটার জ্বরে ঘামতে ঘামতে তার মা তার কাছে বলে যেতেন অতীতের জাঁকজমকের কাহিনী। ফারনান্দা যখন খুব ছোট, তখন এক জোছনাভরা রাতে সে দেখেছিল আগাগোড়া সাদা কাপড় পরা এক রমণী বাগানটা পেরিয়ে চ্যাপেলের দিকে যাচ্ছে। সেই ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যের যে-ব্যাপারটা তাকে ভীষণ বিচলিত করেছিল তা হল রমণীটি দেখতে অবিকল তার নিজেরই মতো, যেন বিশ বছর পরের নিজেকে দেখে ফেলেছিল সে আগেই। কাশির দমকে খানিকটা বিরতি পড়লে একবার তার মা তাকে জানান, 'উনি হচ্ছেন তোর দাদীর মা; রানী ছিলেন উনি। এক ছড়া কন্দ কাটার সময় কু-বাতাস লেগে মারা গিয়েছিলেন।' বহু বছর পর যখন তার মনে হতে শুরু হয়েছে যে সে তার দাদীর মায়ের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে, ছেলেবেলাকার সেই দৃশ্যটার ব্যাপারে সন্দেহ জন্মে তার, কিন্তু সেই অবিশ্বাসের জন্যে তাকে বকাঝকা করেন তার মা।

'আমাদের পরিবারটা খুবই ধনী আর ক্ষমতাশালী,' তিনি বলেন তাকে। 'দেখিস, একদিন রানী হবি তুই।'

যদিও তারা তখন স্রেফ এক কাপ পানি দেয়া চকোলেট আর একটা মিষ্টি রুটি খাওয়ার জন্যে লিনেন-এর টেবিল-ঢাকা আর রুপোর এক প্রস্থ থালাবাটি সামনে নিয়ে লম্বা একটা টেবিলে বসে রয়েছে, তারপরেও কথাটা বিশ্বাস করে নেয় ফারনান্দা। তার বিয়ের পোশাক-আশাক কেনার জন্য তার বাবা দন ফারনান্দাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও তাদের বাড়িটা বন্ধক রাখতে হয়, কিন্তু ফারনান্দা তার বিয়ের দিন পর্যন্ত কিংবদন্তীর মতো এক রাজ্যের স্বপ্ন দেখতো। ব্যাপারটা যে সারল্য কিংবা জাঁকজমকের মোহ, তা কিন্তু নয়, আসলে ওভাবেই তাকে বড় করেছিলেন তাঁরা। তার মনে আছে, বুদ্ধি হবার পর থেকেই সে তাদের কুলচিহ্ন বসানো একটা সোনার গামলায় পায়খানা-প্রস্রাব করেছে। প্রথম সে বাড়ির বাইরে যায় বারো বছর বয়সে, ঘোড়ায় টানা একটা কোচে করে, যদিও তাকে একটা কনভেন্টে পৌঁছে দিতে সেটাকে মাত্র দুটো ব্লক ঘুরতে হয়েছিল। খুব উঁচু পিঠঅলা একটা চেয়ারে সে সবার কাছ থেকে খানিকটা দূরে বসতো বলে আর এমনকি জলখাবারের সময়ও তাকে কারো সঙ্গে মিশতে না দেখে তার সহপাঠীরা সবাই অবাক হয়ে যায়। 'মেয়েটা একটু আলাদা। একদিন ও রানী হবে।' সন্ন্যাসিনীরা এই বলে সবাইকে বোঝাতো। তার স্কুলের শিক্ষকরাও কথাটা বিশ্বাস করতেন কারণ, ততদিনে সে তাঁদের দেখা সবচেয়ে সুন্দরী, আলাদা, আর বিচক্ষণ মেয়ে হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছে। অবশেষে, নয়ে পা দিয়ে, সে তাদের নিজেদের বাড়ি ফিরে আসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মালা গাঁথতে, ততদিনে সে শিখে গেছে লাতিন কবিতা লেখা, ক্ল্যাভিকর্ড বাজানো, ভদ্রলোকদের সঙ্গে কী করে বাজপাখি ওড়ানো সম্পর্কে কথা বলতে হয় আর আর্চবিশপের সঙ্গে বলতে হয় আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক কথাবার্তা, কী করে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আলাপ করতে হয় দেশের নানান ব্যাপার নিয়ে আর পোপের সঙ্গে ঈশ্বর-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। তো, এসে দেখে একেবারে ভগ্নদশা বাড়িটার। থাকার মধ্যে আছে কেবল না হলেই নয় এমন কিছু আসবাবপত্র, রুপোর মোমদান আর টেবিলের থালাবাটি, কারণ তার লেখাপড়ার খরচ জোগাতে গিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের তৈজসপত্র এক এক করে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। পাঁচটার জ্বরে ভুগে তার মা মারা গেছেন। শক্ত কলারঅলা কালো পোশাক আর একটা সোনার ঘড়িঅলা চেইন পরা তার বাবা সোমবারের সন্ধ্যায় গেরস্থালি খরচা বাবদ একটা রুপোর পয়সা তার হাতে তুলে দিতেন, আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মালাগুলো নেবার নির্দিষ্ট সময়ের এক হপ্তা আগেই সেগুলো তৈরি হয়ে যেতো। নিজের পড়ার ঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন তার বাবা, মাঝে মধ্যে বাইরে আসতেন তার সঙ্গে জপমালায় স্তবগান আওড়ানোর জন্যে। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছিল না ফারনান্দার। গোটা দেশে রক্তের নহর বইয়ে দেয়া যুদ্ধটার কথাও কাউকে বলতে শোনেনি সে। বিকেল তিনটের পিয়ানো পাঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে। এমনকি রানী হওয়ার মোহটা পর্যন্ত যখন কেটে যেতে শুরু করেছে তার, এমনি সময় একদিন দরজায় কড়া নাড়ার কর্তৃত্বপূর্ণ আওয়াজ শুনে দরজা খুলে সে দেখে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত ফিটফাট এক সামরিক অফিসার, তার গালে একটা কাটা দাগ আর বুকে একটা সোনার মেডেল। ফারনান্দার বাবার সঙ্গে পড়ার ঘরে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় তার। দুই ঘণ্টা পর ওর খোঁজে সেলাইঘরে ঢোকেন তার বাবা। তিনি তাকে বলেন, 'তুই তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে, মা। একটা লম্বা সফরে যেতে হবে তোকে।' এই হচ্ছে তার ম্যাকোন্দোয় আসার কাহিনী। বাস্তবতার যে-ভার তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা-মা বহুদিন তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, জীবন তার পুরোটাই এক নিষ্ঠুর চপেটাঘাতে ফারনান্দার ওপর চাপিয়ে দেয় মাত্র এক দিনের মধ্যে। বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করে সে, দন ফারনান্দা বৃথাই সেই উদ্ভট রসিকতার ক্ষতগুলো মুছে দিতে চেষ্টা করেন শত অনুনয়-বিনয় আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। নিজের কাছে ফারনান্দা কসম খেয়েছিল মরার আগ পর্যন্ত শোবার ঘর ছেড়ে বেরুবে না সে, আর তখনই অরেলিয়ানো সেগান্দো আসে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সে-এক অবাস্তব নিয়তির খেলা, কারণ তার সেই ঘৃণা মেশানো প্রচণ্ড ক্রোধের মুহূর্তে, সেই লজ্জার আক্রোশে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছে মিথ্যে কথা বলেছিল সে, যাতে লোকটা তার আসল পরিচয় কোনোদিনই জানতে না পারে। তার খোঁজে বেরোবার সময় অরেলিয়ানো সেগান্দোর হাতে সূত্র বলতে ছিল কেবল ফারনান্দার স্পষ্ট পার্বত্যদেশীয় উচ্চারণ, আর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মালা গাঁথার ব্যবসা। মাকোন্দো পত্তন করার জন্যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যে ভয়ংকর দুঃসাহস নিয়ে পাহাড় ডিঙিয়েছিল, যে অন্ধ গর্ব নিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার নিষ্ফল যুদ্ধগুলো চালিয়ে গিয়েছিল, উন্মত্ত যে-একগুঁয়েমী নিয়ে উরসুলা তার বংশের ভালো-মন্দের দেখাশোনা করছিল, তার সবটুকু এক করে ফারনান্দাকে খুঁজেছিল অরেলিয়ানো, মুহূর্তের জন্যে বিরাম না মেনে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মালা কোথায় বিক্রি হয় জিজ্ঞেস করাতে লোকজন তাকে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে নিয়ে যায়, যাতে সবচেয়ে ভালো মালাগুলো পছন্দ করতে পারে সে। এই পৃথিবীতে মানুষের দেখা সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করাতে প্রত্যেক মহিলাই তার কাছে নিয়ে আসে নিজের মেয়েকে। আবছায়া অলিগলিতে, বিস্মৃতির জন্য সংরক্ষিত সময়ে, হতাশার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলে সে। হলুদ-রঙা এমন এক সমতলভূমি পাড়ি দেয় সে যেখানে লোকের ভাবনা-চিন্তা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে আর উৎকণ্ঠার কারণে সেই সব মরীচিকা তৈরি হয় যা আগেই সতর্ক করে দেয় সবাইকে। কয়েক হপ্তা নিষ্ফলা কেটে যাওয়ার পর অচেনা এক শহরে এসে পড়ে সে, দেখে সেখানকার সব কটা ঘণ্টাতেই একটা শোকসঙ্গীত বেজে চলেছে। দেখামাত্রই সে চিনে ফেলে সেই সব নোনাধরা দেয়াল, ভেঙে পড়া, ছত্রাকদষ্ট কাঠের ব্যালকনি, আর বাইরের দরজায় পেরেক আঁটা, বৃষ্টির ধারায় প্রায় মুছে যাওয়া, পৃথিবীর সবচেয়ে বিষণ্নদর্শন কার্ডবোর্ডের সাইনবোর্ডটি: *এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মালা বিক্রি হয়*। সাইনবোর্ডটা তার নজরে পড়ার সেই মুহূর্ত আর কনভেন্ট প্রধানের তত্ত্বাবধানে রেখে ফারনান্দা হিমঠাণ্ডা যে-সকালে বাড়ি ছাড়ে সেই সময়টার মাঝখানে জোটা সামান্য অবসরের মধ্যে সন্ন্যাসিনীরা তার বিয়ের পোশাক সেলাই করে দেয়, আর ছ'টা ট্রাংকের ভেতর ভরে দেয় সুদৃশ্য, ডালপালা ছড়ানো মোমদানি, রুপোর থালাবাটি, সোনার চেম্বারপট, আর সেই সঙ্গে, দুই শতাব্দী দেরি করে আসা একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার অগুনতি অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ। ফারনান্দার সঙ্গী হওয়ার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন দন ফারনান্দা। কথা দেন, নিজের কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে তারপর যাবেন তিনি, আর মেয়েকে আশীর্বাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার পর নিজেকে ফের অবরুদ্ধ করে ফেলেন পড়ার ঘরে, শোকার্ত সব বিবরণ আর তাঁদের কুলচিহ্নসহ একটা ঘোষণাপত্র লিখে ফেলার জন্য; এটাই হয়ে দাঁড়াবে ফারনান্দা আর তার বাবার সারা জীবনে ঘটা প্রথম মানবিক সম্পর্ক। ফারনান্দার সত্যিকারের জন্মদিন সেটাই, আর অরেলিয়ানো সেগান্দোর জন্যে সেটা একই সঙ্গে সুখের শুরু ও শেষ।

ছোট ছোট সোনালী গুটিকা লাগানো একটা জটিল ক্যালেন্ডার সঙ্গে নিয়ে নেয় ফারনান্দা, তাতে তার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা লাল-বেগুনি কালিতে মিলন-নিষিদ্ধ দিনগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। হোলি উইক[1], রোববার, মাস্ শোনার ও ভারি কাজ থেকে বিরত থাকার দিনগুলো, প্রথম শুক্রবারগুলো, ধর্মচিন্তার জন্য সাময়িক নিভৃতাবাস, নৈবেদ্যদান আর মাসিকের দিনগুলো বাদ দেয়ার পর কার্যত তার বছরটা এসে ঠেকেছিল লাল কাটাচিহ্ন ভরা একটা জালের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিয়াল্লিশ দিনে। সময়-ই এসব বিরূপ ব্যাপার-স্যাপারের অবসান ঘটাবে এই বিশ্বাস নিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো উৎসবটাকে বাড়তি কিছু দিন বরাদ্দ করে। ব্র্যান্ডি আর শ্যাম্পেনের খালি বোতলগুলো যাতে বাড়িটাকে বোঝাই করে ফেলতে না পারে সেজন্যে সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে ক্লান্ত আর সেই সঙ্গে আতশবাজি, গান বাজনা আর গবাদি পশু জবাইয়ের মোচ্ছবের ভেতর বর-কনে আলাদা ঘরে আর একেক সময়ে শুচ্ছে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠা উরসুলার মনে পড়ে যায় তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা, ভাবে, ফারনান্দারও কোনো সতীত্বরক্ষাকারী কোমরবন্ধ আছে কিনা যা শিগগিরই শহরময় নানান হাসি-তামাশার জন্ম দেবে আর কোনো করুণ ঘটনার কারণ হবে। কিন্তু ফারনান্দা তার কাছে খোলাসা করে যা বলে তা হল যে আসলে তার স্বামীর সঙ্গে প্রথম সংসর্গের আগে দুটো হপ্তা সময় নিচ্ছে সে। সত্যি বলতে কি, সময়টা পেরিয়ে যাবার পর প্রায়শ্চিত্তকারী এক শিকারের বশ্যতা নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দরজা খুলে দেয় ফারনান্দা আর তখন অরেলিয়ানো সেগান্দো দেখতে পায় দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে, তার দীপ্তিময় চোখে এক জন্তুর ভীরুতা আর তার দীর্ঘ তামাটে রঙের চুল বালিশে ছড়ানো। দৃশ্যটা তাকে যারপরনাই মুগ্ধ করে ফেলে, আর সেজন্যে এটা বুঝতে তার খানিকটা সময় লাগে যে ফারনান্দা গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা একটা সাদা রাত্রিবাস পরে আছে, সেটার হাতা লম্বা, আর তার তলপেট বরাবর রয়েছে চমৎকার করে ছাঁটা একটা বিরাট, গোল বোতামঘর। হাসির দমকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না অরেলিয়ানো সেগান্দো।

'এর চেয়ে অশ্লীল দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি,' পুরো বাড়ি কাঁপানো এক হাসি হেসে বলে ওঠে সে। 'আমি তো দেখছি সন্ন্যাসিনী বিয়ে করেছি।'

এক মাস পরেও বৌকে তার রাত্রিবাসটা খুলে ফেলতে বাধ্য করতে না পেরে মাদাগাস্কারের রানী হিসেবে পেত্রা কোতেসের ছবি তোলায় সে। পরে, ফারনান্দাকে

---

[1] ইস্টার-এর আগের সপ্তাহ। — অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন সে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, তখন সব কিছু মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে তার আগ্রহের আতিশয্যের কছে হার মেনে নেয় তার বৌ, কিন্তু শান্তির যে-স্বপ্ন নিয়ে সেই বত্রিশটা ঘণ্টাঘরের শহরে অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে আনতে গিয়েছিল সেই শান্তি তাকে দিতে পারে না তার বৌ। তার মধ্যে অরেলিয়ানো সেগান্দো যা পায় তা হল স্রেফ নিঃসঙ্গতার এক গভীর বোধ। এক রাতে, ওদের প্রথম সন্তান জন্ম নেয়ার কিছুদিন আগে, ফারনান্দা বুঝতে পারে তার স্বামী গোপনে পেত্রা কোতেসের শয্যায় ফিরে গেছে।

অরেলিয়ানো সেগান্দো অবশ্য স্বীকার করে, 'আসলেই ব্যাপারটা তাই।' তারপর অসহায় আত্মসমর্পণের সুরে সে ব্যাখ্যা করে বলে, 'আমার জন্তুগুলো যাতে বাচ্চা বিয়োনো বন্ধ না করে সেজন্যে কাজটা আমাকে বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে।'

এমন অদ্ভুত একটা সুবিধাজনক উপায়ের কথা ফারনান্দাকে বিশ্বাস করাতে খানিকটা সময় ব্যয় করতে হয় তাকে, তবে অকাট্য প্রমাণ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন তাকে বিশ্বাস করানো যায়, ফারনান্দা কেবল এই একটা ওয়াদা দাবি করে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছে যে, রক্ষিতার বিছানায় যেন মৃত্যু না হয় তার। তো, এভাবেই, কেউ কারো অসুবিধা সৃষ্টি না করে দিন গুজরান করে যায় তিনজন। দু'জনের সঙ্গেই নিয়মনিষ্ঠ আর প্রেমপূর্ণ অরেলিয়ানো সেগান্দো, মনকষাকষি মিটে যাওয়ার গর্বে ডগমগ পেত্রা কোতেস, আর এসবের কিছুই না জানার ভান করা ফারনান্দা।

ফারনান্দাকে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চুক্তিটা অবশ্য খাটে না। সহবাসের পর সে একটা শক্ত গলাবন্ধ পড়তো আর তাই দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা কানাকানি করতো, উরসুলা বৃথাই তাকে সেটা খুলে রাখার জন্যে জোরাজুরি করে। তাছাড়া, সে যাতে গোসলখানা কিংবা রাতের পায়খানাটা ব্যবহার করে আর সোনার চেম্বারপটটা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দিয়ে দেয় যাতে সে ওটা দিয়ে ছোট ছোট মাছ বানাতে পারে—এসব ব্যাপারে অনেক বলে কয়েও তাকে কিছুতেই রাজি করানো যায় না। তার ভুলভাল শব্দচয়ন, আর প্রতিটি জিনিসের উল্লেখেই সেটাকে আরো মিষ্টি করে বলার অভ্যাসে আমারান্তা এমনই অস্বস্তি বোধ করতো যে ফারনান্দার সামনে সব সময় আবোলতাবোল বকতো সে।

বলতো, 'থিফিসিফ ইফিসিফ অনেফস অফোসিফ থোফোসিফ হুসোফি ক্যান্টানটান্ট স্টাটান্টান্ড থেফেসেফ স্মুফুমেলু ওফোসিফ দেরিসির ওফিসোন শিফিসিফিট।'

এই বিদ্রূপবাণে অতিষ্ঠ হয়ে ফারনান্দা একদিন জানতে চায় আমারান্তা কী বলছে, আমারান্তা কিন্তু উত্তর দেবার সময় কোনো সুভাষণ ব্যবহার করে না।

সে তাকে বলে, 'আমি বলছিলাম তুমি সেই সব মানুষের দলে যারা পাছা আর কাছার মধ্যে ফারাক বুঝতে পারে না।'

সেই দিন থেকে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে কথা বলতে হলে একে অন্যের কাছে চিরকুট পাঠাতো তারা। এ-বাড়ির তরফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সুস্পষ্ট বিরোধিতার পরেও ফারনান্দা তার পূর্ব-পুরুষদের রীতিনীতি প্রচলন করার ইচ্ছেটা ছাড়তে পারে না। রান্নাঘরে বসে, আর খিদে পেলেই খাওয়ার নিয়মের অবসান ঘটায় সে, আর সেই সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেয় লিনেন কাপড়ে ঢাকা, রুপোর মোমদানি ও থালাবাটি সাজানো বিরাট টেবিলে নিয়মিত বিরতিতে খাওয়া-দাওয়া সারার। যে-কাজটিকে উরসুলা প্রাত্যহিক জীবনের সবচেয়ে সহজ-সরল কাজ বলে ভেবেছিল, সেটাতে এমন এক গুরু-গম্ভীর ভাব চলে আসাতে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আর সেটার বিরুদ্ধে অন্য সবার আগে যে-মানুষটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সে হল ঠাণ্ডা, চুপচাপ স্বভাবের হোসে আর্কাদিও সেগান্দো। কিন্তু তারপরেও রীতিটা চালু হয়ে যায়, ঠিক যেমনটি চালু হয় রাতের খাওয়ার আগে স্তবমালা জপ করার রেওয়াজ; আর, এসব ব্যাপার কিন্তু পাড়াপড়শীর নজর এড়ায় না, শিগ্‌গিরই তারা গুজব ছড়িয়ে দেয় যে বুয়েন্দিয়ারা অন্যদের মতো টেবিলে বসে না, বরং খাওয়ার কাজটাকে তারা 'হাই মাস'-এর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এমনকি, কোনো ঐতিহ্য অনুযায়ী নয় বরং পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী তৈরি হওয়া উরসুলার কুসংস্কারগুলোর সঙ্গেও ফারনান্দার কুসংস্কারগুলোর দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়; এগুলো সে তার বাবা-মার কাছ থেকে পেয়েছিল, আর প্রতিটি উপলক্ষ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত ও শ্রেণীভাগ করে রেখেছিল। যদ্দিন পর্যন্ত উরসুলার কর্মক্ষমতা পুরোপুরি বজায় থাকে তদ্দিন পর্যন্ত কিছু কিছু পুরনো রেওয়াজ বহাল রয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে তার আবেগপ্রবণতারও খানিকটা বৈশিষ্ট্য পরিবারটির দৈনন্দিন জীবনে বজায় থাকে, কিন্তু তার চোখের জ্যোতি নিভে আসাতে আর তার বয়সের ভার তাকে এক কোনায় ঠেলে দিতেই, ফারনান্দা আসার পর থেকে এ-সংসারে শুরু হওয়া কঠোরতার বৃত্তটি পূর্ণতা লাভ করে, আর, অন্য কেউ নয়, সে-ই হয়ে যায় সংসারটির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী। পাখি আর ছোট ছোট প্রাণীর আদলে মিছরি তৈরির যে-ব্যবসাটা উরসুলার ইচ্ছেয় সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল সেটাকে একটা বাজে কাজ হিসেবে ধরে নিয়ে শিগ্‌গিরই সেটার ইতি টেনে দেয় ফারনান্দা। ভোর থেকে রাতে শোবার সময় পর্যন্ত হাট করে খুলে রাখা বাড়ির দরজাগুলো সিয়েস্তার সময় এই অজুহাতে বন্ধ করে দেয়া হয় যে রোদ পড়ে শোবার ঘরগুলো গরম হয়ে যায়, আর শেষ পর্যন্ত সেগুলো চিরতরেই বন্ধ হয়ে যায়। মাকোন্দো পত্তনের সময় থেকেই ঘৃতকুমারীর যে ডাল আর পাউরুটি দরজা থেকে ঝুলতো সেগুলোর জায়গায় প্রচলন হয় যিশুর পবিত্র মূর্তি রাখা একটি কুলুঙ্গি। এসব পরিবর্তনের কিছু কিছু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার নজরে পড়ে, আর এসবের পরিণতি আগে ভাগেই বুঝতে পারে সে। প্রতিবাদ জানিয়ে সে বলে, 'এসব করে আমাদের রুচির বেশ ভালোই উন্নতি হচ্ছে। আর এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ফের রক্ষণশীল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে আমাদের, তবে এবার সে-যুদ্ধ হবে ওদের বদলে একজন রাজা বসাবার যুদ্ধ।' কায়দা করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো ফারনান্দা। ভেতরে ভেতরে সে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার স্বাধীন সত্তা আর সব ধরনের সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠোরতার প্রতি তার বিরোধিতা নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতো। সকাল পাঁচটায় তার মগের পর মগ কফি খাওয়া, তার কামারশালার হযবরল অবস্থা, তার ছেঁড়াফাঁড়া কম্বল, আর সন্ধ্যাবেলায় তার দরজায় বসে থাকার অভ্যাস, এসব নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু সংসারযন্ত্রের এই একটি ঢিলে অংশকে তার সহ্য করতেই হতো, তার কারণ সে খুব ভালো করেই জানতো যে বুড়ো কর্নেল এমন এক জীব যাকে বয়স আর হতাশার গুরুভারই কেবল বশ মানাতে পেরেছে, কিন্তু তারপরেও তার বার্ধক্যজনিত বিদ্রোহের এক বিস্ফোরণে এ-বাড়ির ভিত্তিমূল সে ঠিকই উপড়ে ফেলতে পারে। তার স্বামী যখন ওদের প্রথম ছেলের নাম তার দাদার বাবার নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফারনান্দা কিছু বলার সাহস পায়নি, কারণ তখন মাত্র এক বছর হয় সে এই সংসারে এসেছে। কিন্তু প্রথম কন্যাটি যখন জন্মায়, তখন তার মায়ের নামে মেয়েটির নাম রেনাতা রাখার জন্য একেবারে গোঁ ধরে থাকে সে। উরসুলা মেয়েটাকে রেমেদিওস নামে ডাকবে বলে ঠিক করে। উত্তেজনাপূর্ণ একটা বিতর্কের পর, অরেলিয়ানো সেগান্দোর কৌতুকপূর্ণ মধ্যস্থতায়, তাকে রেনাতা রেমেদিওস নামে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়া হলেও, ফারনান্দা ওকে স্রেফ রেনাতা বলেই ডাকতে থাকে, আর অন্যদিকে তার শ্বশুর বাড়ির সবার আর শহরের প্রত্যেকের কাছেই রেমেদিওস-এর একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'মেম' নামটা চালু হয়ে যায়।

প্রথম দিকে ফারনান্দা তাদের পরিবারের গল্প করতো না, কিন্তু ধীরে ধীরে সে তার বাবাকে মহিমান্বিত করতে শুরু করে। খাবার টেবিলে বসে তাঁকে সে এক ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে তুলে ধরতো, এমন একজন মানুষ যিনি কিনা সব ধরনের অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে একজন সন্তের পর্যায়ে উন্নীত হতে যাচ্ছেন। শ্বশুরের এই লাগামছাড়া প্রশংসায় চমকে উঠে মেম-এর আড়ালে দু'-একটা ছোটখাটো রসিকতা করার লোভ সংবরণ করতে পারতো না অরেলিয়ানো সেগান্দো। পরিবারের বাকি সবাই-ও তার পথ ধরে। এমনকি উরসুলা, যে-কিনা পারিবারিক সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে ভীষণ সাবধানী ছিল আর ভেতরে ভেতরে পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিয়ে কষ্টে ভুগত, সে-ও একবার রাশ আলগা হয়ে বলে ফেলে যে তার ছোট্ট নাতির জন্য একটা যাজকীয় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়ে আছে, কারণ সে একদিকে 'এক সন্তের নাতি, অন্য দিকে এক রানী আর গবাদিপশু চোরের ছেলে'। সেই সব হাসি-ঠাট্টার ষড়যন্ত্রের পরেও বাচ্চারা তাদের নানাকে একজন কিংবদন্তীতুল্য মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েই বড় হয়, যিনি তাদের ধর্মীয় কবিতা লিখে পাঠাতেন আর প্রত্যেক বড় দিনেই উপহারভরা এমন এক বাক্স পাঠাতেন যেটাকে বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকাতে বেশ কষ্টই হতো। আসলে ওগুলো তাঁর মহিমান্বিত উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ মাত্র। বাচ্চাদের ঘরে প্রমাণ আকারের সন্তদের একটা বেদি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো ওগুলো; সেইসব সন্তের কাচের চোখগুলো অস্বস্তিকর রকমের জীবন্ত দেখাতো, আর তাঁদের শিল্পসম্মতভাবে সেলাইকরা জামাকাপড় ছিল মাকোন্দোর যে কারো জামাকাপড়ের চাইতে ভালো। সেই প্রাচীন আর বরফশীতল প্রাসাদের বিষাদগ্রস্ত জাঁকজমক ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে থাকে বুয়েন্দিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের জাঁকজমকে। 'এরি মধ্যে ওরা আমাদেরকে পুরো পারিবারিক গোরস্থানটাই পাঠিয়ে দিয়েছে,' অরেলিয়ানো সেগান্দো মন্তব্য করে একদিন। 'এখন যা দরকার তা হচ্ছে উইপিং উইলোগুলো আর কবরের স্মৃতিস্তম্ভ।' যদিও এমন কোনো কিছু কোনোদিন এসে পৌছোয়নি যা দিয়ে ছেলেমেয়েরা খেলতে পারে, কিন্তু সারা বছর-ই ডিসেম্বর মাসটার জন্যে পথ চেয়ে থাকতো ওরা, কারণ শত হলেও, সেই প্রাচীন আর অভাবিত উপহারগুলো এ-বাড়ির জন্যে তো নতুন-ই। দশম বড়দিনের সময়, ছোট্ট হোসে আর্কাদিও যখন সেমিনারিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন একদিন শক্ত করে পেরেক-আঁটা, পিচ দিয়ে সুরক্ষিত, আর 'অতীব সম্মানিত ভদ্রমহিলা দোনা ফারনান্দা দেল কার্পিও বুয়েন্দিয়া'র বরাবরে সনাতন গথিক অক্ষরে লেখা ঠিকানায় অন্যান্য বছরের চাইতে একটু আগেই এসে পৌছয় পেল্লায় বাক্সটা। ফারনান্দা যখন তার ঘরে গিয়ে চিঠিটা পড়তে বসে, বাচ্চারা ছোটে বাক্সটা খোলার জন্য। বরাবরের মতোই অরেলিয়ানো সেগান্দোর সাহায্য নিয়ে ওরা সীল ভেঙে, আচ্ছাদনটা সরিয়ে, সুরক্ষামূলক করাতের গুঁড়ো বের করে নেবার পর ভেতরে তামার বল্টু দিয়ে আটকানো একটা লম্বা সীসার সিন্দুক দেখতে পায়। অস্থির হয়ে ওঠা বাচ্চাদের চোখের সামনে আটটা বল্টু খুলে ফেলে অরেলিয়ানো সেগান্দো, আর তারপর সীসার ঢাকনাটা তুলতে না তুলতেই একটা চিৎকার দিয়ে বাচ্চাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় সে ভেতরে দনা ফারনান্দাকে দেখে, তার পরনে কালো পোশাক, আর বুকে একটা ক্রুশবিদ্ধ যিশু মূর্তি, গায়ের চামড়াটা তার জঘন্য সব ক্ষতে ফেটে পড়েছে আর জ্যান্ত মুক্তোর মতো বুদবুদে ভরা একটা গাঁজলা-তোলা স্ট্যু-র মতো হয়ে ফুটছে ধীরে ধীরে।

ওদের মেয়ের জন্মের অল্প কিছুদিন পরে, নিয়ারলান্দিয়া-র সন্ধির আরেকটি বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে, সরকারী আদেশে হঠাৎ করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের ঘোষণা দেয়া হয়। সরকারের নীতির সঙ্গে সিদ্ধান্তটা এতোটাই বেমানান আর অগ্রহনীয় যে মহাক্ষাপ্পা কর্নেল সেটার বিরোধিতা করে স্বীকৃতিটা ফিরিয়ে দেয়। সে বলে, 'এই প্রথম "পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব" কথাটা শুনলাম আমি। কিন্তু এর অর্থ যাই হোক, এ একটা চাল না হয়ে যায় না।' স্বর্ণকারের ছোট্ট দোকানটা দূতে দূতে ভরে যায়। কালো স্যুট পরা সেই উকিলেরা, এক সময় যারা কর্নেলের চারপাশে কাকের মতো ঘুর ঘুর করতো, তারা ফিরে আসে, এতোদিনে আরো বুড়িয়ে গেছে তারা, হয়ে পড়েছে আরো গম্ভীর। সেই যখন যুদ্ধের ইতি টানতে এসেছিল, সেই আগেরবারের মতো তারা এসে পৌছুলে কর্নেল তাদের প্রশংসার নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি সহ্য করতে পারে না। সে তাদেরকে বলে তারা যেন তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়, আর এ-ও বলে বারবার যে, যদিও তারা বলছে সে দেশের এক বীর সন্তান, কিন্তু আসলে সে সে-রকম কেউ নয়, বরং নেহাতই এক কারিগর, যার কোনো স্মৃতি নেই, যার একমাত্র স্বপ্ন হচ্ছে তার ক্ষুদে ক্ষুদে সোনার মাছের বিস্মরণের ভেতর আর যারপরনাই দুর্দশার মধ্যে অবসাদের ভারে মারা যাওয়া। যে-ব্যাপারটা তাকে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ করে তা হচ্ছে রিপাবলিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট ঠিক করেছেন কর্নেলকে অর্ডার অভ্ মেরিট খেতাব প্রদানের জন্যে তিনি নিজে মাকোন্দোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কর্নেল তাকে আক্ষরিকভাবে ঠিক এই কথাটা বলে পাঠায় যে সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে সেই বিলম্বিত কিন্তু উপযুক্ত অনুষ্ঠানটির জন্যে অপেক্ষা করছে প্রেসিডেন্টের বুকে একটা গুলি ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে, তবে সেটা তার শাসনামলের স্বেচ্ছাচারী আর সময়বিরুদ্ধ কাজকর্মের প্রতিদান হিসেবে নয়, বরং যে বুড়ো মানুষটা কারো কোনো ক্ষতি করেনি তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য। এমনই জোর দিয়ে হুমকিটা দেয় সে যে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট একেবারে শেষ মুহূর্তে তার সফরটা বাতিল করে একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধির হাতে পদকটি পাঠিয়ে দেন। রাজ্যের অনুরোধ-উপরোধে জেরবার হয়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস তার সহযোদ্ধাকে রাজি করাতে শয্যা ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হয়। চারজন লোককে দোলখাটিয়াটা বয়ে নিয়ে আসতে দেখে আর সেটার ওপরে কয়েকটা ঢাউশ সাইজের বালিশের মধ্যে যৌবন থেকে তার জয়-পরাজয়ের সঙ্গীকে বসে থাকতে দেখে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্যেই এই কষ্টটা স্বীকার করছে সে। কিন্তু তার আসার আসল কারণটা যখন সে জানতে পারে, বাহকদের দিয়ে তাকে কারখানার বাইরে নিয়ে আসে সে। সে তাকে বলে, 'যদিও খুব দেরি হয়ে গেছে, তারপরেও এতোদিনে আমি বুঝতে পারছি ওদেরকে তোর বুকে গুলি চালাতে দিলেই মস্ত বড় এক উপকার করতাম আমি তোর।'

কাজেই বুয়েন্দিয়া পরিবারের কারো অংশগ্রহণ ছাড়াই পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবটা অনুষ্ঠিত হয়। আর ঘটনাক্রমে কার্নিভালের হপ্তাটাও পড়ে ঠিক একই সময়, কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মাথা থেকে কেউ-ই এই একগুঁয়ে ধারণাটা তাড়াতে পারে না যে প্রহসনটির তীব্রতা বাড়ানোর জন্যে সরকারই ফন্দি করে এই কাকতালীয় ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। তার নিজের কামারশালা থেকেই সামরিক সঙ্গীত, গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদের কামানের অভিবাদন, টি ডিউম ধর্মসঙ্গীত, আর তার নামে রাস্তাটার নাম রাখার সময় বাড়ির সামনে দেয়া বক্তৃতাগুলোর গুটি কতেক শব্দাংশ কানে আসে তার। ক্ষোভে, ক্রুদ্ধ অক্ষমতায় চোখ দুটো ভিজে আসে তার, আর তার পরাজয়ের পর এই প্রথমবারে মতো এই ব্যাপারটা তাকে পীড়া দেয় যে এখন আর তার যৌবনের সেই শক্তি নেই যাতে সে একটা রক্তাক্ত যুদ্ধ করতে পারে, যে-যুদ্ধ রক্ষণশীল সরকারের শেষ কুটোটাও ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে পারে। সশ্রদ্ধ সেই স্বীকৃতির প্রতিধ্বনি তখনো মিলিয়ে যায়নি এমন সময় উরসুলা কামারশালার দরজায় করাঘাত করে।

কর্নেল বলে ওঠে, 'বিরক্ত করো না, আমি ব্যস্ত।'

স্বাভাবিক গলায় উরসুলা বলল, 'দরজা খোল। ব্যাপারটা উৎসব সংক্রান্ত কিছু নয়।'

আগল খুলে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া দেখে, দরজায় সতেরোজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। একেবারে ভিন্ন ভিন্ন চেহারার, সব ধরনের আর বর্ণের, কিন্তু সবার মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গাতেই তাদেরকে শনাক্ত করার মতো একটা নিঃসঙ্গ ভাব। ওরা সবাই তার ছেলে। লোকমুখে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের কথা শুনে, একে অন্যের সঙ্গে কোনো ধরনের আগাম আলাপ আলোচনা ছাড়া, কেউ কাউকে না চিনেই, উপকূলের দূরতম প্রান্ত থেকে এসে হাজির হয়েছে ওরা। তাদের প্রত্যেকেই গর্বের সঙ্গে ধারণ করে আছে অরেলিয়ানো নামটা আর সেই সঙ্গে তাদের যার যার মায়ের শেষ নাম। উরসুলার পরিতৃপ্তি কিন্তু ফারনান্দার মর্মপীড়ার কারণ হয়ে যে-তিনদিন ওরা বাড়িতে থাকে সেই তিনটে দিন যেন একটা যুদ্ধাবস্থা চলে সারা বাড়িতে। পুরনো কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাটি শুরু করে দেয় আমারান্তা জাবেদা খাতাটার খোঁজে, যেখানে উরসুলা তাদের সবার নাম আর জন্মতারিখ লিখে রেখেছিল, তারপর প্রত্যেকের নামের পাশের খালি জায়গায় আমারান্তা ওদের বর্তমান ঠিকানাটা জুড়ে দেয়। তালিকাটা বিশ বছরের যুদ্ধের একটা খুব ভালো সার-সংক্ষেপ হতে পারতো। একটা খামখেয়ালি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে একুশজন লোককে নেতৃত্ব দিয়ে মাকোন্দো ছাড়ার পর থেকে রক্তে শক্ত হয়ে যাওয়া কম্বলে মোড়ানো অবস্থায় শেষ বারের মতো ফিরে আসা পর্যন্ত কর্নেলের নৈশ ভ্রমণপথের তালিকা ফের তৈরি করা যেতো ওটা থেকে। অরেলিয়ানো সেগান্দো তার জ্ঞাতি ভাইদের পরিতৃপ্ত করার সুযোগটা হেলায় হারায় না, বজ্রনিনাদ তোলা একটা শ্যাম্পেন আর অ্যাকোর্ডিয়ান পার্টি দেয় সে, আর সেই পার্টিটাকে এই বলে ব্যাখ্যা করা হয় যে ওটা হচ্ছে কার্নিভালের জমা-খরচের একটা বিলম্বিত হিসাব নিকাশ, যেটা সেই পঞ্চাশ বছর পূর্তির কারণে সময়মতো করা যায়নি। আজকের মতো বাসন-কোসন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় অরেলিয়ানোরা, একটা বলদকে বেঁধে ফেলার চেষ্টায় সেটাকে তাড়া করতে গিয়ে গোলাপের বেডগুলোর সর্বনাশ করে ছাড়ে, গুলি করে মেরে ফেলে মুরগিগুলোকে, আমারান্তাকে বাধ্য করে পিয়েত্রো ক্রেসপির বিষণ্ন ওঅল্‌জ নাচ নাচতে, সুন্দরী রেমেদিওসকে বাধ্য করে পুরুষমানুষের একজোড়া প্যান্ট পরতে আর তেল দেয়া একটা খুঁটি বেয়ে উঠতে, আর খাবার ঘরে ছেড়ে দেয় একটা শুয়োর, ফারনান্দাকে সেটা ঢুস্ দিয়ে ফেলে দেয়, কিন্তু কেউই এসব ক্ষয়ক্ষতিতে দুঃখ পায় না, তার কারণ, এক স্বাস্থ্যকর ভূমিকম্পে বাড়িটা কাঁপিয়ে দেয় ওরা। প্রথমটায় ওদেরকে অবিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করলেও, এমনকি কারো কারো বংশপরিচয় নিয়ে তার সন্দেহ থাকলেও, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ওদের বন্যতা উপভোগই করে, আর ওরা চলে যাওয়ার আগে সবাইকে সে একটা করে ছোট্ট সোনার মাছ উপহার দেয়। এমনকি উদাসীন হোসে আর্কাদিও সেগান্দো পর্যন্ত ওদেরকে এক বিকেলে মোরগযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানায়, যা কিনা আরেকটু হলে একটা করুণ ঘটনাতেই পরিণত হতো, কারণ দেখা যায় সেই অরেলিয়ানোদের মধ্যে অনেকেই মোরগ-লড়াইয়ের ব্যাপারে এতো অভিজ্ঞ যে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল-এর জারিজুরি তারা মুহূর্তেই ধরে ফেলেছে। পাগল এই কুটুম্বরা যে আদিম মুহূর্ত উপহার দেয় তার মধ্যে অসীম সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো ঠিক করে ওরা সবাই এখানেই থাকবে। রাজি হয় কেবল একজন। দাদার কর্মশক্তি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কারের মনমানসিকতা সম্পন্ন এক বিশালদেহী মুলাটো অরেলিয়ানো ত্রিস্তে। এরিমধ্যে দুনিয়ার অর্ধেকটায় সে তার ভাগ্য পরীক্ষা করে ফেলেছে, তাছাড়া সে কোথায় থাকল কি না থাকল তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই তার। যদিও তাদের কেউ-ই বিয়ে-শাদী করেনি, তারপরেও বাকি সবাই ধরে নিয়েছে যে তাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারা সবাই দক্ষ কারিগর একেকজন, বাড়ি অন্তপ্রাণ, শান্তি প্রিয় মানুষ। উপকূল অঞ্চলে আবার ছড়িয়ে পড়ার আগের অ্যাশ ওয়েন্‌সডে-তে আমারান্তা ওদেরকে রোববারের পোশাক-আশাক পরিয়ে গির্জায় নিয়ে যায়। যতটা না ভক্তি নিয়ে তার চেয়ে বেশি মজা পেয়ে ওরা সবাই তার পিছু পিছু বেদীর রেলিং পর্যন্ত এগিয়ে যায়, আর সেখানে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল ছাই দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেন ওদের গায়ে। বাড়ি ফিরে ওদের সবার ছোট জন কপালের ছাই পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে দাগটা মোছা যাচ্ছে না; তার ভাইদের দাগেরও ঠিক একই দশা। প্রথমে সাবান-পানি, মাটি আর গা ঘষার বুরুশ, আর সবশেষে ঝামা পাথর আর একটা কড়া ক্ষারীয় তরল দিয়ে চেষ্টা করেও ওরা ক্রুশচিহ্নগুলো মুছতে পারে না। অন্যদিকে আমারান্তা আর অন্য যারা মাস্‌-এ গিয়েছিল তাদের কিন্তু দাগটা তুলতে কোনো কষ্টই করতে হয় না। ওদের বিদায় জানাবার সময় উরসুলা মন্তব্য করে, 'এটাই বরং ভালো হল। এখন থেকে সবাই জানতে পারবে তোরা কে।' একদল বাজনাদার আর আতশবাজির খেলার পিছে পিছে দল বেঁধে রওনা হয় ওরা, শহরে এমন একটা ধারণা রেখে যায় যে বেশ কয়েক শতাব্দীর জন্যে যথেষ্ট সন্তানসন্ততি রয়েছে বুয়েন্দিয়া বংশের। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তার উদ্ভাবন ক্ষমতার প্রবল উত্তেজনার বশে যে-বরফকল বসানোর স্বপ্ন দেখেছিল, শহরের প্রান্তে সে-রকম একটা বরফ কল বসায় কপালে ছাই দিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকা আরেলিয়ানো ত্রিস্তে ।

মাকোন্দোয় পা দেবার বেশ কয়েক মাস পর সে যখন সবার বেশ চেনাজানা আর প্রিয়পাত্র হয়ে গেছে, সে-সময় একদিন আরেলিয়ানো ত্রিস্তে একটা বাড়ির খোঁজে বেরোয়, যাতে সে তার মা আর বোনকে (সে অবশ্য কর্নেলের মেয়ে নয়) নিয়ে আসতে পারে, আর তখন স্কোয়ারের এক কোনায় পরিত্যক্ত মতো দেখতে জরাজীর্ণ বড় বাড়িটা তাকে কৌতূহলী করে তোলে। সে খোঁজ নেয় বাড়িটার মালিক কে। একজন তাকে জানায়, কেউ না; বলে, অনেক আগে মাটি আর দেয়ালের চুনকাম খেয়ে বেঁচে থাকা এক নিঃসঙ্গ বিধবা থাকতো ওখানে, তার শেষ বছরগুলোয় মাত্র দু'বার দেখা গিয়েছিল তাকে, ছোট ছোট নকল ফুলের একটা টুপি আর পাণ্ডুর হয়ে আসা রুপোলী জুতো পরে বিশপের কাছে লেখা একটা চিঠি ডাকে দিতে স্কোয়ার পেরিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে যাওয়ার সময়। লোকজন আরেলিয়ানো ত্রিস্তেকে বলে, বিধবার একমাত্র সঙ্গী ছিল এক দয়ামায়াহীন চাকরানী; কুকুর, বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণী বাড়িটার ভেতর ঢুকলেই সেটাকে সে মেরে রাস্তার মধ্যেখানে ফেলে রাখতো লোকজনকে পচা দুর্গন্ধে জ্বালিয়ে মারার জন্যে। শেষবারের মতো কোনো প্রাণীর ফাঁপা চামড়া রোদে পুড়ে মমিতে পরিণত হওয়ার পর এতো লম্বা সময় পেরিয়ে গেছে যে সবাই ধরেই নিয়েছে যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলা আগেই সেই বিধবা আর তার চাকরানী মরে ভূত হয়ে গেছে, তবে বাড়িটা যে এখনো দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ হলো গত কয়েক বছরে সে-রকম তীব্র শীত পড়েনি বা ঝোড়ো হাওয়া বয়নি। মরিচা পড়ে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেছে কব্জাগুলো, দরজাগুলোকে ধরে রেখেছে স্রেফ মাকড়াসার জালের মেঘগুলো, ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে জানলাগুলো ঝালাইয়ের মতো আটকে গেছে, ঘাস আর বুনো ফুল গজানো মেঝে গেছে টুটোফাটা হয়ে, ফাটলগুলোয় বাসা বেঁধেছে গিরগিটি আর রাজ্যের সব কীটপতঙ্গ, আর এসব মিলিয়ে এই ধারণাটাই যেন আরো জোরদার হয় যে, অন্তত গত পঞ্চাশ বছর ধরে ওখানে কোনো মানুষ থাকে না।

ব্যাপারটা কী তা দেখার জন্যে আবেগপ্রবণ অরেলিয়ানো ত্রিস্তের এ-ধরনের কোনো প্রমাণ দরকার ছিল না। কাঁধ দিয়ে সদর দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢোকে সে, পোকায় খাওয়া কাঠের ফ্রেমটা কোনো শব্দ না করে ধুলো আর উইপোকার বাসার এক মহাপ্রলয় সৃষ্টি করে ভেঙে পড়ে। ধুলোটা পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায় দোরগোড়ায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অরেলিয়ানো ত্রিস্তে, আর তারপরই ঘরের মধ্যেখানে দেখতে পায় সেই নোংরা আর বিবর্ণ মহিলাকে, তখনো তার পরনে আগের শতাব্দীর কাপড়চোপড়, কেশহীন মাথায় গুটি কতেক হলুদ সুতো, চোখ দুটো বড় বড়, এখনো সুন্দর, তবে সেখানে আশার শেষ তারাগুলো নিভে গেছে, আর তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে নিঃসঙ্গতার শুষ্কতায়। অন্য এক জগতের সেই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত অরেলিয়ানো ত্রিস্তে ঠিকমত দেখতেই পায় না যে মহিলাটি তার দিকে একটা সেকেলে পিস্তল তাক করে আছে।

'মাফ করবেন,' বিড়বিড়িয়ে বলে ওঠে সে।

ছোটখাটো আসবাবপত্র আর টুকটাক জিনিসে ভর্তি কামরার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহিলা, চওড়া কাঁধ আর কপালে ছাইয়ের উল্কি দাগা দৈত্যটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে সে, আর ধুলোর সেই কুয়াশা ভেদ করে সে তাকে দেখতে পায় অতীতের কুয়াশার মধ্যে দোনলা একটা শটগান আর হাতে এক ছড়া খরগোস নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়।

'ঈশ্বরের ভালোবাসার দোহাই,' নিচু গলায় বলে ওঠে সে, 'সেই স্মৃতি নিয়ে তাদের এখন আমার কাছে আসাটা মোটেই ঠিক না।'

'বাড়িটা আমি ভাড়া নিতে চাই,' অরেলিয়ানো ত্রিস্তে বলে ওঠে।

মহিলা তখন তার পিস্তলটা উঁচু করে, শক্ত কব্জিতে তাক করে ধরে ছাই-এর ক্রুশ বরাবর, আর সে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে ট্রিগারে আঙুল রাখে যে সেটার বিরুদ্ধে কোনো ওজর-আপত্তির অবকাশ থাকে না।

'বেরিয়ে যাও,' হুকুম করে সে।

সেদিন রাতের বেলা খাওয়ার সময় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে পরিবারের সবাইকে ঘটনাটার কথা বললে, তীব্র কষ্টে কেঁদে ফেলে উরসুলা। 'ওহ্ ঈশ্বর!' হাত দিয়ে নিজের মাথাটা টিপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। 'এখনো বেঁচে আছে ও!' সময়, যুদ্ধ, অগুনতি দৈনন্দিন দুর্ঘটনা, এসবের কারণে রেবেকার কথা ভুলেই গিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। কিন্তু সে যে বেঁচে আছে আর তার পোকার গর্তের মতো ডেরায় বসে পচে মরছে এই কথাটা যে-মানুষটি এক মিনিটের জন্যেও ভুলতে পারেনি সে হচ্ছে একরোখা আর বুড়িয়ে যেতে থাকা আমারান্তা। ভোরবেলা যখন তার হৃদয়ের বরফ তাকে তার নিঃসঙ্গ শয্যা থেকে ডেকে তুলতো তখন তার কথা মনে পড়তো তার, আর যখন সে তার চিমসে আসা স্তনে আর শীর্ণ পেটে সাবান ঘষতো, তার বৃদ্ধ বয়েসের সাদা, মাড়-দেয়া পেটিকোট আর কাঁচুলি পরতো, নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের নিদর্শনস্বরূপ হাতের কালো পট্টিটা বদলাতো, তখন তার কথা মনে পড়তো তার। সবসময়, প্রতিটি মুহূর্তে, ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায়, সবচেয়ে স্বর্গীয়, সবচেয়ে করুণ মুহূর্তে রেবেকার কথা মনে পড়তো আমারান্তার, কারণ নিঃসঙ্গতা তাঁর স্মৃতির একটা অংশ আলাদা করে নিয়ে তার হৃদয়ে জমা হওয়া স্মৃতিকাতর আবর্জনার নিষ্প্রভ হতে থাকা স্তূপটাকে পুড়িয়ে দিয়ে অন্যগুলোকে, সবচেয়ে তিক্তগুলোকে, বিশুদ্ধ স্ফীত আর চিরন্তন করে তুলেছিল । আমারান্তার কাছ থেকেই সুন্দরী রেমেদিওস জানতে পেরেছিল যে রেবেকা বেঁচে আছে। যখনই ওরা জরাজীর্ণ বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতো, প্রতিবারই আমারান্তা একটা অপ্রীতিকর ঘটনার কথা, একটা ঘৃণার গল্প বলতো তাকে, আর এভাবেই সে চেষ্টা করতো এতোকাল পর্যন্ত টিকে থাকা বিদ্বেষটা ভাইঝির মনে চারিয়ে দিতে, যাতে তার ফলে নিজের মৃত্যুর পরেও সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু তার পরিকল্পনাটা কাজে দেয়নি, কারণ কোনোধরনের আবেগপ্রবণ অনুভূতি সুন্দরী রেমেদিওসের মনকে স্পর্শ করতো না, তাছাড়া অন্যদেরগুলোতো আরো কম। অন্যদিকে, আমারান্তার পুরোপুরি উল্টো একটা প্রক্রিয়ায় যে-নারী কষ্টভোগ করেছে, সেই উরসুলার যখন রেবেকার কথা মনে পড়ে, তার স্মৃতিতে কোনোরকম মলিনতা থাকে না, কারণ যে-মেয়েটাকে তার বাবা-মায়ের হাড়গোড় ভর্তি একটা থলেসহ এ-বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার করুণ প্রতিচ্ছবিটা সেই অপরাধটাকেও ম্লান করে দিয়েছিলো যে-অপরাধের কারণে মেয়েটিকে আর এই বংশের একজন হওয়ার যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। অরেলিয়ানো সেগান্দো ঠিক করে, তাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসে তার দেখাশোনা করতে হবে, কিন্তু বহু বছরের কষ্ট আর দুর্দশার বদলেই যে-মানুষটি নিঃসঙ্গতার সুবিধাগুলো ভোগ করার এক্তিয়ার পেয়েছিল, এবং বদান্যতার মিথ্যে আকর্ষণের কারণে নষ্ট হওয়া একটা বৃদ্ধ বয়েসের বদলে সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়নি, সেই রেবেকারই কঠোর, আপোসহীন মনোভাবের জন্য তার সদিচ্ছা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারিতে ফিরে আসে অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ষোলজন ছেলে, তখনো তাদের কপালে ছাই-এর ক্রুশচিহ্ন আঁকা, আর সে-সময় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে উৎসবের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে তাদের কাছে রেবেকার গল্প করলে তারা সবাই মিলে বাড়িটার দরজা-জানলা বদলে দিয়ে, সামনের অংশে উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে, দেয়ালগুলোকে শক্ত করে আর মেঝেতে নতুন করে সিমেন্ট ঢেলে স্রেফ আধা-দিনের মধ্যেই সেটার চেহারা ফিরিয়ে দেয়, যদিও এ-ধরনের কোনো কিছু বাড়ির ভেতরে করার অধিকার তারা পায় না। রেবেকা এমনকি দরজার কাছেও আসে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে এই উন্মত্ত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যেতে দেয়, তারপর তাতে কত খরচা হয়েছে তা হিসেব করে তখনো তার সঙ্গে রয়ে যাওয়া বুড়ি চাকরানী আর্জেনিদাকে দিয়ে টাকাটা ওদের কাছে পাঠিয়ে দেয়, তবে সে যে একমুঠো মুদ্রা পাঠায় সেগুলো বাজার থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল শেষ যুদ্ধটার পর পরই, কিন্তু তার ধারণা ছিল ওগুলো তখনো চালু-ই আছে। আর তখনই ওরা বুঝতে পারে জগৎ-সংসারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদটা ঠিক কোন উদ্ভট অবস্থায় পৌঁছেছে, আর সেই সঙ্গে তারা এ-ও বুঝে যায় যে রেবেকার শরীরে প্রাণ থাকতে তাকে তার এই কঠিন ঘের থেকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে না।

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ছেলেরা যখন দ্বিতীয়বারের মতো মাকোন্দোয় আসে, তখন অরেলিয়ানো সেন্তেনো নামে তাদের মধ্যে আরেকজন অরেলিয়ানো ত্রিস্তের সঙ্গে কাজ করার জন্যে ওখানেই থেকে যায়। সে হল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাদানের জন্যে বাড়িতে আনা প্রথম দিককার ছেলেগুলোর এক জন; উরসুলা আর আমারান্তার খুব ভালোই খেয়াল রয়েছে তার কথা, কারণ, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার হাতে পড়া প্রত্যেকটা ভঙ্গুর জিনিসের দফারফা করে ছেড়েছিল সে। সময়ই তার বেড়ে ওঠার প্রাথমিক উৎসাহে বাদ সেধেছিল, ফলে এখন সে এক মাঝারি উচ্চতার মানুষ, গায়ে গুটিবসন্তের দাগ, কিন্তু ধ্বংস-সাধন করার আশ্চর্য ক্ষমতাটা তার হাতের অটুটই থেকে গিয়েছে। এমনকি না ছুঁয়েই সে এতোগুলো প্লেট ভেঙে ফেলে যে ফারনান্দা ঠিক করে ছেলেটা তার দামি চীনামাটির বাসন-কোসনগুলোর অবশিষ্টাংশেরও দফারফা করার আগেই তাকে পিউটারের একপ্রস্থ থালা-বাসন কিনে দিতে হবে তার, আর ওদিকে এমনকি শক্ত ধাতুর প্লেটগুলো পর্যন্ত টোল খেয়ে যায়, বেঁকেচুরে যায়। কিন্তু যা এমনকি ছেলেটিকেও অতিষ্ঠ করে ফেলেছিল, সেই প্রতিকারবিহীন শক্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ছেলেটি পেয়েছিল সবার ভরসা অর্জন করা এক আন্তরিকতা আর কাজ করার দুর্দান্ত ক্ষমতা। অল্প সময়ের মধ্যেই সে বরফের উৎপাদন এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যে স্থানীয় বাজার তা নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারতো না, কাজেই জলার অন্যান্য শহরেও ব্যবসার প্রসার ঘটানোর কথা ভাবতে বাধ্য হয় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে। আর ঠিক এই সময়টাতেই সেই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে, শুধু যে তার ব্যবসার আধুনিকীকরণের জন্যেই কেবল তা নয়, সেই সঙ্গে গ্রামটার সঙ্গে বাকি দুনিয়ার একটা সংযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যেও বটে।

সে ঘোষণা করে, 'রেলপথ বসাতে হবে আমাদের।'

মাকোন্দোর জন্যে কথাটা একবারেই নতুন। হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যে-পরিকল্পনামাফিক সৌরযুদ্ধের জন্য তার প্রকল্পের ছবি এঁকেছিল সেটারই প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী অরেলিয়ানো ত্রিস্তের আঁকা নকশাটা টেবিলের ওপর দেখে উরসুলার এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয় যে সময় বৃত্তাকার পথেই এগোচ্ছে। কিন্তু তার পূর্বসূরীর মতো অরেলিয়ানো ত্রিস্তের ঘুম বা খিদে কোনোটাই কিন্তু নষ্ট হয় না, কিংবা মেজাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ করে সে কারো মনে কোনো কষ্টও দেয় না, বরং নিদারুণ খামখেয়ালি এই প্রকল্পটা যে তাৎক্ষণিক ফল দিতে পারে সেই সম্ভাবনাটা সে পরিষ্কার দেখতে পায়, খরচপাতি আর দিন-তারিখ নিয়ে বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে হিসাব নিকাশ করে, আর তারপর সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটায় মাঝখানে কোনো রকম উত্তেজনার কারণ না ঘটিয়েই। অরেলিয়ানো সেগান্দোর মধ্যে যদি তার দাদার বাবার কিছু থেকে থাকে আর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কোনো কিছুর কমতি থাকে, সেটা হচ্ছে কোনো রকম ছলচাতুরী বা ভান সম্পর্কে তার চরম অনীহা, আর সে তার ভাই-এর উদ্ভট নৌচালনা প্রকল্পের জন্যে যে-রকম অবলীলায় টাকা ঢেলেছিল ঠিক একইভাবে রেলপথ চালু করার জন্যেও পকেট থেকে টাকা বের করে দেয়। ক্যালেন্ডার ঘেঁটে, বর্ষার পর ফিরে আসার ইচ্ছে নিয়ে পরের বুধবার মাকোন্দো ত্যাগ করে অরেলিয়ানো ত্রিস্তে। তারপর আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় না তার। কারখানার উন্নতি দেখে অভিভূত হয়ে অরেলিয়ানো সেন্তেনো এরিমধ্যে ফলের রসের স্তর বিশিষ্ট বরফ উৎপাদন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিল, আর তার নিজের অজান্তেই, বা সে-রকম কিছু না ভেবেই, শরবত আবিষ্কারের মূল ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এভাবেই, তার নিজের বলে ভেবে নেয়া একটা প্রকল্পের উৎপাদন বহুমুখী করার পরিকল্পনা এঁটে ফেলেছে সে, কারণ বর্ষার পরেও তার ভাই-এর ফিরে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না, তার কোনো খোঁজ-খবর ছাড়াই কেটে যায় পুরো একটা গরমকাল। যাই হোক, আরেক শীতের শুরুতে, দিনের সবচেয়ে গরম সময়টাতে নদীতে কাপড় কাঁচছিল এক মহিলা, সে হঠাৎ রীতিমত ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো শোরগোল তুলে চিৎকার করতে করতে প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে ছুট দেয়।

'আসছে,' শেষ পর্যন্ত সে খুলে বলে ব্যাপারটা। 'ভয়ংকর একটা জিনিস, যেন একটা রান্নাঘর গোটা একটা গ্রাম টেনে নিয়ে আসছে।'

আর ঠিক সেই সময়-ই ভয়ংকর প্রতিধ্বনিসহ একটা সিটি-র আওয়াজে আর আর তারপর জোরে জোরে, হাঁপাতে হাঁপাতে নেয়া শ্বাসের শব্দে পুরো শহরটা কেঁপে ওঠে। আগের কয়েক হপ্তা ধরে একদল লোককে স্লীপার আর রেলপথ বসাতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু কেউই আমল দেয়নি তাদের, ভেবেছে এগুলো জিপসিদের নতুন কোনো কৌতুক, আবার আসছে তারা শীস্, আর তাম্বুরিন আর জেরুজালেমের প্রতিভাধর কারিগরদের বানানো কোনো পাঁচমিশেলি যন্ত্রের গুণকীর্তন করা ওদের প্রাচীন আর সেকেলে নাচ-গান নিয়ে। কিন্তু সেই সিটির আওয়াজ আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দটা সামলে ওঠার পর সবাই দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে দেখতে পায় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে এঞ্জিনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা চেয়ে থাকে প্রথমবারের মতো মাকোন্দোতে এসে পৌছোনো, আট মাস দেরিতে যদিও, ফুলে ফুলে ঢাকা ট্রেনটার দিকে। সেই নির্দোষ হলুদ ট্রেনটা, মাকোন্দোতে যেটা নিয়ে আসবে কত না রহস্য, কত না ভরসা, কত না আনন্দ আর বেদনার মুহূর্ত, কত না পরিবর্তন, বড় বড় বিপর্যয় আর স্মৃতিকাতরতার অনুভূতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতোসব অসাধারণ আবিষ্কার দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে মাকোন্দোবাসীরা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না কবে থেকে তাদের বিস্ময়ের শুরু হয়েছিল। ট্রেনটার দ্বিতীয় যাত্রায় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে যে প্ল্যান্টটা নিয়ে এসেছিল সেটা থেকে শক্তি পাওয়া পাণ্ডুর বৈদ্যুতিক বাল্বগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে রাত কাবার করে দেয় তারা, তাছাড়া ট্রেনটার আচ্ছন্ন-করা *টুম-টুম* শব্দে অভ্যস্ত হতে বেশ খানিকটা সময় আর শ্রম ব্যয় করতে হয় তাদের। টিকিট কাটার সিংহের মাথাঅলা জানলা বসানো থিয়েটারের মালিক, উঠতি ব্যবসায়ী ব্রুনো ক্রেসপি তার ছবিঘরে যেসব চলমান ছবি দেখায় সেগুলো দেখে মহাক্ষাপ্পা হয়ে ওঠে তারা, কারণ একটা ছবিতে যে-চরিত্রটা মারা গেল, তাকে কবরও দেয়া হল, সেই সঙ্গে যার দুর্ভাগ্যে সহানুভূতির অশ্রুও বিসর্জন দেয়া হল সে-ই আবার জ্যান্ত অবস্থায় এক আরবে রূপান্তরিত হয়ে হাজির হতো আরেকটা ছবিতে। অভিনেতাদের সমস্যাগুলোকে ভাগ করে নেয়ার জন্য মাথাপিছু দুই সেন্ট করে দর্শনী দেয়া দর্শকেরা এই উদ্ভট জালিয়াতি কোনো রকমেই বরদাশত না করে আসনগুলো তছনছ করে ফেলে। ব্রুনো ক্রেসপির অনুরোধে মেয়র একটা ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বলেন যে সিনেমা হচ্ছে বিভ্রমসৃষ্টিকারী এক ধরনের যন্ত্র, দর্শকদের আবেগজনিত বিস্ফোরণের প্রতি সেটার কোনো সহানুভূতি নেই। এই হতাশকরা ব্যাখ্যার পর অনেকেরই মনে হয় তারা জিপসিদের নতুন আর জমকালো কোনো ব্যাপার-স্যাপারের শিকার হয়েছে, কাজেই এই ভেবে তারা আর কখনো সিনেমা হলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যে, এমনিতেই তাদের নিজেদের এতো বেশি সমস্যা আছে যে কাল্পনিক মানুষের অভিনয়-করা দুঃখ-দুর্দশার জন্যে কাঁদতে তাদের বয়েই গেছে। খানিকটা একই ধরনের ব্যাপার ঘটে সেই চোঙাঅলা ফনোগ্রাফগুলোর বেলায়, ফ্রান্সের হাসিখুশি রমণীরা যেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সেকেলে হ্যান্ড অর্গ্যানগুলোর বদলে, আর বাজনাদারদের জীবিকার ওপরও যেসবের একটা নিদারুণ প্রভাব পড়েছিল। কৌতূহলের কারণে প্রথম প্রথম নিষিদ্ধ এলাকায় গ্রাহকের দল বেড়ে গিয়েছিল, এমনকি কিছু সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কথাও শোনা গিয়েছিল যারা ফনোগ্রাফের অভিনবত্বের টাটকা স্বাদ পাওয়ার জন্যে মজুরের ছদ্মবেশ নিয়েছিল, কিন্তু এতোবার এতো কাছ থেকে দেখার পর তারা সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে সবাই যেমনটা ভেবেছিল আর সেই ফরাসী রমণীরা নিজেরা যেমন বলেছিল সে-রকম কোনো মায়াবী জাঁতাকল নয় ওটা, বরং স্রেফ একটা যান্ত্রিক কৌশল, বাজনাদারের একটা দলের মতো এতো মর্মস্পর্শী, এতো মানবিক আর এমন দৈনন্দিন বাস্তব সত্যে ভরপুর একটা জিনিসের সঙ্গে কোনোক্রমেই ওটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলনা হতে পারে না। এটা এমনই এক ভয়ানক হতাশাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে ফনোগ্রাফ জিনিসটা যখন এতোই জনপ্রিয় হয়ে যায় যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে সেটা শোভা পেতে থাকে, তখনো কিন্তু কোনো ঘরেই সেটাকে বড়দের বিনোদনের বস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো না, বরং ওটাকে এমন জিনিস বলে ভাবা হতো যেটা বাচ্চাদের পক্ষে অনায়াসে খুলে ফেলা সম্ভব। অন্যদিকে যখন শহরের একজন রেল স্টেশনে বসানো টেলিফোনটা হাতে-কলমে ব্যবহারের সুযোগ পায়, যেটাকে তারা সেই হাতলটার কারণে ফনোগ্রাফের একটা প্রাথমিক সংস্করণ বলে ধরে নিয়েছিল, তখন এমনকি সবচেয়ে অবিশ্বাসী লোকজনও মুষড়ে পড়ে। ঈশ্বর যেন অবাক-করা প্রত্যেকটা জিনিসই বাজিয়ে দেখার, মাকোন্দোবাসীদেরকে পালাক্রমে উত্তেজনা আর হতাশা, সন্দেহ আর সন্দেহমুক্তির দোলাচলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর সেটা এমন-ই চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত যে বাস্তবের সীমা যে কোনখানে সে-বিষয়ে তারা দ্বিধায় পড়ে যায়। সত্য আর মরীচিকার এই জগাখিচুড়ি অবস্থার কারণে, চেস্টনাট গাছের নিচে থাকা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার ভূতটা পর্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে থাকে, এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকেও। রেলপথটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে নিয়মিতভাবে প্রতি বুধবার এগারোটার সময় রেলগাড়ি পৌঁছনো শুরু করার পর একটা ডেস্ক, টেলিফোন আর টিকেটকাটার জানালাসহ একটা আদিম, কাঠের তৈরি স্টেশনঘর তৈরি হয়ে গেলে মাকোন্দোর রাস্তায় রাস্তায় এমনসব লোকজনকে দেখা যেতে থাকে যাদেরকে তাদের স্বাভাবিক আচরণ-আচরণ সত্ত্বেও আক্ষরিক অর্থেই সার্কাস থেকে আসা লোকজন বলে মনে হয়। জিপসিদের জারিজুরি দেখে দেখে যে-শহর বিরক্ত হয়ে গেছে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সেই ভ্রাম্যমাণ দড়াবাজদের পক্ষে পয়সা কামানোর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না; যে-ধৃষ্টতা নিয়ে তারা শীস্ বাজানো কেতলি বিক্রি করতে চাইতো, ঠিক একই ধৃষ্টতা দেখিয়ে তারা সপ্তম দিনে আত্মার নির্বাণ লাভ নিশ্চিত করার প্রাত্যহিক বিধি-বিধান দিতে চাইতো, কিন্তু নেহাত অবসাদে পেয়ে বসায় যারা রাজি হয়ে যায়, আর যারা সবসময়ই অসাবধান, তাদের কাছ থেকে দারুণ লাভ কামিয়ে নেয় তারা। এই নাটুকে প্রাণীগুলোর মধ্যেই, অগুনতি বুধবারের একটিতে মাকোন্দো পৌঁছে বুয়েন্দিয়া-বাড়িতেই ডান হাতের ব্যাপার সারে গোলগাল, হাসিখুশি মি. হার্বার্ট, পরনে তার ঘোড়ায় চড়ার আঁটো পাজামা আর লেগিং, মাথায় নলখাগড়ার শাঁস দিয়ে তৈরি শিরস্ত্রাণ আর চোখে স্টীলরিমের চশমা, চোখদুটো যেন পোখরাজ পাথর, আর গতরটা চিকন-চাকন মোরগের চামড়ার মতো।

কলার প্রথম ছড়াটা খাওয়ার আগ পর্যন্ত কেউই খেয়াল করেনি তাকে। জ্যাকব হোটেলে কোনো কামরা খালি না থাকায় ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে লোকটা যখন তর্কাতর্কি করছিল তখন হঠাৎ করেই অরেলিয়ানো সেগান্দো হাজির হয়েছিল সেখানে, আর তারপর, নতুন মানুষ দেখলে সচরাচর সে যা করে থাকে, বাড়িতে নিয়ে আসে তাকে। দড়িতে আটকানো বেলুনের ব্যবসা তার, সেই সূত্রেই অর্ধেক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়া ঘুরেছে সে, পয়সাও কামিয়েছে প্রচুর। কিন্তু মাকোন্দোতে কাউকে আকাশে ওড়াতে পারেনি, তার কারণ জিপসিদের উড়ন্ত গালিচা দেখে সেগুলো ব্যবহার করার পর এই আবিষ্কারটাকে নেহাতই সেকেলে ঠেকেছে তাদের কাছে। তাই পরের ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছিল সে। ডোরাকাটা দাগঅলা যেসব কলার ছড়া ওরা সচরাচর খাওয়ার ঘরেই ঝুলিয়ে রাখে তারই একটা যখন টেবিলে রাখা হয়, সে-রকম কোনো আগ্রহ না দেখিয়েই সেখান থেকে প্রথম কলাটা ছিঁড়ে নেয় সে। কিন্তু কথা বলতে বলতে খেয়েই যেতে থাকে একটার পর একটা; যতটা না ভোজনরসিকের আনন্দ নিয়ে তার চেয়ে বেশি এক অভিজ্ঞ লোকের বিহ্বলতা নিয়ে স্বাদ নিতে থাকে, চিবুতে থাকে, আর যখন প্রথম ছড়াটা শেষ হয় তখন আরেকটা ছড়া আনতে বলে সে। তারপর, তার সর্বক্ষণের সঙ্গী টুলবক্স থেকে বের করে অপটিকাল যন্ত্রপাতির একটা ছোট্ট বাক্স। হীরে ব্যবসায়ীর খুঁতখুঁতে মনোযোগ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলাগুলোকে পরীক্ষা করে সে, বিশেষ একটা ছুরি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করে, ফার্মাসিস্টের তুলাদণ্ডে ওজন নেয় একেকটা কলার, আর বন্দুক নির্মাতার ক্যালিপার্স দিয়ে সেগুলোর প্রস্থ মাপে। তারপর বাক্সটা থেকে একের পর এক কিছু যন্ত্রপাতি বের করে নিয়ে তাপমাত্রা, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ আর আলোর তীব্রতা মাপে। সেটা এমনই কৌতূহলভরা একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, মি. হার্বার্ট একটা চূড়ান্ত আর চোখ খুলে দেয়া ফলাফল ঘোষণা করবে ভেবে কেউ-ই আর শান্তিতে খেতে পারে না, কিন্তু তার মতলবটা যে কী তা আন্দাজ করার মতো কিছুই বলে না সে।

এর পরের কয়েকটা দিন তাকে দেখা যায় শহরের প্রান্তসীমায় একটা জাল আর ছোট্ট একটা ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে প্রজাপতি ধরে বেড়াচ্ছে। বুধবার এসে হাজির হয় একদল এঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জলানুসন্ধানবিদ, ভূ-সংস্থানবিদ আর ভূ-জরিপকারী, তারপর, মি. হার্বার্ট যেখানে প্রজাপতি ধরে বেড়িয়েছিল সেখানে বেশ কয়েক হপ্তা ধরে অনুসন্ধান চালায় তারা। এরপর সেখানে এসে উপস্থিত হয় মি. জ্যাক ব্রাউন, হলুদ ট্রেনটার সঙ্গে জুড়ে দেয়া আর আগাপাশতলা রুপোর প্রলেপ মাখানো একটা বাড়তি কোচে চড়ে, কোচটার আসনগুলো যাজকীয় মখমলের আর ছাতটা নীল কাচের। বিশেষ সেই গাড়িতে মি. ব্রাউনের চারপাশে ভনভন করতে করতে হাজির হয় কালো পোশাক পরা সেই গোমড়ামুখো উকিলেরা যারা মাঝে মাঝে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার পিছে ছায়ার মতো ঘুরতো, আর তাতে করে লোকজনের এরকম একটা ধারণা হয় যে, দড়িতে আটকানো বেলুন আর রঙিন প্রজাপতিঅলা মি. হার্বার্টের মতো, চাকাঅলা সমাধি আর জার্মান শেফার্ড কুকুরঅলা মি. ব্রাউনের মতো, কৃষিবিদ, জলানুসন্ধানবিদ, ভূ-সংস্থানবিদ আর জরিপকারীদের সঙ্গেও যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক আছে। এ-নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করার সময় থাকে না, কারণ মাকোন্দোর সন্দেহগ্রস্ত অধিবাসীরা যখন সবেমাত্র ভাবতে শুরু করেছে কি করেনি যে কী ঘোড়ার ডিমটাই না জানি ঘটতে যাচ্ছে তারই মধ্যে শহরটা বদলে যায় দস্তার ছাদঅলা কাঠের বাড়ির একটা বসতিতে, যেখানে ট্রেনে করে আসা সব ভিনদেশীর বাস, আর তারা যে কেবল কোচগুলোর আসন আর পাদানিতে বসেই দুনিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক জায়গা থেকে এসেছে তাই নয়, এসেছে ছাদে চড়েও। রেলপথের ওপর পাড়ে গ্রিংগোরা গড়ে তোলে আলাদা একটা শহর, তারপর নিয়ে আসে মসলিনের কাপড়-চোপড় পরা আর নেকাবঅলা বিরাট বিরাট টুপি মাথায় দেয়া তাদের নিস্তেজ বৌগুলোকে; সে-শহরের রাস্তায় রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে তাল গাছ, বাড়ির জানলায় ঝোলে পর্দা আর সামনের উঁচু চত্বরে রাখা থাকে ছোট ছোট সাদা টেবিল, সিলিং-এ লাগানো হয় পাখা, আর বিশাল বিশাল নীল লনে ঘুরে বেড়ায় ময়ূর আর তিতির পাখি। ধাতব একটা বেড়া দিয়ে এলাকাটা ঘেরা, আর সেই বেড়ার ওপর বিদ্যুতায়িত চিকন তারের জাল, সেই জালটা গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা সকালগুলোয় কালো হয়ে থাকে ঝলসে যাওয়া চড়ুই পাখিতে। ওদের উদ্দেশ্যটা যে কী, বা ওরা স্রেফ মানুষের উপকার করে বেড়ায় কিনা এসবের কিছুই তখনো জানতে পারেনি কেউ, কিন্তু এরি মধ্যে ওরা মহা বিরক্তির কারণ ঘটিয়ে ফেলেছে, পুরনো সেই জিপসিরা যতোটা করেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি, যদিও ওদের কাজকর্ম যতটা পরিষ্কার আর বোধগম্য ছিল এদেরটা ততটা নয়, বরং কম। যেসব ক্ষমতা এক সময় ঐশ্বরিক শক্তির জন্যে বরাদ্দ ছিল, সেইগুলো পেয়ে গিয়ে ওরা বৃষ্টিপাতের ধাঁচটা বদলে ফেলে, ফসল ফলানোর চক্রটার গতি বাড়িয়ে দেয়, আর বরাবর-ই নদীটা যেখানে ছিল সেখান থেকে সেটাকে সরিয়ে আনে সেটার সাদা পাথর আর বরফশীতল স্রোতসমেত, শহরের অন্যধারে, গোরস্থানের পেছনে। এই সময়টাতেই লোহার রড ব্যবহার করে পোক্ত করা কংক্রিট দিয়ে হোসে আর্কাদিওর বিরাট সমাধিটার ওপর একটা দুর্গমতো তৈরি করে ওরা, যাতে বারুদের গন্ধ পানিকে দূষিত করতে না পারে। যেসব বিদেশী নিমরাজি হয়ে এসেছে এখানে তাদের জন্য তারা ফ্রান্সের মোহনীয় রমণীদের গলিটাকে আরো বড়সড় একটা পল্লীতে রূপান্তরিত করে ফেলে, আর এক চমৎকার বুধবার ট্রেনভর্তি উজ্জ্বল বেশ্যাদের এনে হাজির করে, বেবিলনীয় ঢংয়ের সেই রমণীরা প্রাচীন সব পদ্ধতিতে পটু, আর তাদের কাছে রয়েছে সব ধরনের মলম আর কলাকৌশল যা নির্জীবকেও উত্তেজিত করে তোলে, ডরপুককেও সাহস যোগায়, অতি লোভীর খাই মেটায়, লাজুক লোককেও উজ্জীবিত করে তোলে, যারা বারে বারে আসে তাদেরকে একটা শিক্ষা দেয়, আর নিঃসঙ্গ লোকজনের ভুলভাল শুধরে দেয়। তুর্কীদের সড়কটা এখন বিদেশী জিনিস-ঠাসা দোকানপাটে সয়লাব, আর সেগুলোর উজ্জ্বল রঙের দাপটে পুরনো সব হাট-বাজার হঠে গেছে, শনিবার রাতে জায়গাটা উপচে পড়ে দুঃসাহসিক লোকজনের ভিড়ে, রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায় জুয়োর টেবিলে, শুটিং গ্যালারিতে, ভবিষ্যৎ আর স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার অলিগলিতে, ভাজাভুজি আর পানীয়ের টেবিলে, আর রোববার সকালে এখানে-সেখানে পড়ে থাকে সুখী মাতালদের দেহ, তবে তাদেরকেই সেখানে বেশি দেখা যায় যারা ঝগড়াঝাটির সময় চিৎপাত হয়ে গেছে গুলি, ঘুষি, ছোরা আর বোতলের ঘায়ে। এ-এমনই এক শোরগোলভরা আর বাড়াবাড়িরকমের আগ্রাসন যে প্রথম প্রথম তো আসবাবপত্র আর তোরঙ্গের ভিড়ে, কারো অনুমতির ধার না ধেরে ফাঁকা জায়গা পাওয়া মাত্র বাড়ি বানাতে লেগে যাওয়া লোকজনের কাঠের কাজ চলার আওয়াজে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর দুই অ্যালমন্ড গাছের মাঝখানে দোলখাটিয়া টাঙিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মশারির নিচে রমণ শুরু করে দেয়া কপোত-কপোতীদের জঘন্য কাজকর্মের কারণে রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নিরিবিলি একমাত্র জায়গাটা তৈরি করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান শান্তিপ্রিয় নিগ্রোরা, সরু একটা রাস্তা আর তার পাশে খুঁটির ওপর কিছু কাঠের ঘর তৈরি করেছিল তারা, সেই বাড়ির দরজায় বসে তাদের অগোছাল উচ্চারণে বিষণ্ন ধর্মসংগীত গাইতো তারা। এতো কম সময়ে এতো বেশি পরিবর্তন ঘটে যায় যে মি. হার্বার্ট আসার আট মাস পর নিজেদের শহরটাকে চিনতে রীতিমত কষ্ট হয়ে দাঁড়ায় পুরনো বাসিন্দাদের।

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া সে-সময় একবার বলে, 'নিজেদের কী এক ঝামেলায় জড়িয়েছি আমরা দেখো; কারণ কী? না, এক গ্রিংগোকে ডেকে এনে কয়েকটা কলা খেতে দিয়েছিলাম।'

অন্যদিকে, বিদেশীদের এই তুষারধ্বসে অরেলিয়ানো সেগান্দোর খুশি আর ধরে না। হঠাৎ করেই অচেনা সব অতিথিতে, বেপরোয়া, হৈ-হুল্লোড়ে মাতালে ভরে যায় বাড়িটা, তাতে করে উঠোনের কাছেই কয়েকটা শোবার ঘর বসাতে হয়, খাবার ঘরটা আরো লম্বা করতে হয়, আর পুরনো কাঠের টেবিলটার জায়গায় বসাতে হয় ষোলজন বসতে পারে এমন একটা টেবিল, চীনে মাটি আর রুপোর নতুন থালাবাটি-চামচসহ, কিন্তু দেখা যায় তারপরেও সবাইকে পালা করে খেতে বসতে হচ্ছে। নিজের খুঁতখুঁতে ভাব চেপে গিয়ে ফারনান্দা এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অতিথিকেও রাজার মতো আপ্যায়ন করতে বাধ্য হয়, আর ওদিকে তারা বুটজুতো পায়ে হেঁটে বারান্দাটাকে কাদা কাদা করে ফেলে, বাগানের মধ্যে পেচ্ছাব করে, সিয়েস্তার ঘুমটা ঘুমোবার জন্য যেখানে-সেখানে মাদুর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে, আর মহিলাদের অনুভূতি বা সৌজন্যের তোয়াক্কা না করে মুখে যা আসে তাই বলে যায়। এই গণ-আগ্রাসনে আমারান্তা এমনই আহত বোধ করে যে আগের মতো রান্নাঘরে গিয়ে খাওয়া শুরু করে সে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে অভিনন্দন জানাতে যেসব লোক তার কামারশালায় আসছে তাদের বেশির ভাগই যে তার প্রতি সহানুভূতি বা সম্মান জানাতে আসছে না, বরং একটা ঐতিহাসিক পুরানিদর্শন, জাদুঘরের ফসিল দেখতে আসছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলে কর্নেল, দু'-একটা বিরল মুহূর্তে সে যখন রাস্তার পাশের দরজায় এসে বসতো সেই সময়টুকু ছাড়া এরপর থেকে তাকে আর দেখাই যেতো না। অন্যদিকে, উরসুলাকে যখন পা টেনে টেনে আর দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে চলাফেরা করতে হতো, তখন-ও সে ট্রেন আসার সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্যের একটা উন্মাদনা অনুভব করতো। 'কিছু মাছ-মাংস রান্না করে রাখতে হবে আমাদের,' হুকুম দিয়ে বলতো সে চার বাবুর্চিকে, আর তারা তখন সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের নির্বিকার তদারকিতে লেগে পড়তো সবকিছু তৈরি করতে। 'সব কিছুই তৈরি করে রাখতে হবে আমাদের, কারণ নতুন এই লোকগুলো কী খেতে পছন্দ করে তা তো আর আমরা কেউ জানি না,' সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ বলতো। ট্রেনটা এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছুতো দিনের সবচেয়ে গরম সময়টাতে। দুপুরের খাওয়ার সময় হাট-বাজারের হৈ চৈ নিয়ে কেঁপে উঠতো বাড়িটা, আর ঘর্মাক্ত কলেবর অতিথিরা, যারা এমনকি এ-ও জানতো না তারা কাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছে, তারা হুটোপুটি লাগিয়ে দিতো টেবিলের সবচেয়ে ভালো জায়গাটা দখল করার জন্য, এদিকে স্যুপের ঢাউশ ঢাউশ কেতলি, মাংসের বাটি, শাক-সবজিভরা বড় বড় লাউয়ের খোল আর ভাতের পাত্র নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকা বাবুর্চিরা সব এক অন্যের গায়ের ওপর গিয়ে পড়তো, আর পিঁপেগুলো থেকে সবাইকে লেমোনেড দিয়ে যেতো অক্ষয় হাতাগুলোর সাহায্যে। বিশৃঙ্খলাটা এমনই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে, অনেকেই দু'বার খাচ্ছে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে ফারনান্দা, আর বার কয়েক তো সে সজিঅলাদের মতো খিস্তি করেই উঠতে গিয়েছিল, কারণ টেবিলে খেতে বসা কেউ কেউ ভুল করে কিছু একটা চেয়ে বসেছিল তার কাছে। মি. হার্বার্ট মাকোন্দোতে পা দেবার পর এক বছর কেটে গেলেও সাকুল্যে যে-ব্যাপারটা জানা গেছে তা হল গ্রিংগোরা সেই মায়াবী এলাকাটায় কলার আবাদ করার পরিকল্পনা করছে যে-এলাকাটা হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার লোকেরা অতিক্রম করেছিল বিরাট বিরাট সব আবিষ্কার যেখানে হচ্ছিল সেখানে যাবার রাস্তা খুঁজে বের করতে। সেই প্রবল আগ্নেয় উদ্‌গিরণের আকর্ষণে কপালে ছাই দিয়ে আঁকা ক্রুশচিহ্ন নিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার আরো দুই ছেলে এসে পৌঁছোয় একদিন, আর তারা যে-শব্দসমষ্টি দিয়ে তাদের দৃঢ় সংকল্পের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে সেটাই হয়ত ওদের সবার আসার কারণ।

ওরা বলে, 'আমরা এলাম, কারণ সবাই আসছে।'

সুন্দরী রেমেদিওসই একমাত্র মানুষ যাকে এই কলার মহামারী ছুঁতে পারেনি। চমৎকার এক বয়োসন্ধিতে এসে স্থির হয়েছে সে, ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে সব ধরনের লৌকিকতা থেকে, ক্রমেই উঠে যাচ্ছে সব ধরনের ঈর্ষা আর সন্দেহের ঊর্ধ্বে, নিজের সহজ-সরল বাস্তবতার পৃথিবী নিয়েই সে সুখী। কাঁচুলি আর পেটিকোট দিয়ে মেয়েরা যে কেন তাদের জীবনটাকে জটিল করে ফেলে সেটা বুঝতে না পেরে নিজের জন্যে মোটা কাপড়ের একটা আলখাল্লা সেলাই করে স্রেফ মাথার ওপর দিয়ে সেটা গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে সে, তাতে কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই মিটে গেছে পোশাক-আশাকের সমস্যাটা, বজায় থেকেছে তার নগ্ন থাকার অনুভূতিটাও, আর তার কথা অনুযায়ী, কেউ যখন বাড়িতে থাকে তখন ওভাবে থাকাটাই নাকি একমাত্র শোভন উপায়। এরিমধ্যে উরু পর্যন্ত নেমে আসা তার চুলের বন্যাটা ছেঁটে ফেলে চিরুনী দিয়ে রোল করে নিতে আর ফিতা দিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাড়ির লোকেরা তাকে এমনই পীড়াপীড়ি শুরু করে যে মাথাটা স্রেফ কামিয়ে ফেলে সে, তারপর সেই কাটা চুলগুলো দিয়ে পরচুলা বানিয়ে ফেলে সন্তদের জন্যে। সব কিছু সহজ-সরল করে দেখার তার এই স্বভাবটার সবচেয়ে অবাক-করা ব্যাপার হল আরামের জন্যে যতোই সে সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকে, স্বতঃস্ফূর্ততায় সাড়া দিতে গিয়ে যতোই সে গতানুগতিকতা এড়িয়ে চলে, ততোই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে তার অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য, ততোই উত্তেজক হয়ে ওঠে সে পুরুষের কাছে। কর্নেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ছেলেরা যেবার প্রথম মাকোন্দোতে এসেছিল, উরসুলার মনে পড়ে গিয়েছিল যে ওদের শিরায় যে-রক্ত বইছে তার নাতির মেয়ের শিরাতেও সেই একই রক্ত বইছে, আর তখন এক বিস্মৃত আতংকে শিউরে উঠেছিল সে। সুন্দরী রেমেদিওসকে সতর্ক করে দিয়ে সে বলেছিল, 'চোখ কান খোলা রাখবি। ওদের কারো সঙ্গে ফেঁসে গেছিস তো শুয়োরের লেজ নিয়ে জন্মাবে তোর ছানাপোনারা।' উরসুলার এই হুঁশিয়ারি মেয়েটা এমনভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল যে পুরুষের মতো পোশাক-আশাক পরে বালিতে গড়াগড়ি খেতে লেগে গিয়েছিল তেল-মাখানো খুঁটি বেয়ে ওঠার জন্যে, আর তাতে করে তার সতেরো জ্ঞাতি ভাইয়ের জীবনে একটা ট্র্যাজেডি নিয়ে আসার উপক্রম করে ফেলেছিল, কারণ এই অসহনীয় দৃশ্য দেখে তাদের তো রীতিমত উন্মাদ হবার জোগাড়। এই কারণেই, মাকোন্দোয় এলে বাড়িতে ঘুমোতো না ওরা কেউ, তাছাড়া যে-চারজন রয়ে গিয়েছিল তারা উরসুলার জোরাজুরিতে ভাড়া করা ঘরে থাকতো। অবশ্য এই সাবধানতার ব্যাপারটা জানা থাকলে সুন্দরী রেমেদিওস হেসেই খুন হয়ে যেতো। পৃথিবীতে তার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত-ও সে জানতো না যে বিঘ্ন-বিপত্তি সৃষ্টিকারী এক রমণী হিসেবে তার অমোচনীয় নিয়তি প্রতিদিনই কোনো না কোনো অঘটনের কারণ হচ্ছে। উরসুলার বারণ সত্ত্বেও যতোবারই খাবার ঘরে যেতো সে, ততোবারই বাইরের লোকজনের মধ্যে হতাশার একটা আতংক তৈরি করতো সে। ব্যাপারটা দিব্যি বোঝা যেতো যে তার সেই নামমাত্র রাতের শার্টটার নিচে আর কোনো কাপড় নেই, আর এটা কেউই বুঝতো না যে তার কামানো এবং নিখুঁত খুলিটা কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ নয়, তাছাড়া, পা ঠাণ্ডা করার জন্যে যে-রকম দুঃসাহসের সঙ্গে সে উরুযুগল থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলতো সেটা কোনো অপরাধমূলক প্ররোচনা নয়, বা খাওয়ার পরে সে যখন শব্দ করে আঙুল চাটতো সেটাও সে তার মনের খুশিতে করতো না। পরিবারের লোকজনেরা যে-কথাটা কখনোই জানতে পারেনি তা হলো, এই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে বাইরের লোকজনের খুব বেশি সময় লাগতো না যে সুন্দরী রেমেদিওসের গা থেকে উত্তেজনাকর একটা হল্কা বের হয়, গায়ে ছ্যাঁকা দেয়া হালকা একটা বাতাস, আর সে চলে যাওয়ার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও সেটা দিব্যি টের পাওয়া যেতো। ভালোবাসার ধড়ফড়ানির বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকজন, যারা সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে, তারা বলতো, সুন্দরী রেমেদিওসের শরীর থেকে বেরুনো অতি স্বাভাবিক সুবাসটা তাদের মধ্যে যে-অস্থিরতা তৈরি করতো এমনটি তাদের কোনোদিন হয়নি আগে। বেগনিয়াশোভিত বারান্দায়, বৈঠকখানায়, বাড়ির যেকোনো জায়গায়, ঠিক কোনখানে সে ছিল আর সে সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর কতক্ষণ কেটেছে সেটা ঠিক ঠিক বলে দেয়া যেতো। সূত্রটা খুবই নিশ্চিত আর সুস্পষ্ট হলেও পরিবারের কেউ-ই কিন্তু সেটা বুঝতে পারেনি, তার কারণ অনেক দিন আগেই আটপৌরে গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সেটা, তবে বাইরের লোকেরা সেটা মুহূর্তের মধ্যে টের পেয়ে যেতো। কাজেই শুধু তারাই বুঝতে পারতো রক্ষীদলের তরুণ অধিনায়ক কী করে ভালোবেসে মারা গিয়েছিল, কী করে দূরদেশের এক সজ্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক হতাশার কারণে অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যে অস্থির পরিমণ্ডলে সে ঘোরাফেরা করতো, পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় নিশ্চিত বিপর্যয়ের যে অসহনীয় অবস্থা তৈরিতে সে ইন্ধন যোগাতো, সে-সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন সুন্দরী রেমেদিওসের ব্যবহারে লোকজনের প্রতি কোনো বিদ্বেষ প্রকাশ পেতো না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সরল সৌজন্য তাদের হতাশ করতো। বাইরের লোকজন যাতে তাকে দেখতে না পায় সেজন্য সুন্দরী রেমেদিওস যেন আমারান্তার সঙ্গে রান্নাঘরেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে উরসুলার এই আদেশ জারি হওয়ার পর সে বরং হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, তার কারণ, শত হলেও কোনো ধরনের নিয়মকানুন মানা তার ধাতে নেই। কোথায় বসে সে খাচ্ছে না খাচ্ছে তা নিয়ে আদতেই কোনো মাথাব্যথা নেই তার, আর সে যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর খায় তা-ও নয়, খায় খিদের খেয়ালমাফিক। মাঝেমধ্যে সে হয়ত রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়বে দুপুরের খাওয়ার জন্য, তারপর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেবে সারাটা দিন, আর মাস কয়েক ধরে এই উল্টো-পাল্টা সময়সূচিই বলবৎ থাকবে, যদ্দিন পর্যন্ত না কোনো মামুলি ঘটনা তাকে ফিরিয়ে আনবে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে। অবস্থা যখন আরেকটু ভালো থাকে, তখন সকাল এগারটায় ঘুম থেকে উঠে দুপুর দুটো পর্যন্ত একেবারে দিগম্বর হয়ে বসে থাকবে সে গোসলখানায়, দরজা বন্ধ করে, তার নিবিড় আর দীর্ঘ ঘুমের রেশ কাটিয়ে উঠতে উঠতে নিধন করে চলবে কাঁকড়াবিছেগুলো। তারপর একটা লাউ-এর খোল দিয়ে সিস্টার্ন থেকে জল নিয়ে নিজের গায়ে ঢালবে। কাজটা সে এতো সময় নিয়ে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সারবে যে তাকে যে চেনে না তার কাছে মনে হবে অত্যন্ত সঙ্গতকারণেই সে নিজের শরীরের প্রেমে পড়ে গেছে। আসলে কিন্তু এই নিভৃত কৃত্যানুষ্ঠানটির মধ্যে কোনো ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নেই, বরং সেটা স্রেফ খিদে না লাগা পর্যন্ত সময় কাটানোর একটা উপায় মাত্র। একদিন ও গোসল শুরু করতে যাবে কেবল, এমন সময় বাইরের এক লোক ছাদের একটা টালি খুলে ওর নগ্নতার দুর্দান্ত দৃশ্যটা দেখে রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে। ভাঙা টালির ভেতর দিয়ে লোকটার চোখ দুটো নজরে আসে সুন্দরী রেমেদিওসের, কিন্তু তার মধ্যে লজ্জার কোনো বোধ-ই দেখা যায় না, উল্টো সে বরং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

'সাবধান,' চেঁচিয়ে বলে ওঠে সে, 'পড়ে যাবে তুমি।'

ভিনদেশী লোকটা বিড়বিড় করে বলে, 'আমি স্রেফ একটু দেখতে চাই তোমাকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ঠিক আছে,' সে বলে, 'কিন্তু সাবধান, টালিগুলো কিন্তু পচে গেছে।'

অচেনা লোকটার মুখে হতচেতন দশার একটা বেদনামাখা ছাপ ফুটে ওঠে, দেখে মনে হয় এই মরীচিকাটি ছিন্ন না করার জন্যে ভেতরে ভেতরে সে তার আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সুন্দরী রেমেদিওস ভাবে, লোকটা বুঝি এই ভেবে ভয় পাচ্ছে যে টালিগুলো ভেঙে পড়বে, তাই সে-বেচারা যাতে বিপদে না পড়ে সেজন্য সে বরাবরের চেয়ে তাড়াতাড়ি গায়ে পানি ঢালতে শুরু করে। সিস্টার্ন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি ঢালার সময় সে লোকটাকে বলে যে তার ধারণা ছাদটার ঐ দশার কারণ হল পাতার স্তরটা বৃষ্টিতে পচে গিয়েছে, আর সে-কারণেই গোসলখানাটা ভরে উঠেছে কাঁকড়াবিছায়। আগন্তুক ভাবে তার এই টুকরো-টাকরা কথাবার্তা আসলে তার অসাধারণ সৌজন্য আড়াল করারই একটা চেষ্টা মাত্র, কাজেই সুন্দরী রেমেদিওস যখন গায়ে সাবান লাগাতে শুরু করে, লোভের কাছে হার মেনে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় সে।

বিড়বিড় করে বলে, 'তোমার গায়ে একটু সাবান মাখাতে দাও না আমাকে।'

সুন্দরী রেমেদিওস বলে, 'তোমার এই সদিচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু সেজন্যে আমার এই দুই হাতই যথেষ্ট।'

ভিনদেশী লোকটা কাকুতি মিনতি করে বলে, 'অন্তত তোমার পিঠটায় লাগাতে দাও।'

সে বলে, 'সেটা একটা বোকার মতো কাজ হবে। মানুষ কখনো পিঠে সাবান মাখে না।'

তারপর, সে যখন গা মুছতে শুরু করেছে লোকটা তখন এই বলে পীড়াপীড়ি শুরু করে যে সুন্দরী রেমেদিওস যেন তাকে বিয়ে করে। সে তাকে আন্তরিকভাবেই বলে, যে-লোক এমনই সরল-সোজা যে স্রেফ একটা মেয়েলোকের গোসল দেখার জন্যে একটা ঘণ্টা নষ্ট করেছে, এমনকি দুপুরের খাওয়াটা পর্যন্ত খায়নি, তাকে কোনোদিনও বিয়ে করবে না সে। শেষে সে যখন গায়ে তার আলখাল্লাটা চাপাতে যাচ্ছে, লোকটা এই চাক্ষুষ প্রমাণটা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না যে, প্রত্যেকেই যেটা সন্দেহ করেছে সেটাই ঠিক, আলখাল্লাটার নিচে কিছুই পরতে যাচ্ছে না সে, আর তার কাছে মনে হয় এই গোপন সংবাদটার গনগনে উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকাটা চিরদিনের জন্যে লেগে গেল তার গায়ে। এরপর সে গোসলখানার ভেতরে নেমে পড়ার জন্যে আরো দুটো টালি সরিয়ে ফেলে।

ভয় পেয়ে তাকে সতর্ক করে দেয় সুন্দরী রেমেদিওস, 'খুব উঁচু কিন্তু ছাদটা, মারা পড়বে তুমি।'

আর তখনই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পচা টালিগুলো, শান বাঁধানো মেঝেতে বাড়ি খেয়ে মাথাটা চুরমার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় লোকটা, আতংকে একটা চিৎকার করারও সময় পায় না। খাওয়ার ঘর থেকে শব্দটা শুনে যেসব ভিনদেশী ছুটে গিয়ে লাশটা সরিয়ে আনে, তারা লোকটার গায়ে সুন্দরী রেমেদিওসের দম বন্ধ করা সুবাসটা পায়। এমনই প্রকট হয়ে সুবাসটা লেগে থাকে তার শরীরে যে তার মাথার ফাটা জায়গাগুলো থেকে রক্ত না বেরিয়ে বেরোয় সেই গোপন সুবাসভরা রজন-রঙা একটা তেল, আর তখনই তারা বুঝতে পারে সুন্দরী রেমেদিওসের গায়ের সুবাস মানুষকে তাদের মৃত্যুর পরেও জ্বালাতে থাকে, একেবারে তাদের হাড়ের ভেতরের মজ্জা পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে। তারপরেও কিন্তু লোকজন বীভৎস সেই দুর্ঘটনাটাকে সুন্দরী রেমেদিওসের কারণে মারা যাওয়া আগের দু'জন লোকের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক করে দেখে না। সুন্দরী রেমেদিওসের শরীর থেকে ভালোবাসার হল্কা ছড়ায় না, ছড়ায় একটা ভয়ংকর বিকিরণ, এই কিংবদন্তীতে বাইরের লোকজনের আর মাকোন্দোর পুরনো বাসিন্দাদের ভেতরে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মাতে আরো একটা শিকারের তখনো প্রয়োজন ছিল। সেই প্রমাণের ঘটনাটা ঘটে কয়েক মাস পর, সুন্দরী রেমেদিওস যখন একদল সখীর সঙ্গে নতুন আবাদটা দেখতে যায় তখন। মাকোন্দোর মেয়েদের জন্য এই নতুন খেলাটা হাসি আর চমক, ভীতি আর কৌতুকের একটা উপলক্ষ, তাছাড়া রাতের বেলা তারা তাদের সেই বেড়ানো নিয়ে এমনভাবে আলাপ করতো যেন সেটা স্বপ্নে ঘটা কোনো অভিজ্ঞতা। এমনই বিশিষ্টতা সেই নৈঃশব্দের যে সুন্দরী রেমেদিওসকে সেটার মজা থেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছে হয় না উরসুলার, কাজেই টুপি আর ভদ্রস্থ পোশাক-আশাক পরে যাওয়ার শর্তে এক বিকেলে তাকে যেতে দেয় উরসুলা। সখীর দলটা গিয়ে সেই আবাদে পৌঁছুতেই পুরো এলাকাটা একটা প্রাণঘাতী সুবাসে ভরে ওঠে। সার বেঁধে কাজ করতে থাকা লোকগুলোর মনে হয় এক অদ্ভুত আকর্ষণের কাছে বন্দি হয়ে পড়েছে তারা, পেয়ে বসেছে তাদেরকে এক অদৃশ্য বিপদের ভয়, আর তাদের মধ্যে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ার এক অদম্য ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। একদল হিংস্র পুরুষ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করতে সুন্দরী রেমেদিওস আর তার হতচকিত সখীরা কোনোমতে কাছের একটা বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। খানিক পর চার অরেলিয়ানো গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনে, তাদের কপালে দাগা ছাই-এর ক্রুশগুলো দেখে এমন এক পবিত্র সম্ভ্রম সৃষ্টি হয় যেন সেগুলো কুলচিহ্ন, দুর্দমনীয়তার সিলমোহর। একটা কথা সুন্দরী রেমেদিওস কাউকেই বলেনি যে সেই হুড়োহুড়ির সুযোগে লোকগুলোর মধ্যে একজন একটা হাত চালিয়ে দিতে পেরেছিল তার পেটে, শৈলশিরার কিনারা আঁকড়ে ধরে থাকা ঈগলের থাবাও সে-হাতের কাছে কিছু নয়। একটা চকিত বিদ্যুচ্চমকের মতো দস্যু লোকটার দিকে তাকিয়েছিল সুন্দরী রেমেদিওস, দেখেছিল, সান্ত্বনাহীন শোকে ছাওয়া তার দুই চোখ, আর সে-দৃশ্য তার মনে গেঁথে গিয়েছিল করুণার উত্তপ্ত কয়লার মতো। সেই রাতে তুর্কীদের সড়কে দাঁড়িয়ে লোকটা তার সৌভাগ্য নিয়ে বড়াই করার মিনিট কয়েক পরেই একটা ঘোড়ার লাথিতে তার বুকটা বিদীর্ণ হয়ে যায়, আর বাইরে থেকে আসা একদঙ্গল লোক দেখে কিভাবে রাস্তার মাঝখানে নিজের রক্তমাখা বমির ভেতর ছটফট করতে করতে মারা যায় লোকটা।

সুন্দরী রেমেদিওস যে মৃত্যুর ক্ষমতা ধরে এই চারটে অকাট্য ঘটনায় সে-ধারণাটা প্রমাণ হয়ে যায়। কিছু মুখ-আলগা লোক যদিও বলে যে এমন উত্তেজক রমণীর সঙ্গে এক রাতের প্রণয়ের জন্যে গোটা জীবনটাই বিলিয়ে দেয়া চলে, কিন্তু সত্যি কথাটা হল কাউকেই সে-রকম কোনো কিছু করতে দেখা যায় না। সুন্দরী রেমেদিওসকে কেবল পাওয়ার জন্যেই নয়, তার তরফ থেকে আসা বিপদগুলো তুকতাক করে এড়িয়ে দেবার জন্যে সম্ভবত যে-জিনিসটি দরকার ছিল তা হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার মতো আদিম আর মামুলি একটা অনুভূতি। কিন্তু এই কথাটাই কারো মাথায় আসে না। ওকে নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেয় উরসুলা। আরেকবার, তখনো সে সুন্দরী রেমেদিওসকে জাগতিক ব্যাপার-স্যাপারে কাজে লাগাবার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেনি, সেই সময় একদিন সে গেরস্থালি বিষয়ের মৌলিক দিকগুলোর ব্যাপারে ওকে উৎসাহী করে তোলার চেষ্টা করেছিল। খানিকটা রহস্য করে সে বলেছিল, 'তুই যা ভাবিস ব্যাটা ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু চায়। তুই যা ভাবিস তার চেয়ে অনেক বেশি রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা আর ছোটখাটো ব্যাপারে দুঃখ পাবার ব্যাপার আছে।' পারিবারিক সুখের ব্যাপারে তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে, ভেতরে ভেতরে আসলে নিজের মনকেই চোখ ঠারছিল উরসুলা, কারণ সে ভালো করেই জানতো দুনিয়াতে এমন লোক একজনও নেই যে তার আসক্তি একবার ফুরিয়ে যাওয়ার পর বোধবুদ্ধির অগম্য কোনোধরনের অযত্ন-অবহেলা একদিনের জন্যেও সহ্য করতে পারবে। এই নতুন হোসে আর্কাদিও-র জন্ম আর তাকে পোপ হিসেবে গড়ে তোলার অদম্য ইচ্ছা শেষঅব্দি তাকে তার নাতির মেয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামানো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুন্দরী রেমেদিওসকে সে এই বিশ্বাসে তার ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয় যে আজ নয় কাল কোনো না কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটবেই, আর, বারোভাজা জিনিসের এই দুনিয়াতে এমন ঢিলেঢালা লোকও পাওয়া যাবে যে ওর সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেবে। সুন্দরী রেমেদিওসকে কাজকর্মে পটু করে তোলার চেষ্টায় অনেক আগেই ইস্তফা দিয়েছে আমারান্তা। সেইসব বিস্মৃত বিকেলে সে যখন দেখতো সেলাই মেশিনের হাতল ঘোরানোর ব্যাপারে তার ভাইঝির প্রায় কোনো আগ্রহ-ই নেই তখনই সে বুঝে গিয়েছিল যে মেয়েটা অন্যরকম, সরল-সোজা। পুরুষমানুষের আলাপে তার মন নেই দেখে সে তাকে বলতো, 'তোর একটা গতি করতে দেখছি লটারির ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।' পরে যখন উরসুলা নিয়ম করে দেয়, একটা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে মাস্-এ যেতে হবে সুন্দরী রেমেদিওসকে, তখনই আমারান্তার মনে হয়েছিল যে এরকম একটা রহস্যময় প্রতিষেধক শেষমেষ এমনই উত্তেজনাকর হয়ে দাঁড়াবে যে শিগ্‌গিরই এক পুরুষ এসে যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাবে মেয়েটার মনের একটা দুর্বল জায়গা খুঁজে পেতে। কিন্তু পাণিপ্রার্থী যে-লোকটাকে বহু দিক দিয়েই যে-কোনো রাজপুত্তুরের চেয়েও পছন্দসই বলে মনে হওয়ার কথা, তাকেও যখন সুন্দরী রেমেদিওস নির্বোধের মতো ফিরিয়ে দেয়, তখনই সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল আমারান্তা। আর ফারনান্দাতো ওকে বোঝার কোনো চেষ্টাই করেনি। সেই রক্তাক্ত কার্নিভালে রানীর সাজে সুন্দরী রেমেদিওসকে দেখে ওকে এক অসাধারণ কিছু বলে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু পরে যখন দেখে সে দুই হাত দিয়ে খাচ্ছে, একটা অতি সাদামাটা কথারও উত্তর দিতে পারছে না, তখন কেবল একটা কথা ভেবেই আফসোস হয়েছিল তার যে এই পরিবারে হাবাগোবাদেরই আয়ু বেশি। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যদিও তার এই বিশ্বাসে অটল, আর সেকথা সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতোও বারে বারে যে, সুন্দরী রেমেদিওসই তার দেখা সবচেয়ে সহজবোধ্য মানুষ, আর মেয়েটাও সেকথা প্রতি মুহূর্তেই প্রমাণ করে যেতো সবার ওপরে তার খেয়ালখুশি চাপিয়ে দেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়ে, তারপরেও কিন্তু সবাই তাকে তার নিজের খেয়াল-খুশির ওপরেই ছেড়ে দেয়। নিঃসঙ্গতার মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে, সে-রকম কোনো দায়-দায়িত্ব না নিয়ে, তার দুঃস্বপ্নহীন স্বপ্ন, তার অনিঃশেষ গোসল, তার অনির্ধারিত ভোজনপর্ব, আর তার গভীর ও দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে পরিণত হতে হতে যখন সুন্দরী রেমেদিওসের দিন কাটছে, এমনি সময়, মার্চের এক বিকেলে, ফারনান্দা বাগানে তার ব্রেব্যান্ট চাদরগুলো ভাঁজ করার জন্য বাড়ির মেয়েদের সাহায্য করতে বলে। কাজ শুরু করেই আমারান্তা খেয়াল করে ভীষণ একটা পাণ্ডুরতা ঘিরে ধরেছে সুন্দরী রেমেদিওসকে।

সে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'খারাপ লাগছে নাকি?'

চাদরের অন্য প্রান্ত ধরে থাকা সুন্দরী রেমেদিওস একটা করুণার হাসি হাসে। সে জবাব দেয়, 'ঠিক উল্টো। এতো ভালো আগে কোনোদিন লাগেনি আমার।' কথাটা সে বলে শেষ করেছে মাত্র এমনি সময় ফারনান্দা অনুভব করে আলোর একটা আবছা হাওয়া তার হাত থেকে চাদরগুলো টেনে নিয়ে উপরের দিকে মেলে ধরেছে। পেটিকোটের ঝালরে একটা রহস্যময় কাঁপুনি অনুভব করে আমারান্তা যখন পতন ঠেকানোর জন্য চাদরটা আঁকড়ে ধরেছে, ঠিক তখুনি মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করে সুন্দরী রেমেদিওস। যদিও উরসুলা প্রায় অন্ধ তখন, তারপরেও কেবল সে-ই এই স্থিরসংকল্প বাতাসের স্বরূপটা বোঝার মতো শান্ত অবস্থায় ছিল, তাই সেই আলোর করুণার হাতেই চাদরগুলো ছেড়ে দিয়ে সে দেখতে থাকে সুন্দরী রেমেদিওস হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে পতপত করতে থাকা চাদরগুলোর ভেতর থেকে, সেগুলো তারই সঙ্গে মর্তভূমি ছেড়ে এসেছে, তারই সঙ্গে ছেড়ে যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ডালিয়া ফুলের পরিবেশ, তারই সঙ্গে বাতাস কেটে চলে যাচ্ছে বিকেল চারটা বাজতে না বাজতে, আর সেই চাদরগুলো চিরদিনের জন্যে তার সঙ্গে আরো উপরের সেই বায়ুমণ্ডলে হারিয়ে যায় যেখানে যাওয়ার সাধ্য স্মৃতির সবচেয়ে উর্ধ্বগামী পাখিদেরও নেই।

বাইরের লোকজন অবশ্য ভেবে নেয় সুন্দরী রেমেদিওস শেষ পর্যন্ত তার রানী মৌমাছি হওয়ার অমোচনীয় ভাগ্যকেই বরণ করে নিয়েছে, আর তার মান বাঁচানোর জন্যে এখন তার পরিবার এই উর্ধ্বগমনের কাহিনী ফেঁদেছে। ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে শেষতক অলৌকিক ঘটনাটার ব্যাপারটা মেনে নেয় ফারনান্দা, আর বহুদিন ধরে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যায় তিনি যেন তার চাদরগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেন। বেশির ভাগ লোকই অবশ্য অলৌকিক ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নেয়, এমনকি তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে পর পর নয় দিন ধরে প্রার্থনা আর আরাধনা-ও চালিয়ে যায়। অরেলিয়ানোদের বর্বর হত্যাকাণ্ডটা এই বিস্ময়কে সরিয়ে দিয়ে আতংকের জায়গা করে না দিলে লোকজনের মুখে হয়ত বহুদিন ধরে সুন্দরী রেমেদিওসের উর্ধ্বগমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া অন্য আর কোনো কথা থাকত না। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার ছেলেগুলোর এই করুণ পরিণতিটার ব্যাপারে কখনো কোনো আগাম সংকেত না পেলেও, কী করে যেন সেটা আগে ভাগে বুঝতে পেরেছিল। সেই গণ্ডগোলের সময় এসে পৌঁছুনো অরেলিয়ানো সেরাদর আর অরেলিয়ানো আর্কাইয়া যখন মাকোন্দোতে থেকে যেতে চাইল, ওদের বাবা ওদেরকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। রাতারাতি একটা বিপজ্জনক স্থানে পরিণত হওয়া শহরটাতে ওরা কি করতে চায় সেকথা মাথায় এলো না তার। কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দোর ইন্ধনে অরেলিয়ানো সেন্তেনো আর অরেলিয়ানো ত্রিস্তে নিজেদের ব্যবসার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল ওদের। তখনো কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কিছু গোলমেলে ধ্যান-ধারণা ছিল, যে-কারণে এই সিদ্ধান্তটা পছন্দ হয়নি তার। মি. ব্রাউনকে মাকোন্দোয় পৌঁছুনো প্রথম গাড়িতে দেখে—কমলা রঙের সেই কনভার্টিবলের ভেঁপুর শব্দে কুকুরগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল—বুড়ো সৈনিকের মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল লোকজনের মোসাহেবসুলভ উত্তেজনার কারণে, আর তার কাছে মনে হয়েছিল যে, সেই সময়টার পর থেকে—যখন লোকগুলো তাদের বৌ-বাচ্চার কথা ভুলে কাঁধের ওপর শটগান ফেলে যুদ্ধে চলে যেতো—তাদের মনের গড়নে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। নিয়ারলান্দিয়ার যুদ্ধ বিরতির পর স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন বলতে রয়েছে উদ্যমহীন কিছু মেয়র, আর মাকোন্দোর শান্তিপ্রিয়, ক্লান্ত-শ্রান্ত রক্ষণশীলদের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া ঠুঁটো জগন্নাথ কিছু বিচারক। পুলিশগুলোকে কাঠের মুগুর হাতে নিয়ে খালি-পায়ে হেঁটে যেতে দেখলে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে উঠতো, 'এ-হচ্ছে বজ্জাতের সরকার। আমাদের বাড়িগুলো যেন নীল রং করতে না হয় স্রেফ এই জন্যে এতোগুলো যুদ্ধ করেছি আমরা।' কলা কম্পানি আসার পর, স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের জায়গা নেয় স্বেচ্ছাচারী বিদেশীর দল, তাদেরকে মি. ব্রাউন বিদ্যুতায়িত চিকন তারের জাল ঘেরা জায়গায় এই জন্যে নিয়ে এসেছিল যাতে করে, তার কথানুযায়ী, তারা তাদের পদমর্যাদামাফিক সম্মান পেতে পারে, আর বেঁচে যেতে পারে শহরের গরম আর মশা আর অগুনতি অসুবিধা ও বিধি-নিষেধের হাত থেকে। বুড়ো পুলিশের জায়গায় আসে মেশেটিধারী ভাড়াটে খুনেরা। কামারশালার ভেতর বন্দি অবস্থায় এসব পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে থাকে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, আর তার জীবনের নিঃসঙ্গ বছরগুলোর মধ্যে এই প্রথমবারের মতো একটা স্থির বিশ্বাস তাকে পীড়া দিতে থাকে যে একেবারে শেষটা না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধটা বন্ধ করা ঠিক হয়নি। সেই সময়েই একদিন সেই বিস্মৃত কর্নেল ম্যাগ্‌নিফিকো ভিস্‌বালের ভাই তার সাত বছর বয়সের নাতিকে নিয়ে যখন স্কোয়ারের একটা ঠেলাগাড়ি থেকে কোমল পানীয় কিনে আনতে যাচ্ছিল, তখন বাচ্চাটা দুর্ঘটনাক্রমে পুলিশের এক কর্পোরালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তার উর্দিতে খানিকটা পানীয় ফেলে দিলে সেই বর্বরটা তার মেশেটি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে তাকে, আর তার দাদা বাধা দিতে এলে মেশেটির এক কোপে তার কল্লাটাও নামিয়ে দেয় সে। তাবৎ শহরটা দেখে, মাথা-কাটা লোকটাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদল লোক, ওদিকে মাথাটাকে চুলে ধরে আর বাচ্চার দেহের টুকরোগুলো একটা থলেতে ভরে সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল এক মহিলা। কর্নেল বুয়েন্দিয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্তের চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায় ঘটনাটা। পাগলা কুকুরে কামড়েছিল বলে পিটিয়ে মেরে ফেলা এক মহিলার লাশ দেখে যৌবনে তার মনে যে-মর্মজ্বালা হয়েছিল, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ঠিক সেই মর্মজ্বালা অনুভব করছে সে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকের দলটার দিকে তাকায় সে, তারপর তার নিজের ওপর এক প্রবল বিতৃষ্ণায় পুনরুদ্ধার করা তার সেই আগের ভারি গলায় তাদের ওপর ঝেড়ে ফেলে তার বুকের ঘৃণার পুরো ভার, যে-ভার সে আর বইতে পারছিল না।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'এই খতরনাক গ্রিংগোগুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে একদিন আমার ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবো আমি।'

গোটা সেই হপ্তা ধরেই উপকূলের বিভিন্ন এলাকার অদৃশ্য সব খুনে গুণ্ডা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সতেরোজন ছেলেকে খরগোশের মতো খুঁজে বের করে তাদের ছাই-এর ক্রুশের ঠিক মাঝখানটা তাক করে গুলি চালিয়ে দেয়। সন্ধ্যা সাতটায় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে তার মায়ের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে, এমন সময় অন্ধকার থেকে ছুটে আসা একটা রাইফেলের গুলি তার কপাল এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। কারখানায় যে-দোলখাটিয়া টাঙিয়ে শুতে অরেলিয়ানো সেন্তেনো অভ্যস্ত ছিল, সেখানেই তাকে পাওয়া যায় দুই ভুরুর মধ্যখানে একেবারে হাতল পর্যন্ত গুঁজে একটা বরফ-ভাঙা কুড়াল বসানো অবস্থায়। বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আলো ঝলমলে তুর্কীদের সড়ক ধরে ফিরে আসছিল অরেলিয়ানো সেরাদোর, এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে কে যে রিভলভারের একটা গুলিতে তাকে টগবগিয়ে ফুটতে থাকা শুয়োরের চর্বির একটা কড়াইয়ের ওপর ফেলে দেয় তা আর কখনোই বোঝা যায় না। এ-ঘটনার মিনিট কয়েক পর, অরেলিয়ানো আর্কাইয়া যে-ঘরের মধ্যে এক রমণীকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে ছিল, সেই ঘরের দরজায় এক লোক করাঘাত করে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'জলদি। তোমার ভাইদের ওরা গুলি করে মেরে ফেলল।' ওর সঙ্গে যে-রমণীটি ছিল সে পরে বলেছে অরেলিয়ানো আর্কাইয়া লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই একটা মাউজারের গুলির অভ্যর্থনায় তার মাথা ফাঁক হয়ে যায়। সেই কালরাত্রিতে বাড়িটা যখন চারটা লাশের জন্য শোকপালনের জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন অরেলিয়ানো সেগান্দোর খোঁজে পাগলের মতো শহরময় দৌড়ে বেড়াতে থাকে ফারনান্দা, ওদিকে, পেত্রা কোতেস তখন তাকে এই ভেবে একটা দেয়াল কুঠুরির ভেতর লুকিয়ে রেখেছে যে মৃত্যুর পরোয়ানাটা বুঝি কর্নেলের নামধারী সবার জন্যেই। তিন দিন পার হওয়ার আগে তাকে বেরুতে দেয় না সে, আর ততদিনে উপকূলের নানান জায়গা থেকে আসা টেলিগ্রামের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা পষ্ট হয়ে যায় যে সেই অদৃশ্য শত্রুর প্রবল আক্রোশের লক্ষ্য ছিল কেবল ছাই-এর ক্রুশ দিয়ে চিহ্নিত ভাইয়েরাই। ভাইপোদের বিবরণ লিখে রাখা জাবেদা খাতাটা বের করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনে আমারান্তা, তারপর, এক এক করে টেলিগ্রাম পৌছোতে নামগুলো কেটে দিতে থাকে সে; শেষে বাকি থাকে কেবল সবচেয়ে বড়জনের নামটা। তার কালো গা আর সবুজ চোখের জন্যে তাকে মনে করতে কোনো কষ্টই হয় না তাদের। তার নাম অরেলিয়ানো আমাদোর, পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি, থাকে পাহাড়ের পাদদেশে নিভৃত এক পল্লীতে। তার মৃত্যুর খবর নিয়ে টেলিগ্রাম আসার জন্যে দুই হপ্তা অপেক্ষা করার পর অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এক সংবাদবাহক পাঠায় তার কাছে, এই ভেবে যে, তার ওপর যে মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে সে-খবর হয়ত সে না-ও জেনে থাকতে পারে। দূত খবর আনে, অরেলিয়ানো আমাদোর নিরাপদেই আছে। করাল সেই রাতে তাকে ধরার জন্যে দু'জন লোক তার বাড়িতে গিয়ে রিভলভার দিয়ে ঠিকই গুলি করেছিল তাকে, কিন্তু ছাই-এর ক্রুশে গুলি লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা। লাফ মেরে উঠোনের দেয়ালটা পার হয়ে, পাহাড়ের গোলকধাঁধার ভেতর মিশে যেতে পেরেছিল অরেলিয়ানো আমাদোর, জায়গাটা তার হাতের পিঠের মতো চেনা, ভাগ্যিস ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল তার, কারণ ওদের কাছ থেকে কাঠ কিনতে যেতো সে। তো, এরপর আর তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

শনি ভর করেছে তখন কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ওপর। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সান্ত্বনা জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান তাকে। সেই টেলিগ্রামে ব্যাপক একটা তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি আর মৃতদের প্রতি জ্ঞাপন করেন তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর আদেশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চারটে ফুলের তোড়া নিয়ে সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন মেয়র, চেষ্টা করেন সেগুলো কফিনে অর্পণ করার, কিন্তু কর্নেল তাঁকে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকার হুকুম দেয়। দাফনের পর, তর্জনগর্জন ভরা একটা টেলিগ্রাম লিখে ব্যক্তিগতভাবে সেটা দাখিল করে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে, কিন্তু টেলিগ্রাম প্রেরণকারী লোকটা সেটা পাঠাতে রাজি হয় না। তখন সে আক্রমণাত্মক বাছাবাছা বাক্য সহযোগে সেটাকে শানিয়ে তোলে, তারপর একটা খামের ভেতর পুরে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়। তার স্ত্রীর মৃত্যুর সময় যা ঘটেছিল, যুদ্ধের সময় বহুবার যেমনটি ঘটেছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মৃত্যুর সময়, এবারো তার মনে দুঃখের কোনো অনুভূতি হয় না, বরং জন্ম নেয় অন্ধ, উদ্দেশ্যহীন এক ক্রোধ, নপুংসকতার এক স্পষ্ট অনুভূতি। তার ছেলেদেরকে যাতে শত্রুরা চিনে নিতে পারে সে-উদ্দেশ্যে তাদেরকে অমোচনীয় ছাই দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়ার জন্যে সে এমনকি ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলকে সেই শত্রুদেরই একজন হিসেবে অভিযুক্ত করে বসে। লোলচর্ম পাদ্রী লোকটা, এখন আর যাঁর ভাবনাচিন্তার কোনো খেই থাকে না, আর প্রচারবেদী থেকে দেয়া যাঁর উদ্ভট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে যাকজপল্লীর অধিবাসীরা ইদানীং চমকে উঠতে শুরু করেছে, তিনি একদিন বিকেলবেলা সেই পানপাত্রটা নিয়ে বাড়িতে হাজির হন যেটার ভেতর সেই বুধবার তিনি ছাইগুলো তৈরি করেছিলেন, আর ছাইগুলো যে ধুলেই চলে যায় সেটা দেখিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের সবার কপালে তা মেখে দেবার। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের আতংক এমন গভীরভাবে সবার মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল যে এমনকি ফারনান্দাও তার ওপর পরীক্ষাটা চালাতে দেয় না, আর শুধু তাই না, এরপর থেকে আর অ্যাশ ওয়েন্সডে-তে কোনো বুয়েন্দিয়াকে বেদীর রেলিঙের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসতে দেখা যায়নি।

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার অস্থির দশাটা কাটতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ছোট মাছগুলো বানানো ছেড়ে দেয় সে, খাওয়া-দাওয়া করে মেলা কসরত করে, কম্বলটা টানতে টানতে আর তার শান্ত রোষটা নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে, যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে এমনিভাবে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ি জুড়ে। তিন মাস পর দেখা যায় ছাই-রঙা হয়ে গেছে তার সব চুল, শনের মতো তার প্রাচীন গোঁফজোড়া ঝুলে পড়েছে ফ্যাকাশে দুই ঠোঁটের পাশে, কিন্তু অন্যদিকে আবার তার চোখজোড়া হয়ে উঠেছে সেই জ্বলন্ত কয়লা, এক সময় যা চমকে দিয়েছিল জন্মের সময় তাকে দেখতে আসা লোকজনকে আর পরে যা স্রেফ একটা চাহনীতেই কাঁপিয়ে দিতো চেয়ারগুলোকে। যেসব সংকেত যৌবনে তাকে বিপজ্জনক সব পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গৌরবের নির্জন বন্ধ্যাভূমিতে, সেই সংকেত জাগিয়ে তোলার নিষ্ফল চেষ্টা চালায় সে তার যন্ত্রণার রুদ্ররোষের মধ্যে। বেদিশা, বেপথু হয়ে যায় সে এক অদ্ভুত বাড়িতে, যেখানে কোনো কিছুই বা কেউই তার মধ্যে ভালোবাসার সামান্যতম বিন্দুটিও জাগিয়ে তুলতে পারে না। যুদ্ধের আগেকার অতীতের চিহ্নের খোঁজে একবার মেলকিয়াদেসের ঘরটা খোলে সে, কিন্তু সেখানে পায় সে কেবল পাথরকুঁচি, আজেবাজে জিনিস আর বছরের পর বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় জমে ওঠা আবর্জনার স্তূপ। যেসব বই কেউ আর পড়েনি কখনো তার দুই মলাটের মধ্যে, স্যাঁতস্যাঁতে দশার কারণে নষ্ট হয়ে আসা পুরোনো পার্চমেন্টে, বিবর্ণ একটা ফুল ফুটে ছিল, আর সারা বাড়ির মধ্যে যে-বাতাসটা সবচেয়ে টাটকা রয়ে গিয়েছিল সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছিল যত মন্দস্মৃতির অসহ্য গন্ধ। একদিন সকালে সে দেখে, চেস্টনাট গাছটার নিচে মৃত স্বামীর হাঁটুর কাছে বসে কাঁদছে উরসুলা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াই বাড়ির একমাত্র লোক যে পঞ্চাশ বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে থেকে বিধ্বস্ত দশাসই বুড়ো লোকটাকে দেখেনি। উরসুলা তাকে বলে, 'তোর বাবার সঙ্গে কথা বল।' বাদাম গাছটার নিচে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ায় সে, আবারো লক্ষ্য করে যে, সামনের ফাঁকা জায়গাটা তার মধ্যে কোনো ভালোবাসা জাগিয়ে তুলছে না।

সে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কী বলছে?'

উরসুলা জবাব দেয়, 'ওর মনটা খুব খারাপ। ওর ধারণা, তুই খুব শিগ্‌গিরই মারা যাবি।'

মৃদু হেসে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে, 'বাবাকে বলে দাও, যখন মরা উচিৎ তখন লোকে মরে না, মরে তখন যখন তার মরার সঙ্গতি হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহংকারের যে-অবশেষটুকু তার বুকের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল সেটাকে জাগিয়ে তোলে তার মৃত বাবার সংকেতটি, কিন্তু সেটাকে সে ভুল করে শক্তির একটা দমকা বাতাস ভেবে বসে। সন্ত জোসেফের প্লাস্টারের মূর্তির ভেতর পাওয়া সোনার মোহরগুলি উঠোনের কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে সেকথা উরসুলার কাছ থেকে বের করার চেষ্টায় তাকে ত্যক্ত করে মারে সে এই জন্যেই। অতীতে পাওয়া একটা শিক্ষা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উরসুলা তাকে বলে, 'সেকথা তুই কোনোদিনই জানতে পারবি না।' তারপর সে যোগ করে, 'ওই সম্পদের মালিক একদিন ঠিকই এসে হাজির হবে, আর কেবল সে-ই ওটা খুঁড়ে তুলতে পারবে।' জীবনভর যে-লোকটা এমন দিল-দরিয়া ছিল সে যে কেন হঠাৎ করে এমন নির্লজ্জের মতো টাকা-পয়সার পেছনে ছোটে, সে-কথা কেউই বলতে পারে না, আর তা-ও যদি সেটা হঠাৎ দেখা দেওয়া কোনো প্রয়োজন মেটাবার মতো সামান্য কোনো অংক হতো, উল্টো সেটা এমনই বেয়াড়া রকমের যে স্রেফ অংকটার উল্লেখেই অরেলিয়ানো সেগান্দো যারপরনাই অবাক হয়ে যায়। সাহায্যের জন্যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার পুরোনো পার্টি সদস্যদের কাছে যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যাতে কথা বলতে না হয় সেজন্যে লুকিয়ে পড়ে তারা। এই সময়টাতেই তাকে বলতে শোনা যায়, 'উদারপন্থী আর রক্ষণশীলদের মধ্যে ইদানিং পার্থক্য হচ্ছে কেবল এই যে উদারপন্থীরা প্রার্থনাসভায় যায় পাঁচটায়, রক্ষণশীলরা আটটায়।' তারপরেও, এমনই অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে সে, এমনভাবে অনুনয়-বিনয় শুরু করে, এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত সে তার মর্যাদাবুদ্ধির লংঘন ঘটায় যে এক বিপুল আর পরিশ্রমে আর নিষ্করুণ অধ্যবসায়ে এখান থেকে কিছু ওখান থেকে আরো কিছু সাহায্য নিয়ে আট মাসের মধ্যেই উরসুলার পুঁতে রাখা টাকা-পয়সার চেয়ে বেশি অর্থ জোগাড় করে ফেলে সে। এরপর কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসের সঙ্গে দেখা করে সে, যাতে জলে-স্থলে-অন্ত রীক্ষে যুদ্ধ শুরু করতে তাকে সাহায্য করে সে।

AMARBOI.COM

একটা সময় ছিল যখন কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসই পারতো, এমনকি তার পক্ষাঘাতের চেয়ার থেকেও, বিদ্রোহের জংধরা তারে টান দিতে। নিয়ারলান্দিয়ার যুদ্ধবিরতির পর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন তার ছোট ছোট মাছের জগতের শরণ নিয়েছে, তখন কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস পরাজয়ের আগ পর্যন্ত তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা বিদ্রোহী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। তাদের নিয়ে শুরু করেছিল সে নিত্যদিনের অবমাননা, কাকুতি-মিনতি আর দরখাস্ত, আগামী-কাল-আসুন, যে-কোনো-সময়, যথাযথ-মনোযোগ-দিয়ে-আমরা-আপনার-কেসটি-দেখছি, — এসবের এক করুণ যুদ্ধ: সেই যুদ্ধে চরম নিঃসহায়ভাবে পরাজয় ঘটেছিল তাদের সেইসব অগুনতি আপনার-একান্ত-বিশ্বস্তদের কাছে যারা কখনোই আজীবন পেনশনের দরখাস্তে সই করেনি, যদিও তা করার কথা ছিল তাদের। অন্য যুদ্ধটা, বিশ বছরের সেই রক্তাক্ত যুদ্ধটাও, এই অন্তহীন স্থগিতাবস্থার ক্ষয়কারী যুদ্ধটার মতো ক্ষতি করতে পারেনি তাদের। এমনকি কর্নেল জেরিনাল্‌দো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কেসও— যে-কিনা তিন তিনবার বেঁচে গিয়েছিল তার জানের ওপর চালানো হামলা হাত থেকে, পাঁচ পাঁচটা আঘাত যার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, এন্তার যুদ্ধের ভেতর থেকে যে বেরিয়ে গেছে নিজের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়তে না দিয়ে—সে-ও অপেক্ষার এই নৃশংস অবরোধের কাছে হার মেনে যায়, আর, একটা ধার-করা বাড়িতে হীরের আকৃতির ছোপ ছোপ আলোর ভেতর বসে আমারান্তার কথা ভাবতে ভাবতে তলিয়ে যায় বার্ধক্যের করুণ পরাজয়ের ভেতর। শেষ যেসব বর্ষীয়ান সৈনিকের খবর পেয়েছিল সে তাদের ছবি ছাপা হয়েছিল একটা খবরের কাগজে, প্রজাতন্ত্রের এক অজ্ঞাত প্রেসিডেন্টের পাশে নির্লজ্জের মতো মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল তারা, আর প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজের প্রতিকৃতি আঁকা বোতাম দিচ্ছিলেন তাদেরকে ল্যাপেলে পরার জন্যে, আর সেই সঙ্গে রক্ত ও বারুদ-মাখা একটা পতাকা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন তাদের যাতে তারা তাদের কফিনের ওপর সেটা বিছিয়ে দিতে পারে। ওদিকে তখন ক্ষুধায় মরো মরো হয়ে, রাগে ক্ষোভে দিন পার করে, গৌরবের চমৎকার মলের ভেতর বয়সের ভারে পচতে পচতে আরো সম্মানীয় অন্যান্যরা মানুষের দাক্ষিণ্যের খুদকুঁড়ো খেয়ে পথ চেয়ে ছিল একটা চিঠির জন্যে। কাজেই কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন তাকে একটা মরণ-যুদ্ধ শুরু করার আমন্ত্রণ জানায়, যে-যুদ্ধ বিদেশী হানাদারদের মদতপুষ্ট, দুর্নীতিবাজ আর কেলেংকারীকণ্টকিত একটা সরকারের সমস্ত নাম-নিশানা মুছে দেবে, কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস সহানুভূতির একটা শিহরণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, 'হায় রে অরেলিয়ানো, আমি জানতাম তোর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, দেখতে যতোটা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছিস তুই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরসুলা তার শেষ বয়েসের হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে হোসে আর্কাদিওর পোপ-সংক্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা দেখাশোনা করার কোনো সুযোগ প্রায় পেতোই না বলা চলে, আর এদিকে বাচ্চাটার সেমিনারিতে যাওয়ার সময়ও চলে আসে খুব তাড়াতাড়ি। ফারনান্দার কড়াকড়ি আর আমারান্তার তিরিক্ষি মেজাজের মধ্যে নিজের সময়টা ভাগাভাগি করে কাটাতে কাটাতে তার বোন মেম্ প্রায় ঠিক এই সময়টাতেই পা দেয় সন্ন্যাসিনীদের স্কুলে যাওয়ার বয়েসে, ওখানে ওরা ক্ল্যাভিকর্ড বাজানোয় পটু করে তুলবে তাকে। যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে উরসুলা শিক্ষানবিস সুপ্রিম পন্‌টিফের নেতানো সত্ত্বাটিকে গড়েপিটে দিয়েছিল সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে মনে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দেয়ায় মনোকষ্টে ভুগছিল সে, কিন্তু উরসুলা এ-জন্যে নিজের নিদারুণ বার্ধক্য কিংবা বিভিন্ন ব্যাপার-স্যাপারের আকার-প্রকার তাকে প্রায় ঠাহরই করতে না দেয়া কালো মেঘ—এ-দুয়ের কোনোটিকেই দোষী করেনি, বরং দূষেছে এমন একটা কিছুকে যেটাকে সে নিজেই চিনতে পারেনি, যেটাকে তার আবছাভাবে মনে হয়েছে সময়ের ক্রমবর্ধমান ভাঙন বলে। দৈনন্দিন বাস্তবতা যে তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে সেকথা বুঝতে পেরে সে বলতো, 'আগে যেভাবে বছরগুলো যেতো এখন আর সেভাবে যায় না।' তার মনে হতো, আগে বাচ্চাকাচ্চারা বড় হতে অনেক সময় নিতো, তখন শুধু মনে রাখতে হতো বড় ছেলে হোসে আর্কাদিও জিপসিদের সঙ্গে পালিয়ে যেতে কতটা সময় নিয়েছে আর সে গায়ে রঙচঙ মাখিয়ে সাপের মতো হয়ে ফিরে এসে জ্যোতির্বিদদের মতো কথা বলার আগ পর্যন্ত কী কী ঘটে গেছে; তাছাড়া আরো মনে রাখতে হতো আমারান্তা আর আর্কাদিও ইন্ডিয়ানদের ভাষা ভুলে গিয়ে হিস্পানি শেখার আগে বাড়িতে কী কী ঘটে গেছে। শুধু দেখে যেতে হতো চেস্টনাট গাছের নিচে হতভাগ্য হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার কাটিয়ে দেয়া রোদ-বৃষ্টিভরা দিনগুলো আর তার মৃত্যুতে শোকপালন করতে কতটা সময় লেগেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধরাধরি করে লোকজন নিয়ে এসেছে এক মুমূর্ষু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিাকে, যার বয়স এতো যুদ্ধ আর যুদ্ধের এতো দুঃখকষ্টের পরেও পঞ্চাশ পুরো হয়নি। বাচ্চাগুলোকে যে একদাগ রেঁড়ির তেল খাওয়ানো দরকার সেটা তাদের চোখের সাদা অংশ দেখে বুঝে নিতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সময় পেতো আগে উরসুলা সারাদিন মিছরির জীব-জন্তু বানানোর পরেও। অথচ এখন যে শুধু সকাল-সন্ধ্যা হোসে আর্কাদিওকে পাছার ওপর চড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো ছাড়া তার করার কিছুই নেই, তারপরেও এই বাজে ধরনের সময়টা তাকে বাধ্য করে কাজকর্ম অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখতে। আসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা হচ্ছে, বয়েসের গাছ-পাথর হারিয়ে ফেলার পরেও উরসুলা বুড়ো হওয়াটা ঠেকাতে চেয়েছে, আর সে এখন সবার কাছেই একটা উৎপাত বিশেষ, কারণ সব কিছুতেই মাথা ঘামাতে চেষ্টা করে সে, বাইরের লোকজনকে বিরক্ত করে মারে এই প্রশ্ন করে করে যে যুদ্ধের সময় বর্ষা মরসুমটা পার হওয়ার আগ পর্যন্ত সন্ত জোসেফের একটা প্লাস্টারের মূর্তি তারা মাটির তলায় পুঁতে রেখে গিয়েছিল কিনা। কবে থেকে যে সে দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেছিল তা কেউ-ই জানে না। এমনকি তার শেষ বছরগুলোতে, যখন সে বিছানা ছেড়েও উঠতে পারে না, তখনো মনে হয়েছিল সে বুঝি জরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু এটা কেউই বুঝতে পারেনি যে সে চোখে দেখতে পায়না। হোসে আর্কাদিওর জন্মের আগেই উরসুলা নিজেই খেয়াল করেছিল ব্যাপারটা। প্রথমে সে এটাকে একটা সাময়িক অক্ষমতা হিসেবেই ধরে নিয়ে গোপনে গোপনে মজ্জার সিরাপ খেতো আর চোখে মধু লাগাতো, কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই সে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে অমোচনীয়ভাবে অন্ধত্বের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে, আর সেটা এমন পর্যায় পর্যন্ত যে বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া তার হয়ে ওঠেনি, কারণ প্রথম যখন বাল্ব জ্বালানো হয়েছিল, সে তখন স্রেফ একটা আলোর দীপ্তি দেখতে পেয়েছিল। কথাটা সে কাউকে বলেনি, কারণ বললে সেটা হতো তার অকর্মণ্যতার একটা প্রকাশ্য স্বীকৃতি। সে বরং জিনিসপত্রের দূরত্ব আর লোকজনের গলার স্বরের ওপর এক নীরব শিক্ষাগ্রহণে মন দেয়, যাতে করে তার ছানির ছায়ান্ধকার তাকে যেসব জিনিস দেখতে দিচ্ছে না সেগুলো সে দেখতে পায় তার স্মৃতির সহায্যে। কিছুদিন পর আবিষ্কার করবে সে গন্ধের অভাবনীয় সাহায্যের ব্যাপারটি। ছায়ান্ধকারে যা কিনা এমনই এক তীব্রতা নিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন বস্তুর কলেবর আর রঙের চেয়েও অনেক বেশি আশ্বস্তকর, আর এই গন্ধগুলোই শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয় তাকে। অন্ধকার ঘরে বসে সুচে সুতো পরিয়ে বোতামের ফুটো সেলাই করতে পারতো সে, জানতো দুধে কখন বলক উঠবে। প্রতিটি জিনিসের অবস্থান এমন নিশ্চিতভাবে জানতো সে যে মাঝে মধ্যে সে নিজেই ভুলে যেতো যে সে অন্ধ। একবার বিয়ের আংটি হারিয়ে ফারনান্দা পুরো বাড়িতে হুলস্থুল ফেলে দিলে উরসুলা বাচ্চাদের শোবার ঘরের একটা তাকের ওপর খুঁজে পায় সেটা। অন্যরা যখন গাছাড়াভাবে ঘোরাফেরা করতো, সে তখন তার চার ইন্দ্রিয় দিয়ে খুব আলগোছে তাদের লক্ষ্য করে যেতো যাতে কেউই ব্যাপারটা ধরতে না পারে। কিছুদিন পরে সে আবিষ্কার করে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই প্রতিদিন একই পথ দিয়ে হাঁটে, একই কাজ করে, আর ঠিক একই সময় প্রায় ঠিক একই কথা বলে, নিজের অজান্তেই। যখনই তারা তাদের এই সতর্ক রুটিন ভেঙেছে কেবল তখনই কোনো কিছু হারাবার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে তারা। কাজেই সে যখন শোনে বিয়ের আংটি হারিয়ে ফারনান্দা একেবারে ভেঙে পড়েছে, উরসুলার মনে পড়ে যায় ফারনান্দা সেদিন রুটিনের বাইরে একমাত্র যে-কাজটা করেছিল তা হচ্ছে বিছানা রোদে শুকাতে দেয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ মেম্ সেটায় একটা ছারপোকা পেয়েছিল। বাষ্প দিয়ে পোকামাকড় দূর করার সময় যেহেতু বাচ্চারাও উপস্থিত ছিল, উরসুলা অনুমান করে, ফারনান্দা নিশ্চয়ই আংটিটা এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে ওরা জিনিসটার নাগাল পাবে না, আর সে-রকম জায়গা হলো সেই তাকটা। অন্যদিকে ফারনান্দা বৃথাই ওটা খুঁজে মরেছে তার দৈনন্দিন চলার পথে, একথাটা না জেনেই যে রোজকার অভ্যেসই হারানো জিনিসের অনুসন্ধানে বাদ সাধে, আর সেকারণেই সেগুলো খুঁজে পাওয়া এতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

হোসে আর্কাদিওর লালন-পালনের কাজই বাড়ির সামান্যতম পরিবর্তনগুলো সম্পর্কেও সচেতন থাকার প্রাণান্তকর কাজে সাহায্য করে উরসুলাকে। সে যখন বুঝতে পারে শোবার ঘরে আমারান্তা সন্তদের মূর্তিগুলোয় কাপড়চোপড় পরাচ্ছে, উরসুলা ছেলেটাকে রঙের বিভিন্নতা শেখানোর ভান করে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা বল্ দেখি, দেবদূতশ্রেষ্ঠ রাফায়েল কোন রঙের কাপড় পরে আছে?'

এভাবেই ছেলেটা তাকে সেইসব তথ্য জানিয়ে দেয় যা তার চোখ তাকে দিতে অক্ষম, আর হোসে আর্কাদিও সেমিনারিতে যাওয়ার অনেক আগেই সন্তদের কাপড়ের নানান রঙ উরসুলা বলে দিতে পারতো স্রেফ সেগুলোর বুনোন থেকেই। মাঝে মধ্যে অবশ্য দু'-একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটতো। একদিন বিকেলে বেগনিয়াশোভিত বারান্দায় আমারান্তা এমব্রয়ডারির কাজ করছে, এমন সময় উরসুলা তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। আমারান্তা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঈশ্বরের দোহাই, দেখে পথ চলো।'

উরসুলা বলে ওঠে, 'দোষটা তোরই, তোর যেখানে বসার কথা সেখানে বসিসনি তুই।'

উরসুলা নিশ্চিত সে ঠিকই বলেছে। কিন্তু সেদিনই সে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করে যা আগে কেউ কখনো খেয়াল করেনি, আর সেটা হলো, বর্ষপরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও খুব সূক্ষ্মভাবে তার অবস্থান বদলে ফেলে, আর যারা বারান্দায় বসে তাদেরকেও একটু একটু করে তাদের অবস্থান বদলে ফেলতে হয় নিজেদের অজান্তেই। সেই দিন থেকে আমারান্তা ঠিক কোথায় বসে আছে সেটা জানার জন্যে উরসুলাকে শুধু সেদিনের তারিখটা খেয়াল রাখতে হতো। যদিও তার হাতের কাঁপন আরো বেশি করে নজরে পড়ছিলো আর তার পায়ের ভরও ক্রমেই বাড়তি হয়ে উঠছিলো তার জন্যে, তারপরেও তার ছোট্ট শরীরটা একই সময়ে এতো বেশি জায়গায় আর কখনোই দেখা যায়নি। পুরো বাড়িটার দায়িত্ব যখন তার কাঁধে ছিল তখন যেমন পরিশ্রমী ছিল সে এখনোই প্রায় তাই আছে সে। তারপরেও, তার বার্ধক্যের সেই অভেদ্য নিঃসঙ্গতার মধ্যেও, পরিবারের একবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে সে এমনই এক দিব্যদৃষ্টি অর্জন করে যে পরিষ্কারভাবে সে এমন কিছু সত্য দেখতে পায় যা তার পুরনো আমলের ব্যস্ত দিনগুলো তাকে দেখতে দেয়নি। হোসে আর্কাদিওকে যখন ওরা সেমিনারিতে পাঠাবার জন্যে তৈরি করছে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরসুলা তখন মাকোন্দো পত্তনের পর থেকে এই বাড়িতে কাটানো জীবনের একটা বিস্তৃত সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে তার উত্তরসূরীদের সম্পর্কে তার আজীবনের ধারণা আমূল পাল্টে ফেলেছে। সে বুঝতে পেরেছে, যুদ্ধের কারণে মনটা পাষাণ হয়ে যাওয়ায় এই পরিবারের প্রতি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ভালোবাসা মরে যায়নি, যেমনটা সে আগে ভেবেছিল, বরং সে কাউকেই কোনোদিন ভালোবাসেনি, এমনকি তার বৌ রেমেদিওস বা তার জীবনে আসা অগুনতি এক-রাতের রমণীদেরও না, আর তার সন্তানদেরতো আরো কম। উরসুলা বুঝতে পারে, আদর্শের কারণে এতোগুলো যুদ্ধে লড়াই করেনি সে, যা কিনা সবাই ভেবে এসেছে, এমনকি সে যে একটা নিশ্চিত বিজয় পায়ে দলে গিয়েছিল সেটাও অবসাদের কারণে নয়, যা কিনা সবাই ভেবে এসেছে, বরং সে জিতেছে এবং হেরেছে ঠিক একই কারণে, নিখাদ আর পাপপূর্ণ এক অহংকারের কারণে। উরসুলা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোয় যে, যে-ছেলের জন্যে সে নিজের জীবনটা দিয়ে দিতে পারতো, সে এমন-ই একটা মানুষ যে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। ও যখন তার পেটে, তখন এক রাতে সে তাকে কাঁদতে শুনেছিল। সেটা এমন-ই পষ্ট একটা গোঙানির শব্দ যে তার পাশে শোয়া হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া জেগে উঠে এই ভেবে খুশি হয়েছিল যে তার ছেলে মায়াকণ্ঠের অধিকারী হতে যাচ্ছে। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সে এক পয়গম্বর হবে। ওদিকে উরসুলা কিন্তু চাপা সেই গোঙানিটাকে নিশ্চিতভাবেই ভয়ংকর সেই শুয়োরের লেজের প্রথম ইঙ্গিত মনে করে কেঁপে উঠে ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়েছিল বাচ্চাটা যেন পেটে থাকতেই মারা যায়। কিন্তু তার বুড়ো বয়েসের স্বচ্ছদৃষ্টির কল্যাণে সে বুঝতে পারে, আর সেকথা সে অনেককে বলেও বেড়ায় যে, মায়ের পেটে বাচ্চার কান্না মায়াকণ্ঠের অধিকারী হওয়ার বা পয়গম্বর হওয়ার ঘোষণা নয়, বরং ভালোবাসতে না পারার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। নিজের ছেলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ব্যাপারটি তার মনের মধ্যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার জন্যে যতো সহানুভূতি জমা ছিলো সেগুলো সব এক সঙ্গে এনে হাজির করে হঠাৎ করে। আর যার হৃদয়ের কাঠিন্যকে সে ভয় পেতো, যার পুঞ্জীভূত তিক্ততা তাকেও বিরূপ করে তুলেছিল, সেই আমারান্তা শেষ বিচারে হঠাৎ করেই সবচেয়ে দয়াবতী রমণী হিসেবে আবির্ভূত হয় তার কাছে, আর এক করুণাঘন স্বচ্ছতা নিয়ে সে বুঝে যায়, পিয়েত্রো ক্রেসপিকে সে যে অন্যায্য যন্ত্রণা দিয়েছে তা প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেয় নয়, যা কিনা সবাই ভেবেছিল, আবার কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস-এর জীবনটাকে সে যে ধীর আত্মদানের হতাশায় ভরিয়ে তুলেছিল সেটাও, সবাই যা ভেবেছিল, তার তিক্ততাভরা বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং এই দুটো কাজই ছিল অন্তহীন ভালোবাসা আর এক অমোচনীয় কাপুরুষতার মধ্যে এক প্রাণঘাতী সংঘর্ষ, আর আমারান্তা তার হৃদয় নিয়ে যে এক অযৌক্তিক ভয়ে ভীত ছিল সারাক্ষণ সেই ভয়টাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। এই সময়টাতেই রেবেকার নাম শোনা যেতে থাকে উরসুলার মুখে, বিলম্বিত অনুতাপ আর এক হঠাৎ সুদৃষ্টিতে মহীয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে ওঠা ভালোবাসার সঙ্গে মেয়েটির স্মৃতি মনে আসে তার, আর সে বুঝতে পারে যে একমাত্র সে-ই, রেবেকাই, যে কখনো তার বুকের দুধ খায়নি, বরং খেয়েছে জমির মাটি আর দেয়ালের চুন, যার শিরায় তার শিরার রক্ত কখনো প্রবাহিত হয়নি, বরং রয়েছে সেই অজ্ঞাতপরিচয় মানুষগুলোর অজানা রক্ত যাদের হাড়গোড় তাদের গোরের ভেতর আজো *খটর খটর* আওয়াজ করে যাচ্ছে, সেই রেবেকাই, অস্থির চিত্তের সেই মেয়েটিই, এক ভয়ংকর গর্ভের সেই মেয়েটিই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যার মধ্যে ছিল সেই অদম্য সাহস উরসুলা যা সবসময় কামনা করেছে নিজের বংশের জন্যে।

দেয়াল হাতড়ে এগোতে এগোতে সে বলবে, 'রেবেকা, কী অন্যায়টাই না আমরা করেছি তোর ওপর।' বাড়িতে সবাই ভেবেছে, বিশেষ করে যখন থেকে সে দেবদূতশ্রেষ্ঠ গেব্রিয়েলের মতো ডান হাতটা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে, তার মনটা বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ফারনান্দা অবশ্য বুঝে যায় যে সেই বিক্ষিপ্ত দশার আবছায়াতে দিব্যদৃষ্টির একটা সূর্য লুকিয়ে আছে, কারণ কোনোরকম ইতস্তত না করেই উরসুলা বলে দিতে পারতো গত বছর বাড়িতে কত টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে। আমারান্তারও ঠিক একই ধারণা হয় যখন তার মা রান্নাঘরে একপাত্র স্যুপ নাড়তে নাড়তে, তার কথা যে ওরা শুনছে সেকথা না জেনেই, হঠাৎ করে বলে ওঠে যে, প্রথম-আসা জিপসিদের কাছ থেকে কেনা শস্য-পেষাইয়ের যন্ত্রটা—যেটা হোসে আর্কাদিও পঁয়ষট্টিবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার আগে হারিয়ে গিয়েছিল—সেটা এখনো পিলার তারনেরার বাড়িতেই আছে। উরসুলার কথা যে ঠিক তাতে কিন্তু পিলার তারনেরা অবাক হয় না, তার কারণ তার নিজের অভিজ্ঞতাই তাকে একথা জানাতে শুরু করেছে যে একটা হুঁশিয়ার বৃদ্ধ-বয়স তাসের চেয়েও শানানো হতে পারে; পিলার তারনেরার বয়সও প্রায় একশো বছর এখন, কিন্তু বেয়াড়া রকমের পৃথুলা হওয়ার পরেও এখনো শক্তসমর্থ আর চটপটে রয়েছে সে, যদিও তার এই অস্বাভাবিক স্থূলত্ব দেখে বাচ্চকাচ্চারা তাকে ঠিক সে-রকমই ভয় পায়, তার হাসির শব্দে ঘুঘুগুলো আগে যে-রকম ভয় পেতো।

তারপরেও, উরসুলা যখন বুঝতে পারে, হোসে আর্কাদিওর বৃত্তিটিকে সুদৃঢ় করে যাবার মতো সময় তার হাতে নেই, আতংকে অস্থির হয়ে ওঠে সে। স্বজ্ঞা তাকে যেসব জিনিস দেখার অনুমতি দিয়েছে সেসব জিনিস চোখে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল-ভাল করতে শুরু করে সে। একদিন সকালে গোলাপজল ভেবে ছেলেটার মাথায় দোয়াতের কালি ঢেলে দেয়। প্রত্যেকটা ব্যাপারে নাছোড়বান্দার মতো নাক গলাতে গিয়ে তাকে এতোবার হোঁচট খেতে হয় যে দমকে দমকে মনমেজাজ বিগড়ে গুম হয়ে থাকে সে, তবে যে-ছায়াগুলো মাকড়সারজালের আঁটোসাঁটো জামা হয়ে তার হাতদুটোকে বেঁধে ফেলতে শুরু করেছে সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা সে ঠিকই চালিয়ে যায়। তখনই তার মনে হয় তার এই জবুথবু দশাটা জরা আর অন্ধকারের প্রথম বিজয় নয়, বরং সময়ের দেয়া একটা শাস্তি। সে ভাবে, আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার-স্যাপারগুলো অন্যরকম ছিল, তুর্কীরা এক গজ কাপড় মাপতে গিয়ে যেসব জারিজুরি খাটায় ঈশ্বর তখন মাস আর বছর নিয়ে সে-রকমটি করতেন না। তার মনে হয়, বাচ্চারা এখন যে শুধু আরো তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তাই-ই না, বরং তাদের অনুভূতিগুলোও গড়ে ওঠে ভিন্নভাবে। সুন্দরী রেমেদিওস সশরীর সআত্মা স্বর্গে উঠে যেতে না যেতেই অবিবেচক ফারনান্দা তার চাদরগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে আপনমনে বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াতো। অরেলিয়ানোদের লাশগুলো কবরে ঠাণ্ডা হতে পেরেছে কি পারেনি, অরেলিয়ানো সেগান্দো বাড়িতে ফের আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে, মাতালের দল সেখানে অ্যাকোর্ডিয়ান বাজায়, শ্যাম্পেনে ভেজায় নিজেদের, যেন খ্রিস্টান নয় মারা গেছে কয়েকটা কুকুর, যেন এটাই নিয়তির লিখন যে, যে-পাগলের আখড়াটার কারণে উরসুলাকে এতো মাথাব্যথা সইতে হয়েছে আর এতো মিছরির জীবজন্তু খরচা করতে হয়েছে সেটা একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। হোসে আর্কাদিওর তোরঙ্গটা গোছাতে গোছাতে সেসব কথা মনে করে উরসুলা ভাবে সে যদি জন্মের মতো কবরে গিয়ে শুয়ে পড়তো আর ওরা তাকে মাটিচাপা দিতো তাহলেই বুঝি ভালো হতো, আর, ভয়ডরের কোনো তোয়াক্কা না করেই সে ঈশ্বরকে শুধোয় এতোসব সমস্যা আর যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে মানুষকে লোহা দিয়ে বানান হয়েছে বলে তিনি সত্যি-ই মনে করেন কিনা; এসব প্রশ্ন বার বার করে সে তার নিজের সন্দেহগুলোকেই খুঁচিয়ে তুলতে থাকে, দুর্দমনীয় ইচ্ছে জাগে তার ভিনদেশীর মতো ছুটোছুটি করে বেড়াতে আর নিজেকে শেষতক একবার অন্তত বিদ্রোহ করার সুযোগ দিতে—যে-সুযোগ সে বহুবার কামনা করেছে, আবার অনেকবারই মুলতুবি রেখেছে—নিজের অসহায়ত্ব ঝেড়ে ফেলে শেষবারের মতো সবকিছুর ওপর থুথু ছিটিয়ে দিতে আর এক শতাব্দীর বাধ্যতা তাকে গালিগালাজের যে অশেষ ভাণ্ডারটাকে গিলে ফেলতে বাধ্য করেছে সেটাকে মনের ভেতর থেকে বের করে আনতে।

সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যত্তসব!'

তোরঙ্গের মধ্যে কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতে যাচ্ছিল আমারান্তা, সে ভাবে কাঁকড়াবিছে কামড়েছে বুঝি উরসুলাকে।

আঁতকে উঠে সে জানতে চায়, 'কোথায় ওটা?'

'কী?'

'পোকাটা!'

নিজের বুকে একটা আঙুল রাখে উরসুলা।

বলে, 'এখানে।'

বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোর সময় সেমিনারির উদ্দেশে রওনা হয়ে যায় হোসে আর্কাদিও। তাকে বিদায় জানাবার দৃশ্যটা কখনো ভুলতে পারবে না উরসুলা; তামার বোতামঅলা সবুজ করডুয়ারী স্যুট আর মাড় দেয়া টাই পরা অবস্থায় গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকা রোগাপাতলা গম্ভীর ছেলেটা উরসুলার দেয়া শিক্ষা মেনে এক ফোঁটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের জলও ফেলে না। খাবার ঘরটা গোলাপজলের ঘ্রাণে ভরে রেখে যায় হোসে আর্কাদিও, ঘরময় তার পেছন পেছন যেতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্যে উরসুলাই ওর মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিল জিনিসটা। দুপুরে, বিদায়ী ভোজের সময়, উৎসবের আমেজে নিজেদের অস্বস্তিবোধটা আড়াল করে রাখে পরিবারের সদস্যরা, আর ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের মন্তব্যটা নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের মাতামাতি করে তারা। কিন্তু মখমলে মোড়া, আর কোনায় কোনায় রুপোর পাত লাগানো তোরঙ্গটা যখন ওরা বের করে আনে তখন মনে হয় যেন বাড়ি থেকে কোনো কফিন বের হলো। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াই একমাত্র লোক যে এই বিদায়পর্বে অংশ নেয় না।

সে বিড়বিড়িয়ে বলে, 'ওটাই কেবল দরকার আমাদের। একজন পোপ।'

তিন মাস পরে অরেলিয়ানো সেগান্দো আর ফারনান্দা মেম্‌কে স্কুলে নিয়ে যায়, তারপর ফিরে আসে একটা ক্ল্যাভিকর্ড নিয়ে; পিয়ানোলার জায়গা দখল করে সেটা। এই সময় নাগাদই আমারান্তা নিজের কাফনের কাপড় সেলাই করতে শুরু করে। কলা নিয়ে মাতামাতির জ্বরটা এরিমধ্যে থিতিয়ে এসেছিল। চারপাশে নতুন নতুন সব লোকজন আবিষ্কার করে মাকোন্দোর পুরনো বাসিন্দারা, সাবেক কালের অনিশ্চিত সম্পদগুলোই কাজে লাগাবার জোর চেষ্টা চালিয়ে যায় তারা, কিন্তু তারপরেও, একটা জাহাজডুবি থেকে বেঁচে যাওয়ার সন্তুষ্টির ভাব কাজ করে তাদের মধ্যে। বাড়িতে তখনো দুপুরের খাওয়ার অতিথির কমতি নেই, তাছাড়া বছর কয়েক পরে কলা কম্পানি উঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পুরনো রুটিনটা আর চালু করা যায়নি। তারপরেও, আতিথেয়তার সনাতন পর্যায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, কারণ সে-সময় ফারনান্দাই তার নিয়মকানুন চাপিয়ে দিয়েছিল। হালে উরসুলা ছায়ান্ধকারে ঠাঁই নেয়ায়, আর আমারান্তা তার কাফনের কাপড় তৈরিতে ব্যস্ত থাকায়, সাবেক শিক্ষানবিস রানী অতিথি বেছে নেয়া আর তাদের ওপর তার বাবা-মার শেখানো কঠোর কেতাকানুন আরোপ করার স্বাধীনতা পেয়ে যায়। যে-শহরে বাইরের লোকজন তাদের অনায়াসে-কামানো পয়সা ওড়ানোর অশ্লীল কাজকর্ম করে তুলকালাম বাঁধিয়ে দিয়েছে, সেখানে ফারনান্দার এইসব কঠোরতা বাড়িটাকে পুরনো রীতি-নীতির একটার দুর্গে পরিণত করে। কলা কম্পানির সঙ্গে যার কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই, সে-ই তার কাছে ভালো লোক, অন্য কোনো প্রশ্ন অবান্তর। এমনকি তার দেবর হোসে আর্কাদিও সেগান্দো পর্যন্ত তার পক্ষপাতমূলক ঈর্ষার শিকার হয়, কারণ উত্তেজনায় ভরা গোড়ার দিনগুলোতে সে তার সেই বিশাল বিশাল মোরগ ফের ছেড়ে দিয়ে কলা কম্পানিতে ফোরম্যানের চাকরি নিয়েছিল।

ফারনান্দা ঘোষণা করে দেয়, 'ভিনদেশীগুলোর চুলকানি যদ্দিন ওর গা থেকে না যাচ্ছে তদ্দিন এ-বাড়িতে আর ঢোকা হচ্ছে না ওর।'

বাড়িতে এমন-ই কড়াকড়ি শুরু হয় যে পেত্রা কোতেসের বাড়িতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে অরেলিয়ানো সেগান্দো। প্রথমে বৌ-এর কাজের চাপ কমানোর অছিলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পার্টিগুলো ও-বাড়িতে সরিয়ে নেয় সে। তারপর, তার পশুগুলোর উর্বরতা কমে যাচ্ছে এই অজুহাতে সরিয়ে ফেলে সে গোলাঘর আর আস্তাবল। শেষে, তার রক্ষিতার ঘরটা বেশি ঠাণ্ডা এই দোহাই দিয়ে সেই ছোট্ট ঘরটাও সরিয়ে নেয় যে-ঘরে সে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ দেখাশোনা করতো। ফারনান্দা যখন বুঝতে পারে স্বামী থাকতেও সে বিধবা, তখন আর সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরে আসার কোনো উপায় থাকে না। বাড়িতে অরেলিয়ানো সেগান্দো খেতো না বললেই চলে, আর যেসব কারণে তার দেখা মিলতো, এই যেমন বৌ-এর সঙ্গে শোবার জন্যে, তাতে কারো সন্দেহ দূর হতো না। একদিন, বেখেয়ালে, পেত্রা কোতেসের বিছানাতেই রাত ভোর হয়ে যায় তার। ফারনান্দা বিন্দুমাত্র বকাঝকা করে না তাকে, বা মনোকষ্টের সামান্যতম দীর্ঘশ্বাসও পড়ে না তার বুক থেকে। বরং, যা কিনা আশাই করা যায়নি, সেই দিনই দুটো তোরঙ্গে স্বামীর জামাকাপড় ভরে তার রক্ষিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সে, একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে, আর, বেপথু স্বামী তার লজ্জাটা সইতে না পেরে মাথা নিচু করে খোঁয়াড়ে ফিরে আসবে এই ভেবে রাস্তার একবারে মধ্যেখান দিয়ে যেন ওগুলো নিয়ে যাওয়া হয় একথাও বলে দেয় সে লোকগুলোকে। কিন্তু, শুধু তার স্বামীর চরিত্রই নয়, যে-সমাজের সঙ্গে তার বাপ-মায়ের সমাজের কোনো মিল নেই সেই সমাজের চরিত্র সম্পর্কেও যে ফারনান্দা কী ভীষণ অজ্ঞ সেটাই প্রমাণ করে দেয় তার এই বীরোচিত কাজটা। কারণ যারাই ঐ তোরঙ্গ দুটো নিয়ে যেতে দেখে তারাই বলে এ হচ্ছে এমনই এক কাহিনীর চূড়ান্ত পর্ব যে-কাহিনীর নাড়ি-নক্ষত্র কারোরই জানতে বাকি নেই, আর অরেলিয়ানো সেগান্দো তার এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তি উদযাপন করে তিনদিন ধরে চলা একটা পার্টি দিয়ে। তার বৌ যখন বিষণ্নদর্শন লম্বা লম্বা কাপড়, সাবেক আমলের পদক আর তার সেকেলে গর্ব নিয়ে ক্রমশ একটা পরিণত দশায় পৌঁছুচ্ছে, তখন তাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে প্রাকৃতিক রেশমের জাঁকালো পোশাক-আশাকে নিজেকে সাজিয়ে, বাঘের মতো ডোরাকাটা চোখে প্রতিশোধ চরিতার্থের দীপ্তি মাখিয়ে রক্ষিতাটি তার দ্বিতীয় যৌবন নিয়ে ফেটে পড়েছে। বয়োসন্ধির ক্রোধ নিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো নিজেকে আবার তার হাতে সঁপে দেয়, সেই আগের মতো, যখন পেত্রা কোতেস তাকে তার কারণে ভালোবাসেনি, বেসেছিল এই কারণে যে তাকে তার যমজ ভাই-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল সে, আর যখন সে একই সময় দু'জনের সঙ্গে শুয়ে ভাবতো ঈশ্বর তাকে দু'জনের মতো সহবাস করতে পারে এমন এক লোক পাওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী করেছে। ফিরে আসা কামনাটা এমনই তীব্র ছিল যে অনেকবারই এমন ঘটেছে যে খেতে বসার প্রস্তুতি নিতে নিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই কেউ কোনো কথা না বলে যার যার প্লেট ঢেকে রেখে খিদে আর কামের তাড়নায় জেরবার হয়ে ঢুকে পড়েছে শোবার ঘরে। যখন সে গোপনে ফরাসী রমণীদের কাছে যেতো তখন দেখে আসা বিছানা থেকে প্রেরণা পেয়ে পরম যাজকীয় চাঁদোয়াসহ একটা বিছানা কিনে আনে অরেলিয়ানো সেগান্দো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানলায় মখমলের পর্দা লাগায়, শোবার ঘরের দেয়াল আর সিলিং ঢেকে দেয় বড় বড় রক-ক্রিস্টালের আয়না দিয়ে। প্রতিদিন বেলা এগারোটায় এসে পৌঁছনো ট্রেন থেকে কেসের পর কেস শ্যাম্পেন আর ব্র্যান্ডি নামাতো সে। স্টেশন থেকে ফেরার সময় পথের যতো স্থানীয়-অস্থানীয়, চেনা, এখনো চেনা বাকি, ইতর-বিশেষ, নির্বিশেষে সবার সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যেতো সে উপস্থিতমতো তৈরি করা *কম্বিয়াম্বা*-টা। এমনকি, পিচ্ছিল চরিত্রের মি. ব্রাউন, যে-কিনা একটা অদ্ভুত ভাষা ছাড়া কথা বলে না, সে-ও অরেলিয়ানো সেগান্দোর করা আকার-ইঙ্গিতে নিজেকে অনায়াসে প্রলুব্ধ হতে দিতো, আর মদ খেয়ে বেদম মাতাল হয়ে আকছার পড়ে থাকতো পেত্রা কোতেসের বাড়ি। এমনকি তার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী ভয়ংকর জার্মান শেফার্ডগুলোকে পর্যন্ত সে অ্যাকোর্ডিয়ানের সুরে সুরে কোনোরকমে বিড়বিড়িয়ে যাওয়া টেক্সাস সঙ্গীতের তালে তালে নাচতে বাধ্য করতো।

পার্টি যখন তুঙ্গ দশা উঠতো, অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন চেঁচিয়ে বলে উঠতো, 'ক্ষান্ত দাও, গরুর দল। ক্ষান্ত দাও, কারণ জীবন ক্ষণিকের।'

এতো ভালো তাকে আর কখনো দেখা যায়নি, এতো ভালোও তাকে বাসেনি কেউ আগে, তার পশুগুলোও এমন সৃষ্টিছাড়াভাবে বিয়োয়নি কখনো। অন্তহীন সেই পার্টিগুলোর জন্যে এতো সব গরু, শুয়োর আর মুরগির বাচ্চা জবাই করা হয় যে রক্তে রক্তে কালো আর কাদা কাদা হয়ে ওঠে উঠোনটা। হাড়গোড় আর নাড়িভুঁড়ির এক সার্বক্ষণিক বধ্যভূমি এই উঠোনটা, উচ্ছিষ্টের একটা ভাগাড়, সারাক্ষণই সেখানে ডিনামাইট ফাটাতে হয় যাতে শিকারী পাখিগুলো অতিথিদের চোখগুলো খুবলে না নেয়। পৃথিবী ঢুঁড়ে ফিরে আসার সময় হোসে আর্কাদিওর যে-রকম খিদে পেয়েছিল, কেবল তার সঙ্গে তুলনীয় এক খিদের কারণে মাংস লাগে অরেলিয়ানো সেগান্দোর গায়ে-গতরে, রঙটা হয়ে ওঠে লাল টকটকে, আর আকৃতিটা কচ্ছপের মতো। তার এই সৃষ্টিছাড়া খিদে, দেদার খরচ করার ক্ষমতা, আর অদৃষ্টপূর্ব মেহমানদারীর খ্যাতি পৌঁছে যায় জলার ওধারেও, গোটা উপকূল থেকে টেনে নিয়ে আসে সেরা সেরা সব খাদককে। পেত্রা কোতেসের বাড়িতে আয়োজন করা ভোজন আর সক্ষমতার সৃষ্টিছাড়া সব প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে দুর্দান্ত সব খাদক এসে জড়ো হয় সবখান থেকে। এদের মধ্যে সে-ই ছিল অজেয় খাদক, যদ্দিন পর্যন্ত না এক অশুভ শনিবারে এসে হাজির হয় গোটা এলাকায় হস্তিনী নামে বিখ্যাত এক টোটেমিক রমণী কামিলা সাগাস্তুম। মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত চলে সেই দ্বৈরথ। কাসাভা, ইয়াম, আর ভাজা কলা সহযোগে তিতিরের মাংস, সেই সঙ্গে দেড় কেস শ্যাম্পেনের এক ডিনার পেটে চালান করে দিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো নিশ্চিত হয়ে যায় জিত তারই হবে। তাকেই বেশি উৎসাহী আর প্রাণশক্তিসম্পন্ন বলে মনে হয় তার শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে, যার কায়দা-কানুন নিশ্চিতভাবেই আরো বেশি পেশাদারী, যদিও ঘরভর্তি দর্শকদের জন্যে ঠিক ততটাই হতাশাব্যঞ্জক। জেতার চিন্তায় হুঁশ হারিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন বড় বড় গ্রাসে খেয়ে চলেছে, হস্তিনী তখন শৈল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসকের নৈপুণ্যে মাংস ছিঁড়ে, ধীরে সুস্থে, এমনকি খানিকটা ফূর্তি নিয়ে গলাধঃকরণ করতে থাকে খাবারগুলো। রমণীটি বিশালদেহী: শক্তপোক্ত গড়ন, কিন্তু তার বিপুলায়তন ছাড়িয়ে ফুটে উঠেছে নারীত্বের এক কমনীয়তা, আর তার মুখটা এতো সুন্দর, হাত দুটো এতো চমৎকার ও সযত্নচর্চিত আর তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ এমনই অপ্রতিরোধ্য যে অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিচু গলায় মন্তব্য করেছিল, দ্বৈরথটা টেবিলের বদলে বিছানায় হলেই ভালো লাগতো তার। পরে যখন সে দেখে রমণীটি ভোজসভার কেতাকানুন একটাও না ভেঙে বাছুরের মাংসের একটা পাশ খেয়ে নেয়, তখন সে আন্তরিকভাবেই বলে ওঠে যে এই রুচিবান, আকর্ষণীয় আর প্রবল খিদের অধিকারিণী হস্তিনী এক দিক থেকে এক আদর্শ রমণী। কথাটা সে ভুল বলেনি। হস্তিনী নামে বিখ্যাত হওয়ার আগে হাড়খেকো বলে তার যে খ্যাতি ছিল সেটার কোনো ভিত্তি ছিল না। রমণীটি আসলে গরু-খেকো না, গ্রীক সার্কাসের কোনো শশ্রুধারিণীও না, যদিও অরেলিয়ানো সেগান্দোকে সেকথাই বলা হয়েছিল। রমণীটি আসলে এক কণ্ঠশীলন স্কুলের কর্ণধার। ভোজনবিদ্যাটি সে যখন রপ্ত করেছে ততদিনে সে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মা বনে গেছে, আর তার নিজের সন্তানেরা কী করে আরো ভালো খেতে পারবে—কৃত্রিম উদ্দীপকের সাহায্যে নয়, বরং তাদের আত্মার পরম প্রশান্ত দশার সাহায্যে—তারই উপায় খোঁজ করছে। তার তত্ত্বটার সারকথা হল, যে-লোকের সব ধরনের নীতিবোধ নিখুঁত অবস্থায় রয়েছে সে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়ে যেতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অবসন্নতা তাকে কাবু করে ফেলছে। নীতিবোধহীন এক খাদক হিসেবে দেশজুড়ে পরিচিত লোকটার সঙ্গে সে যে এক হাত লড়তে চলে আসে তার স্কুল ছেড়ে এর জন্যে অবশ্য নৈতিক কারণ আর খেলোয়াড়ি উৎসাহটাই ছিল প্রধান। অরেলিয়ানো সেগান্দোকে দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল লোকটার কেবল পেটটাই নষ্ট হবে না, সে তার চরিত্রটাও খোয়াবে। প্রথম রাতের শেষে হস্তিনী যখন ধুমসে খেয়ে চলেছে, অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন বিস্তর বকে আর হাসি-তামাশায় নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে নেয় ওরা। ঘুম থেকে উঠে ওরা দু'জনই সাবড়ে দেয় চল্লিশটা কমলার রস, আট কোয়ার্ট কফি আর তিরিশটা কাঁচা ডিম। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা, বেশ কয়েক ঘণ্টার নির্ঘুম দশা পার করে আর দুটো শুয়োর এক ছড়া কলা আর চার কেস শ্যাম্পেন-এর সদ্ব্যবহারের পর হস্তিনীর সন্দেহ হয় অরেলিয়ানো সেগান্দো বুঝি না জেনেই, তবে চরম দায়িত্বহীনতার একটা উদ্ভট উপায়ে, তার পদ্ধতিটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। কাজেই, লোকটা নিশ্চয়ই সে যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। আসলে কিন্তু পেত্রা কোতেস যখন টেবিলে তিতিরপাখির দুটো রোস্ট নিয়ে আসে অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন একেবারে ভরপেট অবস্থা থেকে মাত্র এক পা দূরে।

হস্তিনী তাকে বলে, 'না পারলে আর খেয়ো না। ধরে নিলাম আমরা দু'জনেই জিতেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে সে আর এক গ্রাসও মুখে তুলতে পারবে না বুঝতে পেরে আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেবার অনুশোচনায় কথাটা সে মন থেকেই বলে। কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দো সেটাকে আরেকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে তার অবিশ্বাস্য ক্ষমতারও বাইরে গিয়ে তিতির পাখির রোস্টটাও চালান করে দেয় পেটে। তারপরই বেহুঁশ হয়ে পড়ে সে। হাড়ে ভরা প্লেটটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে সে, ফেনা বেরোতে থাকে তার মুখ দিয়ে, ডুবে যেতে থাকে যন্ত্রণাভরা কাতরানিতে। অন্ধকারের ভেতর তার মনে হয়, ওরা তাকে একটা গম্বুজের চূড়া থেকে তলহীন একটা কূপের ভেতর ফেলে দিচ্ছে, আর চেতনার শেষ ঝলকের ভেতর সে বুঝতে পারে অন্তহীন সেই পতনের শেষ প্রান্তে মৃত্যু তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কোনোরকমে শুধু এটুকু বলতে পারে সে, 'আমাকে ফারনান্দার কাছে নিয়ে যাও।'

বন্ধুরা তাকে এই সান্ত্বনা নিয়ে বাড়িতে রেখে যায় যে রক্ষিতার বিছানায় মরবে না বলে বৌ-এর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সাহায্য করেছে তারা অরেলিয়ানো সেগান্দোকে। পাকা চামড়ার যে-বুটজোড়া সে কফিনে পরতে চেয়েছিল সেগুলো পালিশ করে রাখে পেত্রা কোতেস, সে এমনকি সেগুলো পৌছে দেবার জন্যে একটা লোকও খুঁজতে থাকে, আর এমন সময় ওরা এসে তাকে জানিয়ে যায় অরেলিয়ানো সেগান্দোর বিপদ কেটে গেছে। সত্যি সত্যিই সেরে ওঠে সে, হপ্তাখানেকের আগেই, আর তার দুই হপ্তা পর তাকে দেখা যায় ঘটনাটা উদযাপন করছে সে অদৃষ্টপূর্ব এক উৎসবের মধ্যে দিয়ে। ফের পেত্রা কোতেসের বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করে সে, যদিও প্রতিদিনই বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসে ফারনান্দার সঙ্গে, মাঝে মাঝে পরিবারের সবার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে থেকেও যায়, ভাবখানা যেন নিয়তির ফেরে অবস্থাটা উল্টে গিয়ে সে হয়ে গেছে তার রক্ষিতার স্বামী আর তার স্ত্রীর প্রেমিক।

ফারনান্দার একটা অবসর জোটে। তার একাকীত্বের একঘেয়েমীর মধ্যে সিয়েস্তার সময় ক্ল্যাভিকর্ড শেখার সময়টা আর তার ছেলেমেয়েদের চিঠিটাই ব্যতিক্রম। দুই হপ্তা পর পর ওদেরকে সে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, যদিও তাতে সত্যি কথা থাকেনা এক রত্তিও। নিজের সমস্যার কথা সে গোপন রাখে ওদের কাছে কাছে। বেগনিয়াগুলোর ওপর এসে পড়া আলো সত্ত্বেও, রাস্তা থেকে ভেতরে আসা আনন্দ উৎসবের ঢেউ সত্ত্বেও যে-বাড়িটা ধীরে ধীরে তার বাবা-মা'র উপনিবেশিক প্রাসাদটার মতো হয়ে পড়ছে, সেই বাড়িটার বিষণ্ণতা ওদের কাছে সে গোপন করে যায়। তিন জ্যান্ত ভূত আর হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মরা ভূতের সান্নিধ্যের ভেতর উথাল পাথাল ভেবে চলে ফারনান্দা, আর সে যখন ক্ল্যাভিকর্ড বাজায়, মাঝে মাঝে তখন হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার ভূত বৈঠকখানার আধো আলোতে কৌতূহলী মনোযোগ নিয়ে এসে বসে থাকে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া এখন একটা ছায়া মাত্র। কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসকে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাহীন একটা যুদ্ধের প্রস্তাব দিতে শেষবারের মতো রাস্তায় বেরোনোর পর থেকে শুধু চেস্টনাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছটার নিচে পেশাব করার জন্যেই বাইরে আসে সে। তিন হপ্তা অন্তর নাপিত আসে, এছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না সে। দিনে একবার উরসুলা তাকে যা এনে দেয় তাই খেয়ে নেয়, আর যদিও সে আগের মতোই প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে ছোট ছোট সোনার মাছ তৈরি করে যায়, কিন্তু যেদিন সে আবিষ্কার করে লোকজন এখন আর অলংকার হিসেবে সেগুলো কেনে না, কেনে ঐতিহাসিক স্মারক বস্তু হিসেবে, তখন থেকেই ওগুলো বিক্রি করা বন্ধ করে দেয় সে। রেমেদিওসের পুতুলগুলো, বিয়ের পর থেকেই যেগুলো ওদের শোবার ঘরে শোভা বর্ধন করছিল, একদিন সেগুলোর বহ্ন্যুৎসব করে সে উঠোনের মধ্যে। ছেলে কী করছে সেটা সদা-সতর্ক উরসুলা টের পেলেও সে তাকে থামাতে পারে না।

শুধু বলে, 'তোর মনটা পাষাণের তৈরি রে।'

কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বলে, 'ব্যাপারটা মনের নয়, ঘরটা দেয়ালী পোকায় ভরে উঠেছে।'

আমারান্তা তার কাফনের কাপড় বুনে চলেছে। কেন যে সে মেম্‌কে চিঠি দেয়, এমনকি উপহারও পাঠায়, অথচ অন্যদিকে হোসে আর্কাদিওর নামটা পর্যন্ত শুনতে চায় না সেকথা ফারনান্দা বুঝতে পারে না। উরসুলার মাধ্যমে প্রশ্নটা তাকে করা হলে সে জবাব দেয়, 'মরার আগেও কথাটা জানতে পারবে না ওরা।' তার এই উত্তরটা ফারনান্দার মনের ভেতর এমন একটা রহস্যের জন্ম দেয় যার জট সে আর কখনোই খুলতে পারে না। লম্বা, চওড়া কাঁধ, অহংকারী, সব সময় যথেষ্ট সংখ্যক পেটিকোট পরে থাকা, সেই সঙ্গে সময় ও মন্দস্মৃতিগুলো ঠেকিয়ে রাখার মতো এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত আমারান্তাকে দেখলে মনে হয় সে বুঝি তার কপালে কুমারীত্বের ছাইদাগা ক্রুশ বহন করে চলেছে। আসলে সেটা সে ধারণ করে আছে তার হাতের কালো পট্টিতে, যেটা সে ঘুমোতে যাবার সময়েও খোলে না, নিজেই ধোয়, নিজেই ইস্তিরি করে। নিজের কাফনের কাপড় বুনে বুনেই তার জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কথাটা হয়ত এভাবেও বলা যেতে পারে যে, কাপড়টা সে দিনে বোনে আর রাতে খুলে ফেলে, আর এভাবে সে যে তার নিঃসঙ্গতাকে পরাজিত করতে চায় তা নয়, উল্টো বরং সেটাকে সে প্রতিপালন করতে চায়।

নিঃসঙ্গতার বছরগুলোয় যে-ব্যাপারটা ফারনান্দার সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল মেম্‌ প্রথমবারের মতো তার ছুটি কাটাতে এসে অরেলিয়ানো সেগান্দোকে বাড়িতে দেখতে পাবে না। অরেলিয়ানো সেগান্দোর পেটফাঁপড়ের কারণে সে ভয় আর থাকে না। মেম্‌ বাড়িতে আসতে আসতে তার বাবা-মা এই চুক্তিতে পৌঁছোয় যে, অরেলিয়ানো সেগান্দো যে আগের মতোই ছা-পোষা স্বামী রয়ে গেছে মেয়েটাকে কেবল এই ধারণা দিলেই চলবে না, বাড়ির বিষণ্ণতাও তার কাছে ধরা পড়তে দেয়া যাবে না। প্রতি বছর দুই মাসের জন্যে অরেলিয়ানো সেগান্দো আদর্শ এক স্বামীর ভূমিকা পালন করে, আয়োজন করে আইসক্রীম আর বিস্কিটসহ নানান পার্টির, আর সেই উচ্ছল ও প্রাণবন্ত স্কুলপড়ুয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা সেগুলোকে আরো আনন্দময় করে তোলে ক্ল্যাভিকর্ডটার সাহায্যে। তখন থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে উত্তরাধিকারসূত্রে সে তার মায়ের চরিত্রের খুব সামান্যই পেয়েছে। তাকে আমারান্তার দ্বিতীয় সংস্করণ বলেই মনে হতো আরো বেশি, সেই সময়ের আমারান্তা যখন তার মধ্যে তিক্ততার জন্ম হয়নি, যখন সে বারো-চোদ্দ বছর বয়সে তার নৃত্যপর পায়ের শব্দে জাগিয়ে তুলছিল গোটা বাড়িটাকে, পিয়েত্রো ক্রেসপির জন্যে তার গোপন আবেগ শেষ পর্যন্ত তার মনের গতিপথটাকে পাল্টে দেয়ার আগে। কিন্তু আমারান্তার মতো, বা অন্য সবার মতো, মেম্‌কে দেখে তখনো পরিবারটির নিঃসঙ্গতার নিয়তির কথা বোঝা যেতো না, মনে হতো সে যেন গোটা দুনিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌছেছে, এমনকি সে যখন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে দুপুর দুটোর সময় বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ক্ল্যাভিকর্ড বাজানো অনুশীলন করতো তখনো। পরিষ্কার বোঝা যায়, বাড়িটাকে সে পছন্দ করে, তার আগমনে কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাই নিয়ে গোটা বছর স্বপ্নে বিভোর থাকে সে, আর তার বাবার হৈ-হট্টগোলে স্বভাব আর আতিথ্যের বাড়াবাড়ি থেকে সে খুব একটা পিছিয়ে নেই। সেই ভয়াবহ উত্তরাধিকারের প্রথম নিদর্শনটা পাওয়া যায় তার তৃতীয় ছুটির সময়, যখন কোনোরকম আগাম খবর না দিয়ে, মেম্‌ তার নিজের উদ্যোগেই চারজন সন্ন্যাসিনী আর আটষট্টি জন সহপাঠী নিয়ে হাজির হয় বাড়িতে। ফারনান্দা কপাল চাপড়ে বলে ওঠে, 'কী সব্বোনাশ! এ-মেয়েতো দেখছি এর বাপের মতোই অসভ্য, বর্বর।'

অতঃপর পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে বিছানা-বালিশ আর দোলখাটিয়া ধার করে আনতে হয়, নয়টা শিফট বসাতে হয় টেবিলে, গোসলের জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হয়, আর পুরুষালি বোতাম লাগানো নীল য়্যুনিফর্ম পরা স্কুল পড়ুয়া মেয়েগুলোকে যাতে সারাক্ষণই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়ে বেড়াতে না হয় সেজন্যে ধার করতে হয় চল্লিশটা টুল। কিন্তু ওদের এই বেড়ানোটা যে-কারণে বরবাদ হয়ে যায় তা হল সারাক্ষণই হৈ চৈ করতে থাকা এই মেয়েগুলোর সবার সকালের নাস্তা খাওয়ার পাট চুকতে না চুকতেই তাদেরকে দুপুরের খাওয়ার জন্যে তারপর আবার রাতের খাবারের জন্যে লাইন ধরতে হয়, আর গোটা হপ্তায় মাত্র একবার সুযোগ পায় ওরা প্ল্যান্টেশনটায় ঘুরতে যাবার। রাত নামতে নামতে সন্ন্যাসিনীরা সব বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, নড়তে চড়তে পারে না, আরেকটা হুকুম দেবারও শক্তি থাকে না, অথচ তখনো ক্লান্তিহীন কিশোরীর দল বেসুরো গলায় গাইতে থাকে স্কুলের গান। নিজে সে যেখানে সবচেয়ে বেশি অনাসৃষ্টির কারণ সেইখানেই যে লোকের উপকারে লাগতে যায় সেই উরসুলাকে তো প্রায় পা-মাড়িয়েই দিতো তারা আরেকটু হলে। আরেকদিন সন্ন্যাসিনীরা তো মহা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কারণ উঠোনে স্কুলের মেয়েরা আছে দেখেও কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া চেস্টনাট গাছের নিচে পেশাব করতে ক্ষান্ত হয়নি। আরেকবার, আমারান্তা সবার ভেতর আতংকই ছড়িয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলে, কারণ সে যখন স্যুপে লবণ দিচ্ছে তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সন্ন্যাসিনী রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল আর তার মনে একমাত্র যে-প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তা হল সেই মুঠো মুঠো সাদা গুঁড়োটা কী।

আমারান্তা জবাব দিয়েছিল, 'আর্সেনিক।'

যেদিন ওরা এসে পৌছোয় সে-রাতে সেই স্কুলছাত্রীরা শুতে যাবার আগে বাথরুমে ঢোকার জন্যে এমন হুটোপুটি শুরু করে দেয় যে রাত একটার সময়ও দেখা যায় শেষ ক'জন বাথরুমে ঢুকছে। ফারনান্দা তখন বাহাত্তরটা চেম্বারপট কিনে আনে, কিন্তু তাতে লাভ হয় এটুকুই যে রাতের সমস্যাটা বদলে গিয়ে দিনের সমস্যায় রূপ নেয়, কারণ সকাল থেকেই মেয়েদের একটা লম্বা লাইন পড়ে যায়, সবাই যার যার পট হাতে নিয়ে সেটা ধোওয়ার জন্যে নিজের পালা আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও তাদের কেউ কেউ জ্বরে ভোগে আর অনেকেই মশার কামড় খেয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু তারপরেও, তাদের বেশিরভাগই যারপরনাই সমস্যার মুখোমুখি হয়েও, অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, আর এমনকি চরম গরমের সময়েও বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটোছুটি করতে দেখা যায় তাদের। শেষ অব্দি ওরা যখন বিদায় নেয়, দেখা যায় ফুলগুলো একটিও অটুট নেই, আসবাবপত্র ভাঙা, দেয়ালগুলো লেখালেখি আর আঁকাজোকায় ভরা, কিন্তু ওরা যে বিদায় হয়েছে এই স্বস্তিতেই তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেয় ফারনান্দা। ধার করা বিছানা আর টুলগুলো ফেরত দিয়ে সেই বাহাত্তরটা চেম্বারপটটি মেলকিয়াদেসের কামরায় রেখে আসে সে। যে-কামরাকে কেন্দ্র করে একসময় বাড়িটার আত্মিক জীবনটা আবর্তিত হতো সেই তালাবদ্ধ কামরাটাকে এরপর থেকে সবাই 'চেম্বারপট ঘর' বলতো। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার জন্যে এই নামটাই ছিল সবচেয়ে মোক্ষম, তার কারণ মেলকিয়াদেসের কামরাটার ধুলোবালি আর বিনাশের হাত থেকে শত হাত দূরে থাকার ব্যাপারটা পরিবারের বাকি সবার কাছে একটা আশ্চর্যের বিষয় হলেও, সে মনে করতো ওটা একটা গোবর-গাদায় পরিণত হয়েছে। সে যাই হোক, কার কথা সত্যি তা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, আর সে যদি ঘরটার নিয়তি বিষয়ে জেনে গিয়ে থাকে তার কারণ হল চেম্বারপটগুলো সরানোর সময় গোটা বিকেল জুড়ে যাওয়া-আসা করে ফারনান্দা তার কাজের বিঘ্ন ঘটিয়েছিল।

এই সময়টাতেই হোসে আর্কাদিও সেগান্দো বাড়িতে ফিরে আসে। কারো সঙ্গে ভালোমন্দ কোনো কথা না বলে বারান্দা ধরে এগিয়ে যায় সে, তারপর কর্নেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে কামারশালায় গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। উরসুলা যদিও তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু সে ফোরম্যান হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর বুটজোড়ার আওয়াজ বিশ্লেষণ করার পর এই পরিবারের সঙ্গে, এমনকি তার যে যমজ ভাইয়ের সঙ্গে ছেলেবেলায় সে লোকজনকে বিভ্রান্ত করার অসাধারণ সব খেলা খেলত অথচ যার সঙ্গে এখন তার আর কোনো কিছুরই মিল নেই সেই অরেলিয়ানো সেগান্দোর সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া তার অমোচনীয় দূরত্ব অনুভব করে অবাক হয়ে যায়। ঋজু, গম্ভীর, চিন্তিত, আর সারাসিনদের মতো একটা বিষণ্নতার প্রলেপমাখা হোসে আর্কাদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগান্দোর শরৎ-রঙা মুখে একটা শোকপূর্ণ দীপ্তি। তার মা সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ-এর চেহারার সঙ্গেই তার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি। এই পরিবারের প্রসঙ্গে আলাপের সময় ওর কথা ভুলে যাওয়ার অভ্যাসের জন্যে নিজেকে ভর্ৎসনা করতো উরসুলা, কিন্তু এই বাড়িতে ফের যখন সে তার উপস্থিতি অনুভব করে আর দেখে যে কাজ করার সময় কর্নেল তাকে কামারশালায় ঢুকতে দিয়েছে, উরসুলা তখন তার সাবেক স্মৃতি ঘেঁটে এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয় যে শৈশবের কোনো এক মুহূর্তে সে তার যমজ ভাইয়ের সঙ্গে জায়গা বদল করে ফেলেছে, তার কারণ তাকেই অরেলিয়ানো বলে ডাকা উচিৎ ছিল, অন্যজনকে নয়। তার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। একটা সময়ে জানা যায় তার নির্দিষ্ট কোনো থাকার জায়গা নেই, জানা যায় পিলার তারনেরার ঘরে সে লড়িয়ে মোরগ পেলেছে, মাঝে মাঝে সে ওখানেই থেকে যেতো ঘুমানোর জন্যে, তবে প্রায় সব সময়ই ফরাসী রমণীদের ঘরেই রাত কাটাতো সে। উরসুলার সৌরজগতে একটা পথভ্রষ্ট নক্ষত্রের মতো ঘুরে বেরিয়েছে সে, স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন আর উচ্চাশার পরোয়া না করে।

আসলে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো এই পরিবারের কোনো সদস্য নয়, আর সে যে অন্য কোনো পরিবারেরও কেউ হতে পারতো না, সেটা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেদিনই যেদিন কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস তাকে ব্যারাকে নিয়ে গিয়েছিল, একটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দৃশ্য দেখতে নয়, বরং যে লোকটাকে গুলি করা হচ্ছিল তার বিষণ্ন আর খানিকটা উপহাসভরা হাসি সে যাতে জীবনে কোনোদিন ভুলতে না পারে সেজন্যে। সেটা যে শুধু তার জীবনের সবচেয়ে পুরনো স্মৃতি তা নয়, বরং তার শৈশবের ওটাই একমাত্র স্মৃতি। অন্য স্মৃতিটা যে কোন সময়ের তা সে ঠিক করে বলতে পারে না, আর সেটা হলো এক বুড়ো মানুষের, গায়ে সাবেকি আমলের গেঞ্জি আর মাথায় দাঁড়কাকের ডানার মতো কানাঅলা একটা টুপি, লোকটা তাকে অসাধারণ সব কথা বলছে একটা জানলার ফ্রেমে বন্দি হয়ে। সেটা একটা অনিশ্চিত ধরনের স্মৃতি, একেবারেই কোনো শিক্ষা বা স্মৃতিকাতরতাহীন, সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া লোকটার স্মৃতির ঠিক উল্টো, যা কিনা তার জীবনের গতিধারাটাই পাল্টে দিয়েছে আর তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো পরিষ্কার হয়ে ফিরে এসেছে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে তার বন্দিদশা থেকে বের করে আনার জন্যে হোসে আর্কাদিওকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে উরসুলা। তাকে বলে, 'ওকে ছবি দেখতে নিয়ে যেতে পারিস কিনা দ্যাখ। ছবিটা যদি ওর ভালো না-ও লাগে তারপরেও খানিকটা টাটকা বাতাস তো অন্তত পাবে ও।' কিন্তু এটা বুঝে যেতে উরসুলার খুব একটা সময় লাগেনা যে তার এসব কাকুতি মিনতিতে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যতোটা উদাসীনতা দেখাতো, হোসে আর্কাদিও সেগান্দোও ঠিক ততোটাই উদাসীন, আর ওদের দু'জনেরই রয়েছে ভালোবাসার বিরুদ্ধে একই ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা। কামারশলায় দরজাবন্ধ অবস্থায় দীর্ঘ বৈঠকে ওরা দু'জনে যে কী নিয়ে আলাপ করে সেটা অন্য সবার মতো সে-ও কখনোই জানতে না পারলেও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বুঝতে পারে যে এই পরিবারে সম্ভবত কেবল এই দু'জনই খানিকটা ভালোবাসার টানে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

সত্যি কথাটা হল, এমনকি হোসে আর্কাদিও সেগান্দো পর্যন্ত কর্নেলকে তার বন্দিদশা থেকে বের করে আনতে পারতো না। স্কুলছাত্রীদের আক্রমণ তার ধৈর্যের সীমা সীমিত করে দিয়েছে। রেমেদিওসের লোভনীয় পুতুলগুলো ধ্বংস করে ফেলার পরেও তার বিয়ের ঘরটা দেয়ালী পোকাদের করায়ত্তে চলে গেছে এই অজুহাতে কামারশালায় একটা দোলখাটিয়া টাঙিয়ে ফেলে সে, আর তারপর থেকে উঠোনে তার জরুরি কাজ সারার সময়টুকু ছাড়া ওটাই হয়ে যায় তার স্থায়ী নিবাস। স্রেফ মামুলি দু'-একটা কথাবার্তাও গুছিয়ে বলে উঠতে পারে না উরসুলা তার সঙ্গে। সে জানে খাবারের পদগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না সে, কাজের বেঞ্চির এককোনায় রেখে দিয়ে ছোট্ট একটা মাছ তৈরির কাজ শেষ করে নেয়, স্যুপটা জমাট বেঁধে গেল কিনা বা মাংসটা ঠাণ্ডা হল কিনা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। ভীমরতিপ্রসূত এক যুদ্ধের ব্যাপারে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস তাকে সাহায্য করতে পারবে না বলার পর থেকে দিন দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে সে। নিজের মধ্যে নিজেকেই বন্দি করে ফেলে সে, আর শেষ পর্যন্ত পরিবারের সবাই তাকে মৃত বলেই ধরে নেয়। এক অক্টোবর মাসের এগারো তারিখের আগে পর্যন্ত অন্য কোনো মানবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না তার মধ্যে, আর সেদিন দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় সে এক সার্কাসের সমাবেশ দেখার জন্যে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার জন্যে এ-দিনটা তার জীবনের শেষ বছরগুলোর অন্য যে-কোনো দিনের মতোই একদম। সকাল পাঁচটার সময় দেয়ালের ওপাশের ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে ঘুম ভেঙে যায় তার। শনিবার থেকে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছে, বাগানের পাতাগুলোর ভেতর থেকে ভেসে আসা পোকার মৃদু ফিসফিসানি শোনার এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না তার, কারণ তার হাড়ের ভেতর ঠাণ্ডাটা সে এমনিতেই টের পেতো। বরাবরের মতো সে একটা উলের কম্বল মুড়ি দিয়ে আর তার যেনতেনভাবে তৈরি করা সুতির লম্বা অন্তর্বাস পরে ছিল, আরামের জন্যে এই অন্তর্বাসটা সে সব সময় পরে থাকে, যদিও সেটার বোঁটকা গন্ধ আর সেকেলে ধরনের জন্যে ওটাকে সে বলত তার 'গথিক অন্তর্বাস'। সে তার আঁটোসাঁটো পাতলুন পরে নেয় ঠিকই কিন্তু বোতাম লাগায় না, আর আগে সব সময় শার্টের কলারে সোনার বোতাম লাগালেও এখন আর সেগুলো লাগায় না, কারণ সে গোসল করতে যাবে বলে ঠিক করেছে। এরপর সে তার কম্বলটা দিয়ে মাথাটা একটা মাথা-ঢাকা-র মতো করে পেঁচিয়ে নেয়, নুয়ে পড়া গোঁফজোড়া আঁচড়ে নেয় আঙুল দিয়ে, তারপর উঠোনে বেরিয়ে আসে পেশাব করার জন্যে। সূর্য ওঠার তখনো এতো দেরি যে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া তখনো বৃষ্টিতে পচে যাওয়া তালপাতার ছাউনীর নিচে ঘুমে বিভোর। আগে যেমন কর্নেল কখনো দেখেনি তাকে, এখনো সে তাকে দেখতে পায় না, আর ঠিক একইভাবে, গরম প্রস্রাবের ধারা ছিটকে তার বাবার ভূতের জুতোর ওপর পড়ায় সে জেগে উঠে অবোধ্য ভাষায় যা বলে তা সে শুনতে পায় না। গোসলটা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখে সে, ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে ভাবের জন্যে নয়, অক্টোবর মাসের প্রবল প্রতাপ কুয়াশার কারণে। স্টোভ জ্বালানোর জন্যে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ যে-সলতেটা ব্যবহার করছিল সেটার গন্ধ পায় সে কামারশালায় ফেরার পথে, রান্নাঘরে অপেক্ষা করে কফিটা ফোটার জন্যে যাতে করে সে তার চিনি দেয়া কফির মগটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকদিন সকালের মতো সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ তাকে জিজ্ঞেস করে আজ কী বার, সে জবাব দেয়, মঙ্গলবার, এগারোই অক্টোবর। যে-রমণী শুধু তখন কেন, তার জীবনের কোনো মুহূর্তেই পুরোপুরি অস্তিত্বশীল ছিল কিনা সন্দেহ, সেই রমণীকে সোনার মতো উজ্জ্বল করে তোলা আগুনটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় যে যুদ্ধের মাঝখানে এক অক্টোবরের এগারো তারিখে এই নির্দয় বিশ্বাসের সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল যে সে যে-রমণীর সঙ্গে শুয়েছিল সে মারা গেছে। সত্যিই মারা গিয়েছিল সে, কিন্তু সেই তারিখটা ভোলা সম্ভব হয় না তার পক্ষে, কারণ মারা যাওয়ার একঘণ্টা আগে সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সেদিন কী বার ছিল। কথাটা মনে হওয়ার পরেও পূর্ববোধগুলো তাকে কতটা ছেড়ে গেছে সেটা দেখার জন্যে তাড়া থাকে না তার, আর কফিটা যখন গরম হচ্ছে তখন পুরোপুরি কৌতূহলবশত তবে স্মৃতিকাতরতার সামান্যতম সম্ভাবনা ছাড়াই সেই রমণীর কথা সে ভাবতে থাকে যার নাম সে কখনোই জানতে পারেনি, মুখটাও কখনোই দেখেনি, কারণ সে তার দেবখাটিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে। তারপরেও, ঠিক একইভাবে তার জীবনে আসা অগুনতি রমণীদের শূন্যতার ভেতর তার মনে পড়ে না যে প্রথম সাক্ষাতের ঘোরের মধ্যে যার কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো দশা হয়েছিল ও-হল সে, যে তার মৃত্যুর একঘণ্টারও কম সময় আগে দিব্যি দিয়ে বলেছিল যে আমরণ সে তাকে ভালোবেসে যাবে। ধূমায়িত কাপটা হাতে নিয়ে কামারশালায় ঢোকার পর সেই রমণী কিংবা অন্য কোনো রমণীর কথা আর মনে থাকে না অবশ্য, একটা টিনের বালতিতে রাখা ছোট্ট সোনার মাছগুলো গুনে দেখার জন্যে সে আলো জ্বালে। দেখা যায় মাছ আছে সতেরোটা। কখনো আর কোনো মাছ বিক্রি করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে প্রতিদিন দুটো করে মাছ বানায় সে, তারপর পঁচিশটা মাছ হয়ে গেলে সেগুলো গলিয়ে ফের শুরু করে গোড়া থেকে। নিমগ্ন চিত্তে, অন্য কোনো কিছুর কথা না ভেবে সারা সকাল কাজ করে যায় সে, খেয়ালই করেনি যে দশটার সময় বৃষ্টির তোড়টা আরো প্রবল হয়েছিল, আর কেউ একজন কামারশালার পাশ দিয়ে দৌড় দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ঘরটা পানিতে ভেসে যাওয়ার আগেই দরজা বন্ধ করে দিতে বলেছিল; এমনকি নিজের কথাও খেয়াল হয়নি তার যতক্ষণ পর্যন্ত না দুপুরের খাবার নিয়ে উরসুলা এসে আলোটা জ্বালায়।

উরসুলা বলে, 'কী বৃষ্টি!'

সে বলে, 'অক্টোবর যে।'

কথাটা বলার সময় দিনের প্রথম ছোট্ট মাছটার ওপর থেকে চোখ সরায়নি সে, কারণ সে তখন চোখ-এর জায়গায় রুবিগুলো বসাতে ব্যস্ত। কাজটা শেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যগুলোর সঙ্গে মাছটাকে বালতিতে রাখার পরেই কেবল স্যুপে চুমুক দেয় সে। তারপর, খুব ধীরে ধীরে, একই পাতে রাখা, পেঁয়াজ দিয়ে রোস্ট করা মাংসের টুকরোটা, সাদাভাতটুকু, আর কলাভাজার ফালিগুলো খেয়ে নেয়। চরম সুসময় বা দুঃসময় তার ক্ষুধার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আলস্যের একটা ঝিমধরাভাব পেয়ে বসে তাকে। একটা বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারবশত, খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা পার না হওয়া পর্যন্ত সে কখনো কোনো কাজ, বা পড়াশোনা, বা গোসল বা সহবাস করতো না, আর এটা এমনই একটা গভীর বিশ্বাস যে এরকম বহুবারই হয়েছে যে সৈন্যরা যাতে বদহজমের শিকার না হয় সেজন্যে সামরিক অপারেশন স্থগিত করে দিয়েছে সে। কাজেই একটা পেননাইফ দিয়ে কানের ময়লা বের করতে করতে দোলখাটিয়ায় শুয়ে থাকে সে, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে, সাদা দেয়ালঅলা একটা বাড়ির ভেতর ঢুকছে সে, আর প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সেই বাড়িতে ঢোকার দায়টার কারণে তার মন বিষণ্ণ। স্বপ্নের মধ্যেই তার মনে পড়ে যে আগের রাতে, বিগত বছরগুলোর বহু রাতেও একই স্বপ্ন দেখেছে সে, আর সে বুঝতে পারে জেগে উঠলেই ছবিটা তার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে কারণ সেই পৌনঃপুনিক ছবিটার বৈশিষ্ট্য হল সেই স্বপ্নটার ভেতরেই কেবল সেটার কথা মনে থাকে, অন্য সময় নয়। আর সত্যিই, একটু পরে নাপিত এসে যখন কামারশালার দরজায় টোকা দেয়, জেগে উঠে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কাছে মনে হয় সে বুঝি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্ন দেখার ফুরসতই পায়নি।

সে নাপিতকে বলে, 'আজ নয়। শুক্রবার।'

মুখে তার তিন দিনের কাঁচা-পাকা দাড়ি, কিন্তু তা কামাবার প্রয়োজন বোধ করে না সে, কারণ শুক্রবার সে চুলও কাটাবে, তখন এক সঙ্গে সারা যাবে সব। অনাকাঙ্খিত সিয়েস্তার চটচটে ঘাম তার বগলের ঘাগুলোকে খুঁচিয়ে তোলে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু সূর্যের দেখা নেই এখনো। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া একটা সশব্দ ঢেকুর তোলে, তাতে করে তার টাকরাতে স্যুপের টক উঠে আসে, আর সেটা তার শরীরের মধ্যে একটা হুকুমের মতো কাজ করে কাঁধে কম্বলটা ফেলে পায়খানায় পাঠায় তাকে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ কাটায় সে সেখানে, যে-কাঠের বাক্সটার ভেতর থেকে ঘন গাঁজলা বেরিয়ে আসছিল সেটার ওপর গুঁটিশুঁটি মেরে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অভ্যাস তাকে বলে ফের কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। ওখানে থাকার সময় তার মনে পড়ে যে সেদিন মঙ্গলবার, হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কামারশালায় আসেনি, কারণ আজ কলা কম্পানির ফার্মগুলোয় বেতন দেয়ার দিন। এই কথাটা তাকে বিগত কয়েক বছরের স্মৃতির মতো যুদ্ধের কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়, যদিও ব্যাপারটা সে বুঝে উঠতে পারে না। তার মনে পড়ে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস একবার তাকে কথা দিয়েছিল মুখে সাদা তারা আঁকা একটা ঘোড়া জোগার করে দেবে, কিন্তু তারপর এ-নিয়ে আর কোনো কথা বলেনি সে কোনোদিন। এরপর সে চলে যায় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার দিকে, কিন্তু সেগুলোকে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ধরনের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী ফিরিয়ে আনে না, কারণ সে যেহেতু অন্য আর কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারে না, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তার করার ব্যাপারটা সে রপ্ত করেছে যাতে করে অপরিহার্য স্মৃতিগুলো কোনো অনুভূতিকে ছুঁতে না পারে। কামারশালায় ফেরার পথে, বাতাস শুকনো খরখরে হয়ে আসছে দেখে, সে ঠিক করে গোসল করার জন্যে সময়টা বড্ড চমৎকার, কিন্তু তার আগেই আমারান্তা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। কাজেই দিনের দ্বিতীয় ছোট মাছটার কাজ শুরু করে সে। লেজটাতে সে একটা আংটা বসাচ্ছে এমন সময় এমন তেজ নিয়ে সূর্যটা বেরিয়ে আসে যে জেলে নৌকার মতো ক্যাঁচক্যাঁচিয়ে ওঠে আলো। তিন দিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া বাতাস ভরে ওঠে উড়ুক্কু পিঁপড়ায়। তখনই সে টের পায় তার পেশাব পেয়েছে, দ্বিতীয় মাছটার গতি না করা পর্যন্ত বেগটা আটকে রেখেছিল সে। চারটা দশের সময় পেশাব করতে বাইরে যায় সে, আর তখনই দূর থেকে ভেসে আসে ব্রাসব্যান্ডের আওয়াজ, বেইস ড্রামের দ্রিম দ্রিম, শিশুদের চেঁচামেচি, আর তার যৌবনের পর এই প্রথমবারের মতো সে জেনেশুনে স্মৃতিকাতরতার ফাঁদে পা দেয়, তরপর ফিরিয়ে আনে জিপসিদের সেই বিস্ময়কর বিকেলটিকে যেদিন তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে বরফ আবিষ্কার করেছিল। রান্নাঘরে হাতের কাজ ফেলে দরজার কাছে ছুটে আসে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'সার্কাস এসেছে।'

চেস্টনাট গাছের কাছে না গিয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াও রাস্তার দরজাটার কাছে চলে আসে, তারপর মিশে যায় শোভাযাত্রা দেখতে জমা হওয়া দর্শকদের সঙ্গে। দেখে, স্বর্ণখচিত পোশাক-আশাক পরা এক রমণী বসে আছে একটা হাতির মাথার ওপর। মনমরা একটা এককুঁজঅলা উট দেখতে পায় সে। দেখে, ওলন্দাজ এক বালিকার সাজ পরা একটা ভালুক একটা স্যুপের চামচ আর একটা কড়াই নিয়ে গানের তাল রক্ষা করছে। দেখে, ভাঁড়গুলো শোভাযাত্রার পেছনে আড়াআড়ি ডিগবাজি দিয়ে যাচ্ছে আর সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন রাস্তার উজ্জ্বল বিস্তার, বাতাসে উড়ন্ত পিঁপড়া আর অনিশ্চয়তার গিরিচূড়ায় উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দু'-একজন দর্শক ছাড়া আর কেউ থাকে না তখন সে আরো একবার দেখতে পায় তার করুণ নিঃসঙ্গতার অবয়বটাকে। এরপর, সার্কাসটার কথা ভাবতে ভাবতে সে চেস্টনাট গাছটার কাছে যায়, আর পেশাব করার সময়ও চেষ্টা করে সার্কাসটার কথা ভাববার, কিন্তু এবার আর সে তার স্মৃতির নাগাল পায় না। দুই কাঁধের ভেতর মাথাটা পাখির ছানার মতো গুঁজে দিয়ে কপালটা চেস্টনাট গাছের গুঁড়ির ওপর ঠেস দিয়ে রেখে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে সে। পরদিন সকাল এগারোটায় সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ বাড়ির পেছনে ময়লা ফেলতে গিয়ে আকাশ থেকে নেমে আসতে থাকা শকুনগুলোকে দেখতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত বাড়ির কেউ তার হদিস পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেম্‌-এর শেষ ছুটিটা পড়ে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার শোকপর্বের সময়েই। অবরুদ্ধ বাড়িটায় তখন পার্টির আয়োজন করার কোনো অবস্থাই নেই। ওরা সবাই কথা বলছে ফিসফিসিয়ে, খাওয়া-দাওয়া করছে নীরবে, জপমালা পাঠ করছে দিনে তিনবার ক'রে আর এমনকি সিয়েস্তার গরমের সময় ক্ল্যাভিকর্ড অনুশীলনেও বাজছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুর। ফারনান্দার সঙ্গে কর্নেলের একটা গোপন বৈরিতা থাকার পরেও শোকপালনের এই কড়াকড়ি সেই-ই আরোপ করেছিল, কারণ সরকার যেভাবে তার এই মৃত শত্রুর স্মৃতির গুণগান করল তাতে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অরেলিয়ানো সেগান্দো তার মেয়ের ছুটির সময় ঘুমোনোর জন্যে যথারীতি বাড়ি চলে এসেছিল, আর ফারনান্দা নিশ্চয়ই আইনানুগ স্ত্রী হিসেবে তার অধিকার ফিরে পাবার জন্যে কিছু করেছিল, কারণ পরের বছরই মেম্‌ একটি সদ্যোজাত ছোট্ট বোন পায়, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়ার সময় যার নাম রাখা হয়—তার মায়ের অমতেই—আমারান্তা উরসুলা।

মেম্‌-এর পাঠক্রম শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার পাঠ সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজন করা অনুষ্ঠানে যে অসাধারণ নৈপুণ্যে সে সপ্তদশ শতকের জনপ্রিয় সুরগুলো বাজিয়ে শোনায় আর যেভাবে শোকপর্বটার সমাপ্তি ঘটে তাতে কনসার্ট ক্ল্যাভিকর্ড বাজিয়ে হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেয়া ডিপ্লোমাটা আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে। অতিথিরা অবশ্য তার দক্ষতার চেয়েও তার দ্বৈত চরিত্রেরই প্রশংসা করে বেশি। তার প্রগলভ, এমনকি খানিকটা শিশুসুলভ চরিত্র দেখে তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত বলে মনে না হলেও ক্ল্যাভিকর্ডে গিয়ে বসার পর এক অন্য মেয়ে হয়ে যায় সে, এমন এক মেয়ে যার অদৃষ্টপূর্ব পরিণত দশা তার মধ্যে একটা বয়স্ক বয়স্কভাব এনে দেয়। বরাবরই সে এরকম। আসলে তার কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল না, কিন্তু এক অনমনীয় নিয়মানুবর্তীতার সাহায্যে সে যে সবচেয়ে ভালো গ্রেড পায় সেটা স্রেফ এই কারণে যে নইলে তার মা বিরক্ত হতো। অন্য যে-কোনো বিষয়ে ওরা তাকে শিক্ষানবিশী করতে দিতে পারতো, তাতে ফলাফলের কোনো হেরফের হতো না। খুব ছোটবেলা থেকেই ফারনান্দার কড়াকড়ির কারণে, সবসময়ই কঠোর সব সিদ্ধান্ত নেয়ার তার বাতিকের কারণে বেশ ধকল পোহাতে হয়েছে তাকে; তাছাড়া, ক্ল্যাভিকর্ড অনুশীলনের মুখোমুখি হওয়ার চাইতেও আরো অনেক কঠিন কোনো ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতো সে। তার স্নাতক উপাধি অর্জনের অনুষ্ঠানের সময় তার মনে হয়েছিল যে পার্চমেন্টের কাগজটার গথিক বর্ণগুলো আর অলংকৃত বড় হাতের অক্ষরগুলো তাকে এমন একটা আপোসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-আপোসটা সে যতটা না বাধ্যতার কারণে করেছে তার চেয়ে বেশি করেছে সুবিধার জন্যে, আর সে বুঝতে পারে যে, সন্ন্যাসিনীরা পর্যন্ত যে-যন্ত্রটাকে জাদুঘরের ফসিল বলে মনে করে সেটা নিয়ে এমনকি নাছোড়বান্দা ফারনান্দাও এরপর থেকে আর মাথা ঘামাবে না। প্রথম প্রথম কয়েক বছর তার মনে হয় তার হিসেবে বোধ হয় ভুল হয়েছে কোথাও, কারণ শুধু বৈঠকখানাতেই না, সমস্ত দাতব্য ফাংশনে, স্কুলের অনুষ্ঠানে, আর মাকোন্দোতে অনুষ্ঠিত হওয়া দেশহিতকর উৎসবে শহরের আদ্ধেক লোককে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার পরেও সদ্য আগত যাকেই তার মায়ের কাছে মনে হয়েছে মানুষটি তার মেয়ের গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে তাকেই তার মা বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমারান্তার মৃত্যুর পরে পরিবারের সবাই যখন শোকপালনের জন্যে আরো একবার নিজেদের ঘরবন্দি করে, কেবল তখনই মেম্ তার ক্ল্যাভিকর্ডটাকে তালা মেরে চাবিটা একটা ড্রেসারের ড্রয়ারে রেখে সেটার কথা ভুলে যাওযার অবকাশ পায়, আর ফারনান্দাও এটা জেনে বিরক্ত হয় না কখন কার ভুলে সেটা হারিয়ে গেছে। তো, মেম্ সেসব প্রদর্শনী ঠিক সেই নির্লিপ্তি নিয়ে সহ্য করে যায় যে-নির্লিপ্তি সে একান্তভাবে নিবেদন করেছিল শিক্ষানবিসীর ক্ষেত্রে। এ হল তার স্বাধীনতার মূল্য। তার বাধ্যতায় ফারনান্দা এতোই খুশি হয় আর তার দক্ষতার প্রশংসায় গর্বিত হয়ে ওঠে যে বাড়িটা তার বান্ধবীতে ভরে ওঠা নিয়ে, কুঞ্জবনে সন্ধ্যা কাটানোর ব্যাপারে, অথবা অরেলিয়ানো সেগান্দো বা কোনো বিশ্বস্ত মহিলার সঙ্গে গির্জায় বসে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের অনুমোদন দেয়া ছবি দেখতে যাওয়া নিয়ে এরপর আর কখনো কোনো আপত্তি করেনি সে। সেই চিত্ত বিনোদনের মুহূর্তগুলোতেই মেম্-এর আসল রুচি প্রকাশ পেতো। নিয়মশৃঙ্খলার একেবারে উল্টো প্রান্তেই তার মজো সুখ—শোরগোলভরা পার্টিতে, প্রেমিকদের সম্বন্ধে গালগপ্পে, সখীদের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডায়, যেখানে তারা ধূমপানে তালিম নিতো আর পুরুষদের কায়-কারবার নিয়ে আলাপে মেতে উঠতো, আর যেখানে তারা একবার আখের মদের সদ্ব্যবহারের পর শেষ পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাপামাপি আর একে অন্যের সঙ্গে তুলনায় মশগুল হয়েছিল। সেদিনের কথা মেম্ কখনোই ভুলতে পারবে না যেদিন সে যষ্টিমধু মেশানো লজেন্স চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফিরেছিল, আর যে-টেবিলে বসে ফারনান্দা আর আমারান্তা কোনো বাক্য বিনিময় না করে চুপচাপ তাদের রাতের খাওয়া সারছিল সেই টেবিলেই বসে পড়েছিল ওদের কষ্টের দিকে দৃকপাত না করে। এর আগে, হাসি আর আতংকে কাঁদতে কাঁদতে দুটো জবরদস্ত ঘণ্টা কাটিয়েছিল সে তার এক সখীর বাড়িতে, সমস্ত সংকট উজিয়ে পৌঁছেছিল দুঃসাহসের সেই বিরল অনুভূতিতে যা তার দরকার ছিল স্কুল পালিয়ে কোনো না কোনোভাবে তার মাকে এই কথাটা বলার জন্যে যে এখন আর ক্ল্যাভিকর্ডটার কোনো মূল্য নেই তার কাছে। টেবিলটার মাথার কাছে বসে, মৃতসঞ্জীবনী সুরার মতো গিয়ে তার পেটে পড়তে থাকা মুরগির বাচ্চার ঝোল পান করতে করতে, মেম্ দেখতে পায় অনুযোগমূলক বাস্তবতার একটা দীপ্তি ফারনান্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমারান্তাকে ঘিরে আছে। তাদের এই বাড়াবাড়ি রকমের শালীনতার ভান করার স্বভাব, তাদের আত্মিক দৈন্য আর তাদের বহ্বাড়ম্বরের ভ্রান্তি ওদেরই দিকে ছুঁড়ে না মারার জন্যে প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয় তাকে। দ্বিতীয়বারের মতো ছুটিতে এসেই সে জেনে গিয়েছিল যে তার বাবা স্রেফ লোক দেখানোর জন্যে বাড়িতে থাকছে, তাছাড়া ফারনান্দাকে চেনার পর, আর পরে পেত্রা কোতেসের সঙ্গে একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার পর তার মনে হয়েছে তার বাবা ঠিক কাজই করেছে। সে যদি ওই উপপত্নীর কন্যা হোতো সেটাকেই সে শ্রেয় মনে করতো। ঠিক এই মুহূর্তে সে যা ভাবছে তা যদি তাকে প্রকাশ করতে হতো তাহলে যে কী কেলেংকারি হতো সেটা ভেবে মদিরার এই ঘোরের ভেতর তার বেশ মজা লাগে, আর তার দুষ্টুমীপনার প্রগাঢ় তৃপ্তি এতোটাই তীব্র ছিল যে ফারনান্দা সেটা খেয়াল করে।

সে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার?'

মেম্ জবাব দেয়, 'কিছু না। এই এখুনি কেবল আমি আবিষ্কার করছিলাম তোমাদের দু'জনকে আমি কতটা ভালোবাসি।'

এই ঘোষণার মধ্যে ঘেন্নার যে পষ্ট গুরুভার রয়েছে সেটা লক্ষ্য করে চমকে ওঠে আমারান্তা। কিন্তু ফারনান্দা কথাটা শুনে এমনই অভিভূত হয়ে যায় যে মাঝরাতে মেম্ যখন মাথা ছিঁড়ে যাওয়া প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে জেগে ওঠে, পেটের ভেতর থেকে উগরে আসা পিত্তরসের ভেতর মাথাটা তার তলিয়ে যাবার জোগাড় হয়, ফারনান্দার মনে হয় সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। মেম্‌কে এক বোতল রেড়ির তেল খাইয়ে দিয়ে সে তার পেটে সেঁক আর মাথায় বরফ দিয়ে, পাঁচদিন তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য করে, আর এক নতুন, অদ্ভুত ফরাসী ডাক্তারের নির্দেশমতো খাবার খাওয়ায়, এই ডাক্তারটি দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মেম্‌কে দেখার পর এই ধোঁয়াটে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে তার যে রোগ হয়েছে তা মেয়েদের পক্ষে বেশ অদ্ভুত। সাহস হারিয়ে, মনোবল হারানো এক করুণ দশায় পতিত হয়ে, অবস্থাটা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না মেম্-এর। ততোদিনে পুরোপুরি অন্ধ কিন্তু তারপরেও কর্মক্ষম আর স্থিরমস্তিষ্ক উরসুলাই একমাত্র ব্যক্তি যে অনুমানে ঠিকভাবে রোগটা নির্ণয় করতে পারে। সে ভাবে, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি মাতাল লোকজনের বেলাতেই ঠিক এরকম ব্যাপার ঘটে।' কিন্তু তারপরেও সে যে কেবল ধারণাটা বাতিলই করে দেয় তা নয়, উল্টো নিজের চিন্তার চাপল্যে নিজেকে ভর্ৎসনাও করে। মেম্-এর বিপর্যস্ত দশা দেখে বিবেকের একটা দংশন অনুভব করে অরেলিয়ানো সেগান্দো, নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যতে মেয়েটার দিকে আরো বেশি মনোযোগ দেবার। এভাবেই বাপ-বেটির মধ্যে হাসিখুশিভরা বন্ধুত্বের একটা সম্বন্ধ গড়ে ওঠে যা অরেলিয়ানো সেগান্দোকে কিছুদিনের জন্যে রেহাই দেয় তার আনন্দোৎসবের নিঃসঙ্গতা থেকে, আর মেম্‌কে মুক্তি দেয় ফারনান্দার চৌকিদারি চোখের দৃষ্টি থেকে, ততোদিনে প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠা পারিবারিক সংকট উসকে না দিয়েই। মেম্-এর সঙ্গে থাকার জন্যে, তাকে ছবি বা সার্কাস দেখতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন যে-কোনো কাজ মুলতুবি করে দিতো, নিজের অবসর সময়ের বড় অংশটা তার সঙ্গেই কাটাতো। জুতোর ফিতে বাঁধতে না পারার মতো নিজের অসম্ভব রকমের স্থূলত্ব আর সব ধরনের বিকৃত ক্ষুধার প্রতি ইদানিংকার বিরক্তি তাকে খিটখিটে করে তুলছিল। নিজের কন্যাকে আবিষ্কার করার পর তার আগের সেই আমুদে স্বভাবটা ফিরে আসে, তার সঙ্গে থাকার আনন্দটা তাকে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরিপূর্ণ একটা বয়সে পা দিচ্ছে তখন মেম্। আমারান্তা যেমন কখনোই সুন্দরী ছিল না, সে-রকম মেম্-ও দেখতে সুন্দর নয়, তবে মেম্ হাসিখুশি, সরলসোজা, আর, প্রথম সাক্ষাতেই মানুষের মনে একটা সুন্দর ছাপ ফেলার গুণ রয়েছে তার। ওর একটা আধুনিক মন আছে; ফারনান্দার সেকেলে গাম্ভীর্য, পরিমিতি বোধ, আর কোনোরকমে গোপন করে রাখা সংকীর্ণ মনটাকে তা আহত করে, অথচ অন্যদিকে সেই মনটারই বিকাশ ঘটাতে অরেলিয়ানো সেগান্দোর যতো আনন্দ। সে-ই সিদ্ধান্ত নেয় তাকে তার শোবার ঘরের বাইরে নিয়ে আসার, যে শোবার ঘরে রয়েছে সে তার ছোটবেলা থেকে, আর যেখানকার সন্তদের ভয়ংকর চোখগুলো তার বয়োঃসন্ধিকালের আতংকে এখনো ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে; অরেলিয়ানো সেগান্দো রাজকীয় একটা বিছানা, পেল্লায় একটা ড্রেসিং টেবিল, আর মখমলের পর্দা দিয়ে একটা ঘর সাজিয়ে দেয়, তার খেয়ালই থাকে না যে সে আসলে পেত্রা কোতেসের কামরারই একটা দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরি করছে। মেম্-এর বেলায় সে এতোই বেহিসেবী হয়ে পড়ে যে তার পেছনে সে কত খরচ করছে সে-হিসেবই থাকে না তার, কারণ মেম্ নিজেই তার পকেট থেকে টাকাটা বের করে নিতো, আর তাছাড়া কলা কম্পানির কমিসারিতে যতো ধরনের সৌন্দর্যবর্ধক জিনিসপত্র আসতো সে বিষয়ে সমস্ত তথ্য অরেলিয়ানো সেগান্দোর নখদর্পণে থাকতো। নখ ঘষার জন্যে ঝামা-পাথরের পুটুলি, চুল কোঁকড়া করার যন্ত্র, দাঁতের ব্রাশ, চোখ দুটোকে ঢুলুঢুলু করার ড্রপ, আর আরো এতো নতুন প্রসাধনী এবং সৌন্দর্য সহায়ক জিনিসপত্রে মেম্-এর ঘর ভরে ওঠে যে ফারনান্দা যতোবারই সে-ঘরে ঢুকতো ততবারই সে এই ভেবে শিউরে উঠতো যে তার মেয়ের ড্রেসিং টেবিলটা নিশ্চয়ই দেখতে ঠিক সেই ফরাসী রমণীদের টেবিলের মতো। তারপরেও ফারনান্দা সে-সময়ে তার সময়টা ভাগ করে নিতো দুষ্টু কিন্তু দুর্বল আমারান্তা উরসুলা আর অদৃশ্য সব চিকিৎসকের সঙ্গে পত্রবিনিময়ের মধ্যে। কাজেই বাপ-বেটির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করার পর কেবল একটা প্রতিশ্রুতিই সে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছ থেকে আদায় করে নেয় যে মেম্‌কে সে কখনোই পেত্রা কোতেসের বাড়িতে নিয়ে যাবে না। এর কোনো দরকার ছিল না, তার কারণ উপপত্নী রমণীটি তার প্রেমিক আর প্রেমিকের কন্যার ঘনিষ্ঠতায় এতোই বিরক্ত হয়েছিল যে মেয়েটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ ছিল না। এক অজানা আশংকা তাকে পীড়ন করতে থাকে, যেন তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে দেয় যে ফারনান্দা যা করতে পারেনি মেম্ স্রেফ ইচ্ছে করলেই তা করতে পারে: বঞ্চিত করতে পারে তাকে এমন এক ভালোবাসা থেকে যা সে মনে করেছিল আমৃত্যু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে বাঁধা-ই রয়েছে। এই প্রথমবারের মতো অরেলিয়ানো সেগান্দোকে তার উপপত্নীর রূঢ় মুখভঙ্গি আর প্রচণ্ড তিরস্কার সহ্য করতে হয়, ফলে সে এমনকি এই ভয়ও পেয়ে যায় যে তার ভ্রাম্যমাণ তোরঙ্গগুলো এবার বুঝি তার বৌ-এর ঘরেই ফিরে যায়। তা অবশ্য হয় না। পেত্রা কোতেস তার প্রেমিককে যতো ভালোভাবে চেনে, কোনো মানুষ অন্য মানুষকে তার চেয়ে ভালোভাবে চেনে না, আর সে জানতো তোরঙ্গগুলো যেখানে পাঠানো হয়েছিল সেখানেই থাকবে সেগুলো তার কারণ অরেলিয়ানো সেগান্দো যদি কোনো কিছু অপছন্দ করে থাকে তাহলে সেটা হল পরিবর্তন-পরিমার্জনের মাধ্যমে জীবনটা জটিল করে তোলা। কাজেই, যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে যায় তোরঙ্গগুলো, আর পেত্রা কোতেস সেই অস্ত্রগুলোয় ধার দিয়ে স্বামীটিকে পুনর্জয়ে লেগে পড়ে যেগুলো তার কন্যা তার ওপর প্রয়োগ করতে পারবে না। এটাও একটা অপ্রয়োজনীয় প্রয়াস, বাবার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার কোনো খায়েস ছিল না মেম্-এর, আর থাকলেও সেটা নিশ্চিতভাবে উপপত্নী মহিলার পক্ষেই যেতো। কাউকে বিরক্ত করার মতো সময় ছিল না তার। নিজের ঘর নিজেই ঝাড়পোছ করতো সে, বিছানা ঠিক করতো, ঠিক যেমন করে সন্ন্যাসিনীরা তাকে শিখিয়েছিল। সকাল বেলায় সে তার কাপড়চোপড়গুলোর দিকে মন দিতো, কখনো বারান্দায় বসে সেলাই করতো, কখনো বা আমারান্তার পুরনো পা-চালিত সেলাই মেশিনটা ব্যবহার করতো। অন্যেরা যখন দুপুরের খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, সে তখন দু'ঘণ্টা ধরে ক্ল্যাভিকর্ড বাদন অনুশীলন করতো, এ-কথাটা তার ভালোই জানা ছিল যে এই দৈনিক ত্যাগটুকু ফারনান্দাকে শান্ত রাখবে। ঠিক একই কারণে গির্জার মেলায় আর স্কুলের পার্টিগুলোয় কনসার্ট দেয়া চালিয়ে যায় সে, যদিও দিন দিন সেজন্যে অনুরোধের পরিমাণ কমে আসতে থাকে। রাত হলে নিজেকে সে গুছিয়ে নিতো, গায়ে চাপাতো তার সাদাসিধে জামাকাপড়, পরে নিতো শক্ত উঁচু জুতোজোড়া, আর বাবার সঙ্গে কিছু করার না থাকলে সে তার বান্ধবীদের বাড়ি বেড়াতে যেতো, থাকতো রাতের খাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত। সে-সময় এমনটি খুব কম দিনই হতো যে অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে ছবি দেখতে যাওয়ার জন্যে ডাকতো না।

মেম্-এর সখীদের মধ্যে আমেরিকার তিনটি মেয়ে আছে, বিদ্যুতায়িত চিকন তারের জালের বাধা পেরিয়ে তারা মাকোন্দোর মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। এদেরই একজন প্যাট্রিসিয়া ব্রাউন। অরেলিয়ানো সেগান্দোর আতিথেয়তায় কৃতজ্ঞ ব্রাউন বাবু মেম্-এর জন্যে তার বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে, শনিবারের নাচের আসরে সে তার আমন্ত্রিত অতিথি। কথাটা জানতে পেরে কিছুক্ষণের জন্যে আমারান্তা উরসুলা আর অদৃশ্য চিকিৎসকদের কথা ভুলে গিয়ে অতিনাটকীয় হয়ে ওঠে ফারনান্দা। সে মেম্‌কে বলে, 'একবার ভেবে দেখ্, কবরে শুয়ে কর্নেল কী মনে করবে।' সে অবশ্য উরসুলার সমর্থন কামনা করে। কিন্তু সেই অন্ধ রমণী সবাইকে অবাক করে দিয়ে নাচের আসরে মেম্-এর যাওয়াতে আর সমবয়েসী আমেরিকার মেয়েদের সঙ্গে বন্ধু পাতানোতে দোষের কিছুই দেখতে পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তার গোপন স্বভাবগুলো বজায় রাখছে আর ধর্ম বদলে 'প্রোটেস্টান্ট' না হচ্ছে। মেম্ তার দাদীর দাদীর মনোভাবটা ভালোই বুঝতে পারে, আর তাই নাচের পরদিন অন্যান্য দিনের চেয়েও আগে ঘুম থেকে উঠে মাস্-এ চলে যেতো। আমারান্তার প্রতিরোধ ততোদিন পর্যন্তই কার্যকর থাকে যদ্দিন পর্যন্ত না মেম্ এসে এই খবরটা দিয়ে মায়ের প্রতিরোধ ভেঙে দেয় যে আমেরিকানরা তার ক্ল্যাভিকর্ড বাদন শুনতে চেয়েছে। যন্ত্রটা ফের বাড়ির বাইরে আনা হয়, নিয়ে যাওয়া হয় মি. ব্রাউনের বাড়িতে, সেখানে এই তরুণী কনসার্টবাদিকা সত্যিকার অর্থেই আন্তরিক প্রশংসা আর যারপরনাই উচ্ছ্বসিত শুভেচ্ছা অর্জন করে। এরপর থেকে সে যে কেবল নাচেই আমন্ত্রণ পায় তা নয়, সুইমিং পুলে রোববারের সাঁতারের আসরে আর হপ্তায় একবার দুপুরের খাবার খাওয়ারও দাওয়াত পায় সে। একেবারে পেশাদারদের মতো সাঁতার কাটতে, টেনিস খেলতে আর আনারসের ফালি দিয়ে ভার্জিনিয়া হ্যাম খাওয়া শিখেছে মেম। সে আবিষ্কার করে নাচ, সাঁতার আর টেনিসের মধ্যে দিয়েই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে। মেয়ের অগ্রগতির ব্যাপারে অরেলিয়ানো সেগান্দো এতোটাই উৎসাহী হয়ে ওঠে যে এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার কাছ থেকে সে রঙিন ছবিঅলা ছয় ভল্যুমের একটা ইংরেজি বিশ্বকোষ কিনে ফেলে মেয়ের জন্যে, অবসর সময়ে মেম্ সেটা পড়ে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের নিয়ে গাল-গপ্পের পেছনে বা তার সখীদের সঙ্গে পরীক্ষামূলক অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করতে আগে সে যে মনোযোগটা দিতো সেটা এখন বই পড়ার পেছনে ব্যয় হয়, তার কারণ অবশ্য এই নয় যে নিয়ম হিসেবে সেটা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বরং সেটা এজন্যে যে ততদিনে আমজনতার চৌহদ্দীতে চলে আসা গুপ্ত রহস্যের ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ উবে গেছে তার। সেই মাতাল হওয়ার ঘটনাটাকে সে শৈশবের একটা ডানপিটেমী হিসেবেই দেখে; ব্যাপারটা তার কাছে এতোই মজার বলে মনে হয় যে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছে সেটা বলে ফেলে সে, আর মেয়ের চাইতে বাবার কাছেই সেটা বেশি মজার বলে মনে হয়। হাসতে হাসতে শরীর বাঁকা করে ফেলে সে বলে, মেয়ের কাছে গোপন কোনো কথা বললে যেমনটা সে বরাবরই বলতো, 'শুধু যদি তোর মা ব্যাপারটা জানতে পেতো।' সেই একই বিশ্বাসে, অরেলিয়ানো সেগান্দো আগেই মেয়েকে দিয়ে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছে যে সে তার প্রথম প্রেমের ঘটনাটা তার কাছে বলবে, আর মেম্ তাকে জানায় আমেরিকার লালচুলো একটা ছেলেকে তার ভালো লাগে, বাবা-মার সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসেছে সে। অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন পেত্রা কোতেসকে আরো বেশি সময় দিচ্ছে, আর তার দেহ-মন যদিও আগের সেই লাম্পট্যের অনুমতি দেয় না তাকে, তাই বলে সেসবের আয়োজন করার আর অ্যাকোর্ডিয়ানটাকে মাটির নিচ থেকে বের করে আনার কোনো সুযোগ সে হাতছাড়া করতো না, যদিও সে-সময় অ্যাকোর্ডিয়ানটার কয়েকটা চাবি জুতোর ফিতে দিয়ে টেনে জায়গামতো ধরে রাখা হয়েছে। ওদিকে বাড়িতে আমারান্তা তার কাফনের অন্ত হীন কাপড়টা বুনেই চলেছে, আর উরসুলা তার বার্ধক্য টেনে নিয়ে চলেছে সেইসব ছায়ার ভেতর যেখানে একমাত্র দৃশ্যমান বস্তু হল চেস্টনাট গাছের নিচে হোসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার ভূতটা। ফারনান্দা তার কর্তৃত্ব পোক্ত করে ফেলেছে। এখন হোসে আর্কাদিওর কাছে লেখা তার চিঠিতে একটাও মিথ্যা কথা থাকে না, তবে একমাত্র যে-কথাটা সে গোপন করে যায় তা হল অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে তার চিঠি লেখালেখির ব্যাপারটা, তারা তার বৃহদন্ত্রে একটা নির্দোষ টিউমার আবিষ্কার করেছে, সেই সঙ্গে তাকে প্রস্তুত করছে একটা টেলিপ্যাথিক অপারেশনের জন্যে।

সঙ্গতভাবেই হয়ত কথাটা বলা যেতো যে বুয়েন্দিয়াদের শ্রান্ত প্রাসাদটায় দীর্ঘদিন ধরে সুখ আর শান্তি বজায় ছিল, যদি না হঠাৎ করে আমারান্তার মৃত্যু ঘটে একটা নতুন শোরগোলের সৃষ্টি হতো। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত। যদিও তার বয়স হয়েছিল, আর, সবার কাছ থেকে সে আলাদাও হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তারপরেও, বরাবরের মতোই পাথরের মতো স্বাস্থ্যের আমারান্তাকে শক্তপোক্ত আর ঋজুই দেখাতো। যে-বিকেলে কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেসকে শেষবারের মতো প্রত্যাখ্যান করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সে কাঁদবার জন্যে, সেই বিকেলের পর থেকে কেউই জানতো না সে কী ভাবছে না ভাবছে। সুন্দরী রেমেদিওসের স্বর্গারোহণের সময় কিংবা অরেলিয়ানোদের যখন নিধন করা হয় বা এমনকি পৃথিবীতে সে যাকে সবচেয়ে ভালোবাসতো সেই কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন মারা যায় তখনো তাকে কাঁদতে দেখা যায়নি, যদিও কর্নেলকে যখন চেস্টনাট গাছের নিচে পাওয়া গিয়েছিল তখনই সেই ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। দেহটা তুলে আনতে সাহায্য করেছিল সে। তাকে সৈন্যের পোশাকে সাজাতে সাহায্য করেছিল, তার দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল, চুল আঁচড়ে দিয়েছিল, এমনভাবে তার গোঁফজোড়ায় মোমপালিশ করে দিয়েছিল যেমনটি খোদ কর্নেলও তার গৌরবের দিনগুলোতে কোনোদিন করেনি। ব্যাপারটার মধ্যে যে ভালোবাসা আছে সেকথা অবশ্য কারো মনে হয়নি, কারণ মৃত্যুর আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমারান্তার অন্তরঙ্গতার ব্যাপারটা লোকজনের কাছে নতুন কিছু ছিল না। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনের নয়, কেবল মৃত্যুর সম্বন্ধটাই যে আমারান্তা ভালো বোঝে, যেন ওটা কোনো ধর্ম নয় অন্তে্যষ্টিক্রিয়ার রীতিনীতির সংক্ষিপ্তসার, সেটা উপলব্ধি করে শিউরে ওঠে ফারনান্দা। আমারান্তা তার স্মৃতির একটা বিশেষ অংশ নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্ব প্রমাণের এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তার ছিল না। তার সমস্ত স্মৃতিকাতরতা অক্ষুণ্ন রেখে বৃদ্ধ বয়েসে পৌঁছেছিল সে। পিয়েত্রো ক্রেসপির ওয়ল্জ শোনার পর ঠিক সে-রকমই কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছিল তার ঠিক যেমনটি তার ইচ্ছে হতো ছোট বেলায়, যেন সময় আর তার নির্মম শিক্ষাগুলোর কোনো মূল্যই নেই। স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পচে গেছে এই অজুহাতে সঙ্গীতের যে-রোলগুলোকে সে নিজে আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেগুলোই তার স্মৃতির ভেতর ঘুরে ফিরে খেলে বেড়াচ্ছিল। তার ভাইপো অরেলিয়ানো হোসের জন্যে জলাময় আবেগের যে-দরজা সে খুলে দিয়েছিল ঠিক সেখানেই সেগুলোকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল সে, আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছিল কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস-এর শান্ত, পুরুষোচিত পক্ষপুটে, কিন্তু তা সে পারেনি, এমনকি তার বৃদ্ধ বয়েসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে মরিয়া প্রচেষ্টার সাহায্যেও না, যখন সে সেমিনারিতে পাঠানোর আগের সেই তিন বছরের ছোট্ট হোসে আর্কাদিওকে জড়িয়ে ধরতো গোসল করানোর সময়, দাদীরা যেভাবে নাতিকে জড়িয়ে ধরে সেভাবে নয় বরং যেভাবে এক নারী এক পুরুষকে জড়িয়ে ধরে, যেভাবে সেই ফরাসী রমণীরা জড়িয়ে ধরে বলে বলা হতো, যেভাবে তার বারো-চোদ্দ বছর বয়েসে দেখা নাচের আঁটো পোশাক পরা আর মেট্রোনেমির তাল রাখার জাদুদণ্ড হাতে-ধরা পিয়েত্রো ক্রেসপিকে সে জড়িয়ে ধরতে চাইতো, সেভাবে। দুঃখের সেই বেগবান স্রোতস্বিনীকে তার স্বাভাবিক গতিপথে চলতে দেয়ার জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হতো তার, আর মাঝে মাঝে এ-জন্যে তার এমনই রাগ হতো যে নিজের আঙুলে নিজেই সুঁই দিয়ে খোঁচাতো সে, তাছাড়া যে-ব্যাপারটা তাকে সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ করে তুলতো, তাকে সবচেয়ে বেদনা দিতো তা হল প্রণয়ের সেই সুবাসিত ও কীটপূর্ণ পেয়ারার বাগানটি, যা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুর দিকে। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যেমন নিরুপায় হয়ে যুদ্ধের কথা ভাবতো, আমারান্তাও তেমনি ভাবতো রেবেকার কথা। তবে তার ভাই যেমন তার স্মৃতিগুলোকে বন্ধ্যা করে দিতে পেরেছিল, আমারান্তা পেরেছিল কেবল সেগুলোকে আরো গভীর আর জ্বালাময়ী করে তুলতে। বহু বছর ধরে কেবল একটা জিনিসই সে চেয়েছে ঈশ্বরের কাছে আর সেটা হল তিনি যেন তাকে রেবেকার আগে মারা যাওয়ার শাস্তি না দেন। প্রতিবার তার বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ধ্বংসের অগ্রগতি খেয়াল করে এই মনে করে সে স্বস্তি পেয়েছে যে ঈশ্বর তার কথা শুনছেন। এক বিকেলে, বারান্দায় বসে সেলাই করার সময় এই নিশ্চয়তার বোধটা তাকে অভিভূত করে ফেলে যে ওরা যখন রেবেকার মৃত্যুর খবরটা তার কাছে নিয়ে আসবে সে নিজে তখন ঠিক এখানেই ঠিক এই আলোর মধ্যেই বসে থাকবে। লোকে যেমন করে চিঠির অপেক্ষায় বসে থাকে সে-ও তেমনি সেই ঘটনাটির জন্যে বসে থাকে, আর আসল ঘটনাটা হল, একটা সময় সে বোতামগুলো খুলে ফেলতো আবার সেগুলো সেলাই করার জন্যে যাতে করে কাজের অভাব তার অপেক্ষার সময়টা আরো দীর্ঘ, আরো উৎকণ্ঠাময় করে না তোলে। বাড়ির কেউই তখন বুঝতে পারেনি যে আমারান্তা সে-সময় রেবেকার জন্যে একটা সুন্দর কাফনের কাপড় তৈরি করছিল। পরে অরেলিয়ানো ত্রিস্তে যখন তাকে বলে কী অবস্থায় রেবেকাকে দেখেছে সে—চামড়ার মতো শক্ত গায়ের ত্বক আর খুলির ওপর এক গাছা সোনালী সুতোঅলা একটা ভূতের মতো—তখন কিন্তু আমারান্তা অবাক হয় না, কারণ, যে-অপচ্ছায়াটির বর্ণনা দেয়া হয় সেটার কথাই কিছুদিন ধরে কল্পনা করছিল সে মনে মনে। ভেবে রেখেছিল, রেবেকার লাশটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে সে, মুখের বিকৃতি ঢেকে দেবে প্যারাফিন দিয়ে, তাছাড়া সন্তদের চুল দিয়ে একটা পরচুলাও বানিয়ে রেখেছিল সে ওর জন্যে। চমৎকার একটা মৃতদেহ তৈরি করবে সে, সেটাকে লিনেন-এর কাফনের কাপড় পরিয়ে বেগনি-লাল ঝালরঅলা মখমলের আস্তর দেয়া কফিনের ভেতর রাখবে, তারপর জাঁকজমকপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন শেষে রেখে দেবে পোকামাকড়ের জিম্মায়। যে-পরিকল্পনাটা সে ভালোবেসে করলেও ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একইভাবে করতো সেটা সে এমন ঘৃণা নিয়ে করে যে তার গা কাঁপতে থাকে সেটার কথা ভাবতে গিয়ে, তবে সেই বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে নিজেকে মুষড়ে পড়তে না দিয়ে সে বরং এমনই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিনাটিগুলো নিখুঁত করার দিকে মন দেয় যে মৃত্যুর আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সে হয়ে ওঠে একজন বিশেষজ্ঞেরও বেশি, এক আচার্য। শুধু যে-ব্যাপারটা সে তার ভয়ংকর পরিকল্পনায় মাথায় রাখেনি সেটা হল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সত্ত্বেও রেবেকার আগে সে মারা যেতে পারে। আর সত্যি বলতে কী ঠিক সেটাই ঘটে। শেষ মুহূর্তটিতে অবশ্য হতাশ বোধ করে না আমারান্তা উল্টো বরং সব ধরনের তিক্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে মনে হয় তার, কারণ বেশ কয়েক বছর আগেই তাকে বদান্যতা দেখিয়ে মৃত্যু নিজেই তার কাছে নিজের কথা জানিয়েছিল। প্রচণ্ড গরম এক বিকেলে, মেম্ স্কুলে চলে যাবার খানিক পর, মৃত্যুকে দেখতে পায় সে বারান্দায় তার নিজের সঙ্গে সেলাইরত অবস্থায়। দেখতে পায় তার কারণ সে ছিল নীল পোশাক পরা লম্বা চুলের এক নারী, চেহারায় কেমন একটা সেকেলে সেকেলে ভাব, আর পিলার তারনেরা যখন এ-বাড়িতে রান্নাঘরের কাজকর্মে সাহায্য করতো তার তখনকার চেহারার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল ছিল তার। বেশ কয়েকবারই সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফারনান্দা তাকে দেখতে পায়নি, যদিও কী ভীষণ বাস্তব আর মানবীয়ই না ছিল সেই মৃত্যুরূপিনী নারী, আর একবারতো সে সুই-এ সুতো পরাবার জন্যে সাহায্য পর্যন্ত চেয়ে বসে আমারান্তার কাছে। অবশ্য মৃত্যু তাকে বলেনি কখন সে মারা যাবে বা রেবেকার আগে তার ঘণ্টা বাজবে কিনা, তবে সে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল সামনের ছয়ই এপ্রিল তার নিজের কাফনের কাপড় বোনা শুরু করার। কাপড়টা তার নিজের ইচ্ছেমতো জটিল আর সুন্দর করে তৈরি করার এক্তিয়ার তাকে দেয়া হয়েছিল, তবে ঠিক রেবেকারটার মতো আন্তরিকতা নিয়ে, আর তাকে বলা হয়েছিল যেদিন সে কাপড়টা বোনা শেষ করবে সেদিনই সন্ধেবেলা কোনোধরনের ব্যথা-বেদনা, ভয়-ভীতি কিংবা তিক্ততা ছাড়াই মারা যাবে সে। যতটা সম্ভব সময় অপচয় করার পর কিছু মোটা শন জোগাড় করার হুকুম দেয় আমারান্তা, তারপর নিজেই কাটে সেই সুতা। এমনই সাবধানে সে কাজটা করে যে স্রেফ ওটা করতেই সময় লেগে যায় চার বছর। এরপর শুরু করে সে কাপড় বোনা। সেই অবশ্যম্ভাবী পরিসমাপ্তির কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়ার পরে সে বুঝতে শুরু করে যে একটা অলৌকিক ঘটনাই কেবল পারে রেবেকার মৃত্যুর পর পর্যন্ত তার কাজটাকে লম্বা করতে, কিন্তু সেই হতাশাকে মেনে নিতে তার যে-প্রশান্তিটুকুর দরকার পড়ে সেটা সে পায় সেই মনোসংযোগের কাছ থেকে। আর তখনই সে বুঝতে পারে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ছোট্ট সোনার মাছের দুষ্ট চক্রের ব্যাপারটাকে। পুরো দুনিয়াটা ছোট হয়ে তার গায়ের ত্বকের উপরিতলে এসে পৌঁছোয়, তার অন্তরাত্মা মুক্ত হয়ে যায় সব রকমের তিক্ততা থেকে। এই ভেবে তার বুকটা বেদনায় ভরে উঠে যে তার এই সংশয়মোচন কেন বহু বছর আগে হয়নি যখন তখনো সম্ভব ছিল স্মৃতিগুলোকে শোধন করার আর একটা নতুন আলোয় পৃথিবীটাকে পুনর্নির্মাণ করা, সম্ভব ছিল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতটুকু কেঁপে না উঠে সন্ধেবেলা পিয়েত্রো ক্রেসপির ল্যাভেন্ডারের সুবাস স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলা আর রেবেকাকে তার দুঃখের খোলস থেকে বের করে আনা, ঘৃণা বা ভালোবাসার সঙ্গে নয়, বরং নিঃসঙ্গতার অপরিমেয় বোধের কারণে। এক রাতে মেম্-এর কথায় সে যে-ঘৃণা লক্ষ্য করেছিল তাতে সে বিচলিত হয়নি কারণ তার লক্ষ্যবস্তু ছিল সে, কিন্তু তার নিজের কৈশোর যতোটা নিষ্কলুষ বলে মনে হতো সেকমই নিষ্কলুষ এক কৈশোরের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করে আমারান্তা ঘটনাটার ভেতর, যদিও এরি মধ্যে তাতে বিদ্বেষ-এর কলুষ লেগে গেছে। কিন্তু ততদিনে সে তার নিয়তিকে এমন প্রবলভাবে গ্রহণ করে ফেলেছে যে সংশোধনের সব পথ যে তার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরে তার এমনকি খারাপও লাগে না। তার একমাত্র কাজ তখন কাফনের কাপড়টা শেষ করা। গোড়ার দিকে সে যেমনটা করেছিল এবার আর সে-রকম অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি দিয়ে কাজের গতি কমিয়ে না দিয়ে বরং তা বাড়িয়ে দেয় সে। হপ্তাখানেক আগে সে হিসেব করে দেখে যে সে শেষ ফোঁড়টা দেবে চৌঠা ফেব্রুয়ারি রাতে, তখন নিজের উদ্দেশ্য না ভেঙে সে মেম্‌কে বলে সে যেন একদিন পরের জন্যে ঠিক করে রাখা তার ক্ল্যাভিকর্ড কনসার্টটা এগিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু তার কথায় মেয়েটা কান দেয় না। আমারান্তা তখন উপায় খুঁজতে থাকে যাতে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়, আর সে এমনকি ভাবেও যে মৃত্যু তাকে আসলেই সময়টা দিতে যাচ্ছে, কারণ চৌঠা ফেব্রুয়ারি রাতে, এক ঝড়ে পাওয়ার প্ল্যান্টটা অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু পরদিন সকাল আটটায়, কোনো নারীর তৈরি করা সবচেয়ে সুন্দর কাপড়ে সেলাইয়ের শেষ ফোঁড়টা দেয় সে, তারপর কোনো ধরনের নাটকীয়তা ছাড়াই ঘোষণা করে, সন্ধের সময় সে মারা যাচ্ছে। সে যে শুধু পরিবারের সদস্যদেরই একথা জানায় তা নয়, বলে শহরের তাবৎ লোককে, কারণ আমারান্তার মনে এই ধারণা হয়েছিল যে পৃথিবীর লোকজনের একটা উপকার করে সে একটা জঘন্য জীবনের ক্ষতিপূরণ করতে পারে, তাছাড়া, মৃতদের কাছে চিঠিপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার চেয়ে ভালো অবস্থায় অন্য কেউ নেই।

আমারান্তা বুয়েন্দিয়া যে মৃত্যুর ডাক নিয়ে সন্ধেবেলায় পাল তুলে দিচ্ছে এ-খবরটা দুপুরের আগেই চাউর হয়ে যায়, আর বিকেল তিনটের মধ্যেই বৈঠকখানায় রাখা একটা পিজবোর্ডের বাক্স ভর্তি হয়ে যায়। লিখতে অনীহা যাদের তারা আমারান্তাকে মৌখিক বার্তা দেয়, সেটা সে একটা নোটবুকে টুকে রাখে প্রাপকের নাম আর মৃত্যুর তারিখসহ। প্রেরকদের আশ্বস্ত করে সে বলে, 'কোনো চিন্তা কোরো না। ওখানে যাওয়ার পর আমার প্রথম কাজই হবে ওর খোঁজ করে তোমার খবরটা পৌঁছে দেয়া।' ব্যাপারটা হাস্যকর। শারীরিক কোনো বিপর্যয়ের কোনো লক্ষণ বা বিষণ্ণতার সামান্যতম ছোঁয়াও দেখা যায় না তার মধ্যে, উল্টো বরং একটা কর্তব্য শেষ করতে পেরে তাকে খানিকটা পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। আগের মতোই ঋজু আর কৃশকায়ই আছে সে। চোখের নিচের প্রকট হয়ে ওঠা হাড় আর দু'-একটা ফোকলা দাঁত না থাকলে তাকে তার আসল বয়েসের চেয়ে অনেক কম বয়েসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই মনে হতো। পিচ দিয়ে সীল করা একটা বাক্সে ওরা যাতে চিঠিগুলো রাখতে পারে সে-ব্যবস্থা সে নিজেই করে দিয়ে বলে দেয় বাক্সটা যেন ওরা তার কবরের পাশে এমনভাবে রাখে যাতে কোনোভাবেই তাতে স্যাঁতসাঁতেভাব না ধরে। সকালবেলায় সে একজন ছুতোরমিস্ত্রি ডেকে পাঠায়, লোকটা বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে আমারান্তার কফিনের মাপ নেয় যেন নতুন পোশাকের মাপ নিচ্ছে সে। আমারান্তা তার শেষ কয়েকটা ঘণ্টায় এমনই প্রাণশক্তির পরিচয় দেয় যে ফারনান্দা মনে করে সে বুঝি মশকরা করছে সবার সঙ্গে। উরসুলা জানে বুয়েন্দিয়ারা অসুখে ভুগে মরে না, কাজেই এ-ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ থাকে না যে মৃত্যুর কাছ থেকে আমারান্তা কোনো না কোনো সংকেত পেয়েছে, কিন্তু তারপরেও সে এই আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যে এই চিঠির ব্যাপারটা আর তাড়াতাড়ি সেগুলো পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রেরকদের উৎকণ্ঠার কারণে ওরা না তাকে জ্যান্তই কবর দিয়ে দেয়। কাজেই অনাহুতদের সঙ্গে চিৎকার করে তর্ক করতে করতে বাড়ি ফাঁকা করার কাজে নেমে পড়ে সে, আর বিকেল চারটার মধ্যেই তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আমারান্তা ততক্ষণে তার জিনিসপত্র গরিব লোকজনের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে আর র‍্যাঁদা না মারা তক্তার নিষ্করুণ কফিনটাতে নিজের জন্যে রেখেছে কেবল মৃত অবস্থায় পরার জন্যে বাড়তি একপ্রস্থ পোশাক আর সাদামাটা একজোড়া কাপড়ের চপ্পল। সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুল হয় না তার, কারণ সে ভোলেনি যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন মারা যায় তখন তার জন্যে একজোড়া নতুন জুতো কিনতে হয়েছিল, কারণ তার রেখে যাওয়া জিনিস বলতে ছিল কেবল শোবার ঘরে পরার চপ্পল, যদিও সেগুলো সে তার কামারশালায় পরতো। পাঁচটা বাজার খানিক আগে অরেলিয়ানো সেগান্দো আসে মেম্‌কে কনসার্টে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু গোটা বাড়ি একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে তৈরি দেখে অবাক হয়ে যায় সে। সেই মুহূর্তে কাউকে যদি জীবন্ত বলে মনে হয়ে থাকে তো সে প্রশান্ত আমারান্তা, তার হাতে তখনো যথেষ্ট সময় তার ফসল কাটার জন্যে। ছদ্ম বিদায় জানিয়ে তার কাছ থেকে চলে আসে অরেলিয়ানো সেগান্দো আর মেম্, তাকে কথা দেয় সামনের শনিবার একটা বড়সড় পুনরুজ্জীবন উৎসবের আয়োজন করা হবে। আমারান্তা বুয়েন্দিয়া মৃতদের জন্যে চিঠি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ-কথা লোকমুখে শুনতে পেয়ে পাঁচটার সময় ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল আসেন শেষ ধর্মীয় আচারগুলো সারতে, কিন্তু গোসল সেরে গ্রহীতার বেরিয়ে আসার জন্যে আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হয় তাকে। ম্যাডাপোলাম কাপড়ের রাত-পোশাক পরা আর চুলগুলো কাঁধের ওপর ছেড়ে দেয়া আমারান্তাকে দেখে বয়োবৃদ্ধ পল্লীযাজকের মনে হয় ব্যাপারটা নেহাতই একটা চাতুরী, কাজেই গির্জার অধস্তন উপাসককে বিদায় দিয়ে দেন তিনি। ভাবেন, এই সুযোগে তিনি আমারান্তার বিশ বছরের মৌনতা ভেঙে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। কিন্তু আমারান্তা সাফ জানিয়ে দেয় কোনো ধরনের আত্মিক সাহায্য তার দরকার নেই, কারণ সে তার বিবেকের কাছে দায়মুক্ত। আমারান্তার কথা শুনে শিউরে ওঠে ফারনান্দা। লোকজন তার কথা শুনতে পাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেও সে নিজেই উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে কী এমন পাপ আমারান্তা করেছে যে স্বীকারোক্তির লজ্জার চেয়ে একটা পাপপূর্ণ মৃত্যু বেছে নিচ্ছে সে। আমারান্তা তখন শুয়ে পড়ে, তারপর উরসুলাকে দিয়ে জনসমক্ষে নিজের কুমারীত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ায়।

ফারনান্দা যাতে শুনতে পায় এমনিভাবে চিৎকার করে উরসুলা বলে ওঠে, 'কারো মনে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে। আমারান্তা বুয়েন্দিয়া যেভাবে এসেছিল সেভাবেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

এরপর আর উঠে দাঁড়ায় না আমারান্তা। সত্যি-ই যেন সে অসুস্থ এমনিভাবে তাকিয়ার ওপর শুয়ে নিজের লম্বা চুল বেনী করে গোল করে পাকিয়ে রেখে দেয় কানের পাশে, যেন মৃত্যু তাকে বলেছে তার শবযানে এরকমই থাকতে হবে ওদুটোকে। এরপর উরসুলার কাছ থেকে একটা আয়না চেয়ে নেয় সে, তারপর, চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পরে এই প্রথমবারের মতো বয়স আর আত্মোৎসর্গের কারণে বিধ্বস্ত নিজের মুখটা দেখে সে, আর মনে মনে নিজের চেহারার যে-ছবিটি সে এঁকেছে তার সঙ্গে সেটা মিলে যাওয়াতে অবাক হয়ে যায় সে। শোবার ঘরের নীরবতা উরসুলাকে বুঝিয়ে দেয় সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

আমারান্তাকে সে অনুনয় করে বলে, 'ফারনান্দাকে বিদায় জানা। সারা জীবনের বন্ধুত্বের চেয়েও এক মিনিটের বিরোধ-মীমাংসা অনেক ভালো।'

আমারান্তা জবাব দেয়, 'এখন আর তাতে কোনো লাভ নেই।'

উপস্থিতমতন তৈরি করা মঞ্চের আলোটা ওরা জ্বেলে দেয়ার পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশ শুরু করার মুহূর্তে আমারান্তার কথা স্মরণ না করে পারে না মেম্। বাজনার মাঝখানে রয়েছে সে এমন সময় একজন এসে তার কানে কানে খবরটা দিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় আসরটা। বাড়িতে পৌঁছে বৃদ্ধা কুমারীর কুৎসিৎ, বিবর্ণ, হাতে কালো পট্টিবাঁধা আর গায়ে কাফনের কাপড় জড়ানো মৃতদেহটা দেখার জন্যে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয় অরেলিয়ানো সেগান্দোকে। বৈঠকখানায় চিঠির বাক্সের পাশে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

আমারান্তার জন্যে নয় দিনের শোক শেষ হওয়ার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না উরসুলা। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ ততদিন তার দেখাশোনা করে। খাবার পৌঁছে দেয় তার শোবার ঘরে, আনাতো গুল্ম ভেজানো পানি এনে দেয় গোসল করার জন্যে, আর মাকোন্দোতে যা কিছু ঘটে তার সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখে তাকে। অরেলিয়ানো সেগান্দো নিয়মিত এসে দেখা করে যায় তার সঙ্গে, নানান কাপড়চোপড় নিয়ে আসে তার জন্যে, উরসুলা সেগুলো বিছানার পাশে দৈনন্দিন জীবনের নানান একান্ত অপরিহার্য জিনিসের সঙ্গেই রেখে দেয় আর তাতে করে অল্প সময়ের মধ্যেই তার হাতের নাগালের মধ্যেই গড়ে তোলে একটা ছোটখাট বিশ্ব। ঠিক তারই মতো দেখতে আমারান্তা উরসুলার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভালোবাসা সৃষ্টিতে সমর্থ হয় সে, তাকে সে পড়তে শেখায়। তার চিন্তার স্বচ্ছতা, নিজের কাজ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই করার ক্ষমতা দেখে লোকজনের ধারণা হয় তার একশো বছরের ভার তাকে স্বাভাবিকভাবেই জয় করে নিয়েছে, কিন্তু তার যে চোখে সমস্যা আছে সে-ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হলেও কেউই সন্দেহ করেনি যে সে চোখে একদমই দেখতে পায় না। তার কাছে তখন এতো সময় আর বাড়িটার দৈনন্দিন জীবনটাকে লক্ষ্য করবার মতো এতোটাই আভ্যন্তরীণ নীরবতা মজুদ যে মেম্-এর নীরব যন্ত্রণাটা সে-ই প্রথম খেয়াল করে।

সে তাকে বলে, 'এদিকে আয় দেখি। আমরা তো দু'জন-ই এখানে একা আছি, এবার এই বুড়িকে বল তো কেন কষ্ট পাচ্ছিস তুই।'

ছোট্ট একটা হাসি হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় মেম্। উরসুলা চাপাচাপি করে না ঠিকই, কিন্তু মেম্ তাকে আর দেখতে না আসায় সন্দেহটা শেষ পর্যন্ত পোক্ত হয়ে যায় তার। সে জানতো মেম্ এখন আগের চেয়ে ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, বাইরে যাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না, পাশের শোবার ঘরে এমাথা-ওমাথা পায়চারী করে কাটায় সারাটা রাত, আর এমনকি একটা প্রজাপতির পাখা ঝাপটানিতেও হয়ে ওঠে অস্থির। কখনো বলে সে অরেলিয়ানো সেগান্দোকে দেখতে যাচ্ছে, কিন্তু তার খানিক পরে বাবা-ই যখন তার মেয়েকে খুঁজতে আসে তখন ফারনান্দার কল্পনাশক্তির সীমাবদ্ধতা দেখে অবাক বনে যায় উরসুলা। এক রাতে ফারনান্দা মেম্‌কে ছবিঘরে এক লোককে চুমু খেতে দেখার অনেক আগে থেকেই যে সে গোপন কিছু ব্যাপার-স্যাপারে, জরুরী কোনো বিষয়ে, চাপা উৎকণ্ঠায় জড়িয়ে পড়েছিল সেটা দিব্যি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

মেম্ তখন নিজেকে নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে উরসুলা তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে বলে সে অনুযোগ করে তার কাছে। আসলে নিজের কাছেই নিজে নালিশ করে সে। বেশ কিছুদিন ধরেই সে এমন কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল যে তা এমনকি একেবারে যারপরনাই তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকেরও ঘোর কাটিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু ফারনান্দার যে সেটা আবিষ্কার করতে এতো সময় লেগে যায় তার কারণ অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে সে নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে ছিল, তারপরেও শেষ পর্যন্ত তার নজরে পড়ে তার মেয়ের গভীর নীরবতা, হঠাৎ হঠাৎ রাগের বিস্ফোরণ, মেজাজের মেঘ-রৌদ্দুর আর স্ববিরোধিতা। এক ছদ্ম কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নজরদারি শুরু করে সে। বরাবরের মতোই সে তাকে তার সখীদের সঙ্গে বাইরে যেতে দেয়, শনিবারের পার্টির জন্যে সাজিয়ে গুজিয়ে দেয়, এমন একটা প্রশ্নও করে না যা তাকে সজাগ করে দিতে পারে। এরিমধ্যে সে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে যে যেসব কাজ সে করেছে বলেছে তার বদলে আসলে অন্য কাজ করেছে মেম্, কিন্তু তারপরেও, তার যে সন্দেহ হয়েছে এমন কোনো ইঙ্গিত তাকে দেয় না সে, অপেক্ষায় থাকে মোক্ষম সময়ের। এক রাতে মেম্ বলে সে তার বাবার সঙ্গে ছবি দেখতে যাচ্ছে। খানিক পরেই পানোৎসব শুরু হওয়ার আর পেত্রা কোতেস-এর বাড়ির দিক থেকে ভেসে আসা অরেলিয়ানো সেগান্দোর অ্যাকোর্ডিয়ানের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারনান্দা। তখন সে গায়ে পোশাক চড়িয়ে ছবিঘরে চলে আসে, অন্ধকার আসনগুলোর ভেতর বসা তার মেয়েকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। নিশ্চয়তার অপ্রস্তুতকর অনুভূতিটার কারণে সেই লোকটিকে আর তার দেখা হয় না যাকে তার মেয়ে চুমু খাচ্ছিল, তবে দর্শকদের কান ফাটানো চিৎকার আর হাসির ভেতরও লোকটার কাঁপা কাঁপা গলা ঠিকই শুনতে পায় সে। শুনতে পায় লোকটা বলছে, 'আই অ্যাম সরি, লাভ,' তারপর মেয়ের সঙ্গে একটাও কথা না বলে তাকে ওখান থেকে বের করে আনে সে, লজ্জায় মেম্-এর মাথা হেঁট করে দিয়ে হৈ-হট্টগোলভরা তুর্কীদের সড়ক ধরে হাঁটিয়ে এনে তাকে ওর শোবার ঘরে আটকে রাখে।

পরের দিন বিকেল ছ'টায় যে-লোকটা মেম্-এর সঙ্গে দেখা করতে আসে তার গলা শুনেই তাকে চিনে ফেলে ফারনান্দা। বয়সে সে তরুণ, গায়ের রং পাণ্ডুর, চোখ দুটো কালো, বিষাদমাখা, যা দেখে ফারনান্দা হয়ত এতোটা চমকে উঠতো না যদি জিপসিদের সঙ্গে তার পরিচয় না থাকতো, আর তাছাড়া যুবকটির মধ্যে একটা স্বপ্নময় ভাব ছিল যা দেখে তার চেয়ে কম কঠোর যে-কোনো নারীরই নিজের মেয়ের মতি গতি বুঝে ফেলতে কষ্ট হতো না। যুবকের পরনে ময়লা, সুতো বেরিয়ে পড়া লিনেনের স্যুট আর জুতোজোড়ায় প্রতিরক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে লাগানো দস্তার সাদা রঞ্জকের ছোপ ছোপ দাগ, হাতে আগের শনিবারে কেনা একটা স্ট্র হ্যাট। যুবকটি সারা জীবনে সেই মুহূর্তের মতো ভয় আর কখনো পায়নি, কিন্তু তার আচার-আচরণে এমন একটা মর্যাদাপূর্ণ ব্যাপার ছিল যা তাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে তার ছিল একটা নিখুত সৌষ্ঠব, যার মর্যাদাহানি হয়েছে কেবল স্থূল কাজকর্মের কারণে বিবর্ণ হাত আর নখের জন্যে। সে যে একজন মেকানিক সেটা বুঝতে তার দিকে মাত্র একবার নজর দিতে হয় ফারনান্দাকে। সে দেখে তার পরনে একটা [illegible]ারের স্যুট আর তার শার্টের নিচে কলা কম্পানির চিহ্ন। সে তাকে কোনো কথা বলতেই দেয় না। এমনকি দরজার এপাশে পা পর্যন্ত ফেলতে দেয় না, তাছাড়া একটু পরেই দরজাটা বন্ধ করে দিতে হয় তাকে, কারণ গোটা বাড়ি ততক্ষণে হলুদ প্রজাপতিতে ভর্তি হয়ে গেছে।

ফারনান্দা তাকে বলে, 'চলে যাও এখান থেকে। কোনো সভ্য লোকের সঙ্গে দেখা করার কোনো কারণ থাকতে পারে না তোমার।'

তার নাম মরিসিও ব্যাবিলনিয়া। মাকোন্দোতেই জন্ম, মাকোন্দোতেই বড় হয়েছে, এখন কলা কম্পানির গ্যারেজে শিক্ষানবিস মেকানিক হিসেবে কাজ করে। কুঞ্জবনে মোটরগাড়ি বিহারের জন্যে একটা গাড়ি জোগাড় করার জন্যে যখন এক বিকেলবেলা প্যাট্রিসিয়া ব্রাউনের সঙ্গে গিয়েছিল সে তখন হঠাৎ করেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মেম্-এর। গাড়ির চালক অসুস্থ হওয়াতে ওরা তাকেই ঠিক করে ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে আর মেম্ শেষ পর্যন্ত চালকের পাশে বসে তার কাজকর্ম দেখার সাধ মেটাতে সক্ষম হয়। বাধা মাইনের চালক যেটা করতো না, মরিসিও ব্যাবিলনিয়া তাকে হাতে কলমে এক প্রস্থ পাঠ দান করে। এটা সেই সময়ের কথা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন মেম্ প্রায়ই মি. ব্রাউনের বাড়িতে যেতো, যখন গাড়ি চালানোটা মেয়েদের জন্যে অশোভন বলে গণ্য হতো। কাজেই কারিগরী তথ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাকে, মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার সঙ্গেও বেশ কয়েক মাস আর দেখা হয় না তার। পরে তার মনে পড়বে মোটরভ্রমণটার সময় সে তার পুরুষোচিত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিল, যদিও তার হাতের রুক্ষ ভাবটা তার ভালো লাগেনি, আর পরে সে প্যাট্রিসিয়া ব্রাউনকে বলেছিল যে মরিসিয়া ব্রাউনের ভেতরে নিরাপত্তার যে একটা অহংকারদীপ্ত বোধ রয়েছে সেটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। যে-শনিবার সে তার বাবার সঙ্গে ছবি দেখতে যায় সেদিনই মরিসিও ব্যাবিলনিয়াকে ফের দেখতে পায় সে, সেই লিলেনের স্যুট পরা, ওদের থেকে কয়েকটা আসন দূরে বসা আর সে খেয়াল করে ওদের দিকে তাকাতে গিয়ে ছবিটার দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না তার। এই অমার্জিত আচরণে বিব্রত হয় মেম্। পরে অরেলিয়ানো সেগান্দোর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে মরিসিও ব্যাবিলনিয়া এগিয়ে আসে তাদের দিকে আর কেবল তখনই মেম্ জানতে পারে ওরা দু'জন একে অন্যকে চেনে কারণ সে অরেলিয়ানো ত্রিস্তের গোড়ার দিককার পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করতো, আর একজন কর্মচারীর অবস্থান থেকেই তার বাবার সঙ্গে কথা বলে সে। তার যে-অহংকারটা মেম্-এর মনে ওর প্রতি একটা বিরূপ ধারণার জন্ম দিয়েছিল, এই ব্যাপারটা জানার পর সেটা কেটে যায়। যে-রাতে সে স্বপ্ন দেখে একটা জাহাজডুবি থেকে সে তাকে বাঁচাচ্ছে সেদিন অব্দি একাকী কখনো সময়ও কাটায়নি ওরা, দু'জনে বা শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তাও বলেনি, কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়ার বদলে ভীষণ রেগে যায় মেম্। যেন মরিসিও ব্যাবিলনিয়া যে-সুযোগটা খুঁজছিল সেটাই মেম্ দেয় তাকে, কারণ মেম্ ঠিক এর উল্টোটাই চাইছিল মনে প্রাণে, সেটা শুধু মরিসিয়া ব্যাবিলনিয়া বলে নয়, বরং তার ব্যাপারে আগ্রহী যে-কারো বেলাতেই। কাজেই, স্বপ্ন দেখার পর তার মনে ঘেন্না মেশানো এমনই রাগ জন্মে যে ঘৃণা করার বদলে ওকে দেখার অদম্য ইচ্ছে জাগে তার মনে। গোটা সেই হপ্তাটা জুড়ে উৎকণ্ঠাটা আরো তীব্রতা পায়, আর শনিবার সেটা এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে মরিসিও ব্যাবিলনিয়া যখন ছবি দেখার সময় তাকে শুভেচ্ছা জানায় তখন তার হৃৎপিণ্ডটা যে লাফ দিয়ে তার মুখে উঠে এসেছে সেটা যাতে ও টের না পায় সেজন্যে মেম্‌কে বেশ কসরত করতে হয়। আনন্দ আর প্রচণ্ড ক্রোধের একটা তালগোল পাকানো অনুভূতিতে হতবুদ্ধি হয়ে এই প্রথমবারের মতো তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় সে আর কেবল তখনই মরিসিও ব্যাবিলনিয়া নিজেকে তার হাত ঝাঁকাতে দেয়। সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের মধ্যেই নিজের এই আকস্মিক আবেগের জন্যে অনুশোচনা আসে মেম্-এর, কিন্তু লোকটার হাতটাও ঘামে ভেজা আর ঠাণ্ডা দেখে তার নিজের অনুতাপ মুহূর্তেই এক নিষ্ঠুর স্বস্তিতে পরিণত হয়। সেই রাতেই সে উপলব্ধি করে যে মরিসিও ব্যাবিলনিয়াকে তার উচ্চাশার অসারতা টের পাইয়ে না দেয়া পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি পাবে না সে, আর গোটা হপ্তাটাই কাটায় সে মনের ভেতর সেই উৎকণ্ঠাটা নিয়ে খেলে বেড়িয়ে। প্যাট্রিসিয়া ব্রাউন যাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি আনতে যায় সেজন্যে ছল চাতুরির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোটাই বাদ রাখে না মেম্। সেই লাল চুলো আমেরিকানটা সে-সময়ে মাকোন্দোতে ছুটি কাটাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তাকেই কাজে লাগায় সে, গাড়ির নতুন নতুন মডেল সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াবার অছিলায় তাকে বাধ্য করে গ্যারেজে নিয়ে যেতে। মরিসিও ব্যাবিলনিয়াকে দেখার পর থেকেই নিজের মনকে চোখ ঠারে মেম্, আর নিজেকে একথাটা বিশ্বাস করায় যে আসলে যে-ব্যাপারটা ঘটছে তা হল ওর সঙ্গে একা সময় কাটাবার ইচ্ছে সে সহ্য করতে পারছে না, ওদিকে তাকে ওখানে পৌঁছতে দেখামাত্রই যে ছেলেটা ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরে মেম্-এর মনটা আরো কুপিত হয়ে ওঠে।

মেম্ বলে, 'নতুন মডেলগুলো দেখতে এসেছি।'

সে বলে, 'অজুহাতটা মন্দ নয়।'

মরিসিও ব্যাবিলনিয়া যে তার গর্বের আগুনে টগবগ করে ফুটছে মেম্ সেটা টের পায়, মরিয়া হয়ে একটা উপায় খোঁজে তাকে অপমান করার জন্যে। কিন্তু সে তাকে কোনো সময়ই দেয় না। নিচু গলায় মেম্‌কে সে বলে, 'মন খারাপ কোরো না। কোনো পুরুষের জন্যে কোনো মেয়ের পাগল হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়।' এমনই পর্যুদস্ত বোধ করে মেম্ যে নতুন মডেলগুলো না দেখেই বিদায় নেয় সে, গোটা রাতটাই বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটায় অপমানের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে। আর যার প্রতি সে কৌতূহলী হয়ে উঠছিল সেই লাল চুলো আমেরিকান ছোঁড়াটিকে তার মনে হয় যেন ডায়াপার পরা একটা শিশু। আর ঠিক এই সময়েই মেম্ বুঝতে পারে হলুদ প্রজাপতিগুলো মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার আগে আগে এসে হাজির হয়। ওগুলো সে আগেও দেখেছে, বিশেষ করে গ্যারেজের ওপরে, কিন্তু ভেবেছে ওগুলো বোধহয় রঙের গন্ধের টানে এসে হাজির হয়েছে। একবার ছবি দেখতে ঢোকার সময় ওর মাথার ওপর এসে ডানা ঝাঁপটাতে শুরু করেছিল প্রজাপতিগুলো। কিন্তু মরিসিও ব্যাবিলনিয়া যখন ভিড়ে এমনভাবে ভূতের মতো তাড়া করে ফিরতে থাকে যে ভিড়ের মধ্যে কেবল সে-ই তার উপস্থিতি টের পেতো, কেবল তখন-ই সে বুঝতে পারে প্রজাপতির সঙ্গে ওর একটা সম্বন্ধ আছে। কনসার্টে, ছবিঘরে, হাই মাস্-এ, সব জায়গায় দর্শকের সারিতে হাজির থাকতো তখন মরিসিও ব্যাবিলনিয়া, আর সে যে সেখানে রয়েছে সেটা বোঝার জন্যে তাকে দেখার প্রয়োজন হতো না মেম্-এর, কারণ প্রজাপতিগুলো সবসময়ই হাজির থাকতো সেখানে। একবার প্রজাপতিগুলোর দমবন্ধকরা ডানা ঝাপটানিতে অরেলিয়ানো সেগান্দো এমনই অস্থির হয়ে ওঠে যে ঝোঁকের মাথায় মেম্ ওয়াদামাফিক বলেই ফেলতে যায় গোপন কথাটা, কিন্তু তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে অরেলিয়ানো সেগান্দো বরাবরের মতোই হেসে বলে উঠবে, 'তোর মা যদি জানতো কী বলতো বল দেখি?' একদিন সকালে মেম্ গোলাপ গাছের পরিচর্যা করছে, এমন সময় ফারনান্দা চিৎকার করে উঠে তাকে জায়গাটা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, বাগানের ঠিক এই জায়গা থেকেই সুন্দরী রেমেদিওস স্বর্গে উঠে গিয়েছিল। মুহূর্তের জন্যে ফারনান্দার মনে হয় অলৌকিক ঘটনাটা বোধহয় তার মেয়ের বেলাতেও ঘটতে যাচ্ছে, কারণ কতকগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডানার হঠাৎ ঝাপটানিতে আক্রান্ত হয়েছিল সে। আসলে ওগুলো ছিল সেই প্রজাপতির দল। মেম্‌-এর কাছে মনে হয় ওগুলো বুঝি হঠাৎ করে আলোর ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে, তার বুকটা ধক করে ওঠে। মরিসিও ব্যাবিলনিয়া সে-সময় এসেছিল, তার কথা অনুযায়ী, প্যাট্রিসিয়া ব্রাউনের পাঠানো একটা উপহারের প্যাকেট নিয়ে। মেম্‌ তার আরক্তিম ভাবটি লুকিয়ে ফেলে, মানসিক কষ্টটুকু হজম করে ফেলে, এমনকি বাগানের কাজ করতে গিয়ে তার হাত ময়লা হয়ে গেছে এই অজুহাতে তাকে ওটা কষ্ট করে রেইলিং-এর ওপর রেখে যেতে বলার সময় একটা স্বাভাবিক হাসিও ফুটিয়ে তোলে মুখে। এর আগে তাকে কোথায় দেখেছে সেটা মনে না করতে পেরেই কয়েক মাস পর ফারনান্দা যাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে তার মধ্যে একমাত্র যে-জিনিসটি সে লক্ষ্য করে তা হল তার চামড়ার হলদেটে রঙ।

ফারনান্দা বলে, 'লোকটা খুবই অদ্ভুত। ওর মুখটা দেখেই তুই বলতে পারবি ও খুব শিগ্‌গিরই মরতে যাচ্ছে।'

মেম্‌ ভেবেছিল তার মা বুঝি প্রজাপতিগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। গোলাপের ঝাড়গুলো ছাঁটা শেষ হলে হাত ধুয়ে প্যাকেটটা নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে সে ওটা খোলার জন্যে। পাঁচটা সমকেন্দ্রিক বাক্সের এক ধরনের চীনা খেলনা ওটা, শেষ বাক্সটায় একটা কার্ড, তাতে কোনোরকমে লিখতে পারে এমন কেউ বহু কসরত করে লিখেছে: *শনিবার ছবিঘরে দেখা হবে*। হঠাৎ এ-কথাটা খেয়াল হতে মেম্‌ কেঁপে ওঠে যে বাক্সটা ফারনান্দার কৌতূহলী দৃষ্টির নাগালের ভেতরেই বেশ কিছুক্ষণ রেলিং-এর ওপর ছিল, আর যদিও মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার দুঃসাহস এবং অকপটতায় সে ঠিকই খুশি হয়, তবে সে যে ঠিকমতো অভিসারে মিলিত হবে মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার এই সরল বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। মেম্‌ সে-সময় জানতো যে শনিবার রাতে অরেলিয়ানো সেগুন্দোর একটা কাজ আছে। তারপরেও উৎকণ্ঠার আগুনে সে গোটা হপ্তা জুড়ে এমনই পুড়ে মরে যে শনিবার সে তার বাবাকে রাজি করায় সে যেন থিয়েটারে তাকে একা রেখে চলে যায় আর শো-র পরে তাকে নেবার জন্যে আসে। বাতিগুলো তখনো নেভেনি, একটা রাতের প্রজাপতি তার মাথার ওপর ঘুরতে থাকে। আর তারপরেই ঘটনাটা ঘটে। বাতি নিভে যেতে তার পাশে এসে বসে মরিসিও ব্যাবিলনিয়া। মেম্‌-এর মনে হয় সে বুঝি দ্বিধার একটা জলাশয়ে ঝপাং করে পড়ে গেছে, আর সেখান থেকে, তার স্বপ্নে যেমনটি ঘটেছিল, কেবল এই লোকটিই তাকে মুক্তি দিতে পারে যার গা থেকে তেলের গন্ধ বের হচ্ছে, অন্ধকারে যাকে সে দেখতেও পাচ্ছে না ভালো করে।

মরিসিও ব্যাবিলনিয়া বলে, 'তুমি যদি না আসতে তাহলে আর কখনো দেখতে পেতে না আমাকে।'

মুচকি হেসে মেম্‌ বলে, 'তোমার যে-ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে আঘাত দেয় তা হল সব সময় তুমি ঠিক তাই বল যা তোমার বলা উচিৎ নয়।'

মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার প্রেমে পাগল হয়ে যায় মেম্‌। তার ঘুম উবে যায়, খিদে নষ্ট হয়ে যায়, আর এমনই গভীরভাবে নিঃসঙ্গতায় ডুবে যায় সে যে এমনকি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবাও হয়ে ওঠে একটা উৎপাত বিশেষ। ফারনান্দাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যে অভিসারের একটা জটিল জাল তৈরি করে সে, তার সখীদের কছে হয়ে ওঠে ডুমুরের ফুল, যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে ডিঙিয়ে যায় গতানুগতিকতার বেড়া। গোড়ার দিকে ওর রুক্ষতায় বিরক্ত হতো মেম্। গ্যারেজের পেছনে পতিত জমিটায় প্রথম যেবার ওরা নির্জনে মিলিত হয় সেবার সে তাকে টানতে টানতে এমন একটা জান্তব অবস্থায় নিয়ে আসে যে মেম্ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এটাও যে এক ধরনের আদর সেটা বুঝে উঠতে দিন কতেক সময় লেগে যায় মেম্-এর, কিন্তু তারপরেই সে অস্থির হয়ে ওঠে আর বাঁচতে শুরু করে কেবল মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার জন্যেই, যদিও কাপড় পরিষ্কারের ক্ষারীয় তরলে ধুয়ে যাওয়া ওর গ্রীজের হতচেতন করা গন্ধে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ইচ্ছেয় খানিকটা বিচলিতও হয়ে ওঠে। আমারান্তার মৃত্যুর দিন কতেক আগে সে হঠাৎ করে হোঁচট খেয়ে তার পাগলামির ভেতরকার সুস্থাবস্থার একটা খোলা জায়গায় প্রবেশ করে, কাঁপতে থাকে ভবিষত্যের অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে। তখনই, তাস দেখে ভবিষ্যৎ বলে দেয় এমন এক রমণীর কথা কানে আসে তার, গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে সে। পিলার তারনেরা-ই সেই রমণী। মেম্‌কে আসতে দেখেই তার গোপন বাসনার কথা বুঝে ফেলে পিলার। সে তাকে বলে, 'বোসো। কোনো বুয়েন্দিয়ার ভবিষ্যৎ জানানোর জন্যে তাস দেখার দরকার পড়ে না আমার।' মেম্ জানতো না, জানবেও না কোনো দিন যে এই একশো বছর বয়েসী ডাইনীবুড়ি তার দাদার মা। তাছাড়া, যে আগ্রাসী বাস্তবতার সঙ্গে সে মেম্-এর কাছে বলে যে প্রেমে পড়ার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি বিছানা ছাড়া অন্য কোথাও ঘটা সম্ভব নয়, তার পরে সে-কথা সে বিশ্বাসও করতো না। মরিসিও ব্যাবিলনিয়ারও ঐ একই মত, কিন্তু মেম্-এর সেকথা বিশ্বাস করতে বাধে, তার কারণ সে ধরে নেয় এসবের পেছনে রয়েছে একজন মেকানিক সম্পর্কে লোকের খারাপ ধারণা। তার তখন মনে হয় এক পক্ষের ভালোবাসা আরেক পক্ষের ভালোবাসাকে হারিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ একবার ক্ষুধা মিটে গেলে পুরুষেরা সাধারণত তাদের খিদে আর স্বীকার করে না। পিলার তারনেরা যে কেবল তার এই ভুলটাই ভাঙিয়ে দেয় তা নয়, সে তাদেরকে সেই পুরোনো চাঁদোয়া টাঙানো বিছানাটা পর্যন্ত ছেড়ে দেয় যেখানে প্রথমে মেম্-এর দাদা আর্কাদিও আর পরে অরেলিয়ানো হোসে তার পেটে এসেছিল। সে তাকে এ-ও শিখিয়ে দেয় সর্ষের পুলটিস বাষ্পে পরিণত করে কী করে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এড়ানো যায়, আর শিখিয়ে দেয় সেই সব আরকের প্রস্তুত প্রণালী যেগুলো কিনা সমস্যার সময় 'এমনকি বিবেকের অনুশোচনা পর্যন্ত দূর করে দিতে পারে'। সাক্ষাতপর্বটি মেম্-এর মনের ভেতর সাহসের ঠিক সেই অনুভূতিটি সঞ্চারিত করে দেয় যা সে অনুভব করেছিল সেই মাতাল সন্ধ্যায়। অবশ্য আমারান্তার মৃত্যু তাকে তার সিদ্ধান্ত মুলতুবি রাখতে বাধ্য করে। সেই নয় রাত সে মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার পাশ ছেড়ে ওঠেনি, আর সে-ও বাড়িতে হামলে পড়া লোকজনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। এরপর আসে শোকপালন আর বাধ্যতামূলক অপসারণের সেই দীর্ঘ পর্ব,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিনের জন্যে আলাদা হয়ে যায় তারা। এমনই অন্তর্জ্বালা, অদম্য উৎকণ্ঠা আর এতোসব অবদমিত তাড়নার দিন ছিল সেসব যে, প্রথম যে-সন্ধ্যায় মেম্ বেরুতে সক্ষম হয়, সেদিনই সে সোজা গিয়ে হাজির হয় পিলার তারনেরার বাড়ি। কোনোরকমের প্রতিরোধ, লজ্জা, আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া, বরং এমনই এক সোজাসাপ্টা নিবেদন আর স্বজ্ঞা নিয়ে মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার কাছে ধরা দেয় সে যে সেটাকে তার মানুষটির চেয়ে সন্দেহপ্রবণ যে-কেউ নিশ্চিত পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতো। তিন মাস ধরে হপ্তায় দু'দিন সহবাস করে চলে ওরা, তাতে নিরাপত্তা জোগায় অরেলিয়ানো সেগান্দোর সরল সহযোগিতা, যে কিনা মেম্‌কে স্রেফ তার মায়ের কড়াকড়ির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যেই তার ওজর-অজুহাতগুলো বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে বিশ্বাস করতো।

ফারনান্দা যে-রাতে ছবিঘরে ওদের অবাক করে দিয়েছিল, অরেলিয়ানো সেগান্দোর সেদিন মনে হয়েছিল সে তার বিবেকের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে, কাজেই ফারনান্দা যে শোবার ঘরটায় মেম্‌কে তালাবন্দি করে রেখেছিল সেখানে হাজির হয় সে সন্ধেবেলা, এই বিশ্বাস নিয়ে যে মেয়েটা তার কাছে ওয়াদামাফিক গোপন কথাগুলো বলে দেবে। মেম্ কিন্তু কিছুই স্বীকার করে না। তাকে এতোটাই আত্মবিশ্বাসী আর তার নিজের নিঃসঙ্গতায় নিমগ্ন বলে মনে হয় যে অরেলিয়ানো সেগান্দোর মনে হয় ওদের দু'জনের মধ্যে এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই, সেই সখ্য আর সহযোগিতা অতীতের একটা মায়াবিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। সে ঠিক করে মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার সঙ্গে কথা বলবে, ভাবে, ছেলেটার প্রাক্তন ওপরওয়ালা হিসেবে তার কর্তৃত্বের কারণে সে তার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, কিন্তু পেত্রা কোতেস তাকে এই ধারণা দেয় যে এটা একটা মেয়েলী ব্যাপার, কাজেই সিদ্ধান্তহীনতার একটা হাওয়ায় ভাসতে থাকে সে, যদিও বন্দিদশাটা তার মেয়ের সমস্যার সমাধান করে দেবে এই আশায় কোনোক্রমেই বুক বাঁধতে পারে না।

মেম্-এর মধ্যে কষ্টের কোনো চিহ্নই লক্ষ্য করা যায় না। বরং পাশের ঘর থেকে উরসুলা তার ঘুমের প্রশান্ত ছন্দ, তার কাজকর্মের স্বাভাবিকতা, তার খাবারের নির্দেশাবলী আর তার পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা টের পেতো। দু'মাসের শাস্তির পর কেবল যে একটা ব্যাপার উরসুলাকে ভাবিয়ে তোলে তা হল অন্য সবার মতো মেম্ সকালবেলা গোসল করতো না, করতো সন্ধ্যা সাতটায়। একবার সে ভাবে তাকে কাঁকড়াবিছে সম্বন্ধে সাবধান করে দেবে, কিন্তু মেম্‌কে তার এমনই দূরের বলে বোধ হয়, মনে হয় সে যেন ভেবেছে উরসুলা তাকে পরিত্যাগ করেছে, যে শেষ পর্যন্ত এক প্রপ্রপিতামহীর অনধিকার চর্চা দিয়ে সে তাকে বিরক্ত না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। সন্ধে হলেই হলুদ প্রজাপতিগুলো বাড়িতে হানা দিতো। আর প্রতি রাতে গোসল সেরে ফেরার সময় মেম্ দেখতো ফারনান্দা কীটনাশকের একটা গোলা হাতে মরিয়া হয়ে প্রজাপতি নিধনে ব্যস্ত। সে বলতো, 'এ-তো ভয়ংকর ব্যাপার। সারা জীবন শুনে এসেছি রাতের প্রজাপতি অমঙ্গল ডেকে আনে।' এক রাতে, মেম্ তখন গোসলখানায়, হঠাৎ করে ফারনান্দা তার শোবার ঘরে ঢুকে দেখে সেখানে এতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজাপতি যে নিঃশ্বাস নেয়া ভার। হাতের কাছে পাওয়া কাপড়টা দিয়ে ওগুলো তাড়াতে যেতেই মেঝেতে গড়িয়ে পড়া সরষের পুলটিসের সঙ্গে তার মেয়ের সান্ধ্যস্নানের সম্বন্ধটা ধরতে পেরে তার বুকটা হিম হয়ে যায়। এই প্রথমবারে মতো এবার আর সুযোগের অপেক্ষা করে না সে। পরের দিনই নতুন মেয়রকে দুপুরের খাবারের নেমন্তন্ন জানায় সে। ফারনান্দার মতো তিনিও পাহাড়ী এলাকা থেকে এসেছেন, তাঁকে ফারনান্দা অনুরোধ করে তিনি যেন পেছনের আঙিনায় একজন রক্ষী নিযুক্ত করেন, কারণ তার ধারণা মুরগির ছানাগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে। সেই রাতেই যখন মরিসিও ব্যাবিলনিয়া গোসলখানায় ঢোকার জন্যে টালিগুলো সরাচ্ছিল, কারণ মেম্ তখন কাঁকড়াবিছে আর প্রজাপতিগুলোর মধ্যে তার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছিল নগ্ন আর প্রণয়পিপাসায় কম্পমান অবস্থায়, যেমনটি সে গত কয়েকটি মাস ধরে নিয়মিত করে এসেছে, সেই সময় রক্ষী তাকে নামিয়ে আনে। তার সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া একটা গুলি তাকে বাকি জীবনের জন্যে শয্যাশায়ী করে দেয়। নিঃসঙ্গ অবস্থায়, বার্ধক্যে ভুগে ভুগে মারা যায় মরিসিও ব্যাবিলনিয়া, কোনোরকম কাতরানি, কোনোরকম প্রতিবাদ ছাড়া, ছলনাময় কোনো মুহূর্তহীন, স্মৃতির দংশনে ও মুহূর্তমাত্র নিস্তার না দেয়া হলুদ প্রজাপতিগুলোর উৎপাতে অতিষ্ঠ হতে হতে, আর মুরগিচোর হিসেবে সমাজবহিষ্কৃত হয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকোন্দোর জন্যে যেসব ঘটনা মারাত্মক আঘাত হয়ে দেখা দেবে সেগুলো যখন সবে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, এই সময় বাড়িতে নিয়ে আসা হয় মেম্ বুয়েন্দিয়ার ছেলেকে। সামাজিক পরিস্থিতি তখন এমনই অনিশ্চিত যে-কোনো ব্যক্তিগত কেলেংকারি নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো যথেষ্ট উদ্যম নেই কারো, কাজেই বাচ্চাটার যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না এমনিভাবে তাকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করার মতো একটা পরিস্থিতির ওপর ভরসা রাখতে ফারনান্দার কোনো অসুবিধাই হয় না। তাকে তার ঘরে তুলে নিতেই হয়েছিল কারণ যে-অবস্থায় ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল তাতে তাকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বাচ্চাটাকে তার সহ্য করে যেতে হয়, তার কারণ সিদ্ধান্ত নেবার সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে সে তার সংকল্পমাফিক বাচ্চাটাকে গোসলখানার সিস্টার্নে চুবিয়ে মারতে সাহস পায়নি। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার পুরনো কামারশালায় তাকে তালাবন্ধ করে রেখে দেয় ফারনান্দা। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদকে সে একথা বোঝাতে সক্ষম হয় যে বাচ্চাটাকে সে একটা ভেসে আসা ঝুড়ির ভেতর পেয়েছে। বাচ্চাটার জন্মরহস্য না জেনেই মারা যাবে উরসুলা। একদিন ফারনান্দা যখন বাচ্চাটিকে খাওয়াচ্ছে তখন কামারশালায় ঢুকে পড়েছিল ছোট্ট আমারান্তা উরসুলা, সে-ও ভেসে আসা ঝুড়ির কাহিনীটা বিশ্বাস করে নেয়। ফারনান্দা যে-হঠকারিতার সঙ্গে মেম্-এর দুঃখজনক ঘটনাটার হিল্লে করেছে তাতে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায় অরেলিয়ানো সেগুন্দোর, তবে শিশুটিকে বাড়িতে আনার তিন বছর পেরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নিজের নাতির অস্তিত্বের কথা টের পায় না সে, পায় তখন যখন শিশুটি ফারনান্দার নজর এড়িয়ে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে মুহূর্তের জন্যে হাজির হয় বারান্দায়, পুরো নগ্ন অবস্থায়, জটপড়া চুল আর তিতির পাখির ঝুঁটির মতো দর্শনীয় একটা পুরুষাঙ্গ নিয়ে, যেন সে কোনো মানবশিশু নয়, বরং বিশ্বকোষে বর্ণিত মানুষখেকোদের একটা মোক্ষম উদাহরণ।

ফারনান্দা তার অলঙ্ঘনীয় নিয়তির সেই জঘন্য চাতুরীটার কথা আগে বুঝতে পারেনি। যে-লজ্জাকে সে চিরদিনের জন্যে বাড়ি থেকে নির্বাসন দিয়েছে বলে ভেবেছিল, এই শিশুটি সেই লজ্জারই প্রত্যাবর্তন স্বরূপ। লোকজন মরিসিও ব্যাবিলনিয়াকে তার বিচূর্ণ সুষুম্নাকাণ্ড সমেত ধরাধরি করে সরিয়ে নিতেই ফারনান্দা ঝামেলাটার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার একটা পরিকল্পনা এঁটে ফেলেছিল, একেবারে খুঁটিনাটি সমেত। স্বামীর সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই তার বাক্স পেঁটরা গুছিয়ে ফেলে সে, মেয়ের দরকার হবে এরকম তিনপ্রস্থ কাপড়চোপড় ভরে নেয় তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যুটকেসে, তারপর ট্রেন পৌঁছনোর আধঘণ্টা আগে মেয়েকে আনতে হাজির হয় তার শোবার ঘরে।

সে তাকে বলে, 'চল রেনাতা, যাওয়া যাক।'

কোনোরকম কৈফিয়তের ধারে কাছ দিয়েও যায় না সে। আর মেম্‌ও সে-রকম কিছু আশা করেনি বা চায়নি। ওরা যে কোথায় যাচ্ছে সেটাই যে সে কেবল জানতো না তাই নয়, ওরা তাকে কসাইখানায় নিয়ে গেলেও ব্যাপারটা তার কাছে একই থাকতো। কোনো কথাই বলেনি সে, পেছনের আঙিনায় গুলির শব্দ আর তার সঙ্গে সঙ্গে মরিসিও ব্যাবিলনিয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠার পর থেকে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোনো কথা বলবেও না সে। তার মা যখন তাকে ঘর থেকে বেরুতে বলে সে তার চুলও আঁচড়ে নেয় না, বা মুখটা পর্যন্ত ধুয়ে নেয় না, এমনকি তখন পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিয়ে যাওয়া প্রজাপতিগুলোকে পর্যন্ত খেয়াল করে না। পাথরের মতো এই নীরবতা তার প্রবল ইচ্ছাজনিত কিনা, নাকি করুণ সেই ঘটনার অভিঘাতেই সে নির্বাক হয়ে গেছে, ফারনান্দা সেকথা কোনোদিনই বুঝতে পারেনি, বুঝতে সে চায়ওনি। আগেকার সেই মনোমুগ্ধকর এলাকাটির ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় মেম্ প্রায় কিছুই লক্ষ্য করে না। রেলপথের দু'ধারে ছায়াঘন অন্তহীন কলার বাগানগুলো তার নজরে পড়ে না। ধুলো আর গরমে রুক্ষ হয়ে যাওয়া আমেরিকানদের সাদা বাড়ি কিংবা বাগানগুলো বা চাতালগুলোয় শর্টস আর নীল ডোরাকাটা শার্ট পরে তাস খেলতে থাকা রমণীদের তার নজরে পড়ে না। ধুলোময় রাস্তায় কলার কাঁদিতে ভরা গরুর গাড়িগুলো তার নজরে পড়ে না। নদীর স্বচ্ছ পানিতে তারপন মাছের মতো লাফিয়ে পড়া মেয়েরা, যাদের অসাধারণ স্তন দেখে তিক্ততায় ভরে যাচ্ছে যাত্রীদের মন, অথবা মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার হলুদ প্রজাপতিগুলো যেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে শ্রমিকদের সেইসব জীর্ণ, গাদাগাদি হয়ে থাকা কুটির এবং সেগুলোর দরজায় যার যার পট নিয়ে বসে পড়া সবুজে নোংরা শিশুগুলো আর ট্রেনের উদ্দেশে গাল পাড়তে থাকা রমণীর দল তার নজরে পড়ে না। সে যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতো তখন তার মনে যেসব চকিত দৃশ্য আনন্দের একটা হিল্লোল তুলে দিতো, সেসব তার মনে কোনো কাঁপন না জাগিয়েই চলে যায়। জানলার বাইরে তাকায় না সে, এমনকি তরুবিথীকার গায়ে-জ্বালা-ধরানো স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা কেটে যাওয়ার পরে ট্রেনটা যখন আফিম চাষ করা একটা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে, যেখানে সেই স্পেনদেশীয় জাহাজটার অঙ্গারে পরিণত হওয়া কংকালটা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারপর বেরিয়ে আসে ফেনাময় নোংরা সমুদ্রের ধার ঘেঁষা খোলা বাতাসে, যেখানে প্রায় একশো বছর আগে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার বিভ্রমের পরাজয় ঘটেছিল, তখনো জানলার বাইরে তাকায় না সে।

বিকেল পাঁচটায় ওরা যখন জলাভূমির শেষ স্টেশনে এসে পৌঁছোয়, ট্রেন থেকে নেমে পড়ে মেম্, কারণ ফারনান্দা নামতে বাধ্য করে তাকে। হাঁপানীতে ভোগা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ঘোড়ায় টানা, প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মতো দেখতে ছোট্ট একটা জুড়িগাড়িতে উঠে বসে ওরা, ছুটে চলে নির্জন শহরের অন্তহীন রাস্তা ধরে, শোনা যেতে থাকে, মাঝে মাঝে নোনা গন্ধসহ, পিয়ানো অনুশীলনের একটা আওয়াজ, ঠিক যেমনটি ফারনান্দা তার বয়োসন্ধিকালে শুনতো সিয়েস্তার সময়। এরপর একটা নৌকোয় চড়ে তারা, সেটার কাঠের চাকায় অগ্নিকাণ্ডের আওয়াজ ওঠে আর জংধরা ধাতব পাতগুলো চুল্লীর মুখের মতো প্রতিধ্বনি তোলে। নিজের কেবিনের দরজা বন্ধ করে ভিতরে বসে থাকে মেম্। দিনে দু'বার ফারনান্দা তার বিছানার পাশে এক থালা খাবার রেখে যায়, দু'বারই থালাটা আগের অবস্থাতে ফেরত যায়, সেটা এজন্যে নয় যে মেম্ অনশনে মরবে বলে পণ করেছিল, বরং এই কারণে যে খাবারের গন্ধতেই বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল তার, তাছাড়া তার পাকস্থলী পানি পর্যন্ত সহ্য করতে পারছিল না। এমনকি সে-ও জানতো না যে তার উর্বরাশক্তি সেই সরিষার পট্টিগুলোকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে, ঠিক যেমন প্রায় এক বছর পরে ওরা যখন বাচ্চাটিকে নিয়ে আসে তার আগ পর্যন্ত ফারনান্দাও কিছুই জানতে পারেনি। দমবন্ধকরা সেই কেবিনের ভেতর ধাতব পাতের কাঁপাকাঁপিতে আর প্যাডেল হুইলের ঘূর্ণনে উঠে আসা কাদার গন্ধে পাগল হয়ে দিন তারিখের হিসেব ভুলে যায় মেম্। দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পর পাখার ব্লেডে বাড়ি লেগে শেষ হলুদ প্রজাপতিটাকে মরে যেতে দেখে সে, আর এক অমোচনীয় সত্য হিসেবে সে বুঝে নেয় মরিসিও ব্যাবিলনিয়া আর বেঁচে নেই। সে অবশ্য নিজেকে পরাজিত হতে দেয় না। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয়া সেরা সুন্দরীর খোঁজ করতে গিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো যেখানে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই অলীক মালভূমির ওপর দিয়ে খচ্চরের পিঠে চড়ে এক কষ্টকর যাত্রার সময় মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার কথা ভাবতে থাকে মেম্, আর ওরা যখন ইন্ডিয়ানদের পথ চলার নিশানা ধরে ধরে পাহাড় ডিঙিয়ে সেই বিষণ্ন নগরীতে ঢোকে যে-নগরীর পাথুরে গলিতে গলিতে বত্রিশটা গির্জায় অন্ত্যেষ্টির ব্রোঞ্জ-ঘণ্টা বেজে ওঠে, তখনো তার কথা ভেবে চলে সে। সেই রাতে, পরিত্যক্ত উপনিবেশিক প্রাসাদটার একটা ঘরের মেঝেতে, ফারনান্দার পেতে দেয়া তক্তার ওপর ঘুমোয় তারা, ঘরটা বুনো লতাপাতা আক্রান্ত আর টুটোফাটা পর্দায় মোড়া, অবশ্য পর্দাগুলো ওরা জানলা থেকে টেনে টেনে নামিয়ে ফেলে, আর প্রতি টানেই সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসে। মেম্ বুঝে যায় কোথায় এসেছে তারা, কারণ তার অনিদ্রার আতংকের ভেতরেই সে নিজেকে কালো পোশাক পরা সেই লোকটির পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে যাকে কিছু লোক মিলে সীসার একটা বাক্সের ভেতরে করে ওদের বাড়িতে দিয়ে এসেছিল সেই কবে, এক বড়দিনের কিছু আগে। পরের দিন, মাস্-এর পর, ফারনান্দা তাকে একটা গম্ভীরদর্শন দালানে নিয়ে যায়, দেখেই বাড়িটা চিনে ফেলে মেম্, কারণ, যে-কনভেন্টে তার মাকে রানী হওয়ার জন্যে গড়ে তোলা হয়েছিল সেটার গল্প তার মা অনেক বলেছে তাকে, আর তখনই সে বুঝতে পারে তাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। ফারনান্দা যখন পাশের ঘরে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলে, মেম্ তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশিক আর্চবিশপদের বড় বড় তেলচিত্রশোভিত একটা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করে, তার পরনে তখনো কালো ফুল তোলা নরম হালকা ঢোলাঢালা সুতির পোশাক, পায়ে পাহাড়ী এলাকার ঠাণ্ডায় ফুলে ওঠা শক্ত উঁচু জুতো। বৈঠকখানার মাঝখানে ঘষা-কাচের জানলা দিয়ে আসা হলুদ আলোর ধারার নিচে দাঁড়িয়ে মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার কথা ভাবছে সে, এমনি সময় খুব সুন্দরী এক নবদীক্ষিতা মেম্-এর তিনপ্রস্থ পোশাক রাখা স্যুটকেসটা নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে আসে। মেম্-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে না থেমেই তার হাতটা টেনে নেয়।

তাকে বলে, 'এসো, রেনাতা।'

মেম্-ও তার হাতটা ধরে, তারপর সেই নবদীক্ষিতার ওপরই ছেড়ে দেয় তাকে পথ দেখানোর ভার। তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে সে, মাঠের লোহার গরাদটা তার পেছনে সবে বন্ধ হয়েছে, এই অবস্থাতেই শেষবার মেম্‌কে দেখে ফারনান্দা। তখনো মরিসিও ব্যাবিলনিয়ার কথাই ভাবছিল মেম্, তার গায়ের সেই গ্রীজের গন্ধের কথা, তার মাথার চারপাশে প্রজাপতির বেষ্টনীর কথা; তার বাকি জীবনের গোটা সময় জুড়েই তার কথা ভেবে যাবে সে যদ্দিন না অনেক দিন পরের এক হেমন্তের সকালে ক্র্যাকাও-এর এক বিষণ্ণ হাসপাতালে মারা যাবে সে বৃদ্ধ বয়েসে, ততদিনে তার নাম বদলে গেছে, মাথা নেড়া হয়েছে কামিয়ে, কিন্তু তারপরেও একটা কথাও বেরোয়নি তার মুখ দিয়ে।

সশস্ত্র পুলিশের প্রহরাধীন একটা ট্রেনে করে মাকোন্দোয় ফেরে ফারনান্দা। পথের মধ্যেই যাত্রীদের চাপা উত্তেজনা, রেলপথের ধারে ধারে শহরে সামরিক প্রস্তুতি আর ভয়ংকর কিছু ঘটার নিশ্চয়তা নিয়ে অন্যরকম হয়ে ওঠা একটা পরিবেশ লক্ষ্য করেছিল সে, কিন্তু মাকোন্দো পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত কোনো কিছু জানতে পারেনি, পরে লোকজন তাকে বলে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কলা কম্পানির শ্রমিকদের উস্কে দিচ্ছে ধর্মঘটে যাবার জন্যে। আপনমনে ফারনান্দা বলে, 'এই তো চাই। পরিবারের মধ্যে এক নৈরাজ্যবাদী।' ধর্মঘটটা হয় দুই হপ্তা পর, কিন্তু যে-রকম ভয় করা হয়েছিল সে-রকম নাটকীয় কিছু ঘটে না। শ্রমিকদের দাবি হল তাদেরকে যেন রোববারেও কলা কেটে গাড়িতে তুলতে বাধ্য করা না হয়, আর দাবিটা এতোটাই ন্যায্য বলে বোধ হয় যে এমনকি ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল পর্যন্ত সেটার পক্ষে ওকালতি শুরু করেন, কারণ তাঁর ধারণা দাবিটা ঈশ্বরের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দাবি আদায়ে সফলতা, আর তার পরের মাসগুলোয় হাতে নেয়া অন্যান্য কাজকর্ম সাদাসিধে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে অপরিচয়ের আড়াল থেকে বের করে নিয়ে আসে, কারণ লোকজন আগে একথা বলতেই অভ্যস্ত ছিল যে সে কেবল ফরাসী বেশ্যা দিয়ে শহর ভর্তি করে ফেলতেই ওস্তাদ। ঠিক যেভাবে ঝোঁকের মাথায় নেয়া সিদ্ধান্তের কারণে সে তার লড়িয়ে মোরগগুলো নিলামে বিক্রি করে দিয়ে হঠকারী এক নৌকা ব্যবসায় নেমে পড়েছিল, ঠিক সেভাবেই সে কলা কম্পানির ফোরম্যানের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিকদের পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে দাঁড়ায়। শিগ্‌গিরই তাকে চিহ্নিত করে ফেলা হয় সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করবার এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের চর হিসেবে। নানান আজেবাজে গুজবে কালো হয়ে ওঠা একটা সপ্তাহের এক রাতে সে যখন একটা গোপন মিটিং থেকে বেরিয়ে আসছে তখন অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় সে তাকে উদ্দেশ্য করে অজ্ঞাত কোনো দলের ছোঁড়া রিভলভারের চার চারটে গুলির হাত থেকে। পরের কয়েকটা মাসের পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে যে এমনকি উরসুলা পর্যন্ত অন্ধকার কোনায় বসে সেটা টের পেয়ে যায়, আর তার মনে হয় সে বুঝি আরেকবার সেই বিপজ্জনক সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে যখন তার ছেলে অরেলিয়ানো ধ্বংসের হোমিওপ্যাথিক বড়ি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে সে সেই ঘটনাটার কথা জানবার জন্যে, কিন্তু অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে বলে যে, যে-রাতে তার জানের ওপর হামলা হয়েছিল সেদিনের পর থেকে সে কোথায় আছে কেউ তা জানে না।

বিস্ময়মাখা গলায় উরসুলা বলে ওঠে, 'ঠিক অরেলিয়ানোর মতো। আগের ঘটনাগুলোই যেন ঘটছে আবার দুনিয়ায়।'

চারপাশের উত্তেজনা ফারনান্দাকে ছুঁতে পারে না। তার স্বামীর অনুমতি না নিয়ে মেম্‌-এর ভাগ্য সম্পর্কে সে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা নিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দোর সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার পর থেকে দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না তার। দরকার হলে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করতে বের হতে তৈরি ছিল অরেলিয়ানো সেগান্দো, কিন্তু ফারনান্দা তাকে এমন কিছু কাগজপত্র দেখায় যা দেখে বোঝা যায় মেম্‌ তার নিজের ইচ্ছেতেই মঠে যোগ দিয়েছে। লোহার গরাদের ওপারে যাওয়ার পর মেম্‌ আসলেই সে-সব কাগজে সই করেছিল, তবে যে নির্লিপ্ততা নিয়ে সে নিজেকে পথ দেখাতে দিয়েছিল সেই একই নির্লিপ্ততা নিয়েই কাজটা করেছিল সে। অরেলিয়ানো সেগান্দো অবশ্য সেই প্রমাণের বৈধতায় বিশ্বাস করেনি, ঠিক যেমন সে বিশ্বাস করেনি মরিসিও ব্যাবিলনিয়া মুরগির বাচ্চা চুরি করতে আঙিনাতে গিয়েছিল, কিন্তু দুটো যুক্তিই তার বিবেককে শান্ত রাখতে সাহায্য করে, আর তাই কোনোরকম অনুতাপ ছাড়াই পেত্রা কোতেসের ছায়ায় ফিরে যায় সে, ফের শুরু করে দেয় সেখানে হৈচৈভরা আনন্দোৎসব আর লাগামছাড়া ভোজনবিলাস। শহরের অস্থিরতা গায়ে না মেখে, উরসুলার শান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কানে না তুলে, ফারনান্দা তার পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনাটির চাল চালে। হোসে আর্কাদিওকে সে একটা লম্বা চিঠি পাঠায়, সে তখন তার প্রথম অর্ডার পেতে যাচ্ছে, আর সে-চিঠিতে ফারনান্দা তাকে জানায় তার বোন রেনাতা কালো বমি করে মারা গেছে। এরপর আমারান্তা উরসুলাকে সে তুলে দেয় সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ-এর হাতে, তারপর নিজেকে উৎসর্গ করে অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে পত্রযোগাযোগের আয়োজন করার কাজে; মেম্‌-এর ঘটনায় তাতে একটা বাধা পড়েছিল। প্রথমেই সে যে-কাজটা করে তা হল মুলতুবি রাখা টেলিপ্যাথিক অপারেশনটার জন্যে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ নির্দিষ্ট করা। কিন্তু অদৃশ্য চিকিৎসকেরা তাকে জানায় মাকোন্দোতে সামাজিক উত্তেজনা থাকাকালীন সেটা উচিৎ হবে না। তার তখন এমনই তাড়া অথচ জানাশোনার পরিধি এতো কম যে আরেক চিঠিতে সে তাদের জানায় যে সে-রকম কোনো উত্তেজনা আসলে বিরাজ করছে না, পুরো ব্যাপারটা তারই এক দেবর-এর পাগলামির ফল, যে ঐ শ্রমিক সংঘের আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে, ঠিক যেমনটি সে একসময় মেতে ছিল মোরগ লড়াই আর নৌকো নিয়ে। এ-ব্যাপারে দু'পক্ষ তখনো একমত হতে পারেনি, এমন সময় এক বুধবার বয়স্কা এক সন্ন্যাসিনী হাতে একটা ছোট্ট ঝুড়ি নিয়ে দরজায় ঘা দেয়। দরজা খোলার পর সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ ভাবে ওটা বোধহয় কোনো উপহার, চমৎকার লেসের কাজ করা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ঝুড়িটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয় সে। কিন্তু সন্ন্যাসিনী তাকে নিরস্ত করে, কারণ তার ওপর নির্দেশ আছে সেটা ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত গোপনে দোনা ফারনান্দা দেল কারপিও দে বুয়েন্দিয়ার হাতে তুলে দেবার। ঝুড়িটাতে করেই নিয়ে আসা হয়েছে মেম্-এর ছেলেকে। ফারনান্দার প্রাক্তন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক তাকে একটা চিঠিতে খোলাসা করে লিখেছেন, শিশুটির জন্ম দু'মাস আগে, আর তারা তার নানার নামে তার নাম রেখেছে অরেলিয়ানো, কারণ ছেলের নাম সে কী রাখতে চায় এ-ব্যাপারে তার মা মুখই খোলেনি। নিয়তির সেই চাতুরীর বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে রুখে দাঁড়ায় ফারনান্দা, তবে সন্ন্যাসিনীর সামনে সেটা প্রকাশ না করার মতো যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেয় সে।

মুচকি হেসে সে বলে, 'আমরা সবাইকে বলব ওকে আমরা একটা ঝুড়িতে ভাসমান অবস্থায় পেয়েছি।'

সন্ন্যাসিনী বলে, 'কেউ সে-কথা বিশ্বাস করবে না।'

ফারনান্দা জবাব দেয়, 'লোকে যদি বাইবেলের কথা বিশ্বাস করতে পারে তাহলে আমার কথা কেন করবে না?'

বাড়িতেই দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় সন্ন্যাসিনী, ওদিকে ফারনান্দা তখন অপেক্ষা করে ট্রেনটা ফিরে আসার, আর, সন্ন্যাসিনীর কাছে যে-রকম বিবেচনাবোধ আশা করা গিয়েছিল তারই পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয়বার সে আর শিশুটির কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু ফারনান্দা তাকে তার লজ্জার এক অবাঞ্ছিত সাক্ষী হিসেবেই গণ্য করে, আর ভগ্নদূতকে ফাঁসী দেবার মধ্যযুগীয় রীতি যে লোকে কেন বর্জন করল এই আক্ষেপ করতে থাকে বারবার। তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয় বাচ্চাটিকে সিস্টার্নে চুবিয়ে মারার, কিন্তু মনটা তার অতটা শক্ত নয়, ফলে যতো দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের অনন্ত কৃপা তাকে তার এই বিরক্তি থেকে মুক্তি না দেয় ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই স্থির করে সে।

নতুন অরেলিয়ানোর বয়স যখন এক বছর সেই সময় কোনোরকম আগাম আভাস না দিয়েই লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো আর অন্যান্য যেসব ইউনিয়ন নেতা আত্মগোপন করে ছিল তারা হঠাৎ এক

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তাহান্তে উদয় হয় আর গোটা কলা অঞ্চলের শহরগুলোর ভেতর দিয়ে বিক্ষোভ-প্রদর্শন, মিছিল ইত্যাদির আয়োজন করে। পুলিশ স্রেফ নাগরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে। কিন্তু সোমবার রাত্রিবেলা নেতাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রাদেশিক রাজধানীর জেলে চালান করে দেয়া হয় পায়ে দুই পাউন্ড করে লোহার বেড়ি পরিয়ে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো আর লরেঞ্জো গাভিলান, মাকোন্দোতে নির্বাসিত মেক্সিকো বিপ্লবের এক কর্নেল, যে বলেছিল সে নাকি তার বন্ধু আর্তেমিও ক্রুজের বীরত্ব নিজ চোখে দেখেছে। তিন মাস পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেয়া হয়, তার কারণ সরকার আর কলা কম্পানি নাকি এই সিদ্ধান্তেই পৌছুতে পারেনি যে জেলে এ-দু'জনকে কে খাওয়াবে। শ্রমিকদের এবারের আন্দোলনটা দানা বেঁধেছে তাদের বাসস্থানে স্যানিটারি সুবিধাদির অভাব, চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা না থাকা, আর শোচনীয় কাজের পরিবেশ, এসবকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া তাদের আরো বক্তব্য হল তাদেরকে আসলে টাকায় বেতন দেয়া হয় না, দেয়া হয় রসিদের মাধ্যমে, যা দিয়ে কেবল কম্পানির কমিসারিতে ভার্জিনিয়ার হ্যাম কেনা যায়। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে জেলে পোরা হয়েছিল কারণ সে এ-ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছিল যে রসিদ দিয়ে বেতন দেয়াটা আসলে কম্পানির বের করা একটা ব্যবস্থা যাতে করে ফলের জাহাজগুলোতে টাকা খাটানো যায়, নইলে কমিসারির পণ্য ছাড়া সেগুলোকে নিউ অর্লিন্স থেকে কলার বন্দরে খালি ফেরত যেতে হয়। অন্যান্য সব অভিযোগের কথা সবারই জানা। কম্পানির ডাক্তাররা কোনো রোগীকে পরীক্ষা করে না, একজনের পেছনে আরেক জনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নার্সরা কপার সালফেটের মতো দেখতে একটা করে বড়ি সবার জিভের ওপর ছেড়ে দেয়, তা তাদের ম্যালেরিয়াই থাকুক বা গনোরিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য। চিকিৎসাটা এতোই মামুলি ব্যাপার ছিল যে বাচ্চারা বহুবারই লাইনে গিয়ে দাঁড়াতো আর বড়িটা গিলে না ফেলে সেটাকে বাড়ি নিয়ে যেতো বিঙ্গো-খেলার মার্কার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। কম্পানি শ্রমিকরা একসঙ্গে গাদাগাদি করে দুর্দশাগ্রস্ত সব ব্যারাকে থাকতো। এঞ্জিনিয়াররা টয়লেট না বসিয়ে বড়দিনের সময় প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্যে একটা বহনযোগ্য শৌচাগার ক্যাম্পে আনাতো, তারপর কিভাবে ব্যবহার করলে সেগুলো অনেকদিন ভালো থাকবে তার একটা গণপ্রদর্শনীর আয়োজন করতো। যারা একসময় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে ঘিরে থাকতো অথচ এখন কলা কম্পানির হাতের পুতুল, সেই কালো পোশাকপরা জরাগ্রস্ত উকিলেরা ওসব দাবি-দাওয়া এমন সব সিদ্ধান্তের সাহায্যে নাকচ করে দেয় যে ব্যাপারটাকে ভেলকিবাজি বলে মনে হয়। শ্রমিকরা সর্বসম্মত অনুরোধের একটা তালিকা দাঁড় করালে কম্পানিকে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে মেলা সময় লেগে যায় সেই উকিলদের। ঐক্যজোটটার ব্যাপারে জানতে পেরেই মি. ব্রাউন তার কাচ দিয়ে মোড়া বিলাসবহুল কোচটাকে ট্রেনটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কম্পানির আরো কিছু বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে মাকোন্দো থেকে উধাও হয়ে যায়। অবশ্য পরের শনিবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের একজনকে কয়েকজন শ্রমিক একটা বেশ্যালয়ে পেয়ে যায়, লোকটাকে ফাঁদে ফেলতে যে-মহিলা তাদের সাহায্য করেছিল তারই সঙ্গে ন্যাংটো অবস্থায়, তখন তারা তাকে দিয়ে সেই দাবি-দাওয়ার কাগজগুলোর একটা অনুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। গম্ভীরদর্শন উকিলেরা আদালতে বলে লোকটার সঙ্গে কম্পানির কোনো সম্পর্ক নেই, আর, কেউ যাতে তাদের কথা অবিশ্বাস না করে সেজন্যে তারা তাকে একটা প্রতারক হিসেবে জেলে পোরার ব্যবস্থা করে। পরে, একটা তৃতীয় শ্রেণীর কোচে ছদ্মবেশে ভ্রমণরত মি. ব্রাউনকেও অবাক করে দেয় শ্রমিকেরা আর তাকে দিয়েও দাবি-দাওয়ার আরেকটা অনুলিপিতে সই করিয়ে নেয় তারা। পরদিন সে হাজির হয় বিচারকদের সামনে, তখন তার চুলে কলপ, মুখে নিখুঁত হিস্পানি বুলি। উকিলেরা প্রমাণ করে দেয় সে আলবামার প্র্যাটভিলে জন্মগ্রহণকারী, কলা কম্পানির সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. জ্যাক ব্রাউন নয়, বরং এক নিরীহ ভেষজ গাছ-গাছড়া বিক্রেতা, জন্ম মাকোন্দোয়, নাম দাগোবের্তো ফনসেকা। খানিক পর, শ্রমিকদের আরেক দফা প্রচেষ্টার পর উকিলেরা সবার সামনে মি. ব্রাউনের মৃত্যুর সনদপত্র হাজির করে, সেটা সত্যায়িত করেছে কয়েকজন কনসাল আর বিদেশমন্ত্রী, আর সেটার বক্তব্য অনুযায়ী, গত নয়ই জুন শিকাগোতে একটা দমকল বাহিনীর এঞ্জিনের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে সে। এইসব ব্যাখ্যামূলক প্রলাপে ক্লান্ত হয়ে শ্রমিকেরা মাকোন্দোর কর্তৃপক্ষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে উচ্চতর আদালতে তাদের অভিযোগ দাখিল করে। আর সেখানেই ভোজবাজিতে ওস্তাদ উকিলরা প্রমাণ করে দেয় যে ওসব দাবি-দাওয়া স্রেফ এই সাধারণ কারণে অসার যে কলা কম্পানির চাকরিতে কোনো শ্রমিক নেই, কোনোদিনই ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না, কারণ তাদের সবাইকেই অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা দরকারমতো ভাড়া করা হয়েছিল। কাজেই সেই ভার্জিনিয়া হ্যামের গল্প স্রেফ গাঁজাখুরি, অলৌকিক বড়ি আর ইয়ুলিটাইড পায়খানার গল্পগুলোও তাই, আর, শ্রমিকদের যে-কোনো অস্তিত্বই নেই একথা আদালতের এক হুকুমবলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বিধিসম্মত রায় হিসেবে লেখাও হয়ে যায়।

এরপরই শুরু হয়ে যায় সেই মহা ধর্মঘট। মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আবাদ, ফলগুলো পচতে থাকে গাছে, আর একশো বিশ গাড়ির ট্রেনটা পড়ে থাকে সাইডিং-এ। বেকার শ্রমিকে ভরে যায় শহরগুলো। তুর্কীদের সড়কে প্রতিধ্বনি ওঠে এক শনিবারের আর তা স্থায়ী হয় বেশ কিছু দিন, হোটেল জ্যাকবের বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে ওদেরকে চব্বিশ ঘণ্টার শিফট চালু করতে হয়। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো যখন সেই হোটেলেই রয়েছে সেই সময়েই একদিন ঘোষণা দেয়া হয় যে নাগরিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ভার সামরিক বাহিনীর হাতে দেয়া হয়েছে। যদিও ব্যাপারটা এমন নয় যে শুভাশুভ সংকেতের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তারপরেও হোসে আর্কাদিও সেগান্দো খবরটা একটা মৃত্যুর ঘোষণা হিসেবেই দেখে, যে-ঘোষণার জন্যে সে সেই দিন থেকে অপেক্ষা করছিল যেদিন কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস তাকে নিয়ে গিয়েছিল একটা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখানোর জন্যে। অবশ্য অশুভ সংকেতটা তার গাম্ভীর্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। সে তার পরিকল্পনামতো কাজ করে ফেলে, আর তা ভালোভাবেই করে। ড্রামের শব্দ, বিউগ্‌লের তীক্ষ্ণ, তীব্র আওয়াজ আর লোকজনের চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ির শব্দ তাকে বলে দেয় যে, কেবল যে বিলিয়ার্ড খেলাই শেষ হয়েছে তাই নয়, শেষ হয়েছে সেই নিঃশব্দ একা একা খেলাটিও যা সে খেলে আসছিল সেই ভোরবেলাকার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিনটি থেকে। এরপরই সে বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের দেখতে পায়। একটা গ্যালি ড্রামের তালে তালে কুচকাওয়াজ করে চলেছে তিনটে রেজিমেন্ট, সেই আওয়াজে ধরণী কাঁপছে। অগুনতি মাথাওয়ালা একটা ড্রাগনের নাসিকাগর্জন জঘন্য বাষ্প দিয়ে দুপুরের প্রখর দীপ্তিকে ভরিয়ে তুলছে। দেখতে ওরা ছোটখাট, গাট্টাগোট্টা আর নির্দয়-নিষ্ঠুর চেহারার। ঘোড়ার মতো ঘামছে ওরা, গায়ে রোদে শুকানো চামড়ার মতো গন্ধ, পাহাড়ী লোকদের মতো মৌনী আর অভেদ্য তাদের অধ্যবসায়। যদিও এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে তাদের মার্চ করে চলে যেতে, কিন্তু দেখে মনে হওয়া বিচিত্র ছিল না যে কয়েকটা মাত্র স্কোয়াড গোল হয়ে মার্চ করছে, কারণ দেখতে তারা সব একই রকম, একই কুক্কুরীর পুত্র-সন্তান, আর একই অবিচলতা নিয়ে তারা সবাই তাদের দল আর ক্যান্টিন, বেয়োনেট লাগানো বন্দুকের লজ্জা, অন্ধ বশ্যতার ক্ষত আর একটা সম্মানবোধের ছাপ বয়ে চলেছে। উরসুলা ছায়াঅন্ধকারে রাখা তার বিছানা থেকেই ওদের চলে যাওয়ার শব্দ শোনে, তারপর আঙুল দিয়ে ক্রুশ আঁকে। এইমাত্র ইস্তিরি করা, নকশাআঁকা টেবিল-ঢাকাটির ওপর ভর দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ, ভাবে তার ছেলে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর কথা, ওদিকে সে তখন ভাবলেশহীন মুখে হোটেল জ্যাকবের দরজার পাশ দিয়ে শেষ সৈন্যটির চলে যাওয়া দেখছে।

সামরিক আইন এই বিরোধে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দেয় সেনাবাহিনীকে, কিন্তু বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। মাকোন্দোয় পা রাখা মাত্র সৈন্যরা রাইফেল সরিয়ে রাখে, তারপর কলা কেটে ট্রেন বোঝাই করে সেটা চালু করে দেয়। এতোক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকেরা অপেক্ষা করেই সন্তুষ্ট ছিল, এবার তারা তাদের কাজের হাতিয়ার সেই মেশেটি হাতেই বনে ঢুকে এই অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধেই অন্তর্ঘাতী কাজে নেমে পড়ে। কলার বাগান আর কমিসারিতে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা; মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে পথ করে নেয়া শুরু করেছিল ট্রেনগুলো, ওরা তাতে বাধা দিতে রেলপথ উপড়ে ফেলে, কেটে দেয় টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের তার। সেচকাজের গর্তগুলোয় রক্তের ছোপ লাগে। বিদ্যুতায়িত চিকন তারের জাল ঘেরা জায়গাটার মধ্যে থাকা মি. ব্রাউনকে মাকোন্দো থেকে সরিয়ে ফেলা হয় তার আর তার দেশীভাইদের পরিবারসহ, তারপর একটা নিরাপদ জায়গায় তাদের রাখা হয় সেনাবাহিনীর প্রহরাধীনে। পরিস্থিতিটা যখন একটা রক্তাক্ত আর অসম গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে এমন সময় শ্রমিকদের মাকোন্দোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়ো হতে বলে কর্তৃপক্ষ। সেই আহ্বানে বলা হয়, প্রদেশের সামরিক ও বেসামরিক নেতারা পরের শুক্রবার এসে পৌঁছোবেন এই বিরোধে মধ্যস্থতা করতে।

যেসব শ্রমিক শুক্রবার খুব সকাল থেকেই স্টেশনে এসে জড়ো হয়েছিল তাদের ভিড়ের ভেতরেই ছিল হোসে আর্কাদিও সেগান্দো। ইউনিয়ন নেতাদের একটা মিটিং-এ অংশ নিয়েছে সে এখানে আসার আগে, কর্নেল গাভিলানের সঙ্গে তার ওপর দায়িত্ব পড়েছে ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার। খানিকটা অসুস্থ বোধ হতে থাকে তার, আর তার টাকরায় যখন নোনামতো একটা আঠালো বস্তু দলা পাকাতে শুরু করেছে, এমন সময় সে খেয়াল করে সেনাবাহিনী সেই ছোট্ট স্কোয়ারটার চারপাশে মেশিনগান দাঁড় করানোর মঞ্চ বসিয়েছে, আর কলা কম্পানির তার দিয়ে ঘেরা শহরটা সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে গোলন্দাজ বাহিনীর কামান দিয়ে। যে-ট্রেনটা শেষ পর্যন্ত আর আসবে না সেটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তিন হাজারেরও বেশি লোক–শ্রমিক, মহিলা আর শিশু–দুপুর বারোটার দিকে স্টেশনের সামনের খোলা জায়গাটা থেকে উপচে পড়ে সারি সারি মেশিন গান দিয়ে বেড় দিয়ে রাখা পাশের রাস্তাগুলোর দিকে চেপে আসতে শুরু করে। মনে হয়, এ যেন অপেক্ষারত মানুষজনের ভিড় নয়, বরং আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকা একটা মেলা। তুর্কীদের সড়ক থেকে লোকজন পিঠা আর বিয়ার স্ট্যান্ড নিয়ে এসেছে, অপেক্ষার একঘেয়েমী আর প্রখর রোদের মধ্যেও লোকজনের ভেতর ফূর্তির মেজাজ। তিনটা বাজার খানিক আগে গুজব ছড়িয়ে পড়ে সরকারি ট্রেনটা পরের দিনের আগে আর আসছে না। হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে ভিড়ের ভেতর থেকে। ভিড়ের দিকে মুখ করে চারটে মেশিনগানের মঞ্চ বসানো হয়েছে স্টেশনের ছাদে, সেনাবাহিনীর এক লেফটেন্যান্ট সেখানে উঠে লোকজনকে চুপ করতে বলে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর পাশেই এক মহিলা দাঁড়িয়ে, খালি পা, ভীষণ মোটা, সঙ্গে দুটো বাচ্চা, তাদের বয়স চার থেকে সাতের মধ্যে। ছোটজনকে সে কোলে নিয়ে আছে; হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে না চিনেই সে তাকে বলে সে যেন বড়টিকে ওপরে তুলে ধরে যাতে কথাগুলো সে ভালো করে শুনতে পায়। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো শিশুটিকে কাঁধের ওপর তুলে নেয়। যদিও তখন কেউই তার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু বহু বছর পরেও সেই শিশুটিকে বলতে শোনা যাবে লেফটেন্যান্টকে সে পুরোনো একটা ফনোগ্রাফের শিঙ্গা দিয়ে সেই প্রদেশের সামরিক ও বেসামরিক নেতার ৪ নম্বর ডিক্রিটা পড়তে শুনেছে। জেনারেল কার্লোস কোর্তেস ভার্গাস আর তার সচিব মেজর এনরিক গার্সিয়া ইসাযা-র সই করা ছিল সেটায়; তো, যারা ধর্মঘটে যাচ্ছে তাদেরকে লেফটেন্যান্ট আশি শব্দের তিনটে ধারায় 'এক দঙ্গল রাস্তার গুণ্ডা' বলে ঘোষণা করে, আর তারপর, হত্যার জন্যে গুলি করার অনুমতি প্রদান করে সেনাবাহিনীকে।

ডিক্রিটা পড়া হয়ে যাওয়ার পর, প্রতিবাদের কানে তালা লাগানো চিৎকারের ভেতর সেই লেফটেন্যান্টের জায়গায় এক ক্যাপ্টেন এসে দাঁড়ায় স্টেশনের ছাদে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিঙ্গার সংকেত দিয়ে জানায় সে কিছু কথা বলতে চায়। ফের শান্ত হয়ে আসে জমায়েতটা। নিচু, ধীর আর খানিকটা ক্লান্ত স্বরে ক্যাপ্টেন বলে, 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, পাঁচ মিনিট সময় দেয়া গেল আপনাদেরকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে।'

মিনিট গুনতে শুরু করা বিউগ্‌লের আওয়াজ চাপা পড়ে যায় আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া বিদ্রূপভরা চেঁচামেচির শব্দে। কেউ নড়ে না।

সেই একই সুরে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, 'পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে। আর এক মিনিট, তারপরেই আমরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করবো।'

ঠাণ্ডা ঘাম বেরাতে থাকে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর শরীর থেকে, বাচ্চাটাকে নামিয়ে মহিলার কাছে ফিরিয়ে দেয় সে। বিড়বিড় করে মহিলা বলে, 'ঐ বেজন্মারা কিন্তু গুলি ছুঁড়তেও পারে।' কথা বলার সময় নেই তখন হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর, কারণ সেই মুহূর্তেই মহিলার কথাটারই প্রতিধ্বনি তুলে চিৎকার করে ওঠা কর্নেল গাভিলানের কর্কশ গলাটা চিনতে পারে সে। টানটান উত্তেজনার মাদকতায়, সেই নৈঃশব্দের অলৌকিক গভীরতায়, আর মৃত্যুর সঙ্গে এক আকর্ষণে আটকে যাওয়া জনতাকে কোনোকিছুই এখান থেকে নড়াতে পারবে না এ-ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হয়ে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তার সামনের মাথাগুলোর ওপর নিজের মাথাটা তুলে ধরে, তারপর জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে উঁচু গলায় কথা বলে ওঠে।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'বেজন্মার পাল! ওই বাড়তি মিনিটটা নিয়ে তোরা তোদের পোদের মধ্যে লাগিয়ে রাখ।'

তার সেই চিৎকারের পর এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাতে আতংক নয় বরং এক ধরনের বিভ্রম ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন গুলি ছোঁড়ার আদেশ দেয়, আঠারোটা মেশিনগান এক সঙ্গে তার হুকুম তামিল করে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকেই একটা প্রহসন বলে মনে হয়। মেশিনগানগুলোকে যেন ঢাকনা পরিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, কারণ সেগুলোর হাঁফ ধরানো ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে, ভাস্বর অগ্নিবর্ষণ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, কোনো চিৎকার নয়, এমনকি যে নিবিড় জনতাকে মনে হয় যেন একটা তাৎক্ষণিক অভেদ্যতায় জমে কঠিন হয়ে গেছে সেটার ভেতর থেকে একটা কান্না বা কোনো দীর্ঘশ্বাসেরও শব্দ ওঠে না। হঠাৎ, স্টেশনের একপাশ থেকে একটা মরণ-চিৎকার সেই মন্ত্রমুগ্ধতা ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয়: 'ও, মাগো।' ভূমিকম্পের মতো একটা কণ্ঠ, একটা আগ্নেয় নিঃশ্বাস, একটা মহা বিপর্যয়ের গর্জন বিপুল বিস্তারে ছড়িয়ে পড়ার শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে সেই ভিড়ের কেন্দ্র থেকে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কোনোমতে তুলে নেয় বাচ্চাটাকে, আর ওদিকে মা-টি অন্য বাচ্চাটিকে নিয়ে হারিয়ে যায় আতংকে ঘুরপাক খাওয়া জনতার ভেতর।

হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কিভাবে তাকে তার মাথার ওপর তুলে ধরে প্রায় শূন্যের ভেতর দিয়ে টেনে, যেন সেই জনতার আতংকের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের রাস্তাটার দিকে নিয়ে গিয়েছিল সেকথা সেই শিশুটি বহু বছর পরেও বলবে, যদিও লোকে তখন তাকে এক পাগল বুড়ো মনে করবে। সেই সুবিধেজনক অবস্থানে থাকার সুবাদে শিশুটি সে-সময় দেখতে পেয়েছিল যে সেই উন্মত্ত জনতা যখন কোনাটার দিকে এগোতে শুরু করেছে তখনই মেশিনগানের সেই সারি থেকে শুরু হয়েছিল গুলিবর্ষণ। একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটা গলা, 'শুয়ে পড়ুন! শুয়ে পড়ুন!'

সামনের সারির লোকেরা অবশ্য গুলির লহরীর আঘাতে এরিমধ্যে সে-কাজ সেরে ফেলেছে। শুয়ে পড়ার বদলে জীবিতরা মাঝখানের সেই স্কোয়ারটায় যাওয়ার চেষ্টা করে, আর আতংকটা একটা ড্রাগনের লেজ হয়ে যায়, একটা নিবিড় ঢেউ আরেকটা বিপরীতমুখী ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে, সেটা আবার এগিয়ে যাচ্ছিল অন্য ড্রাগনের লেজটার দিকে রাস্তার অপর পারে, আর সেখানেও বিরামহীন গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছিল মেশিনগানগুলো। প্রবল একটা ঘূর্ণিঝড় হয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘেরাও হয়ে পড়ে ওরা, আর ঘূর্ণিঝড়টা ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত সেটার নাভিতে এসে ঠেকে, কারণ সেটার প্রান্তসীমাটা চারপাশ থেকেই নিয়মবদ্ধভাবে ছেঁটে ফেলা হচ্ছিল, যেন কিছু মেশিনগানের অতৃপ্ত, নিয়মবদ্ধ কাঁচি একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শিশুটি দেখতে পায় এক মহিলা তার হাত দুটো বুকে ক্রুশের মতো জড়ো করে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটা খোলা জায়গায়, আর কী রহস্য, কেউই তাকে মাড়িয়ে যাচ্ছে না। সেই ফাঁকা জায়গাটা, সেই হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মহিলা, সেই উঁচু, খরায় আক্রান্ত আকাশের আলো, আর উরসুলা ইগুয়ারান যে বেবুশ্যে দুনিয়ায় এতো এতো ছোট ছোট মিষ্টির জন্তুজানোয়ার বিক্রি করেছে সেটাকে পর্যন্ত সেই অতিকায় সৈন্যদলটা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো শিশুটিকে ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড় করিয়ে দেয়, আর তারপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় তার রক্তমাখা মুখটা নিয়ে।

যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে, হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তখন অন্ধকারে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সে বুঝতে পারে এক অন্তহীন, নিঃশব্দ ট্রেনে সওয়ার হয়েছে সে, শুকনো রক্তে তার মাথাটা শক্ত হয়ে আছে, আর তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে একটা ব্যথার অনুভূতি। এক অদম্য ইচ্ছে হয় তার ঘুমিয়ে পড়ার। সন্ত্রাস আর আতংক থেকে নিরাপদ অবস্থায়, বেশ কয়েক ঘণ্টার একটা ঘুম দেবার প্রস্তুতি নিয়ে, যে-পাশটায় কম ব্যথা করছে সে-পাশ ফিরে, শুয়ে পড়ে সে, আর তখনই সে বুঝতে পারে যে সে আসলে মরা মানুষজনের গায়ে ঠেস দিয়ে আছে। মাঝখানের আলপথটা ছাড়া গাড়িটায় খালি বলতে কোনো জায়গাই নেই। সেই গণহত্যার পর নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে, তার কারণ শরৎকালের পলেস্তরার মতো তাপমাত্রা লাশগুলোর, শক্ত হয়ে যাওয়া ফোমের মতোই কঠিন, আর লাশগুলো যারা গাড়িতে তুলেছে তারা নিশ্চয়ই কলার ছড়া চালান দেয়ার মতো করেই গাড়িতে ফেলেছিল সেগুলোকে। দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে ট্রেন যেদিকে ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে সেদিক বরাবর নিজেকে এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে টেনে নিয়ে যায় হোসে আর্কাদিও সেগান্দো, আর ঘুমন্ত শহরগুলোর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কাঠের পাত ভেদ করে আলোর যে-ঝলক এসে ভেতরে ঢুকছিল সেই আলোয় সে দেখতে পায় পুরুষের লাশ, নারীর লাশ, শিশুর লাশ; এদের সবাইকে বাতিল কলার মতো ফেলে দেয়া হবে সমুদ্রে। স্কোয়ারে পানীয় বিক্রি করতো যে-মহিলা তাকে আর কর্নেল গাভিলানকে চিনতে পারে সে কেবল, মরেলিয়া সিলভারের বাকলওয়ালা যে-বেল্টটা দিয়ে কর্নেল গাভিলান সেই আতংকের ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে চেয়েছিল সেই বেল্টটা তখনো তার হাতে পেঁচানো। প্রথম গাড়িটায় পৌঁছে অন্ধকারের ভেতর লাফিয়ে পড়ে সে, ট্রেনটা চলে যাওয়া পর্যন্ত রেলপথের পাশেই শুয়ে থাকে। প্রায় দু'শো মাল গাড়ি, দু'মাথায় দুটো আর মাঝখানে আরেকটা লোকোমোটিভ সহ এই ট্রেনটা তার দেখা সবচেয়ে লম্বা ট্রেন। কোনো আলো নেই ট্রেনটায়, এমনকি লাল আর সবুজ রানিং লাইট দুটোও নেই, ফলে একটা নৈশ, সংগোপন গতিবেগে পার হয়ে যায় সেটা। গাড়িগুলোর মাথায় দেখা যায় তাক করা মেশিনগান নিয়ে বসে থাকা সৈন্যদের কালো কাঠামো।

মাঝরাতের পরেই হঠাৎ করে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়জল। কোথায় সে লাফ দিয়ে পড়েছে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো বুঝতে পারেনি, কিন্তু এটুকু সে বোঝে যে ট্রেনটা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিক বরাবর গেলেই মাকোন্দো পৌঁছে যাবে সে। একেবারে কাকভেজা ভিজে, ভয়ানক মাথাব্যথা নিয়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাঁটার পর ভোরের আলোয় প্রথম বাড়িগুলো চিনতে পারে সে। কফির গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হয় সে, এক মহিলা সেখানে কোলে একটি শিশু নিয়ে চুলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

সে বলে ওঠে, 'কী খবর? আমি হোসে আর্কাদিও সেগান্দো।'

সে যে বেঁচে আছে সেকথা মহিলাটিকে বোঝাতে নিজের পুরো নামটা উচ্চারণ করে সে, এক অক্ষর এক অক্ষর করে। কাজটা করে সে ভালোই করে, তার কারণ রক্ত লেগে ময়লা হয়ে যাওয়া মাথা, কাপড়চোপড় আর মৃত্যুর গাম্ভীর্যের পরশলাগা একটা নোংরা ছায়ার মতো তাকে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে মহিলা তাকে ভূত বলে ভেবেছিল। সে তাকে চিনতে পারে। তার কাপড়চোপড় আগুনে শুকোতে দিয়ে গায়ে চাপানোর জন্যে তাকে একটা কম্বল এনে দেয় সে, খানিকটা পানি গরম করে দেয় তার ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করার জন্যে, অবশ্য ক্ষতটা সে-রকম গভীর নয়, আর একটা পরিষ্কার তোয়ালে এনে দেয় মাথায় পট্টি বাঁধার জন্যে। এরপর সে এক মগ চিনিছাড়া কফি এনে দেয় তাকে, কারণ সে জানতো বুয়েন্দিয়ারা চিনিছাড়া কফি খায়, আর তারপর তার কাপড়-চোপড় বিছিয়ে দেয় আগুনের পাশে।

কফি শেষ হওয়ার আগে মুখ খোলে না হোসে আর্কাদিও সেগান্দো।

বিড়বিড় করে সে বলে ওঠে, 'ওখানে নিশ্চয়ই তিন হাজারের মতো ছিল।'

'কী?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মরা মানুষ,' খোলাসা করে বলে সে। 'স্টেশনে যতো লোক ছিল তার সবই নিশ্চয়ই ছিল ওখানে।'

করুণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় মহিলা। বলে, 'এখানে কোনো লোক মারা যায়নি। তোমার দাদা কর্নেলের সময় থেকে মাকোন্দোতে কিছুই ঘটেনি।' বাড়িতে পৌঁছুনোর আগে তিনটে রান্নাঘরে যাত্রা বিরতি করে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো, আর তিন জায়গাতেই ওরা একই কথা বলে তাকে। 'কেউই মারা যায়নি এখানে।' স্টেশনের পাশের ছোট্ট স্কোয়ারটার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটার ওপর আরেকটা স্তূপাকার করে রাখা পিঠার তাকগুলো চোখে পড়ে তার, গণহত্যার কোনো চিহ্নই সেখানে খুঁজে পায় না সে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে জনমনুষ্যিহীন রাস্তার ওপর, বাড়িগুলোয় তালা মারা, ভেতরে কোনো প্রাণের সাড়া নেই। মাস্-এর জন্যে বাজানো প্রথম ঘণ্টার আওয়াজই মানুষজনের একমাত্র নিশানা। কর্নেল গাভিলানের বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দেয় সে। এক পোয়াতি মহিলা, হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তাকে অনেকবার দেখেছে, সে তার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ভয় পেয়ে মহিলা বলে ওঠে, 'ও চলে গেছে। ও তার নিজের দেশে চলে গেছে।' চিকন তারের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা জায়গাটার প্রধান ফটককে যথারীতি দু'জন স্থানীয় পুলিশ পাহারায় আছে, তাদের দেখে মনে হয় বৃষ্টির নিচে তাদেরকে পাথর দিয়ে গড়ে গায়ে রেইনকোট আর পায়ে রাবারের বুটজুতো পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিগ্রোরা তাদের সংকীর্ণ গলিতে শনিবারের স্তবগান গাইছে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো আঙিনার দেয়ালের ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে রান্নাঘর হয়ে বাড়িতে ঢোকে। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ গলাটা প্রায় স্বাভাবিক রেখেই বলে ওঠে, 'ফারনান্দা যেন দেখতে না পায় তোকে। ও কিন্তু এই উঠল বলে।' যেন সে কোনো প্রচ্ছন্ন চুক্তি মোতাবেক কাজ করছে এই ভাবে সে তার ছেলেকে সেই 'চেম্বারপট কামরায়' নিয়ে যায়, মেলকিয়াদেসের ভাঙাচোরা খাটিয়াটা গোছগাছ করে দেয়, আর তারপর বিকেল দুটোর সময়, ফারনান্দা যখন দুপুরের ঘুমটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে, এক থালা খাবার জানলা দিয়ে কামরার ভেতর পাঠিয়ে দেয়।

অরেলিয়ানো সেগান্দো বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিল, তার কারণ বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছিল সে, আর যখন তিনটে বাজে তখনো সে বৃষ্টিটা কখন থামবে সেই আশায় বসে ছিল। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ-এর [illegible] গোপনে খবর পেয়ে মেলকিয়াদেসের কামরায় ভাইকে দেখতে যায় সে [illegible] ত্যার গল্পটা সে বিশ্বাস করে না, সমুদ্রের দিকে যাত্রা করা লাশভরা ট্রেনের [illegible] না। আগের রাতে সে জাতির উদ্দেশে দেয়া একটা অসাধারণ ঘোষণা পড়ে [illegible] তে বলা হয়েছে শ্রমিকরা স্টেশন ত্যাগ করে শান্তভাবে দলে দলে বাড়ি ফি [illegible]। ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে ইউনিয়ন নেতারা মহান দেশাত্মবোধে [illegible] হয়ে তাদের দাবী-দাওয়াগুলো দুটোতে কমিয়ে এনেছে: চিকিৎসা-সেবা [illegible] র আর তাদের থাকার কোয়ার্টারে শৌচাগার নির্মাণ। পরে বলা হয়েছে, শ্র [illegible] সঙ্গে করা এই চুক্তিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়ার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ মি. ব্রাউনের কাছে ছুটে যায় সেকথা জানাতে, আর সে যে নতুন শর্তগুলো কেবল মেনেই নেয় তা নয়, সেই সঙ্গে এই বিরোধ মীমাংসার ঘটনাটি উদ্‌যাপন করার জন্যে তিন দিনের সামাজিক উৎসবের আয়োজন করার খরচ দেবার প্রস্তাবও করে। শুধু, সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন তাকে জিজ্ঞেস করে কবে তারা চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দেবে, তখন সে এমাথা থেকে ওমাথা বিজলির আলোর ছটায় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষম সন্দেহের একটা ভঙ্গি করে।

বলে, 'বৃষ্টি থামলে। যতদিন বৃষ্টি হবে ততদিন আমাদের সব কাজ মুলতুবি থাকবে।'

তিন মাস বৃষ্টি হয়নি, খরা চলছিল। কিন্তু মি. ব্রাউন তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার পর গোটা কলা অঞ্চল জুড়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। মাকোন্দো ফেরার পথে এই ঝড়বৃষ্টিতেই পড়েছিল হোসে আর্কাদিও সেগান্দো। এক হপ্তা পরেও বৃষ্টি থামে না। হাজারবার পুনরাবৃত্তি করা আর সরকারের এক্তিয়ারে যোগাযোগের যেসব উপায় রয়েছে তার সবগুলোর সাহায্যে দেশজুড়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে ছড়িয়ে দেয়া সরকারী ভাষ্যটাই শেষঅব্দি মেনে নেয়া হয়: কেউ মারা যায়নি, সন্তুষ্ট শ্রমিকেরা যার যার বাড়ি ফিরে গেছে, আর কলা কম্পানি বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত সব কাজ মুলতুবি রেখেছে। অন্তহীন বৃষ্টিতে জনসাধারণের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পূরণে জরুরি পদক্ষেপ নেবার দিকে দৃষ্টি রেখে সামরিক আইন বজায় রাখা হয়, তবে সৈন্যরা ব্যারাকেই থাকে। দিনের বেলায় তারা প্যান্টের নিচটা গুটিয়ে সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ায় আর, বাচ্চাদের সঙ্গে নৌকা দিয়ে খেলে। রাতে, টেলিফোন-টেলিগ্রাফে আড়িপেতে খবর সংগ্রহ করার পর, রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে দরজা ভেঙে ফেলে, সন্দেহভাজন লোকজনকে টেনে বের করে নিয়ে আসে বিছানা থেকে, তারপর নিয়ে যায় তাদের সেই যাত্রায় যেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসে না। রাস্তার গুণ্ডা, খুনি, অগ্নিসংযোগকারী, আর চার নম্বর ডিক্রির বিরোধিতাকারীদের সন্ধান আর নিধন চলতেই থাকে, কিন্তু তাদের খবরের খোঁজে কমাডান্টের বাড়ির দরজায় ভিড় জমানো আত্মীয়-স্বজনদের কাছেও সামরিক কর্তৃপক্ষ সে-খবর অস্বীকার করতে থাকে। অফিসাররা বারবার বলে, 'তোমরা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলে। মাকোন্দোতে কিছুই ঘটেনি, কখনোই কিছু ঘটেনি, কখনোই কিছু ঘটবে না। এটা একটা সুখী শহর।' আর এভাবেই য়্যুনিয়ন নেতাদের শেষ করে দিতে সক্ষম হয় তারা।

বেঁচে যায় কেবল হোসে আর্কাদিও সেগান্দো। ফেব্রুয়ারির এক রাতে রাইফেলের কুঁদোর সেই অতিচেনা ঘা শোনা যায় দরজায়। শব্দটা বন্ধ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই অরেলিয়ানো সেগান্দো দরজাটা খুলে দিয়ে দেখতে পায় একজন কমান্ডারের অধীনে ছয়জন সৈন্য বাইরে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির পানিতে কাকভেজা সৈন্যরা একটাও কথা না বলে বৈঠকখানা থেকে ভাঁড়ারঘর পর্যন্ত প্রত্যেক ঘর, প্রত্যেক দেয়াল কুঠুরি খুঁজে দেখে। ওরা উরসুলার ঘরের বাতি জ্বালাতে তার ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে যায়, যতক্ষণ খোঁজাখুঁজি চলে ততক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখে সে, তবে আঙুলগুলো ক্রুশের মতো করে রাখে, সৈন্যরা যেদিক যেদিক যায় ক্রুশটাও তাক করে রাখে সেদিকে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তখন মেলকিয়াদেসের কামরায় ঘুমাচ্ছিল, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ কোনো রকমে তাকে খবর দেয়, কিন্তু সে বুঝে যায় যে দেরি হয়ে গেছে, এখন আর পালানো যাবে না। কাজেই সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ ফের দরজাটায় তালা মেরে দেয়, ওদিকে সে শার্ট আর জুতো পরে খাটিয়ায় বসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। সেই মুহূর্তে ওরা সোনার কামারশালায় খানাতল্লাশি চালাচ্ছিল। অফিসারটি ওদেরকে দিয়ে তালাটা খোলায়, তারপর লণ্ঠনটা সে নিজে চকিতে একবার দোলাতেই কাজ করার বেঞ্চি, এসিডের বোতল রাখার কাচের আলমারি আর কিছু যন্ত্রপাতি তার নজরে পড়ে, ওগুলো ঠিক সেভাবেই আছে যেভাবে ওগুলোর মালিক রেখে গিয়েছিল। অফিসারটি যেন বুঝতে পারে এখানে কেউ থাকে না। সঙ্গত কারণেই সে অরেলিয়ানো সেগান্দোকে জিজ্ঞেস করে সে রুপোর কাজ করে কিনা, তখন অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে বুঝিয়ে বলে যে এটা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কামারশালা। 'ও, আচ্ছা,' বলে অফিসারটি আলো জ্বালিয়ে দেয় আর তারপর এমন তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাবার হুকুম দেয় যে না-গলানো, বোতলগুলোর আড়ালে টিনের ক্যানের ভেতর রাখা, আঠারোটা সোনার মাছ তাদের নজর এড়াতে পারে না। কাজ করার বেঞ্চির ওপর রেখে মাছগুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখার পর অফিসারটির মনটা নরম হয়। সে বলে, 'সম্ভব হলে আমি একটা মাছ রাখতে চাই। এক সময় এগুলো ধবংসের প্রতীক ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন এসব রেলিক হয়ে গেছে।' অফিসারটি বয়সে তরুণ, প্রায় কিশোর, ভয়ের লেশ মাত্র নেই তার মধ্যে, বরং স্বাভাবিক একটা মুগ্ধতার ব্যাপার আছে তার ভেতর যা এর আগে প্রকাশ পায়নি। অরেলিয়ানো সেগান্দো ছোট্ট মাছটা দিয়ে দেয় তাকে। চোখে শিশুসুলভ একটা আলোর দীপ্তি নিয়ে অফিসারটি সেটা তার শার্টের পকেটে পোরে, তারপর বাকিগুলো আবার ক্যানের ভেতর রেখে সেটা যথাস্থানে রেখে দেয়।

সে বলে, 'চমৎকার একটার স্মারক চিহ্ন এটা। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা মানুষ।'

তারপরেও, সেই মানবিকতার উচ্ছ্বাসটুকু তার পেশাগত আচরণে কোনো পরিবর্তন আনে না। আবার তালা মেরে রাখা মেলকিয়াদেসের কামরায় সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ একটা শেষ চেষ্টা করে দেখে। সে বলে, 'একশো বছর হল ওই ঘরে কেউ থাকে না।' অফিসার ওটা খোলার ব্যবস্থা করে, তারপর লণ্ঠনের আলো ফেলে সেটার ভেতর। আলোটা হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর মুখের ওপর দিয়ে চলে যেতে তার আরবীয় চোখ দুটো দেখতে পায় অরেলিয়ানো সেগান্দো আর সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ, তারা বুঝতে পারে এ হল এক উৎকণ্ঠার শেষ আর আরেকটার শুরু যেটার নিরসন হবে কেবল হাল ছেড়ে দেবার মাধ্যমে। অফিসারটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু লণ্ঠন নিয়ে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে যায়, তবে কয়েকটা আলমারিতে স্তূপাকার করে রাখা বাহাত্তরটা চেম্বার পট আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত তার মধ্যে কৌতূহলের কোনো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। তখন সে আলো জ্বলিয়ে দেয়। দেখা যায়, হোসে আর্কাদিও সেগান্দো খাটিয়ার কোনায় বসে আছে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে, এমন গম্ভীর আর চিন্তিত তাকে আর কখনো মনে হয়নি। তার পেছনে রয়েছে ছেঁড়াখোড়া সব বইয়ের তাক, পার্চমেন্টের রোল, আর পরিষ্কার, পরিপাটি কাজ করার বেঞ্চিটায় রয়েছে এখনো নষ্ট না হওয়া কালির কয়েকটা দোয়াত। অরেলিয়ানো সেগান্দো তার শৈশবে এ-ঘরের বাতাসে যে টাটকা, স্বচ্ছ ভাব লক্ষ্য করেছিল, খেয়াল করেছিল যে ধুলোবালি আর ধ্বংস ওখানে থমকে গেছে, যে-ব্যাপারটা কেবল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াই টের পেতো না, ঠিক সেই অবস্থাই তখনো বিরাজ করছে সেখানে। কিন্তু অফিসারের কৌতূহল কেবল চেম্বারপটগুলো নিয়ে।

সে শুধোয়, 'ক'জন লোক থাকে এ-বাড়িতে?'

'পাঁচ জন।'

স্পষ্টতই, ব্যাপারটা অফিসারের মাথায় ঢোকে না। অরেলিয়ানো সেগান্দো আর সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ যেখানে দাঁড়িয়ে তখনো হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে দেখছিল, ঠিক সেখানে তাকিয়ে থেমে যায় সে, আর পরের জনও বুঝতে পারে যে, সৈন্যটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে, যদিও সে তাকে দেখছে না। কর্নেল তখন বাতি নিভিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। যখন সে সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে, অরেলিয়ানো সেগান্দো বুঝতে পারে তরুণ অফিসারটি ঠিক কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার চোখ দিয়েই কামরাটি দেখেছে।

অফিসার সৈন্যদের বলে, 'ঘরটাতে যে গত একশো বছরে কেউ থাকেনি তা নিশ্চিত। ওখানে এমনকি সাপ-টাপও থাকতে পারে।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো নিশ্চিত বুঝে যায় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বহু বছর আগে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যুদ্ধের আকর্ষণ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলাপ করেছিল, আর তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অগুনতি উদাহরণ টেনে এনে তাকে বোঝাতে চেয়েছিল সেই আকর্ষণের কথা। সে তার কথা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যে-রাতে গত কয়েক মাসের উৎকণ্ঠা, জেলের কষ্ট, স্টেশনের আতংক, আর মরা মানুষভর্তি ট্রেনটার কথা ভাববার সময় সৈন্যরা তার দিকে তাকায় কিন্তু তাকে দেখে না, সেদিনই হোসে আর্কাদিও সেগান্দো এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোয় যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া হয় একটা ঠক নয়ত নির্বোধ ছিল। সে একথা বুঝতে পারে না যে যুদ্ধের সময় তার অনুভূতি কী ছিল সেকথা বোঝাতে লোকটা এতো কথা খরচা করেছিল কেন, কারণ সেজন্যে তো একটা শব্দই যথেষ্ট ছিলঃ ভয়। অন্য দিকে মেলকিয়াদেসের কামরায়, অতিপ্রাকৃত সেই আলো, বৃষ্টির শব্দ, অদৃশ্য হয়ে থাকার অনুভূতি, এসবের নিরাপত্তার কারণে সে সেই প্রশান্তিটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় যা সে তার আগের জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও পায়নি, আর তখন তার কেবল যে-ভয়টি থাকে সেটি হল ওরা না তাকে জ্যান্ত কবর দেয়। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ যখন তার প্রতিদিনের খাবার নিয়ে আসে তখন সে তাকে তার আশংকার কথা জানালে সে তাকে কথা দেয় যে এমনকি তার প্রাকৃতিক শক্তির বাইরে গিয়ে হলেও সে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্যে বেঁচে থাকবে যে ওরা তাকে যেন মৃত অবস্থাতেই কবর দেয়। সব ভয় থেকে মুক্ত হয়ে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো তখন মেলকিয়াদেসের পাণ্ডুলিপি অসংখ্যবার খুঁটিয়ে দেখার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে, আর সেগুলো যখন সে বুঝতে পারে না তখনই সে অনেক বেশি আনন্দ পেতে থাকে। বৃষ্টির শব্দ, যা দু'মাস পর অন্য ধরনের নীরবতায় রূপ নিয়েছে, তাতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়, শুধু যে-ব্যাপারটি তার নিঃসঙ্গতায় বাগড়া দেয় তা হল সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ-এর আসা যাওয়া। কাজেই সে তাকে বলে সে যেন তার খাবার জানলার গবরাটের ওপর রেখে যায় আর দরজাটায় তালা মেরে দেয়। পরিবারের বাকি সবাই ভুলে যায় তার কথা, এমনকি ফারনান্দাও; সৈন্যরা তাকে দেখেও চিনতে পারেনি দেখে তার ওখানে থাকা নিয়ে সে আর কোনো আপত্তি তোলেনি। ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর, সৈন্যরা মাকোন্দো ছেড়ে চলে যাওয়াতে অরেলিয়ানো সেগান্দো তালা খুলে দেয়, কারণ বৃষ্টি যতক্ষণ না থামছে ততদিন কথা বলার জন্যে একজন মানুষ খুঁজছিল সে। দরজাটা খুলতেই চেম্বারপটগুলোর জঘন্য আক্রমণের শিকার হয় সে, সেগুলো সব মেঝেতে রাখা, আর সবগুলোই বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দো পড়েই চলেছে সেই অবোধ্য পার্চমেন্টগুলো, এদিকে তার মাথা গ্রাস করে নিয়েছে টাক, তাছাড়া বাতাসটা যে বমি উদ্রেককারী বাষ্পে কটু হয়ে উঠেছে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই তার। দেবদূতদের মতো একটা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে সে। দরজা খোলার শব্দে স্রেফ এক মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকায় সে, আর ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তার ভাই সেই দৃষ্টির ভেতর দেখে নেয় তাদের দাদার বাবার অমোচনীয় নিয়তির পুনরাবৃত্তি।

হোসে আর্কাদিও সেগান্দো শুধু বলে, 'ওখানে তিন হাজারেরও বেশি লোক ছিল। আমি এখন নিশ্চিত, স্টেশনের সবাই ছিল ওখানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার বছর, এগারো মাস, দুই দিন ধরে বৃষ্টি পড়ে। মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতো, সবাই তখন বৃষ্টির এই ধরে আসাটা উদযাপন করার জন্যে ঢোলাঢালা পোশাক পরে চেহারায় একটা স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারকারী ছাপ ফুটিয়ে তুলতো, তবে শিগ্‌গিরই তারা এই বিরতিগুলোকে দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি নামার লক্ষণ বলে ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এক ঝাঁক বিধ্বংসী ঝড়ে আকাশ ভেঙে পড়তো, আর উত্তর থেকে ঘূর্ণিঝড় এসে ঘরের চাল ছুঁড়ে ফেলতো যত্রতত্র, ভেঙে ফেলতো দেয়াল আর উপড়ে নিয়ে যেত কলার বাগানগুলোর শেষ গাছটিকেও। উরসুলার তখন মনে পড়ে যেত যে, অনিদ্রা মহামারীর সময় খোদ সেই দুর্যোগের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল একঘেয়েমি থেকে বাঁচার রসদ। অলসতা যাতে পেয়ে না বসে সেজন্যে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিল যারা অরেলিয়ানো সেগান্দো তাদেরই একজন। একটা মামুলি কাজে সে সেই রাতে বাড়িতে এসেছিল যে-রাতে মি. ব্রাউন ঝড়ের আগল খুলে দিয়েছিল। একটা দেয়ালকুঠুরিতে পাওয়া, আদ্ধেকটা টুটে যাওয়া ছাতা তার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল ফারনান্দা। কিন্তু সে বলেছিল, 'দরকার নেই। ঝড় না থামা পর্যন্ত বসছি আমি।' যদিও সেটা কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল না, কিন্তু সেটা সে আক্ষরিক অর্থেই পালন করবে। তার কাপড়চোপড় সব পেত্রা কোতেসের ওখানে থাকায় প্রতি তিন দিন অন্তর গায়ের পোশাক খুলে রেখে হাফ প্যান্ট পরে বসে থাকতো সে কাপড়গুলো ধুয়ে আসার জন্যে। যাতে একঘেয়ে না লাগে সেজন্যে বাড়ির যতো মেরামতির কাজ দরকার ছিল সেই সব করতে লেগে পড়ে সে। কব্জাগুলো ঠিক করে, তালায় তেল দেয়, দরজার কড়ার স্ক্রু শক্ত করে এঁটে দেয়, চৌকাঠের বাজু সমান করে ফেলে র‍্যাঁদা মেরে। যন্ত্রপাতির একটা বাক্স হাতে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় বহুদিন, সেটা নিশ্চয়ই হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার সময়ে জিপসিরা ফেলে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু কেউই ঠিক করে বলতে পারে না যে অনিচ্ছাকৃত ব্যায়াম, নাকি শীতকালীন ক্লান্তি, নাকি ইচ্ছাকৃত খাদ্য বর্জন, কোন কারণে তার পেটটা চামড়ার মশকের মতো একটু একটু করে কমে আসে, পরম তৃপ্ত কচ্ছপের মতো তার মুখটায় রক্তরাঙা ভাবটা কমে যায়, দোতলা থুতনিটা মিলিয়ে যেতে যেতে শরীরের সব জায়গার স্থূলত্বে ভাটা পড়ে আর শেষ পর্যন্ত নিজের জুতোর ফিতে নিজে লাগাতে তার কোনো অসুবিধাই থাকে না। তাকে হুড়কো লাগাতে আর ঘড়ি মেরামত করতে দেখে ফারনান্দা ভাবে এই লোকটাকেও কি শেষ অব্দি জিনিস গড়ার রোগে পেতে যাচ্ছে কিনা যাতে সেগুলো নিয়ে সে ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে উঠতে পারে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আর তার সোনার ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট মাছের মতো, আমারান্তা আর তার কাফনের কাপড় আর বোতামগুলোর মতো, হোসে আর্কাদিও আর তার পার্চমেন্ট, উরসুলা আর তার স্মৃতির মতো। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হল বৃষ্টি চড়াও হয়েছিল সবকিছুর ওপরই, তিন দিন অন্তর তেল না পড়লেই সবচেয়ে শুকনো যন্ত্রের গিয়ারের ভেতর থেকেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো ফুল, বুটিদার রেশমি পোশাকের সুতোয় মরিচা ধরে যাচ্ছিল, আর ভেজা কাপড়গুলোতে প্রাদুর্ভাব ঘটছিল নানান রঙের ছত্রাকের। বাতাস এমনই ভেজা ভেজা হয়ে উঠেছিল যে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর মাছ এসে এ-ঘরের ও-ঘরের বাতাসে ভাসতে ভাসতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেত সাঁতার কেটে। প্রশান্ত একটা মূর্ছার ভেতর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে এ-রকম একটা অনুভূতি নিয়ে এক সকালে ঘুম ভেঙে যায় উরসুলার, আর সে যখন ওদেরকে বলেও ফেলেছে যে খাটিয়ায় শুইয়ে নিতে হলেও ওরা যেন তাকে ফাদার আন্তোনিও ইসাবেলের কাছে নিয়ে যায় এমন সময় সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ আবিষ্কার করে উরসুলার পিঠটা জোঁকে ভরে গেছে! রক্ত চুষে উরসুলকে শেষ করে দেয়ার আগেই একটা একটা করে জোঁকগুলো খসিয়ে ফেলে সে, তারপর একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরোর ওপর রেখে পিষে মারে ওগুলোকে। বাড়ির ভেতর থেকে পানি বের করে ফেলতে আর সেটাকে ব্যাঙ, শামুকের হাত থেকে রক্ষা করতে খাল কাটার দরকার হয়ে পড়ে, যাতে মেঝেগুলো শুকিয়ে ফেলে খাটের পায়ার নিচ থেকে ইট সরিয়ে নেয়া যায় আর ফের হাঁটা যায় খালি পায়ে। অগুনতি যে খুঁটিনাটি বিষয় তার মনোযোগের অপেক্ষায় পড়ে ছিল সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অরেলিয়ানো সেগান্দো বুঝতেই পারেনি যে সে বুড়ো হচ্ছে, যদ্দিন পর্যন্ত না এক বিকেলে একটা দোলকেদারায় বসে অকাল সন্ধ্যানি নিয়ে ভাবতে থাকে সে, আর, কোনোরকম শিহরণ বোধ না করেই চিন্তা করে যায় পেত্রা কোতেসের কথা। ফারনান্দার নীরস প্রণয়পাশে ফিরে যাওয়াটা কোনো বিষয়ই হতো না, কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যে একটা গাম্ভীর্য যোগ হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টিটা তাকে তার কামেচ্ছার সব ধরনের তাড়া থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে পূর্ণ করে দিয়েছিল ক্ষুধা মন্দার একটা জলশোষক প্রশান্ততায়। ততদিনে প্রায় এক বছর ধরে ঝরতে থাকা এই বৃষ্টি যদি তার সেই সব হারানো দিনে পড়তো তাহলে সে কী করতো সেকথা ভেবে মজা পাচ্ছিল সে। স্রেফ পেত্রা কোতেসের শোবার ঘরে ছাউনি দিতে, আর বৃষ্টির ফোঁটা সে-সময়ে যে গভীর অন্তরঙ্গতার অনুভূতি তৈরি করতো সেটা উপভোগ করতে মাকোন্দোতে প্রথম দস্তার শীট এনেছিল সে-ই, কলা কম্পানি জিনিসটাকে জনপ্রিয় করে তোলার অনেক আগেই। কিন্তু তার পাগলপারা যৌবনের বুনো স্মৃতিগুলো পর্যন্ত তাকে জাগাতে পারে না, ঠিক একইভাবে, শেষ পানোৎসবের সময় তার লাম্পট্যের বরাদ্দটুকু খরচা করে ফেলার পর তার হাতে যা অবশিষ্ট থাকে তা হল কোনোরকম তিক্ততা বা অনুতাপ ছাড়াই ঘটনাটার কথা মনে রাখার অসাধারণ উপহারটুকু। একথাও ভাবা যেতে পারতো যে এই মহাপ্লাবনটা তাকে বসে বসে ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল, আর, প্লায়ার্স ও তেলের ক্যানের কারবারটা তার মধ্যে নানান ধরনের সেই সব কেজো ব্যবসা-পাতির মন্থর ইচ্ছে জাগিয়ে তুলছিল যেগুলো সে হাতে নিতে পারতো কিন্তু নেয়নি; কিন্তু এর কোনোটিই সত্যি নয়, কারণ ঘরে বসে বসে দিন কাটানোর যে-লোভটা তাকে পেয়ে বসছিল সেটা কোনো পুনরাবিষ্কার বা নৈতিক শিক্ষার ফল নয়। সেটা এসেছিল আরো অনেক দূর থেকে; মেলকিয়াদেসের কামরায় বসে সে যখন উড়ন্ত গালিচা আর সমস্ত নাবিকসহ গোটা একটা জাহাজ খেয়ে প্রাণধারণ করা তিমিদের আজগুবি সব উপাখ্যান পড়তো সেই সব দিন থেকে বৃষ্টির আঁকশি দিয়ে টেনে আনা হয়েছিল সেটাকে। এই রকম সময়েই, কোনো এক অসাবধান মুহূর্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ছোট্ট অরেলিয়ানো, তার নানার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার গোপন পরিচয়। সে তার চুল কেটে দেয়, গায়ে জামাকাপড় চড়ায়, লোকজনকে ভয় না পেতে শেখায়, আর খুব শিগ্‌গিরই তার চোখের নিচের উঁচু হাড়, বিস্ময়মাখানো দৃষ্টি আর তার নির্জনতাপ্রিয় স্বভাব থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় সে এক খাঁটি বুয়েন্দিয়া। ফারনান্দার জন্যে স্বস্তি বয়ে আনে ব্যাপারটা। সে তার আত্মাভিমানের সীমার একটা পরিমাপ করছিল কিছু দিন ধরে, কিন্তু সেটার কোনো প্রতিষেধক খুঁজে পায়নি সে, কারণ যতোই সে সমাধান নিয়ে ভেবেছে ততোই তা আরো অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে তার কাছে। অরেলিয়ানো সেগান্দো যে এক পিতামহের নির্মল আনন্দ নিয়ে ব্যাপারটাকে এভাবে গ্রহণ করবে এটা আগে জানা থাকলে এতো আঁকাবাঁকা পথ বেছে নিতো না ফারনান্দা, সবকিছু এমন তালগোলও পাকিয়ে ফেলতো না, বরং আগের বছর সে যে-যন্ত্রণা ভোগ করেছে তা থেকে রেহাই দিতে পারতো নিজেকে। এরিমধ্যে দ্বিতীয় দাঁতের অধিকারী বনে যাওয়া আমারান্তা উরসুলা তার ভাইপোকে মনে করে একটা ছোটাছুটি-করা খেলনা, বৃষ্টির একঘেয়েমির ভেতর একটা সান্ত্বনার মতো। এই সময় অরেলিয়ানো সেগান্দোর মনে পড়ে সেই ইংরেজি বিশ্বকোষটার কথা, মেম্‌-এর পুরনো ঘরে যেটা কবে থেকে খামোখাই পড়ে আছে। বাচ্চাদের সে ছবি দেখাতে শুরু করে, বিশেষ করে জন্তু জানোয়ারের ছবি, পরের দিকে মানচিত্র, দূর-দূরান্তের নানান দেশ আর বিখ্যাত লোকের ছবি। ইংরেজিটা একেবারেই জানা না থাকায়, আর কেবলমাত্র খুব বিখ্যাত শহর বা লোকজনের ছবি ছাড়া অন্য সব কিছু তার অচেনা বলে, বাচ্চাদের অনন্ত কৌতূহল মেটাতে তাকে নানান নাম আর গল্প-কাহিনী ফাঁদতে হতো।

ফারনান্দা সত্যি সত্যিই ধরে নেয় যে উপপত্নীর কাছে ফিরে যাবার জন্যে তার স্বামী বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছে। বৃষ্টির প্রথম মাসগুলোয় সে এই ভেবে ভয় পাচ্ছিল যে তার স্বামী হয়ত তার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালাবে আর তখন লজ্জার মাথা খেয়ে লোকটাকে তার বলতে হবে যে আমারান্তা উরসুলার জন্মের পর থেকেই সে তার সঙ্গে আগের সম্পর্কে ফিরে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে সে যে উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি চালাচালি শুরু করেছিল তা কেবল এ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেই, যদিও ডাক-ব্যবস্থার ঘনঘন বিপর্যয়ে কাজটায় বাধা পড়েছিল। গোড়ার দিকে যখন জানা গেল বৃষ্টির মধ্যে ট্রেন লাইন থেকে পিছলে যাচ্ছে, তখন একটা চিঠিতে চিকিৎসকেরা তাকে জানায় তার ট্রেনটা আর আসছে না। পরে যখন অচেনা পত্রলেখকদের সঙ্গে তার যোগাযোগটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে সত্যি সত্যিই একবার ঠিক করে যে সেই রক্তাক্ত কার্নিভালে তার স্বামী যে-মুখোশটা পরেছিল সেটা পরে আর একটা ছদ্মনাম নিয়ে কলা কম্পানির চিকিৎসকদের দিয়ে নিজের শরীরটা পরীক্ষা করাবে। কিন্তু প্রতিদিনই যারা এই মহাপ্লাবনের নানান আজেবাজে খবর নিয়ে আসতো তাদেরই একজন যখন তাকে জানায় যে, বৃষ্টি নেই এমন এটা জায়গায় কম্পানি তার ডিসপেনসারিগুলো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সে আশা ছেড়ে দেয়। বৃষ্টি থামার আর ডাক-ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আশার অপেক্ষাই করতে থাকে সে, আর এর মধ্যে সে তার গোপন ব্যাধি থেকে আরাম খুঁজতে থাকে একটা কাল্পনিক ব্যবস্থার সাহায্যে, কারণ মরে গেলেও সে মাকোন্দোর সবেধন নীলমণি ডাক্তারটির কাছে যেতো না: লোকটা এক বর্বর ফরাসী, গাধার মতো ঘাস খায় কেবল। ফারনান্দা বরং উরসুলার কাছে ঘেঁষে, ভাবে সে হয়ত তার ব্যাধির উপশম ঘটানোর মতো কিছু দিতে পারবে। কিন্তু যে-জিনিসের যে-নাম সেটাকে সে-নামে না ডাকার বদঅভ্যাসের কারণে আগের ব্যাপারটাকে সে বলে গিয়ে শেষে, আর বিষয়টাকে কম লজ্জাজনক করার জন্যে 'বেরিয়ে হওয়া'কে 'নির্গত করা', আর 'মাসিক'কে 'জ্বালা-যন্ত্রণা' বলে বর্ণনা করায়ও উরসুলা এই যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে ফারনান্দার সমস্যাটা জরায়ু সংক্রান্ত নয়, আন্ত্রিক; তখন সে তাকে খালি পেটে পারদ-এর এক দাগ ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেই যন্ত্রণাটা না হলে বৃষ্টিটা নিয়ে ফারনান্দার কোনো মাথাব্যথা থাকতো না, কারণ শত হলেও তার সারা জীবনটাইতো এমনভাবে কেটেছে যেন সবসময়ই বৃষ্টি পড়ছে, তাছাড়া এই যন্ত্রণার ভেতরেও তার জন্যে লজ্জাজনক কিছু থাকতো না যদি সে লজ্জা-রোগেরও রোগী না হতো। সে অবশ্য তার কাজকর্মের সময়সূচী বা তার আচার-অনুষ্ঠানে কোনো পরিবর্তন আনে না। ইট দিয়ে টেবিলগুলো উঁচু করা অবস্থাতেই, আর টেবিলে বসলে পা যাতে পানিতে ভিজে না যায় সেজন্যে তক্তার ওপর চেয়ার থাকাকালীনও সে লিনেনের টেবিল-ঢাকা, খাঁটি চীনামাটির বাসন-কোসন, আলো-জ্বালানো মোমবাতি সহযোগে খাবার পরিবেশন করতো, কারণ সে মনে করতো দুর্যোগ-বিপর্যয়কে রীতিনীতির ব্যাপারে শৈথিল্য দেখানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। রাস্তাঘাটে তখন কেউই আর বেরোতো না। ব্যাপারটা যদি ফারনান্দার ওপর নির্ভর করতো তাহলে অবশ্য কখনোই তা করতো না কেউ, শুধু যে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকে তা নয়, বরং তার অনেক আগে থেকেই, কারণ, সে মনে করতো দরজা আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা বন্ধ করে ভেতরে থাকার জন্যে, আর রাস্তায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার কৌতূহলটা রীতিমতো বেশ্যাসুলভ। তারপরেও যখন তাদের বলা হয় যে কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস-এর শবযাত্রা বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন সে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই প্রথম বাইরে তাকায়, আর যদিও সে আধখোলা একটা জানলা দিয়ে তাকায় কিন্তু দৃশ্যটা তাকে এমনই যন্ত্রণাবিদ্ধ করে যে নিজের এই দুর্বলতার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অনুতাপ করে সে।

এর চেয়ে বিষণ্ন শবযাত্রার কথা সে ভাবতে পারতো না কোনোদিন। কফিনটাকে একটা গরুর গাড়ির ওপর রাখা হয়েছে, গরুর গাড়িটার ওপর কলাপাতার একটা চাঁদোয়া টাঙানো, কিন্তু বৃষ্টির এমনই তোড় আর রাস্তা এমনই কাদাটে যে প্রতি পদে গাড়ির চাকা আটকে যাচ্ছে আর আচ্ছাদনটা ভেঙে পড়বার উপক্রম হচ্ছে। কফিনের ওপর ঝরে পড়া বিষণ্ন ধারাপাত ওটার ওপর বিছানো পতাকাটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, আসলে সেটা রক্ত আর বারুদের দাগ-লাগা সেই পতাকা যেটা সাবেককালের আরো সম্মানীয় সৈনিকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কফিনের ওপর ওরা আরো রেখেছে রুপো আর তামার ঝালর লাগানো একটা তরবারি, কর্নেল জেরিনাল্দো মার্কেস যেটা কোট-র‍্যাকের ওপর রাখতো নিরস্ত্র অবস্থায় আমারান্তার সেলাই ঘরে যাওয়ার জন্যে। গরুর গাড়ির পেছনে কিছু লোক, তাদের কারো কারো পা খালি, কিন্তু সবারই প্যান্ট গোটানো, কাদা ভেঙে চলেছে নীয়ারলান্দিয়ায় আত্মসমর্পণের জীবিত শেষ ক'জন, তাদের এক হাতে গবাদি পশুর ব্যবসায়ীদের লাঠি, আরেক হাতে বৃষ্টিতে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাগুজে ফুলের তোড়া। এখনো কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার নামেই পরিচিত সেই সড়কটার ওপরে তাদেরকে একটা অবাস্তব দৃশ্যের মতো মনে হয়, স্কোয়ারের কোনাটা অতিক্রম করে মোড় ঘোরার সময় তারা সবাই একবার বাড়িটার দিকে তাকায়, আর এইখানটাতেই তাদের সাহায্যের দরকার হয়ে পড়ে আটকে যাওয়া গাড়িটাকে নড়াবার জন্যে। উরসুলার কথায় তাকে দরজার কাছে নিয়ে আসে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ। শবমিছিলটার বাধাবিপত্তি উরসুলা এমন মনোযোগ নিয়ে অনুসরণ করে যে, সে যে ঘটনাটা দেখছে এ-ব্যপারে কারো মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয় না, বিশেষ করে এই কারণে যে, দেবদূতীয় বার্তাবাহকের মতো তার ওঠানো হাতটা গরুর গাড়ির দুলুনির সঙ্গে তাল রেখেই নড়ছিল।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'বিদায়, জেরিনাল্দো, বাপ আমার। আমার লোকজনকে শুভেচ্ছা দিস, আর তাদের বলিস বৃষ্টি থামলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে আমার।'

অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে বিছানায় ফিরে যেতে সাহায্য করে, তারপর, বরাবরই যে-রকম স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছে সে, সেভাবেই উরসুলাকে জিজ্ঞেস করে তার এই বিদায় জানানোর মানে কী।

উরসুলা বলে, 'কথাটা সত্যি। মরার জন্যে আমি বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় আছি।'

রাস্তার অবস্থা অরেলিয়ানো সেগান্দোকে শংকিত করে তোলে। তার জন্তু-জানোয়ারগুলোর কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত চিন্তা হয় তার, ফলে মাথায় একটা অয়েলক্লথ ফেলে হাজির হয় পেত্রা কোতেসের বাড়ি। উঠোনেই তাকে পেয়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে, পেত্রা কোতেস তখন কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়ার মৃতদেহ ভাসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। একটা লিভার নিয়ে তাকে সাহায্য করে অরেলিয়ানো সেগান্দো, ফুলে ওঠা সেই প্রকাণ্ড শরীরটা ঘণ্টার মতো একটা পাক খায়, তারপর তরল কাদার প্রবল স্রোতে ভেসে যায়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকে পেত্রা কোতেস একটা কাজই করেছে কেবল, আর সেটা হল তার উঠোন থেকে মরা জন্তু পরিষ্কার করা। প্রথম কয়েক হপ্তা অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছে বার্তা পাঠিয়েছে, সে যেন ত্বরিত একটা ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু সে জবাব দিয়ে গেছে তাড়াহুড়োর কিছু নেই, অবস্থা এমন কিছু আশংকাজনক নয়, বর্ষা কেটে গেলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার মেলা সময় পাওয়া যাবে। পেত্রা কোতেস তাকে খবর পাঠিয়েছে যে ঘোড়ার চারণভূমিটা পানিতে ডুবে গেছে, গবাদিপশুগুলো উঁচু এলাকায় পালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে খাবার বলতে কিছু নেই, ওদের জীবন নির্ভর করছে জাগুয়ার আর রোগবালাইয়ের করুণার ওপর। অরেলিয়ানো সেগান্দো জবাব পাঠিয়েছে, 'কিছুই করার নেই। বৃষ্টি থেমে গেলে আরো জন্মাবে।' দলে দলে জন্তুগুলোকে মরতে দেখেছে পেত্রা কোতেস, কাদায় আটকে যাওয়া পশুগুলোকেই কেবল জবাই করতে পেরেছে সে। যে-সম্পদকে মাকোন্দোতে একসময় সবচেয়ে বড় আর অক্ষয় বলে মনে করা হতো এই মহাপ্লাবন কী করে সেটাকে শেষ করে দিচ্ছে আর কী করে শেষ অব্দি সেটার ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই থাকল না তা প্রশান্ত অক্ষমতা নিয়ে দেখে গেছে সে। অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন ব্যাপারটা দেখে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তখন আস্তাবলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটা ঘোড়া আর একটা নোংরা খচ্চরের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই পায় না সে। পেত্রা কোতেস তাকে আসতে দেখে অবাক, খুশি, বিরক্ত কোনোটাই হয় না, কেবল শ্লেষভরা একটা হাসি হাসে।

বলে, 'সময় প্রায় হয়ে এসেছে।'

বয়স হয়ে গেছে পেত্রা কোতেসের, গায়ে চামড়া আর হাড় ছাড়া কিছু নেই, আর বৃষ্টির দিকে এতো চেয়ে থাকতে থাকতে মাংসাশী প্রাণীর মতো ক্রমশ সরু হয়ে আসা তার চোখে বিষণ্নতা আর বশ্যতার ছায়া দেখা দিয়েছে। তিন মাসেরও বেশি সময় পেত্রা কোতেসের বাড়িতে থেকে যায় অরেলিয়ানো সেগান্দো, এজন্যে নয় যে ওখানে সে তার বাড়ির চেয়ে বেশি ভালো বোধ করে, বরং এই জন্যে যে অয়েলক্লথের টুকরোটা ফের মাথার ওপর ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে ঐ তিনমাস সময়ের দরকার হয় তার। অন্য বাড়িতে যেমন বলেছিল এখানেও সে বলে, 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আশা করছি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টিটা কেটে যাবে।' সময় আর বৃষ্টি তার উপপত্নীর শরীর-স্বাস্থ্যে যে যে ক্ষতি করেছে সে-সবের ব্যাপারে পয়লা হপ্তার ভেতরেই ওয়াকিবহাল হয়ে যায় সে, একটু একটু করে সে তাকে আগের মতো করে দেখতে থাকে, মনে করতে থাকে তার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরা বাড়াবাড়িগুলো, আর তার ভালোবাসা জন্তুগুলোর মধ্যে যে উন্মত্ত উর্বরতা তৈরি করেছিল সেকথা। দ্বিতীয় হপ্তার এক রাতে খানিকটা ভালোবাসা খানিকটা কৌতূহলের কারণে আবেগভরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলিঙ্গনে সে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। পেত্রা কোতেসের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। বিড়বিড়িয়ে সে বলে, 'ঘুমোও তো। এখন এসবের সময় নয়।' সিলিং-এর আয়নায় নিজেকে দেখে অরেলিয়ানো সেগান্দো, দেখে শুকনো এক ছড়া স্নায়ু বরাবর গাঁথা এক সারি স্পূল-এর মতো পেত্রা কোতেসের মেরুদণ্ড, উপলব্ধি করে, সে ঠিকই বলেছে, তবে কারণটা সময় নয়, কারণ তারা নিজেরাই, যাদের আর এখন এসব করার বয়স নেই।

শুধু উরসুলাই নয়, মাকোন্দোর তাবৎ বাসিন্দাই যে মরার জন্যে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় আছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো তার তোরঙ্গগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সেই সময়-ই লোকগুলোকে দেখে সে, বৈঠকখানায় বসে আছে সবাই, চোখে ঘোরলাগা দৃষ্টি, বাহু দুটো ভাঁজ করা, অনুভব করছে তারা নিরবচ্ছিন্ন সময়ের বয়ে যাওয়া, অন্তহীন সময়, কারণ কেবল বৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হলে সময়কে মাস আর বছরে, দিনগুলোকে ঘণ্টায় ভাগ করার কোনো মানে হয় না। বাচ্চারা অরেলিয়ানো সেগান্দোকে সোল্লাসে স্বাগত জানায় কারণ সে তাদের জন্যে ফের সেই হাঁপানীগ্রস্ত অ্যাকোর্ডিয়ানটা বাজাচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বকোষ নিয়ে বসা আসর তাদেরকে যতটা টানে কনসার্টগুলো তাদের ততটা টানে না, কাজেই তারা ফের জমায়েত হয় মেম্-এর কামরায়, সেখানে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কল্পনা উড়োজাহাজকে বানিয়ে ফেলে মেঘের ভেতর ঘুমোনোর জায়গা খুঁজতে থাকা একটা উড়ুক্কু হাতি। একবার, পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ করে ঘোড়ার পিঠে চড়া এক লোকের দেখা পায় সে, লোকটার গায়ে অদ্ভুত পোশাক-আশাক থাকলেও তাকে যেন চেনা চেনা লাগে তার, খুব কাছে থেকে তাকে পরীক্ষা করার পর সে এই সিদ্ধান্তে আসে যে ওটা আসলে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ছবি। সে সেটা ফারনান্দাকে দেখায়, আর সেও ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে যে কেবল কর্নেলেরই মিল খুঁজে পায় তা নয়, মিল খুঁজে পায় পরিবারের সবার সঙ্গে, যদিও আসলে লোকটা ছিল এক তাতার যোদ্ধা। এভাবেই কলোসাসের রোড্‌স আর সাপুড়েদের সঙ্গে দিন কেটে যায়, যদ্দিন পর্যন্ত না তার বৌ এসে একদিন বলে ভাঁড়ার-ঘরে আর মাত্র তিন পাউন্ড শুকনো মাংস আর এক বস্তা চাল রয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করে, 'তা, আমাকে এখন কী করতে হবে?'

ফারনান্দা জবাব দেয়, 'তার আমি কী জানি। এটাতো পুরুষ মানুষের কাজ।'

অরেলিয়ানো সেগান্দো বলে, 'বেশতো, বৃষ্টি থামলে একটা কিছু করা যাবে'খন।'

গেরস্থালি সমস্যার চেয়ে বিশ্বকোষের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ তার, এমনকি দুপুরের খাওয়ার সময় যখন তাকে এক টুকরো মাংস আর খানিকটা ভাত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তখনো। সে কেবল বলবে, 'এখন কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। সারা জীবন তো আর বৃষ্টি হতে পারে না।' ভাঁড়ার ঘরের জরুরী অবস্থা যতই তীব্র হয়, ফারনান্দার ক্ষোভও ততই বাড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চরম ক্ষোভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বিরল তর্জন-গর্জন বেরিয়ে আসে এক উপচে-পড়া, শেকল-ছেঁড়া খরস্রোতের মধ্যে দিয়ে, আর তা শুরু হয় এক সকালবেলা, গিটারের একঘেয়ে গুনগুন সুরের মতো, আর দিন যতই গড়াতে থাকে সেটার তীক্ষ্ণতাও ততই বাড়তে থাকে, হয়ে উঠতে থাকে আরো চমৎকার, আরো দুর্দান্ত। তারপরেও এই শোকবিলাপ অরেলিয়ানো সেগান্দোর কানে ঠিকমতো পৌঁছোয় না, কিন্তু সকালের নাশতা খাওয়ার পর, এরিমধ্যে বৃষ্টির শব্দের চেয়ে আরো তরল আরো প্রবল হয়ে আসা একটা গুনগুন আওয়াজ তার বিরক্তির কারণ ঘটায়; আসলে ফারনান্দার গলার আওয়াজ সেটা, সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আর অনুযোগ করে চলেছে এই বলে যে কোথায় ওরা তাকে গড়েপিটে তুলেছিল রানী হওয়ার জন্যে, অথচ শেষমেষ সে হয়েছে কিনা এক পাগলা গারদের চাকরানী, যার স্বামী একটা অলস, মূর্তিপূজারী, লম্পট, সারাদিন যে কিনা এই আশায় শুয়ে শুয়ে কাটায় যে কখন স্বর্গ থেকে রুটি বৃষ্টি হবে, ওদিকে সে তার জানটা কয়লা করে ফেলছে পিন দিয়ে জোড়া দিয়ে রাখা একটা সংসার ভাসিয়ে রাখতে, যে-সংসারে ঈশ্বর তাঁর সকালবেলার আলো দেবার পর থেকে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত এতো কাজ রয়েছে, এতো কিছু রয়েছে মেরামত করার এতো কিছু রয়েছে সহ্য করার যে শেষ পর্যন্ত সে যখন সেই বিছানায় পৌঁছোয় তার চোখ দুটো ভরে ওঠে গুঁড়ো কাচে, অথচ তারপরেও কেউ কোনোদিন তাকে বলেনি, 'সুপ্রভাত, ফারনান্দা, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?' এমনকি সৌজন্য করেও একথা শুধোয়নি কেউ যে তাকে কেন ফ্যাকাশে লাগছে কিংবা কেন তার চোখের নিচে কালি পড়েছে, যদিও মনে মনে সে সবসময়ে চেয়েছে কথাটা তাকে সেই পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করুক যে-পরিবার তাকে আগাগোড়াই একটা উপদ্রব, পুরনো ন্যাকড়া, দেয়ালে আঁকা নির্বোধের ছবি বলে ভেবেছে, আর যারা সবসময়ই তার নামে গীবত করে বেড়িয়েছে, বলেছে সে নাকি গির্জার ইঁদুর একটা, ভণ্ড, শঠ, আর এমনকি আমারান্তা পর্যন্ত, ঈশ্বর তাকে শান্তিতে রাখুন, প্রকাশ্যেই বলেছে সে হল সেই সব লোকের একজন যারা কিনা তাদের পাছা আর পায়খানার তফাৎ ধরতে পারে না, ঈশ্বর এসব কথা ক্ষমা করুন, অথচ সে এসব বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করে গেছে 'পবিত্র পিতা'র কারণে, কিন্তু সেই শয়তান হোসে আর্কাদিও সেগান্দো যেদিন বলল যে এই সংসারের সর্বনাশ সেদিনই নেমে এসেছে যেদিন তারা এক নাকউঁচু পাহাড়ীর জন্যে এ-বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে সেদিন সে আর সহ্য করতে পারেনি, ভাবো একবার, এক নাকউঁচু পাহাড়ী, প্রভু ক্ষমা করুন, দুরাত্মা এক পাহাড়ী কন্যা যে কিনা সরকার যাদের পাঠিয়েছিল শ্রমিকদের খুন করতে তাদেরই মতো খুনে স্বভাবের, বলো দেখি, আর হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কিনা অন্য কাউকে নয় তাকে, আলবা'র ডিউকের ধর্মসন্তানকে লক্ষ্য করেই বলেছিল কথাগুলো, বলেছিল এমন এক বংশের নারীকে যে কিনা প্রেসিডেন্টের বউদেরও পিলে চমকে দিয়েছিল, বলেছিল তার মতো খাঁটি রক্তের এক অভিজাত রমণীকে, যার এক্তিয়ার রয়েছে এগারোটা উপদ্বীপের এগারোটা পরিবারের উপাধি ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার, যে-এক্তিয়ার অন্য কারোর নেই, আর যে কিনা এই বেজন্মার দঙ্গলে ভরা শহরে একমাত্র মানুষ যে ষোল পীসের রুপোর বাসনকোসন দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, আর তাতে তার লম্পট স্বামী পেট ফাটানো হাসি হাসতে হাসতে বলতে পেরেছিল এতো ছুরি, কাঁটা আর চামচ কোনো মনুষ্যসন্তানের জন্য নয়, শত পা বিশিষ্ট প্রাণীর জন্যে, যে কিনা তার চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে কখন, কোন পাশে, কোন গেলাশে হোয়াইট ওয়াইন পরিবেশন করা হয়েছে, কখন, কোন পাশে, কোন গেলাশে দেয়া হয়েছে রেড ওয়াইন, মোটেও সেই গেঁয়ো আমরান্তার মতো নয়, সে শান্তিতে ঘুমোক, যে ভাবতো হোয়াইট ওয়াইন পরিবেশন করা হয় দিনের বেলা, রেড ওয়াইন রাতের বেলা, আর পুরো উপকূলে যে কিনা একমাত্র মানুষ যে এই নিয়ে গর্ব করতে পারে যে তার শারীরিক প্রয়োজনে কেবল সোনার চেম্বারপটই ব্যবহার করে, যে-কারণে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, তা সে-লোকটা শান্তিতে ঘুমোক, তার অভিজাত বদমেজাজের সঙ্গে এ-কথা জিজ্ঞেস করার সাহস পেয়েছিল এই অভ্যাস সে কোথায় রপ্ত করেছে আর সে কি গু হাগু করে নাকি সুগন্ধী পুদিনা হাগু করে, একবার চিন্তা করে দেখো, কী কথা বলেছিল সে, আর রেনাতা, তার নিজের মেয়ে, যে কিনা একবার তাদের বেখেয়ালে শোবার ঘরে তার পায়খানা করার আসনটা দেখে ফেলে বলেছিল পটটা আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরি হলেও, আর তাতে বংশের কুল চিহ্ন আঁকা থাকলেও ওটার ভেতরে যা আছে তা হল নির্জলা গু, বাস্তব গু, তা-ও আবার অন্য যে-কোনো ধরনের গু-র থেকে খারাপ তার কারণ ওটা হল নাকউঁচু পাহাড়ীর গু, ভাবো একবার, তার নিজের মেয়ে, কাজেই পরিবারের বাকি কারো ব্যাপারে তার আর কোনো মোহ ছিল না, কিন্তু তারপরেও স্বামীর কাছ থেকে আরো খানিকটা বিবেচনা আশা করার অধিকার তার ছিল, কারণ ভালো-মন্দ যাই হোক সে তার মন্ত্রপড়া পতি, তার জীবনসঙ্গী, তার আইনানুগ অপহরণকারী, যে একান্তভাবেইভাবেইবঅবেইভাব তার নিজের ইচ্ছেয় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল তাকে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার গুরু দায়িত্ব, যেখানে সে কোনো কিছুর অভাববোধ করেনি বা কোনো কষ্ট ভোগ করেনি, যেখানে তার অবসর কাটতো অন্ত্যেষ্টির মালা গেঁথে কারণ তার ধর্মপিতা তার সই আর সীল করার মোমের ওপর আংটির ছাপ বসানো একটা চিঠি স্রেফ এই কথা বলতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে তার ধর্মকন্যার হাত দুটো ক্ল্যাভিকর্ড বাজানো ছাড়া অন্য কোনো জাগতিক কাজকর্ম করার জন্যে তৈরি হয়নি, অথচ তারপরেও তার উন্মাদ স্বামী সমস্ত বাধানিষেধ আর সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তাকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল, নিয়ে এসেছিল এই নরকের কড়াইয়ে যেখানে গরমের চোটে কেউ নিঃশ্বাস নিতে পারে না, অথচ লোকটা তার পেন্টাকস্টের উপবাস শেষ হওয়ার আগেই তার ভ্রাম্যমাণ তোরঙ্গ আর তার অকেজো অ্যাকোর্ডিয়ানটা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল এমন একজনের সঙ্গে ব্যাভিচারে মত্ত হতে যে-পাপিষ্ঠার কেবল পেছনটা দেখলেই চলে, ইয়ে মানে সে-রকমটাই বলা হয়ে থাকে, তার ঘোটকীর পাছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোলাতে দেখলেই বোঝা চলে যে সে-মাগী হল, সে-মাগী হল, তার ঠিক উল্টো, যে কিনা প্রাসাদ কিংবা শুয়োরের খোয়াড়, টেবিল কিংবা বিছানা যে-কোনো জায়গাতেই মহারানী, সন্তানের জন্মদাত্রী, ঈশ্বরভীরু, তাঁর আইনকানুন মেনে চলে, তাঁর ইচ্ছার কাছে নতি করে, যার সঙ্গে কিনা তার স্বামী ওসব দড়াবাজগিরি আর ভাঁড়সুলভ কিম্ভুত কাজকর্ম, স্বাভাবিকভাবেই, করতে পারে না, যা লোকটা অন্যটার সঙ্গে করে, যে কিনা ওসব করার জন্যে তৈরিই হয়ে থাকে, সেই ফরাসী মাগীগুলোর মতো, বরং তারচেয়ে খারাপ, কেউ যদি ভালো করে ভেবে দেখে, তার কারণ ওরা অন্তত তাদের দরজায় লালবাতি জ্বালিয়ে রাখার মতো সৎসাহসটুকু দেখায়, ভাবো দেখি একবার, ওসব নোংরামী, আর ওটাই শুধু দরকার ছিল দোনা রেনাতা আরগোত আর দন ফারনান্দা দেল কারপিও-র একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার কাছ থেকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় জনের, যিনি কিনা ছিলেন ঋজু চরিত্রের এক লোক, এক চমৎকার খ্রিস্টান, এ নাইট অভ দ্য অর্ডার অভ দ্য হোলি সেপালকার, যাঁরা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই সুবিধা লাভ করেন যে কবরের ভেতরেও তাদের দেহ নষ্ট হয় না, গায়ের চামড়া থাকে বিয়ের কনের গালের মতো মসৃণ, আর চোখদুটো একেবারে জীবন্ত, পান্নার মতো পরিষ্কার।

অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'কথাটা ঠিক নয়। তাকে যখন এখানে আনা হয় তখন রীতিমতো গন্ধ ছুটতে শুরু করেছে।'

গোটা দিন ধৈর্য ধরে ফারনান্দার বকবকানি শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত একটা ভুল পেয়ে তাকে খপ করে ধরে বসে সে। ফারনান্দা অবশ্য তাতে কর্ণপাত করে না, তবে গলাটা নামিয়ে আনে খানিকটা। সেদিন রাতে খাওয়ার সময় সেই শোকবিলাপের ক্লান্তিকর গুনগুনানি ছাপিয়ে যায় বৃষ্টির শব্দকেও। মাথানিচু করে কোনোরকমে যৎসামান্য মুখে দেয় অরেলিয়ানো সেগান্দো, তারপর একটু আগে আগেই চলে যায় নিজের কামরায়। পরদিন সকালে নাস্তার সময় দেখা যায় ফারনান্দার গা কাঁপছে, চেহারায় অনিদ্রার ছাপ, আর তাকে দেখে মনে হয় অন্তরের বিদ্বেষের জ্বালায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু তারপরেও, তার স্বামী যখন জিজ্ঞেস করে অল্প-সেদ্ধ একটা ডিম তাকে দেয়া যাবে কিনা, সুবোধের মতো সে একথা বলে না যে এক হপ্তা আগেই ডিম ফুরিয়ে গেছে, বরং তীব্র ভর্ৎসনার সুরে সেইসব লোককে গাল পাড়তে থাকে যারা নিজের নাভির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটায় অথচ খাওয়ার সময় খেতে চায় ভরত পাখির যকৃত। বরাবরের মতো অরেলিয়ানো সেগান্দো বিশ্বকোষ দেখাতে নিয়ে যায় বাচ্চাদের, আর ফারনান্দা মেম্-এর ঘর গোছানোর ভান করে যাতে স্বামীকে সে বিড়বিড় করে একথা শোনাতে পারে যে বিশ্বকোষের মধ্যে যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ছবি আছে সেটা মাসুম বাচ্চাগুলোকে বলতে অরেলিয়ানো সেগান্দোর নিশ্চয়ই লজ্জা হয় না। বিকেলবেলা বাচ্চারা যখন একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, অরেলিয়ানো সেগান্দো বারান্দায় গিয়ে বসে, আর ফারনান্দা এমনকি সেখানেও হাজির হয় তার পিছু পিছু, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উস্কাতে থাকে, জ্বালাতে থাকে, ঘোড়ার চারপাশে ঘুরতে থাকা ডাঁশপোকার মতো গুনগুন করে ঘুর ঘুর করতে থাকে তাকে ঘিরে, বলতে থাকে বাড়িতে পাথর ছাড়া খাওয়ার কিছু নেই অথচ তার কর্তা পারস্যের সুলতানের মতো বসে বসে বৃষ্টি দেখছে কারণ আদতেই সে একটা আহাম্মক, একটা পরগাছা, একটা অপদার্থ, ননীর পুতুল, মেয়েমানুষ শুষে খেতে ওস্তাদ, ধরেই নিয়েছে যে সে জোনাহ্‌র বউকে বিয়ে করেছে, তিমির গল্পটা শুনেই যে নাকি মহা সন্তুষ্ট। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শুনে যায় অরেলিয়ানো সেগান্দো, ভাবলেশহীন, যেন সে কালা। এমনি করে বেলা যখন শেষ বিকেল, কেবল তখনই তাকে বাধা দেয় সে, কারণ তার মাথাব্যথা ধরিয়ে দেয়া ঢাকের আওয়াজটার প্রতিধ্বনি সে আর সহ্য করতে পারছিল না।

মিনতি করে সে বলে, 'দয়া করে ক্ষান্ত দাও এবার।'

ফারনান্দা উল্টো তার গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, 'আমার তো থামার কোনো কারণ নেই। আমার কথা যে শুনতে না চায় সে অন্য কোথাও গেলেই পারে।' এইবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় অরেলিয়ানো সেগান্দোর। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ায় সে, ভাবখানা যেন স্রেফ আড়মোড়া ভাঙবে, কিন্তু এরপরই সে পুরোপুরি সংযত আর নিয়মবদ্ধ ক্রোধের সঙ্গে বেগনিয়া, ফার্ন, আর ওরিগ্যানোর পটগুলো একটার পর একটা ধরে একটার পর একটা সেগুলো আছড়ে ভাঙতে থাকে মেঝের ওপর। ভয় পেয়ে যায় ফারনান্দা, কারণ এর আগ পর্যন্ত আসলে সে নিজের শোকবিলাপের ভেতরকার শক্তি সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনো ইঙ্গিত পায়নি, কিন্তু ততক্ষণে সংশোধনের আর কোনো উপায় থাকে না। ভার মুক্তির উপচে পড়া ধারাস্রোতের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো চীনা ক্লজেটের কাচটা ভাঙে, তারপর, একদম ধীরে সুস্থে চীনামাটির বাসনগুলো একটা একটা করে বের করে এনে মেঝেতে আছড়ে চুরমার করে দেয়, সুশৃঙ্খলভাবে, শান্তভঙ্গিতে, যে-অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে ব্যাংক নোট দিয়ে বাড়িটাকে সাজিয়েছিল ঠিক সেভাবে এরপর লেগে পড়ে বৈঠকখানা থেকে ভাঁড়ারঘর পর্যন্ত ভাঙা-যায় এমন প্রত্যেকটা জিনিস দেয়ালের গায়ে আছড়ে ভাঙার কাজে, বোহেমিয় ক্রিস্টালের বাসনকোসন, হাতে-আঁকা ফুলদানি, ফুলেভরা নৌকোয় বসা কুমারীদের যতো ছবি, সোনার গিল্টি করা আয়নাগুলো, আর তারপর, এই ধ্বংসযজ্ঞের ইতি টানে রান্নাঘরের বিশাল মাটির পাত্রটা দিয়ে, উঠোনের মধ্যে একটা ফাঁপা আওয়াজ করে ছত্রখান হয়ে পড়ে সেটা। এরপর সে ধুয়ে নেয় হাত দুটো, তোয়ালেটা জড়িয়ে নেয় গায়ে, তারপর মাঝরাতের আগেই ফিরে আসে শুকনো মাংসের কয়েকটা ছড়া, বেশ কয়েক বস্তা চাল, গুবরেপোকাঅলা শস্য, আর শুকিয়ে যাওয়া কয়েক ছড়া কলা নিয়ে। এরপর থেকে ঘরে আর খাবারের অভাব থাকে না।

আমারান্তা উরসুলা আর ছোট্ট অরেলিয়ানো বৃষ্টির সময়টাকে সুখের সময় হিসেবেই মনে রাখবে। ফারনান্দার কড়াকড়ি সত্ত্বেও তারা উঠোনে তৈরি হওয়া ছোট ছোট গর্তে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করতো, টিকটিকি ধরে ধরে সেগুলো কাটাছেঁড়া করতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের অগোচরে স্যুপের ভেতর প্রজাপতির পাখনা থেকে ধুলো ফেলে সেটাকে বিষাক্ত করার ভান করতো। উরসুলা ছিল তাদের সবচেয়ে মজার খেলনা। ওরা তাকে মনে করতো একটা বড়সড় ভাঙাচোরা পুতুল, তাকে রঙীন কাপড়ে মুড়ে আর তার মুখটা কালিঝুলি আর আনাতো দিয়ে রঙ করে এক কোনা থেকে আরেক কোনায় ওরা তাকে বয়ে বেড়াতো, আর একবার তো ওরা গাছের ডালপালা ছাঁটার কাস্তে দিয়ে তার চোখ দুটোই উপড়ে নেবার জোগাড় করেছিল, ঠিক যেমন করতো ওরা ব্যাঙ ধরে ধরে। উরসুলার প্রলাপ বকাবকিতে যত মজা পেতো এমনটি আর কিছুতে পেতো না ওরা। বৃষ্টির তৃতীয় বছরে তার মনের ভেতর নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটে, কারণ ধীরে ধীরে সে তার বাস্তববোধ হারিয়ে ফেলতে থাকে, বর্তমানকে এমনভাবে তার জীবনের দূর অতীতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে যে একবার তার দাদীর মা পেত্রোনিলা ইগুয়ারানের মৃত্যুতে টানা তিন দিন ধরে কেঁদে ভাসায় সে, অথচ প্রায় একশ বছর আগে তাকে গোর দেয়া হয়েছে। বিভ্রান্তির এমনই এক উন্মত্ত অবস্থায় এসে পৌছোয় সে যে অরেলিয়ানোকে মনে করে তার ছেলে কর্নেল, ঠিক সেই সময়কার যখন তাকে বরফ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর মনে করে হোসে আর্কাদিও—যে তখন সেমিনারিতে পড়াশোনা করছে—সে হল জিপসিদের সঙ্গে চলে যাওয়া তার বড় ছেলে। পরিবারটা নিয়ে সে এতোসব কথা বলতে শুরু করে যে বাচ্চারা সেইসব লোকজনের সঙ্গে কাল্পনিক সাক্ষাতের কথা ভাবতে শুরু করে, অথচ সেই লোকগুলো যে শুধু অনেক আগে মারাই গেছে তা-ই নয়, তারা কিন্তু সমসাময়িকও ছিল না। ছাই-ভস্ম মাখানো চুল আর লাল রুমালে বাঁধা মুখ নিয়ে পরম আনন্দে বিছানায় বসে থাকে উরসুলা কাল্পনিক আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে, আর বাচ্চারা এমনই খুঁটিনাটিসহ তাদের কথা বলে যেন আসলেই তারা চেনে তাদের। পূর্বপুরুষদের সঙ্গে উরসুলা এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলে যায় যে-সব ঘটনা তার নিজেরই জন্মের অনেক আগে ঘটেছে, তারা তাকে যে-সব খবর দেয় সেগুলো সে দস্তুরমতো উপভোগ করে চলে, তাছাড়া তাদের সঙ্গে সঙ্গে সে এমনসব লোকজনের মৃত্যু নিয়ে কান্নাকাটি করে যারা সেইসব কুটুমের চেয়েই অনেক হাল আমলের। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে বাচ্চাদের বেশি সময় লাগে না যে সেই সব ভৌতিক সাক্ষাতের সময় উরসুলা সব সময়ই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো যা দিয়ে সেই লোকটাকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা যেতে পারতো যে বৃষ্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত জিম্মা রাখার জন্যে সন্ত জোসেফের প্রমাণ আকারের একটা প্লাস্টারের মূর্তি নিয়ে এসেছিল। এই কারণেই অরেলিয়ানো সেগান্দোর সেই সম্পদের কথা মনে পড়ে যায় যা কোথায় মাটি চাপা দেয়া আছে তা কেবল উরসুলারই জানা, কিন্তু যে-সব প্রশ্ন আর ধূর্ত কারসাজি তার মাথায় আসে তাতে কোনো কাজ হয় না, তার কারণ সেই পাগলামির গোলকধাঁধার ভেতরেও উরসুলা যেন সেই গোপনকথাটুকু ফাঁস না করার মতো যথেষ্ট সুস্থ অংশ বজায় রাখতে পেরেছে যে-গোপন কথা সে কেবল তাকেই বলবে যে প্রমাণ করতে পারবে যে সে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই মাটিচাপা দেয়া সোনাটার আসল মালিক। সে এমনই চতুর আর কঠোর যে অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন তার পানোৎসবের এক সঙ্গীকে সেই সম্পদের মালিক হিসেবে নিজেকে হাজির হওয়ার জন্যে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠায়, উরসুলা তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁদ পাতা মিনিটখানেকের জেরাতেই লোকটার সব জারিজুরি ধরে ফেলে।

গোপন কথাটা যে উরসুলা নিজের সঙ্গেই কবরে নিয়ে যাবে সেটা বুঝতে পেরে অরেলিয়ানো এই অজুহাতে একদল মাটি-কাটার লোক ভাড়া করে যে তারা সামনের আর পেছনের উঠোনে ময়লা নিষ্কাশনের কিছু নালী কাটবে, তারপর সে নিজে নেমে পড়ে লোহার শিক আর সব ধরনের মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে গভীরতা মাপার কাজে, কিন্তু তিন মাসের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পরেও সে এমন কিছু খুঁজে পায় না যার সঙ্গে সোনার মিল আছে। মাটি-কাটার দলের চেয়ে তাস-ই বেশি দেখতে পাবে এই আশায় অতঃপর সে পিলার তারনেরার কছে যায়, কিন্তু গোড়াতেই সে বলে দেয় উরসুলা তাস না বেটে দিলে কোনো কিছুতেই কোনো ফায়দা হবে না। অন্যদিকে অবশ্য সেই গুপ্তধনের অস্তিত্বের কথা সে এতোখানি নিশ্চিত করে জানিয়ে দেয় যে উরসুলার বিছানাকে কেন্দ্র ধরে তিনশো আটাশি ফুট ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তের ভেতর তামার তার পেঁচিয়ে শক্ত করা তিনটে ক্যানভাসের থলের ভেতর সাত হাজার দু'শো চোদ্দটা স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে এই বলেও সতর্ক করে দেয় যে যতক্ষণ না বৃষ্টি থামছে আর পর পর তিন বছরের জুন মাসে কাদার স্তূপগুলোকে ধুলোমাটিতে পরিণত না করছে ততদিন পর্যন্ত সেগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না। অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছে তথ্যের এই বাহুল্য আর অতিসতর্ক, নিখুঁত অস্পষ্টতা এতোই আধ্যাত্মবাদীদের গল্পের মতো মনে হয় যে তখন অগাস্ট মাস হওয়া সত্ত্বেও আর ভবিষ্যদ্বাণীর শর্তপালন করতে তবুও পুরো তিন বছর অপেক্ষা করার কথা থাকলেও সে তার কাজ চালিয়ে যায়। প্রথমেই যে-ব্যাপারটা তাকে চমকে দেয়, যদিও একই সঙ্গে সেটা তার বিভ্রান্তিও বাড়িয়ে দেয়, তা হল, পেছন-আঙিনার দেয়ালটা উরসুলার বিছানা থেকে ঠিক তিনশো আটাশি ফুট দূরে। তাকে মাপজোক করতে দেখে ফারনান্দার ভয় হয় লোকটা বুঝি তার যমজ ভাইয়ের মতোই উন্মাদ, আর তার ভয়টা আরো বাড়ে যখন তার স্বামী গর্তগুলো আরো তিন ফুট বেশি গভীর করে খোঁড়ার হুকুম দেয় মাটি-কাটার লোকজনকে। তার দাদার বাবা যখন আবিষ্কারের অন্দিসন্ধি খুঁজে ফিরছিল তার তখনকার সেই অভিযাত্রিক বিকারের সঙ্গে তুলনীয় একটা ঘোরে পেয়ে বসায় অরেলিয়ানো সেগান্দোর গায়ের চর্বির শেষ স্তরটাও উবে যায়, সেই সঙ্গে তার যমজ ভাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার মিলটাও ফিরে আসতে শুরু করে, আর সেটা যে কেবল তার হালকা পাতলা গড়নের কারণে তা নয়, বরং সেই উড়ু উড়ু আর উদাসীন ভাবের কারণেও বটে। বাচ্চাদের নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেয় সে। খাওয়া-দাওয়া অনিয়মিত হয়ে পড়ে তার, আপাদমস্তক কাদায় ঢাকা শরীর নিয়ে অসময়ে খেতে বসে সে, আর কাজটা সে করে রান্নাঘরে, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তরে হুঁ হ্যাঁ বলে কাজ চালিয়ে দিতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে। ফারনান্দা যেহেতু কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে অরেলিয়ানো সেগান্দোর পক্ষে এতো কাজ করা সম্ভব, তাই তাকে এতোসব করতে দেখে তার একগুঁয়েমীকে সে মনে করে পরিশ্রম, তার লোভকে আত্মস্বার্থত্যাগ, তার মোটাবুদ্ধিকে অধ্যবসায়, আর লোকটার কুঁড়েমির জন্যে তাকে সে কত বকাঝকা করেছে সেকথা মনে আসতে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে তার। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর চোখে ব্যাপারটা দেখে সব কিছু মিটমাট করে নেবার মতো মনের অবস্থা তখন অরেলিয়ানো সেগান্দোর নেই। উঠোন আর পেছন আঙিনাটার পালা শেষ করার পর, কাঁধ পর্যন্ত মরা ডালপালা আর পচাফুলের জলাশয়ে ডোবা অবস্থায় সে বাগানের ময়লা চারপাশে ছুঁড়ে ফেলে, আর বাড়ির পুব অংশের ভিতের নিচে এমনই গভীর করে খোঁড়ে যে একরাতে বাড়িটা কেঁপে ওঠায় আর মাটির নিচের থেকে ভেসে আসা ভয়ংকর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ভূমিকম্প হচ্ছে মনে করে বাড়ির সবাই আতংকে জেগে ওঠে। পড়ো পড়ো দশা হয় তিনটা ঘরের, আর বারান্দা থেকে ফারনান্দার কামরা পর্যন্ত সৃষ্টি হয় ভয়ানক এক ফাটল। অরেলিয়ানো সেগান্দো অবশ্য সে-কারণে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করার পাত্র নয়। এমনকি তার শেষ ভরসাও উবে যাওয়ার পর তার একমাত্র আশা বলতে রয়েছে যখন কেবল তাসের ভবিষ্যদ্বাণী, এই অবস্থাতেই সে ফাটল ধরা ভিতটা ফের মজবুত করে, চুনবালিসুরকির আস্তর দিয়ে ফাটলটা মেরামত করে, তারপর এগিয়ে যায় পশ্চিম অংশের দিকে। পরের জুন মাসের দ্বিতীয় হপ্তাতেও যখন সে ওখানে, এমন সময় বৃষ্টি ধরে আসতে শুরু করে, মেঘ সরে যেতে থাকে, আর সময় যতই গড়ায় ততই পরিষ্কার বোঝা যেতে থাকে যে বৃষ্টিটা থেমে যাবে। আর ঘটেও ঠিক তাই। এক শুক্রবার দুপুর দুটোর সময় ইটের গুঁড়োর মতো রুক্ষ আর প্রায় পানির মতো ঠাণ্ডা টকটকে লাল একটা সূর্য দুনিয়াটাকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে উঠে আসে, তারপর দশ বছরেও আর বৃষ্টির মুখ দেখা যায় না।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মাকোন্দো। জলাময় রাস্তাঘাটে পড়ে আছে আসবাবপত্রের ভগ্নাবশেষ, লাল লিলি ফুলে ঢাকা জন্তু-জানোয়ারের কংকাল, সেইসব আগন্তুকের স্মৃতিচিহ্ন যারা ঠিক সেই গতিতেই মাকোন্দো থেকে পিঠটান দিয়েছে যে-গতিতে তারা এসেছিল এখানে। কলার সেই জোয়ারের সময় একই রকম তাড়াহুড়োয় বানানো কাঠের বাড়িগুলো পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। আগের সেই তার-ঘেরা শহরটার যা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে ধ্বংসাবশেষ। কাঠের বাড়ি-ঘর আর মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যাওয়া বিকেলবেলার তাস খেলার ঠাণ্ডা চত্বরগুলো যেন সেই দৈববার্তাবাহী বাতাসের আগাম ঘোষণা হিসেবে সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে, যে-বাতাস বহু বছর পর মাকোন্দোকে মুছে ফেলবে দুনিয়ার বুক থেকে। সেই সর্বগ্রাসী ঝঞ্ঝা একমাত্র যে মানবীয় চিহ্ন রেখে গেছে তা হল বুনো পানসী ফুলের ভেতর লুকিয়ে থাকা একটা গাড়ির ভেতরে প্যাট্রিসিয়া ব্রাউনের একটা দস্তানা। মাকোন্দো পত্তনের দিনগুলোতে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া যে মায়াময় এলাকাটায় অভিযান চালিয়েছিল, পরে যেখানে কলা কম্পানি গড়ে উঠেছিল, সেটা এখন পচতে থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেকড়বাকড়ের একটা জলামাত্র, কেউ চেষ্টা করলেই সেটার দিগন্তে সমুদ্রের নিঃশব্দ ফেনা দেখতে পাবে। যে-রোববার অরেলিয়ানো সেগান্দো প্রথমবারের মতো শুকনো কাপড় পরে শহরটার সঙ্গে তার পরিচয় ঝালাই করতে বেরিয়ে যায় সেদিন তার একরকম কষ্টই হয় বলা যায়। এই প্রলয় থেকে উৎরে যাওয়া লোকজন, এরা হল তারা যারা কলা কম্পানির ঝড়ঝঞ্ঝা মাকোন্দোতে আঘাত হানার আগে শহরে ছিল, তারা সবাই রাস্তার মধ্যেখানে বসে প্রথম সূর্যালোক উপভোগ করছে। তখনো তাদের গায়ে শৈবালের সবুজ লেগে আছে, আর বৃষ্টির কারণে একটা ঘুপচিতে ঢুকে থাকতে বাধ্য হয়ে তাদের গা থেকে বেরোচ্ছে একটা ছাতা-ধরা গন্ধ, তবে যে-শহরে তাদের জন্ম সেই শহরটাকে ফের আবিষ্কার করতে পেরে ভেতরে ভেতরে তাদেরকে খুশি খুশি বলেই মনে হয়। আগে যেমন ছিল, তুর্কীদের রাস্তাটা ফের সেই অবস্থায় চলে এসেছে, যখন পায়ে চপ্পল আর কানে দুল পরা আরবরা ম্যাকঅ পাখির বদলে ছোটখাট গয়নাগাটি লেনদেন করতে করতে দুনিয়াময় ঢুঁড়ে বেড়াতো আর শেষে মাকোন্দোতে একটা সুন্দর রাস্তার মোড় পেয়ে সেখানে খুঁজে পেয়েছিল জীবনভর যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াবার নিয়তি থেকে মুক্তি। দোকানঘরের মালামাল এই বৃষ্টির ধকলটা আগাগোড়া সহ্য করে এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দরজার ওপর বিছিয়ে দেয়া কাপড়গুলো জুড়ে আছে ঝুরো মাটি, উঁইপোকা ধসিয়ে দিয়েছে কাউন্টারগুলোকে, নোনায় খেয়ে ফেলেছে দেয়াল, কিন্তু তারপরেও তৃতীয় প্রজন্মের আরবরা তাদের বাপ-দাদাদের মতো ঠিক সেই জায়গায় সেই ভঙ্গিতেই বসে আছে, চুপচাপ, ভয়শূন্য, সময় আর বিপর্যয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে, অনিদ্রা রোগ আর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার তিরিশ বছরের যুদ্ধের পরে যেমন ছিল তেমন-ই জীবন্ত, আর নয়ত তেমনই মৃত। জুয়োর টেবিল, পিঠা রাখার তাক, শুটিং গ্যালারি, আর যেখানে ওরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতো, ভবিষ্যদ্বাণী করতো সেই গলি, এই সবকিছুর ধ্বংসের মুখেও তাদের মনোবল দেখে অরেলিয়ানো সেগান্দো বাধ্য হয় তার স্বভাবজাত আটপৌরে ভাব নিয়ে তাদের এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে যে এই ঝড়জলে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে কোন রহস্যময় উৎসের ওপর ভরসা করে ছিল তারা, যাতে ডুবে না যায় সেজন্যে কোন দুষ্কর্ম তারা করেছিল, আর একের পর এক, এ-দরজায় ও-দরজায় ওরা সবাই তাকে একটা কৌশলী হাসি আর একটা স্বপ্নময় চেহারা উপহার দিয়ে কোনোরকম পূর্ব-আলোচনা ছাড়াই একটা উত্তরই দেয়:

'সাঁতার।'

পেত্রা কোতেসই সম্ভবত একমাত্র স্থানীয় মানুষ যার মন-মানসিকতা আরবদের মতো। তার আস্তাবলগুলোর চরম বিনাশ সে দেখেছে, দেখেছে তার গোলাঘরগুলোকে ঝড়ের দাপটে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে, কিন্তু তারপরেও সে তার বাড়িটা খাড়া অবস্থায় রাখতে পেরেছে। দ্বিতীয় বছরে অরেলিয়ানো সেগান্দোর কাছে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে গেছে সে, কিন্তু সে জবাব দিয়েছে কখন সে তার উপপত্নীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ফিরবে তা সে ঠিক করে বলতে পারে না, তবে একথা ঠিক, যখনই ফিরুক, সঙ্গে সে শোবার ঘরের মেঝে মুড়ে দেবার মতো এক বাক্স সোনার মোহর নিয়েই ফিরবে। এই সময়টাতেই পেত্রা কোতেস নিজের মনের গহীনে ডুব দিয়ে সেই শক্তির খোঁজ করেছে যা তাকে দুর্বিপাকটা উৎরোতে সাহায্য করবে, আর তখন সে এমন একটা চিন্তাপূর্ণ আর ন্যায়সঙ্গত রোষ আবিষ্কার করে যা দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে তার প্রেমিকের উড়িয়ে দেয়া আর পরে মহাপ্লাবনে ভেসে যাওয়া ধন-সম্পদ পুনরুদ্ধার করার। এমনই ধনুর্ভঙ্গ পণ সেটা যে শেষ খবরটা পাওয়ার আট মাস পরে অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন পেত্রা কোতেসের বাড়ি ফিরে আসে সে তাকে দেখতে পায় সবুজ হয়ে যাওয়া আলুথালু বেশে, বসে যাওয়া চোখের পাতা আর চুমকির মতো বসানো খোসপাচড়া ভর্তি গায়ের চামড়া সহ, লটারি করার জন্যে ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় নম্বর বসিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত অবস্থায়। অরেলিয়ানো সেগান্দো অবাক বনে যায়, ওদিকে তখন তার এমনই নোংরা আর গম্ভীর চেহারা যে পেত্রা কোতেস প্রায় বিশ্বাস করেই বসে যে যে-লোকটা তাকে দেখতে এসেছে সে তার প্রেমিক নয়, বরং তার ভাই।

অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে বলে, 'মাথাটা তোমার খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য যদি তুমি তোমার হাড়গোড় লটারি করার পরিকল্পনা করে থাকো তো আলাদা কথা।'

তখন পেত্রা কোতেস তাকে শোবার ঘরের দিকে তাকাতে বললে অরেলিয়ানো সেগান্দো খচ্চরটাকে দেখতে পায়। সেটার চামড়া তার মালকিনের মতোই গায়ের হাড্ডির সঙ্গে লেগে আছে, তবে সেটাও সে-বেচারীর মতোই জীবন্ত আর স্থিরসংকল্প। পেত্রা কোতেস ওটাকে জেদের বশেই বড় করেছে, আর ঘরে যখন কোনো খড় বা শস্য বা শেকড়বাকড় ছিল না তখন সে ওটাকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে পারকেল কাপড়, পারস্য দেশের গালিচা, ভেলভেটের চাদর, মখমলের পর্দা ও সোনার সুতো দিয়ে সেলাই করা চাঁদোয়া আর যাজকীয় বিছানার রেশমী ঝালর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বৃষ্টি থামার পরে যারপরনাই কষ্ট করতে হয় উরসুলাকে। বৃষ্টির সময় সাময়িক সুস্থতার যে-জোয়ার ছিল নিতান্তই বিরল, অগাস্টের পর তা ঘন ঘন দেখা দিতে থাকে, আর এই সময়েই বইতে থাকে একটা শুকনো বাতাস, সে-বাতাস দমবন্ধ করে ফেলে গোলাপ ঝাড়গুলোর আর কাদার স্তূপ গুলোকে শক্ত করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই জ্বলন্ত ধুলোবালি গোটা মাকোন্দো জুড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে চিরকালের জন্যে সেগুলো ছেয়ে ফেলে জংপরা সব দস্তার ছাত আর প্রাচীন অ্যালমন্ড গাছগুলোকে। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বাচ্চারা যে তাকে একটা খেলার জিনিস হিসেবে ব্যবহার করেছে সেটা বুঝতে পেরে হাহাকার করে ওঠে উরসুলা। তারপর ধুয়ে ফেলে নিজের রঙ-করা মুখটা, খসিয়ে ফেলে সারা শরীর থেকে ঝুলতে থাকা রঙ-বেরঙের উজ্জ্বল কাপড়ের যতো টুকরো, শুকিয়ে যাওয়া টিকটিকি আর ব্যাঙ, জপমালা আর আরবদের প্রাচীন সব নেকলেস, আর, আমারান্তা মারা যাওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো কারো সাহায্য না নিয়েই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে সাংসারিক কাজকর্মে আবার যোগ দেয়ার জন্যে। তার হার না মানা মনটার জোরই তাকে ছায়ান্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ দেখায়। তার হোঁচট খাওয়া যাদের নজরে পড়ে কিংবা দেবদূতের মতো মাথা বরাবর উঁচু করে রাখা তার হাতটার সঙ্গে যাদের সংঘর্ষ ঘটে তারা ভাবে উরসুলার বোধহয় শারীরিক কোনো সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তখনো তারা বুঝতে পারে না যে সে অন্ধ। একথা বুঝতে উরসুলার চোখে দেখার দরকার হয় না যে সেই প্রথম পুনর্নির্মাণের সময় থেকে অতি যত্নে তৈরি করা ফুলের কেয়ারিগুলো বৃষ্টি আর অরেলিয়ানো সেগান্দোর খোঁড়াখুঁড়ির ফলে নষ্ট হয়ে গেছে, দেয়াল আর মেঝের সিমেন্ট ফেটে গেছে, আসবাবপত্র হয়ে পড়েছে মণ্ডের মতো আর বিবর্ণ, দরজাগুলো খুলে এসেছে কব্জা থেকে, আর, তার সময় যেটা ভাবা-ই যেতো না, সংসারটাকে পেয়ে বসেছে একটা হালছাড়া ভাব আর হতাশায়। উঁই পোকার কাঠ খেয়ে ফেলার সার্বক্ষণিক কুটকুট আওয়াজ, কাপড় রাখার দেয়ালকুঠুরিতে মথ পোকার কাপড় কাটা, আর, মহাপ্লাবনের সময় বংশবৃদ্ধি ঘটানো এবং এখন বাড়ির ভিত ধসিয়ে দিতে থাকা বিশাল বিশাল সব লাল পিঁপড়ার ভয়ানক আওয়াজ, সবই টের পায় উরসুলা শূন্য শোবার ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে হাঁটার সময়। একদিন সে যখন সন্তদের মূর্তিরাখা তোরঙ্গটা খোলে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আর এরিমধ্যে কাপড়চোপড়গুলোকে ধুলোয় পরিণত করে দেয়া আরশোলাগুলোকে তার গা থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদকে ডাকতে হয় তাকে। উরসুলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ওঠে, 'এমন গাছাড়া অবস্থায় মানুষ জীবন কাটাতে পারে না। এভাবে চললে তো জন্তু-জানোয়ার সব গিলে খেয়ে ফেলবে আমাদের।' এরপর থেকে আর মুহূর্তখানেকেরও অবসর থাকে না তার। ভোর হওয়ারও আগে উঠে হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই এমনকি বাচ্চাদেরও কাজে লাগিয়ে দেবে সে। অল্প যে কিছু কাপড়-চোপড় তখনো ব্যবহারযোগ্য রয়ে গেছে সেগুলো বের করে রোদে দেয়, আরশোলাগুলোকে তাড়ায় শক্তিশালী কীটনাশকের হামলা চালিয়ে, দরজা আর জানলাগুলোয় উঁইপোকা যে-সব সরু সরু দাগ কেটেছিল সেগুলো ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেলে, আর চুন দিয়ে পিঁপড়েগুলোকে শ্বাসরোধ করে মারে তাদের বাসার মধ্যেই। সব কিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে আসে সেই সব কামরায় যেগুলোর কথা ভুলে গেছে সবাই। পরশপাথরের খোঁজ করতে গিয়ে যে-কামরায় বসে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেই ঘরের ময়লা-আবর্জনা আর মাকড়সার জাল সাফ-সুতরো করে, সৈন্যরা রুপোর-কাজ করার যে-ঘরটাকে তছনছ করে দিয়েছিল সেটার চেহারা ফিরিয়ে আনে সে, আর শেষ পর্যন্ত মেলকিয়াদেসের ঘরটা কী অবস্থায় আছে তা দেখার জন্যে চাবি চেয়ে বসে সে। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর মৃত্যুর ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে সে-ঘরে ঢুকতে না দেবার জন্যে তার নিজেরই বারণের প্রতি বিশ্বস্ত সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ উরসুলাকে ভোলাতে সব ধরনের ছল-চাতুরী-ই প্রয়োগ করে, কিন্তু বাড়ির এমনকি সবচেয়ে দূরবর্তী অংশটিকেও পোকামাকড়ের হাতে ছেড়ে না দেবার ব্যাপারে সে এমনই জেদ ধরে যে তার পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি সে মাড়িয়ে যায়, অতএব তিনদিন ধরে লেগে থাকার পর দরজাটা খুলে দেয়া হয় তার জন্যে। গন্ধের ধাক্কাটা তাকে যাতে ফেলে দিতে না পারে সেজন্যে দরজার হাতলটা চট করে ধরে ফেলতে হয় উরসুলাকে, কিন্তু ওই ঘরেই যে স্কুলছাত্রীদের সেই বাহাত্তরটা চেম্বারপট রয়েছে আর সেই বৃষ্টির কোনো এক রাতে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে ধরার জন্যে টহলদার একদল সৈন্য বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও যে তাকে ধরতে পারেনি সেকথা মনে করতে দু' সেকেন্ড সময় লাগে তার।

যেন সবকিছুই সে দেখতে পাচ্ছে এমনিভাবে চেঁচিয়ে ওঠে উরসুলা, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! তোকে আচার-সহবৎ শেখাতে এতো মেহনত করতে হলো আর শেষকালে কিনা তুই একটা শুয়োরের মতো জীবন কাটাচ্ছিস।'

হোসে আর্কাদিও সেগান্দো কিন্তু তখনো সেই পার্চমেন্টগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তার চুলের জটাজালের ভেতর থেকে একমাত্র যে-জিনিসটা দেখা যায় তা হল সবুজরঙা ময়লার ছোপ পড়া দাঁত আর তার স্থির দুই চোখ। দাদার মায়ের গলার আওয়াজ চিনতে পেরে দরজার দিকে মাথা ঘোরায় সে, চেষ্টা করে একটু হাসার, আর তারপর, নিজের অজান্তেই উরসুলারই একটা পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'কী আশা করেছিলে তুমি? সময় থেমে থাকে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরসুলা বলে, 'তা ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এতো জোরেও ছোটে না।'

কথাটা বলার সময়ই উরসুলার খেয়াল হয় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার ডেথ সেলে বসে তাকে যে-উত্তর দিয়েছিল হোসে আর্কাদিও সেগান্দো ঠিক তা-ই বলছে, আর তখন নতুন করে এই কথাটার প্রমাণ পেয়ে সে শিউরে ওঠে যে সময় আসলে এগোচ্ছে না, বরং একটা বৃত্তের ভেতর ঘুরছে। কিন্তু তখনো সে হতাশাকে কোনো সুযোগ দেয় না। হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে সে এমনভাবে বকাঝকা করে যেন সে একটা শিশু, তাড়া লাগায় তাকে গোসল করে দাড়ি কেটে বাড়ি-ঘর ঠিক করার কাজে হাত লাগানোর জন্যে। যে-কামরাটা তাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল সেটা ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই আঁৎকে ওঠে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো। এই বলে সে চেঁচিয়ে ওঠে যে-কোনো মানুষের সাধ্য নেই তাকে এ-ঘর থেকে বের করে দেয়; দু'শো বগিভর্তি লাশ নিয়ে যে-ট্রেনটা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মাকোন্দো থেকে সমুদ্রের দিকে রওনা হয়ে যায় সেটা দেখার কোনো ইচ্ছে-ই তার নেই। সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'স্টেশনে সেদিন যারা ছিল তাদের সবাই ছিল সেই ট্রেনে। তিন হাজার চারশো আট জন।' কেবল তখনই উরসুলা বুঝতে পারে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো এমন একটা ছায়ার জগতে বাস করে যে-জগৎ উরসুলার নিজের জগতের চেয়েও দুর্ভেদ্য, ওর দাদার বাবার জগতের মতোই অগম্য আর নিঃসঙ্গ। তাকে সেই ঘরে রেখেই চলে যায় সে, তবে ওদেরকে দিয়ে সে ব্যবস্থা করে যেন এরপর থেকে তালাটা খোলা থাকে, প্রতিদিন ঘরটা পরিষ্কার করা হয়, একটা বাদে বাকি চেম্বারপটগুলো ফেলে দেয়া হয়, আর হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর দাদার বাবা চেস্টনাট গাছের নিচে তার দীর্ঘ বন্দিদশায় যে-রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর ছিল তাকেও যেন ঠিক সেভাবেই রাখা হয়। গোড়ার দিকে উরসুলার কাজকর্মের এই তোড়জোড়টাকে ফারনান্দা বুড়ো বয়েসে ভীমরতির প্রকোপ বলেই গণ্য করে, বিরক্তি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে। কিন্তু সেই সময়েই হোসে আর্কাদিও তাকে জানায় অন্তিম শপথ নেয়ার আগে সে একবার রোম থেকে মাকোন্দো আসার কথা ভাবছে, আর এই সুখবরটা তাকে এমনই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরিয়ে দেয় যে, দেখা যায়, তার ছেলে ফিরে এসে বাড়িটা সম্বন্ধে যাতে কোনো খারাপ ধারণা করতে না পারে সেজন্যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দিনে চারবার করে গাছে পানি ঢালছে সে। এই একই উদ্দীপনায় অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে পত্রযোগাযোগটা বাড়িয়ে দেয় সে, আর, অরেলিয়ানো সেগান্দোর সেই ধ্বংসযজ্ঞের সময় বারান্দার ফার্ন, অরিগ্যানো আর বেগনিয়ার টবগুলোর যে দফারফা হয়ে গিয়েছিল সেটা উরসুলাকে টের পেতে না দিয়ে নতুন টব আনিয়ে নেয়। কয়েকদিন পরে সে রুপোর বাসনকোসন বিক্রি করে কিনে নিয়ে আসে সিরামিকের থালা, পিউটারের গামলা আর স্যাপের চামচ, আলপাকার টেবিলক্লথ, আর সেই সঙ্গে রিক্ত করে ফেলে ইন্ডিয়া কম্পানির চীনামাটির বাসনকোসন ও বোহিমিয়ার ক্রিস্টালের জিনিসপত্রে অভ্যস্ত আলমারিগুলোকে। উরসুলা সবসময়েই এক ধাপ এগিয়ে থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করে। 'কিছু মাংস আর মাছ রান্না করো, সবচেয়ে বড় কাছিমটা কিনে আনো, অচেনা লোকজনকে আসতে দাও, তারা সব মাদুর পেতে কোনায় কোনায় বসুক আর গোলাপ ঝাড়ে পেশাব করুক, খাক যতোবার খুশি, ঢেকুর তুলুক হল্লা করুক আর বুট জুতো মাড়িয়ে নোংরা করুক সব কিছু, আমাদের সঙ্গে ওরা যা কিছু করতে চায় করতে দাও, কারণ ওটাই ধ্বংস এড়ানোর একমাত্র পথ।' কিন্তু সেটা স্রেফ এক মিথ্যে মায়া। তখন তার মেলা বয়স, ধার করা সময় নিয়ে জীবন চলছে, সেই ছোট্ট মিছরির জন্তু-জানোয়ারের অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর মতো অবস্থা নেই, আর তাছাড়া তার উত্তরপুরুষেরা কেউই তার প্রাণশক্তি পায়নি। কাজেই ফারনান্দার হুকুমমাফিক বাড়িটা অবরুদ্ধ হয়েই থাকে।

অরেলিয়ানো সেগান্দো তার মালপত্র পেত্রা কোতেসের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, আর তার তখন যে-অবস্থা তাতে সে কোনো রকমে এটুকুই করতে পারে যাতে তার পরিবার অন্তত না-খেয়ে না মরে। খচ্চরের লটারির ব্যবস্থা করে সে আর পেত্রা কোতেস আরো কিছু পশু কিনেছে, সেগুলো দিয়ে তারা একটা যেনতেন রকমের লটারি ব্যবসা শুরু করতে পেরেছে। ব্যাপারটা আরো আকর্ষণীয় আর বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে নিজের হাতে রঙীন কালি দিয়ে রঙ করা টিকিট বিক্রি করতে বাড়ি বাড়ি যায় অরেলিয়ানো সেগান্দো, আর ব্যাপারটা হয়তো সে খেয়ালই করে না যে অনেকেই সেগুলো কিনতো কৃতজ্ঞতাবশে, বেশিরভাগই করুণা করে। কিন্তু তারপরেও, সবচেয়ে দয়াশীল ক্রেতাও একটা সুযোগ পেতো বিশ সেন্ট দামে একটা শুয়োর কিংবা বত্রিশ সেন্টে একটা বাছুর জেতার, আর তারা এতোই আশাবাদী হয়ে ওঠে যে মঙ্গলবারের রাতগুলো পেত্রা কোতেসের আঙিনা উপচে উঠতো লোকজনে, তারা সব অপেক্ষা করতো কখন এলোপাথাড়িভাবে বেছে নেয়া একটা বাচ্চা একটা থলে থেকে বিজয়ী নম্বরটা তুলবে। ব্যাপারটা একটা সাপ্তাহিক উৎসবে পরিণত হতে বেশি সময় লাগে না, কারণ সন্ধ্যেবেলা আঙিনাতে বসানো হতো খাবার আর পানীয়ের স্ট্যান্ড, আর ভাগ্যবান লোকজন তাদের জেতা পশুগুলোকে এই শর্তে ওখানেই জবাই দিতো যে, আরেকজন মদ আর সঙ্গীতের ব্যবস্থা করবে, কাজেই অরেলিয়ানো সেগান্দো দেখতে পেতো যে না চাইতেই সে ফের অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাতে শুরু করেছে আর যোগ দিয়েছে হালকাচালের ভোজন প্রতিযোগিতায়। আগেকার দিনের পানভোজনোৎসবের এই ক্ষুদ্র সংস্করণ অরেলিয়ানো সেগান্দোকে দেখিয়ে দিতো তার উৎসাহ কতোটা মরে এসেছে, এক ওস্তাদ হুল্লোড়বাজ হিসেবে তার দক্ষতা কতটা কমে গেছে। সে এক অন্য মানুষ এখন। হস্তিনী যখন তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সেই সময়ের দু'শো চল্লিশ পাউন্ড ওজন একশো ছাপ্পান্নতে এসে ঠেকেছে; টকটকে, ফোলা-ফাঁপা কাছিমের মতো মুখটা হয়েছে ইগুয়ানার মুখের মতো, তাছাড়া এখন সারাক্ষণই একঘেয়েমি আর ক্লান্তি তাকে তাড়া করে ফেরে। পেত্রা কোতেসের কাছে সে অবশ্য তখনকার চেয়ে ভালো আর কখনোই ছিল না, তার কারণ সম্ভবত এই যে, সে যে-করুণার উদ্রেক করেছে তার সঙ্গে মিশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল ভালোবাসা, আর সম্ভবত এই দুর্দশা দু'জনের মধ্যে যে-সংহতির অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল সেটাও এর কারণ। ভেঙে-পড়া বিছানাটা এখন আর সেই সব উন্মত্ত কীর্তিকলাপের জন্ম দিতে পারে না, সেটা বরং পরিণত হয়েছে এক অন্তরঙ্গ আশ্রয়স্থলে। লটারির জন্যে নানান রকমের পশু কিনতে নিলামে বিক্রি করে দেয়া একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো আয়নাগুলো এবং খচ্চরের পেটে চলে যাওয়া বাজে বাজে বুটিদার কাপড় আর মখমলের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে মেলা রাত পর্যন্ত জেগে থাকে তারা দুই নির্ঘুম পিতামহ পিতামহীর মতো সরলতা নিয়ে, আর সেই অবসরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে হিসেব-নিকেশে, যে-পয়সা একসময় তারা স্রেফ অপচয় করার কারণেই অপচয় করেছে এখন তা সরিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্যে। মাঝে মাঝে মোরগ-ডাকা ভোরে তাদের দেখা যায় পয়সার ওপর পয়সা ঢিপ করে রাখছে, কিংবা কখনো নামিয়ে রাখছে, এখান থেকে কিছু নিচ্ছে ওখানে রাখার জন্যে, যাতে করে এই থোকটা ফারনান্দাকে খুশি রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়, আর ওই থোকটা আমারান্তা উরসুলার জুতোর জন্যে, আর অন্য আরেকটা সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের জন্যে, যে কিনা নতুন জামাকাপড় বানায় না বহু যুগ হতে চলেছে, আর এই থোকটা উরসুলা মারা গেলে তার কফিনের জন্যে, আর এটা প্রতি তিনমাস অন্তর পাউন্ড প্রতি এক সেন্ট করে দাম বেড়ে যাওয়া কফির জন্যে, আর এটা হররোজ মিষ্টি কমতে থাকা চিনির জন্যে, ওটা এখনো সেই বৃষ্টিতে ভিজে থাকা কাঠের গুঁড়ির জন্যে, আর এই অন্যটা টিকেট বানানোর কাগজ আর রঙীন কালির জন্যে, আর যা বাকি রয়ে যায় তা এপ্রিলের বাছুরটার বিজয়ীর জন্যে, যে-বাছুরটার একটা উপসর্গমূলক ফোঁড়া ওঠার পরেও ওরা সেটার প্রাণ রক্ষা করেছিল অলৌকিকভাবে, লটারির সব টিকেট বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরে। দারিদ্র্যের সেই আচার-অনুষ্ঠান এমনই নিখুঁত হতো যে প্রায় সময়ই সবচেয়ে বড় অংশটা ওরা রেখে দিতো ফারনান্দার জন্যে, আর এই কাজটা যে তারা দুঃখে পড়ে বা দয়া দেখিয়ে করতো তা কিন্তু নয়, বরং করতো এই কারণে যে ফারনান্দার ভালো থাকাটা ওদের কাছে নিজেদের ভালো থাকার চেয়েও জরুরি। যদিও ব্যাপারটা ওদের দু'জনের কেউই টের পায়নি, কিন্তু আসলে তাদের বেলায় যা ঘটছিল তা হল তারা যে একটা কন্যাসন্তান পেতে চেয়েছিল কিন্তু কখনোই পায়নি, ফারনান্দাকে তারা সেই কন্যা বলেই মনে করতো, আর সেটা এমনই পর্যায়ে পৌঁছয় যে একবার তো তারা একটা ওলন্দাজ টেবিলক্লথ কেনার জন্যে তিন দিন প্রায় না খেয়েই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু যতোই তারা কাজের চাপে নিজেদের জর্জরিত করে ফেলুক, যতোই টাকা পয়সা বাঁচাক, যতো পরিকল্পনার কথাই ভাবুক না কেন, তারা যখন পয়সা চালাচালি করে কোনোরকমে বেঁচে থাকার মতো সামান্য কিছু হাতে পেতে চাইছে তখন কিন্তু তাদের ওপর নজরদারি করার জন্যে নিযুক্ত দেবদূতরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। টাকা-পয়সার টানাটানির সময় যতক্ষণ ওরা জেগে থাকতো ততক্ষণই ওরা ভাবতো জগতে এমন কী ঘটল যে জীব-জন্তুগুলো এখন আর আগের মতো তাড়া নিয়ে বাচ্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পয়দা করে না, পয়সা কী করে হাতের আঙুল গলে পড়ে যায়, আর যে-সব লোক এই কিছুদিন আগেও মদ খেয়ে হৈ-হুল্লোড় করে গাদা গাদা টাকা-পয়সা নষ্ট করেছে ঠিক তারাই কিভাবে ছয়টা মুরগির লটারিতে বারো সেন্ট হাঁকাটাকে রীতিমতো ডাকাতি বলে মনে করছে। মুখে কথাটা প্রকাশ না করে অরেলিয়ানো সেগান্দো মনে মনে ভাবে গণ্ডগোলটা পৃথিবীতে নয়, বরং রয়েছে পেত্রা কোতেসের রহস্যময় মনের কোনো এক গোপন অংশে, যেখানে বন্যার সময় এমন একটা কিছু ঘটেছে যা জন্তুগুলোকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে, টাকা-পয়সাকে পরিণত করেছে এক বিরল জিনিসে। এই রহস্যের ফাঁদে পড়ে সে তার মনের এমন গভীরে ডুব দেয় যে স্বার্থের খোঁজ করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে ভালোবাসা, কারণ তাকে ভালোবাসতে পেত্রা কোতেসকে বাধ্য করতে গিয়ে সে নিজেই তার প্রেমে পড়ে যায়। আর অরেলিয়ানো সেগান্দোর ভালোবাসা বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পেত্রা কোতেস তাকে আরো বেশি করে ভালোবাসতে শুরু করে, আর এই কারণেই শেষ শরতে যৌবনের সেই কুসংস্কারটা তার আরো একবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, আর সেটা হল দারিদ্র্য হচ্ছে ভালোবাসার গোলামী। দু'জনেই তারা সেই উন্মত্ত আনন্দোৎসবের দিনগুলো, সেই চোখ ধাঁধানো সম্পদ, আর লাগামছাড়া মিলনের দিনগুলোকে এক ধরনের বিরক্তির চোখে দেখতে থাকে, বরং এই নিয়ে তারা আফসোস করে যে, ভাগ করে নেয়া নিঃসঙ্গতার স্বর্গ খুঁজে পেতে তাদেরকে জীবনের এতোখানি দিয়ে দিতে হয়েছে। বন্ধ্যা নৈকট্যের এতোগুলো বছর কাটানোর পর প্রেমে পাগল হয়ে টেবিলে কিংবা বিছানায় একে অন্যকে ভালোবাসার অলৌকিক ব্যাপারটা উপভোগ করতে থাকে তারা, আর নিজেদের এতোই সুখী বলে ভাবে যে যখন তারা দু'জনে আসলে দুই জরাজর্জর বুড়োবুড়ি তখনো তারা ছোট ছেলেমেয়েদের মতো বিকশিত হতে থাকে আর একে অন্যের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে কুকুরের মতো।

লটারিটা খুব একটা কাজে দেয় না। গোড়ার দিকে অরেলিয়ানো সেগান্দো হপ্তায় তিনদিন তার একসময়কার খামারবাড়ির অফিসে সময় কাটাতো, যে-পশুর লটারি হবে সে-অনুযায়ী বেশ পটু হাতে এঁকে ফেলতো একটা লাল গরু, একটা সবুজ শুয়োর কিংবা এক দঙ্গল নীল মুরগি, আর সেই সঙ্গে খুব সুন্দর করে স্কেচ করে ফেলতো ছাপা সংখ্যাগুলো আর যে-নামটা এই ব্যবসার জন্যে ভালো হবে বলে পেত্রা কোতেস মনে করে সেটা: *ঐশ্বরিক বিধানের লটারি*। কিন্তু কিছুদিন যেতেই হপ্তায় হপ্তায় দুই হাজার টিকিট এঁকে এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে যে, সব জীব-জন্তু, ব্যবসার নাম, আর সংখ্যাগুলোর রাবার স্ট্যাম্প বানিয়ে নেয় সে, আর তখন কাজ বলতে বাকি থাকে কেবল সেগুলোকে নানান রঙের প্যাডে ভেজানো। জীবনের শেষ বছরগুলোয় সংখ্যাগুলোর বদলে নানান ধাঁধা ব্যবহার করার কথাটা মাথায় আসে তার, যাতে করে যারা ওটা আন্দাজ করতে পারবে তারাও যেন পুরস্কারের একটা অংশ পায়, কিন্তু দেখা যায় ব্যাপারটা এতোই জটিল আর সন্দেহউদ্রেককারী যে দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টার পর সেটা বাদ দিতে হয়েছে তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের লটারির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে বাচ্চাদের দিকে তাকাবার সময়ই হয়ে ওঠে না তার। আমারান্তা উরসুলাকে ছোট্ট একটা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় ফারনান্দা, সেখানে ছাত্রী মাত্র ছ'জন, কিন্তু অরেলিয়ানোকে সে সরকারী স্কুলে পাঠাতে দেয় না। তার ধারণা, ছোঁড়াটাকে তার ঘরের বাইরে বেরোতে দিয়েই সে যথেষ্ট কোমলতার পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া, স্কুলগুলো সে-সময় ক্যাথলিকমতে বিবাহজাত বৈধ সন্তানদেরই গ্রহণ করতো, আর অরেলিয়ানোকে যখন এ-বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন তার গায়ের জামার ওপর পিন দিয়ে সেঁটে দেয়া বার্থ সার্টিফিকেটে তাকে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু হিসেবে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। কাজেই, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের স্নেহমাখা নজর আর উরসুলার মানসিক খামখেয়ালির করুণার কাছেই বন্দি হয়ে থাকতে হয় তাকে, বাড়ির ছোট্ট পৃথিবীর ভেতর তার প্রপিতামহীরা তাকে যা শেখায় তা-ই শিখতে থাকে। অরেলিয়ানো মেয়েদের মতো কোমলস্বভাবের, হালকা-পাতলা, আর বড়দেরকেও চমকে দেয়া কৌতূহলের অধিকারী, তবে কর্নেল তার এই বয়সে যে-রকম জিজ্ঞাসু আর অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টির অধিকারী ছিল তার দৃষ্টি সে-রকম নয়, বরং তারটা খানিকটা কুতকুতে আর বিক্ষিপ্ত। আমারান্তা উরসুলা যখন কিন্ডারগার্টেনে পড়ছে সে তখন বাগানে কেঁচো শিকার করে ফেরে আর পোকামাকড়গুলোকে যন্ত্রণা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু উরসুলার বিছানায় কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেবার সময় একদিন ফারনান্দা তাকে ধরে ফেলে, তারপর তাকে মেম্‌-এর পুরনো ঘরে বন্দি করে রেখে দেয়, সেখানে সে একা একা ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় বিশ্বকোষের পাতায় পাতায় ছবি দেখে দেখে। একদিন যখন উরসুলা বাড়িটাতে ডিস্টিলড্‌ ওয়াটার আর এক ছড়া বিছুটি ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই সময় সেখানে অরেলিয়ানোকে পেয়ে যায় সে, আর উরসুলা যদিও বহুবার তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে তারপরেও সে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে।

সে বলে, 'আমি অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।'

উরসুলা বলে, 'ঠিক বলেছ। এখন তোমার রুপোর কাজ শেখা শুরু করার সময় হয়েছে।'

ছেলেটাকে সে ফের নিজের ছেলে বলে ভুল করে, কারণ সেই প্রবল বর্ষণের পর গরম যে-হাওয়াটা সাময়িক সুস্থতার ঢেউ নিয়ে এসেছিল সেটা কেটে গেছে। এরপর সে আর তার বিচারবুদ্ধি ফিরে পায়না। শোবার ঘরে গিয়ে সে পেত্রোনিলা ইগুয়ারানকে পায় তাঁর বিরক্তিকর ফাঁপানো ঘাগরা আর পুঁতিবসানো জ্যাকেট পরা অবস্থায়, যেগুলো তিনি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের সময় পরতেন, পায় তার দাদী ত্রাংকুইলিনা মারিয়া মিনিয়াতা আলকোক বুয়েন্দিয়াকে, অক্ষমদের দোলখাটিয়ায় বসে নিজেকে হাওয়া করছেন তিনি ময়ূরের পাখা দিয়ে, পায় রাজপ্রতিনিধিদের রক্ষীদের ডলমানের অনুকরণে তৈরি করা কাপড় পরে বসে থাকা তার দাদার দাদা অরেলিয়ানো আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার বাবা অরেলিয়ানো ইগুয়ারানকে যিনি এমন একটা প্রার্থনা আবিষ্কার করেছেন যা পোকামাকড়কে কুঁচকে ফেলে গরুর গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে খসিয়ে দেবে, আর পায় তার ভীতু মা আর তার শুয়োরের লেজঅলা জ্ঞাতি ভাইকে, সেই সঙ্গে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া আর তার মৃত ছেলেদের, দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা চেয়ারে বসা অবস্থায়, যেন তারা বেড়াতে আসেনি এসেছে নিশিজাগরে। বকবকানির বহুরঙা একছড়া সুতো গেঁথে চলে সে, নানান স্থান আর নানান সময়ের নানান বিষয়ে নিজের মন্তব্য পেশ করতে থাকে, ফলে আমারান্তা উরসুলা যখন স্কুল থেকে ফিরে আসে আর অরেলিয়ানো বিশ্বকোষ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা দেখতে পায় নিজের বিছানায় বসে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে সে, হারিয়ে গেছে মৃত লোকজনের এক গোলকধাঁধায়। একবার সে ভয় পেয়ে বলে ওঠে, 'আগুন!' আর মুহূর্তের জন্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে, কিন্তু সে আসলে তার চার বছর বয়েসে একটা গোলাঘরে আগুন লাগার কথা বলছিল। শেষমেষ, অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে সে এমনভাবে গুলিয়ে ফেলে যে মারা যাওয়ার আগে সুস্থতার যে দু'-তিনটে পালা আসে সে-সময় কেউই ঠিক করে বলতে পারে না সে তার অনুভূতির কথা বলছে নাকি যা তার মনে পড়ছে তাই বলছে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছিল সে, পরিণত হচ্ছিল একটা ভ্রূণে, জীবদ্দশাতেই এমনভাবে একটা মমিতে পরিণত হচ্ছিল যে তার শেষ মাসগুলোতে তার রাত্রিবাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা একটা শুকনো চেরি ফলে পরিণত হয়েছিল সে, আর তার যে-হাতটা সে সবসময় উঁচু করে রাখতো সেটাকে মনে হতো মারিমোন্ডা বানরের থাবা। বেশ কিছুদিন নিশ্চল পড়ে থাকে সে, আর সে যে বেঁচে আছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তাকে ধাক্কা দিয়ে দেখতে হয় সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদকে, কোলে বসিয়ে খাওয়াতে হয় কয়েক চামচ শরবত। তাকে দেখতে সদ্যোজাত এক বৃদ্ধার মতো মনে হতো। আমারান্তা উরসুলা আর অরেলিয়ানো তাকে তার শোবার ঘরের বাইরে নিয়ে যেতো, আবার ভেতরে নিয়ে আসতো, তাকে বেদীতে শুইয়ে দিয়ে দেখতো সে শিশু যীশুর চেয়ে বড় কিনা, আর একদিন বিকেলে তারা তাকে ভাঁড়ার ঘরের এমন একটা দেয়ালকুঠুরির ভেতর লুকিয়ে রাখে যেখানে তাকে হয়তো ইঁদুর-ই খেয়ে ফেলতো। এক পাম রোববারে ফারনান্দা যখন গির্জায় গেছে, তারা শোবার ঘরে ঢুকে উরসুলাকে ঘাড় আর পায়ের গোড়ালি ধরে বের করে আনে।

আমারান্তা উরসুলা বলে, 'বেচারী বড় দাদী। বার্ধক্যের কারণে মারা গেল।'

চমকে ওঠে উরসুলা।

'আমি বেঁচে আছি!' সে বলে ওঠে।

আমারান্তা উরসুলা হাসি চেপে বলে, 'দেখো, ওর নিঃশ্বাস পড়ছে না।'

'আমি কথা বলছি!' উরসুলা চিৎকার করে ওঠে।

'ও এমনকি কথাও বলতে পারছে না,' অরেলিয়ানো বলে। 'ছোট্ট একটা ঝিঁঝি পোকার মতো মারা গেল বেচারী।'

এরপর আর কোনো প্রমাণ দেবার চেষ্টা করে না উরসুলা। তাজ্জব হয়ে নিচু গলায় সে বলে ওঠে, 'হায় ঈশ্বর, মরে গেলে তাহলে বুঝি এরকমই লাগে।' এক অন্তহীন, সবিরাম, গভীর প্রার্থনা শুরু করে সে, দু'দিনেরও বেশি সময় ধরে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই প্রার্থনা, আর মঙ্গলবার নাগাদ সেটা ঈশ্বরের কাছে অনুনয়-বিনয় আর এই সব ইহজাগতিক কামনার পর্যায়ে নেমে আসে যে লাল পিঁপড়ারা যেন বাড়িটাকে ধসিয়ে না দেয়, রেমেদিওসের দাগেরোটাইপ ফটোর পাশে যেন বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়, আর, কোনো বুয়েন্দিয়াকে যেন একই রক্তের কাউকে কখনো বিয়ে করতে না দেয়া হয় কারণ তাদের ছেলেমেয়েরা তাহলে শুয়োরের লেজ নিয়ে জন্মাবে। তার এই বিকারগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে অরেলিয়ানো সেগান্দো তার মুখ দিয়ে বের করার চেষ্টা করে সোনাটা কোথায় গোর দেয়া আছে, কিন্তু তার সে-সব অনুনয়-বিনয় এবারো কোনো কাজে আসে না। উরসুলা বলে, 'জিনিসটা যার সে যখন আসবে ঈশ্বর তখন তাকে ওটা খুঁজে পাওয়ার মতো বুদ্ধি যুগিয়ে দেবেন।' সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে শিগ্‌গিরই তারা উরসুলাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাবে, কারণ সেই সময়টায় প্রকৃতিতে সে একটা বিশেষ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করে: গোলাপ ফুলগুলো গুসফুট আগাছার মতো গন্ধ ছড়ায়, শুঁটি ধরা চমৎকার মটরদানা মাটিতে পড়ে গিয়ে একটা স্টারফিশের মতো নিখুঁত জ্যামিতিক আকারে ছড়িয়ে থাকে, আর এক রাতে সে দেখে এক সারি উজ্জ্বল কমলালেবুর চাকতি আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে।

গুড ফ্রাইডে-র সকালে তাকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে ওরা। শেষ যে-বার ওরা তাকে তার বয়স হিসেব করতে সাহায্য করেছিল, সেই কলা কম্পানির সময়ে, সে আন্দাজ করেছিল সেটা একশো পনেরো থেকে একশো পঁচিশের মধ্যে হবে। যে-কফিনে তাকে কবর দেয়া হয় সেটা যে-ঝুড়িতে করে অরেলিয়ানোকে নিয়ে আসা হয়েছিল তার চেয়ে বড় হবে না, আর, শেষকৃত্যানুষ্ঠানে খুব অল্প লোকই আসে, তার একটা কারণ এই যে তার কথা জানে এমন লোক খুব বেশি নেই তখন, আর দ্বিতীয়ত সেদিন দুপুরে এমনই গরম পড়ে যে পাখিরা দিশে হারিয়ে মাটির কবুতরের মতো দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ছিল আর শোবার ঘরের পর্দা ফুঁড়ে ঢুকতে গিয়ে মারা যাচ্ছিল।

AMARBOI.COM

প্রথমে ওরা ভাবে বুঝি কোনো মড়ক লেগেছে। ঘরের বউরা এতো মরা পাখি ঝাঁট দিয়ে ফেলতে ফেলতে হাঁপিয়ে ওঠে, বিশেষ করে সিয়েস্তার সময়, আর পুরুষরা ঠেলাগাড়ি ভরে ভরে সেগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসে। ইস্টার সানডেতে একশো-বছর-বয়েসী ফাদার আন্তোনিও ইসাবেল গির্জার বেদীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন পাখিদের এই মৃত্যুর কারণ 'ভ্রাম্যমাণ ইহুদি'র কুপ্রভাব, আর সেই ভ্রাম্যমাণ ইহুদিকে তিনি নিজে আগের রাতে দেখেছেন। তিনি তাকে একটা পাঠা আর একটা স্ত্রী হেরেটিক-এর সংকর বলে বর্ণনা করেন, বলেন সেটা এমন একটা নারকীয় জন্তু যার নিঃশ্বাস বাতাস পুড়িয়ে ফেলে, আর যার চেহারা দেখলে সদ্য বিবাহিত মেয়েদের পেট থেকে দানবের জন্ম হয়। তার এইসব রহস্যোদ্ঘাটনমূলক কথাবার্তায় অবশ্য খুব বেশি লোক কর্ণপাত করে না, কারণ শহরের লোকজন মনে করে পাদ্রি তাঁর বয়েসের কারণে আবোলতাবোল বকছেন। কিন্তু বুধবার ভোরবেলা এক মহিলা সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে ওঠায়, কি না, সে দ্বিধাবিভক্ত খুরঅলা একটা দু'পেয়ে জন্তুর পায়ের ছাপ আবিষ্কার করেছে। ছাপগুলো এমনই পষ্ট আর নির্ভুল যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা সেগুলো এক নজর দেখতে যায় তাদের মনে গ্রামের পাদ্রির বর্ণনা দেয়া সেই ভয়ংকর প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না, সবাই একজোট হয় যার যার উঠোনে ফাঁদ পেতে ওটাকে ধরার জন্যে। আর এভাবেই ওটাকে ধরা সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। উরসুলা মারা যাওয়ার দুই হপ্তা পর, কাছের থেকেই আসা একটা বাছুরের তীব্র চিৎকারের শব্দে ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে পেত্রা কোতেস আর অরেলিয়ানো সেগান্দো। তারা যখন সেখানে পৌছোয় একদল লোক ততক্ষণে একটা গর্তের শুকনো পাতা বিছানো তলায় বসানো চোখা চোখা খুঁটা থেকে দানবটাকে টেনে ছাড়াচ্ছে, অবশ্য ততক্ষণে সেটার চেঁচামেচি বন্ধ হয়েছে। কমবয়েসী একটা বলদের চেয়ে লম্বা না হলে কী হবে, ওজনে সেটা বড়সড় একটা বলদের মতো, আর সেটার ক্ষতস্থান থেকে সবুজ তেলের মতো একটা তরল পদার্থ বের হচ্ছে। গা-টা খসখসে লোমে ঢাকা, তাতে এঁটেল পোকার দৌরাত্ম্য, গায়ের চামড়াটা চোষক মাছের আঁশে শক্ত হয়ে আছে, তবে পাদ্রীর বর্ণনার সঙ্গে যেটা মেলে না তা হল, ওটার যে-সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের মতো সেগুলোর সঙ্গে বরং রোগাপাতলা এক দেবদূতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলই বেশি, কারণ সেটার হাত দুটো লম্বা টানটান করা আর ক্ষিপ্র, চোখ দুটো বড় বড়, অনুজ্জ্বল, আর ওটার শোল্ডার ব্লেডের ওপর নিশ্চিতভাবে কোনো কাঠুরিয়ার কুঠারের আঘাতে কেটে ফেলা শক্তদুটো ডানার ক্ষতচিহ্ন-কন্টকিত শক্ত গোড়াটা হয়ে গেছে। বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় একটা অ্যালমন্ড গাছে গোড়ালি বেঁধে ওটাকে ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাতে সবাই দেখতে পায়, আর যখন ওটা পচতে শুরু করে, তখন একটা বহ্নুৎসব করে পুড়িয়ে ফেলা হয় ওটাকে, কারণ ওরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে না ওটার জারজ স্বভাবটা কোনো জন্তুর মতো কিনা যাতে ওটাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলা যায়, নাকি মানুষের মতো যাতে কবর দেয়া যায়। পাখিগুলোর মৃত্যুর জন্যে আসলেই ওটা দায়ী কিনা সেটা যদিও কখনোই বের করা যায়নি, তবে সদ্য বিবাহিতাদের পেটে সেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক কোনো দানবেরও জন্ম হয় না, বা গরমের তীব্রতাও কমে না।

সেই বছরেরই শেষ দিকে মারা যায় রেবেকা। তার আজীবনের চাকরানী আর্জেনিদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে এই বলে সাহায্য চায় যে তার কর্তা-মা তিন দিন ধরে যেখানে তালা বন্দি সেই শোবার ঘরের দরজা ভেঙে তারা যেন তাকে বের করে আনে, তখন তারা গিয়ে দেখে রেবেকা নিজের বিছানায় একলা পড়ে আছে, শরীরটা কুঁকড়ে আছে বাগদা চিংড়ির মতো, দাদ-এর কারণে মাথাটা পুরো ন্যাড়া, আর একটা আঙুল মুখে পোরা। অরেলিয়ানো সেগান্দো শেষকৃত্যের ভার নেয়, তারপর বাড়িটা মেরামত করার চেষ্টা করে সেটা বিক্রি করে দেয়ার জন্যে, কিন্তু সেটার ক্ষয় এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে দেয়ালগুলো রঙ করতেই সেগুলো আঁশ আঁশ হয়ে পড়ে, তাছাড়া এতো চুনবালিসুরকি পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে যা দিয়ে মেঝেতে ফাটল ধরানো থেকে আগাছাগুলোকে নিবৃত্ত করা যায়, খুঁটিতে পচন ধরানো থেকে বিরত রাখা যায় আইভি লতাগুলোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো, এভাবেই কাটে সেই মহাপ্লাবনের পরের দিনগুলো। লোকজনের কুঁড়েমি আর বিস্মৃতির গোগ্রাস যেন ঠিক বিপরীতমুখী, আর এই দ্বিতীয়টি একটু একটু করে নিষ্করুণভাবে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল স্মৃতিগুলোকে, আর সেটা এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে নিয়ারলান্দিয়ার আরেক বর্ষপূর্তিতে যখন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের কয়েকজন দূত শেষ পর্যন্ত সেই পদকটা দেবার জন্যে মাকোন্দোতে এসে পৌঁছোয় যেটা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া বহুবার ফিরিয়ে দিয়েছে তখন তার একজন উত্তরপুরুষের সন্ধান দিতে পারে এমন একজন লোকের খোঁজে গোটা একটা বিকেল পার হয়ে যায় তাদের। পদকটা নিরেট সোনায় তৈরি মনে করে অরেলিয়ানো সেগান্দো ওটা নেবার কথা ভাবে একবার, কিন্তু দূতেরা ঘোষণা-টোষণা দিয়ে ফেলেছে আর এমনকি সেই অনুষ্ঠানের জন্যে বক্তৃতাও তৈরি হয়ে গেছে এমন সময় পেত্রা কোতেস তাকে বোঝায় যে, কাজটা করা উচিৎ হবে না। প্রায় এই সময়টাতেই আবার আসে মেলকিয়াদেসের বিদ্যার শেষ উত্তরসূরী জিপসিরা, শহরটা তখন এমনই পর্যুদস্ত আর শহরের বাসিন্দারা বাদবাকি দুনিয়া থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন যে ফের তারা চুম্বকপিণ্ড নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়, যেন আসলেই ব্যাবিলনিয়ার বুজুর্গরা সদ্য সদ্য আবিষ্কার করেছে সেগুলো, ফের তারা এক পেল্লায় আতস কাচ দিয়ে সূর্যরশ্মি একবিন্দুতে আনে; কেতলি গড়িয়ে পড়ছে, বাসন-কোসন গড়াগড়ি যাচ্ছে এসব দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ব্যাদান করে দেখতে লোকের যেমন অভাব হয় না, তেমনি এক জিপসি রমণীকে নকল দাঁত পর্যন্ত আর খুলে নিতে দেখে চমকে যাওয়ার জন্যে পঞ্চাশ সেন্ট খরচা করার মানুষেরও কমতি পড়ে না। মি. ব্রাউন যে লম্বা ট্রেনটায় যাজকীয় আরামকেদারাশোভিত, ছাতে কাচ লাগানো কোচ জুড়ে দিতো আর একশো গাড়ি-জোড়া যে সব ফলের ট্রেন গোটা বিকেল পার করে দিতো শহরটার ওপর দিয়ে যেতে তার অবশেষ হিসেবে পড়ে ছিল একটা ভাঙাচোরা সবুজ ট্রেন, সেটা কোনো যাত্রীকে নিয়েও আসতো না, কাউকে বাইরেও রেখে আসতো না। পাখিগুলোর আশ্চর্য মৃত্যু আর ভ্রাম্যমান ইহুদির বলির খবর তদন্ত করতে আসা গির্জার প্রতিনিধিরা ফাদার আনোন্তিও ইসাবেলকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে কানামাছি খেলতে দেখে তার দেয়া খবরটাকে একটা মতিবিভ্রমের ফল বলে ধরে নিয়ে তাকে একটা পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা পাঠায় ফাদার অগাস্টো অ্যাঞ্জেল নামের নতুন প্রজন্মের এক ক্রুসেডারকে, আপোসবিরোধী, উদ্ধত, দুঃসাহসী এই লোকটা লোকজনের উদ্দীপনা যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে সেজন্যে দিনের মধ্যে কতোবার যে নিজেই ঘণ্টা বাজায়, মাস্-এ যাওয়ার জন্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকজনকে ডেকে তোলে তার হিসেব থাকে না, কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই ওখানকার বাতাসে ছড়িয়ে থাকা ঢিলেমি, সব কিছু পুরনো আর বন্ধ্যা করে দেয়া ধুলো আর সিয়েস্তার অসহ্য গরমের সময় দুপুরে খাওয়া মাংসের পুরিয়া থেকে তৈরি হওয়া ঢুলুনিতে পেয়ে বসে তাকেও।

উরসুলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবারো একটা অযত্নের কবলে পড়ে বাড়িটা, আর তা থেকে এমনকি আমারান্তা উরসুলার স্থিরসংকল্প আর প্রাণশক্তিভরা সদিচ্ছাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটাকে রক্ষা করতে পারে না যখন অনেক দিন পরে এক সুখী, সংস্কারমুক্ত আধুনিক নারীতে পরিণত হয়ে, স্বাবলম্বী অবস্থায় সেই ধ্বংস এড়াতে সে দরজা-জানলা খুলে দেয়, বাগানটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই বারান্দার এ-মাথা-ও-মাথা হেঁটে বেড়ানো লাল পিঁপড়া নিধন করে আর আতিথেয়তার ভুলে যাওয়া মেজাজটা বৃথাই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালায়। ফারনান্দার অবরুদ্ধ আবেগ উরসুলার উদ্দাম একশো বছরের বিরুদ্ধে একটা অভেদ্য বাঁধ তৈরি করে। যখন খর বাতাস বইতে শুরু করে তখন সে যে কেবল দরজাগুলো খুলে দিতেই অস্বীকৃতি জানায় তা নয়, জীবন্ত কবরে যাওয়ার পিতৃমাতৃ আদেশ মেনে লোকজন ডেকে ক্রুশের মতো করে তক্তা কেটে জানলাগুলো পেরেক মেরে বন্ধ করে দেয়। অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে ব্যয়বহুল পত্রযোগাযোগ অশ্বডিম্ব প্রসব করে। বেশ কয়েকবার ব্যাপারটা মুলতুবি রাখার পর, নির্দিষ্ট দিনক্ষণে, সে নিজেই নিজের ঘরের খিল আটকে পড়ে থাকে, গায়ে জড়ায় কেবল একটা সাদা চাদর, মাথাটা রাখে উত্তর সিধা; আর রাত একটার সময় সে টের পায় বরফশীতল একটা রুমাল দিয়ে তার মাথাটা ঢেকে দেয়া হচ্ছে। যখন সে জেগে ওঠে তখন জানলা দিয়ে আলো এসে ঢুকছে আর তার দুই পায়ের মাঝখান থেকে শুরু হয়ে বক্ষাস্থিতে এসে শেষ হওয়া খিলানের মতো দেখতে একটা জঘন্য সেলাই পড়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাপত্রে তাকে যতদিন বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে তা শেষ করার আগেই অদৃশ্য চিকিৎসকদের কাছ থেকে একটা উদ্বেগজনক চিঠি এসে পৌছোয়, চিঠিতে তারা লিখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহুবার সে যে-সব উপসর্গের বর্ণনা দিয়েছিল ছয় ঘণ্টা তাকে পরীক্ষা করে দেখার পরেও তারা সে-রকম কিছু পায়নি। আসলে কোনো কিছুকেই সেটার সঠিক নামে না ডাকার তার সেই বদঅভ্যাসের কারণে একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ সেই টেলিপ্যাথিক চিকিৎসকরা শুধু যে-জিনিসটা খুঁজে পেয়েছিল তা হল জরায়ুর ঝুলকটা নিচে নেমে আসা, যোনিতে বাঁধার পট্টি ব্যবহার করেই যেটা দূর করা যাবে। হতাশ ফারনান্দা চেষ্টা করে আরো নির্দিষ্ট তথ্য পাবার, কিন্তু অদৃশ্য চিকিৎসকরা তার চিঠির আর কোনো জবাব দেয় না। একটা অপরিচিত শব্দের ভারে সে এমনই পরাস্ত বোধ করে যে ঠিক করে সেই পট্টি জিনিসটা কী তা লাজ-শরম বিসর্জন দিয়ে জিজ্ঞেসই করে ফেলবে, কিন্তু ঠিক তখনই সে আবিষ্কার করে সেই ফরাসী চিকিৎসক তিন মাস আগেই কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে, আর শহরের লোকজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার এক সহযোদ্ধা তাকে কবর দিয়েছে। তখন সে তার ছেলে হোসে আর্কাদিওর কাছে ব্যাপারটা খুলে বললে সে তাকে রোম থেকে পট্টিগুলো পাঠিয়ে দেয়, কিভাবে সে-সব ব্যবহার করতে হবে তা লেখা পুস্তিকাসমেত, অবশ্য কেউ যেন তার সমস্যাগুলোর কথা জানতে না পারে সেজন্যে ফারনান্দা সেই নির্দেশাবলী মুখস্ত করে ওটা পায়খানায় ফেলে ভালো করে পানি ঢেলে দেয়। এসবের কোনো দরকার ছিল না, তার কারণ বাড়িতে তখন যাদের বাস তারা তার দিকে নজর দিতো না বললেই চলে। সান্তা সোফিয়া দে লা তখন তার নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বয়স নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য যা কিছু ওরা খায় তাই রান্না করে দেয়, তাছাড়া প্রায় পুরোপুরিই সে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর যত্ন-আত্তির পেছনে নিবেদিত। আমারান্তা উরসুলা, উত্তরাধিকার সূত্রে যে সুন্দরী রেমেদিওসের খানিকটা মনোহারিত্ব পেয়েছে, সে আগে যে-সময়টা উরসুলাকে জ্বালিয়ে নষ্ট করতো এখন সেটা তার স্কুলের কাজের পেছনে ব্যয় করে, চমৎকার বিচারবুদ্ধি আর পড়াশুনোয় একনিষ্ঠার পরিচয় দিতে শুরু করে সে, আর তাই দেখে অরেলিয়ানো সেগান্দোর মনে সেই উজ্জ্বল আশার আলো জেগে ওঠে যা মেম্ একদিন জ্বালিয়েছিল তার বুকে। কলা কম্পানির সময়কার একটা রীতি অনুযায়ী, পড়াশুনো শেষ করার জন্যে তাকে ব্রাসেল্স্-এ পাঠানোর ওয়াদা করেছিল সে, আর সেই মোহই তাকে মহাপ্লাবনে নষ্ট হয়ে যাওয়া জমিগুলো পুনরুদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করে। মাঝে মধ্যে সে যে বাড়ি আসতো তা কেবল আমারান্তা উরসুলার জন্যে, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফারনান্দার কাছে এক আগন্তুকে পরিণত হয়েছে সে, আর ছোট্ট অরেলিয়ানো যতোই বয়োসন্ধির দিকে এগোচ্ছে ততোই সে তার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে। অরেলিয়ানো সেগান্দোর বিশ্বাস ছিল বয়স হলে ফারনান্দার মনটা নরম হবে, বাচ্চাটা যোগ দিতে পারবে শহরের স্বাভবিক জীবনের সঙ্গে, যেখানে নিশ্চিতভাবেই কেউ তার জন্মপরিচয় নিয়ে সন্দেহ-কুটিল ধারণা করবে না। কিন্তু অরেলিয়ানো নিজেই যেন নিঃসঙ্গতার খুপরি পছন্দ করে, বাড়ির সদর দরজা থেকে যে-দুনিয়াটা শুরু হয়েছে সে-সম্বন্ধে জানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে দেখা যায় না তার মধ্যে। উরসুলা যখন মেলকিয়াদেসের ঘরটা খোলার ব্যবস্থা করেছিল, তখনই অরেলিয়ানো সেটার আশেপাশে ঘুর ঘুর করা শুরু করে, আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতো সে, কেউই জানতো না কখন সে হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর কাছাকাছি এসে পড়েছিল পারস্পরিক ভালোবাসার টানে। সখ্যটা শুরু হওয়ার অনেক পরে সেটা নজরে পড়ে অরেলিয়ানো সেগান্দোর, যখন বাচ্চাটা স্টেশনের হত্যাযজ্ঞের কথা বলতে শুরু করে। খাওয়ার টেবিলে একদিন যখন কেউ একজন এই বলে অনুযোগ করে যে কলা কম্পানি মাকোন্দা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে শহরটার ছন্নছাড়া দশা হয়েছে তখনই ব্যাপারটা ঘটে, অরেলিয়ানো বিজ্ঞের মতো, একজন বড় মানুষের মতো অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সে-কথার প্রতিবাদ করে ওঠে। সাধারণ মতের উল্টো তার মত, আর তা হলো মাকোন্দো একটা বেশ সমৃদ্ধ জায়গাই ছিল, আর সেটা চলছিলও ঠিক পথেই, যদ্দিন পর্যন্ত না কলা কম্পানি এসে সেটাকে বিশৃঙ্খল, পংকিল আর কব্জা করে ফেলার পর সেখানকার এঞ্জিনীয়াররা শ্রমিকদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে মহাপ্লাবন ডেকে এনেছিল। জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে যীশু যেমন ছিলেন ঠিক তারই একটা বিপরীতার্থক ব্যাঙ্গাত্মক সংস্করণ বলে ফারনান্দার কাছে মনে হওয়া বাচ্চাটি একেবারে সঠিক আর বিশ্বাসযোগ্য খুঁটিনাটি সহ বলে চলে কী করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা স্টেশনের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাওয়া তিন হাজারেরও বেশি শ্রমিককে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছিল আর তারপর দু'শ গাড়ি জোড়া একটা ট্রেনে লাশগুলো তুলে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রে। বেশিরভাগ লোকের মতোই, কিছুই ঘটেনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্যে বিশ্বাসী ফারনান্দা একথা ভেবে শিউরে ওঠে যে উত্তরাধিকারসূত্রে বাচ্চাটা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার নৈরাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা পেয়ে গেছে, সে তাকে চুপ করতে বলে। ওদিকে অরেলিয়ানো সেগান্দো কিন্তু কথাগুলোর ভেতর তার যমজ ভাইয়ের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। সত্যি কথা বলতে কী, হোসে আর্কাদিও সেগান্দোকে সবাই পাগল মনে করলেও, সে-সময় বাড়ির সবচেয়ে সুস্থ মাথার মানুষ কিন্তু সে-ই। অরেলিয়ানোকে সে পড়তে শেখায়, লিখতে শেখায়, শেখায় কী করে পার্চমেন্টের পাঠোদ্ধার করতে হয়, আর, মাকোন্দোর কাছে কলা কম্পানিটা সে-সময় কী ছিল সে-ব্যাপারে এমন একটা ব্যক্তিগত মত সে জপে জপে তার মনে বুয়ে দেয় যে বহু বছর পর, অরেলিয়ানো যখন জগৎ সংসারের একটা অংশ, লোকে ভাবতো ঘটনাটার একটা অলীক ভাষ্য দিয়ে চলেছে সে, কারণ ঐতিহাসিকরা যে মিথ্যে ভাষ্য তৈরি করেছিল আর স্কুলের বইগুলোতে যেটাকে একটা পবিত্রতা দান করা হয়েছে তার কথাগুলো সেটার একেবারে উল্টো। বিচ্ছিন্ন যে ছোট্ট ঘরটায় শুকনো খরখরে বাতাস কিংবা ধুলোবালি কিংবা তাপ ঢোকে না সেখানে এই দু'জনেই বংশগত চরিত্রের পুনরাবৃত্তির মতো এক বৃদ্ধের দেখা পায়, পিঠটা জানলার দিকে ফিরিয়ে মাথায় কাকের ডানার মতো কানাঅলা একটা টুপি পরে তিনি ওদের জন্মের বহু বছর আগেকার দুনিয়ার কথা বলে চলেন। দু'জনে ঠিক একই সময় বলে চলে কী করে সেখানে সব সময়টা মার্চ মাস-ই থাকে, আর বারটা থাকে সোমবার, আর তখন তারা বুঝতে পারে পরিবারের লোকজন যতটা বলে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া ঠিক ততটা পাগল ছিল না, বরং একমাত্র তারই এ-ব্যাপারটির বোঝার মতো যথেষ্ট সুস্থতা ছিল যে সময়-ও হোঁচট খেতে বা দুর্ঘটনায় পড়তে পারে, ফলে তা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়তে পারে, কোনো না কোনো ঘরের ভেতর রেখে যেতে পারে চিরস্থায়ী হয়ে যাওয়া একটা খণ্ড। এদিকে হোসে আর্কাদিও সেগান্দো পার্চমেন্টের গুপ্ত লেখাগুলো শ্রেণীবিন্যাস করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সে নিশ্চিত হয়ে যায় সাতচল্লিশ থেকে তেপ্পান্ন অক্ষরের একটা বর্ণমালার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ওগুলোর, আলাদা আলাদাভাবে দেখলে অক্ষরগুলোকে আঁচড় আর আঁকিবুকি বলে মনে হয়, আর মেলকিয়াদেসের চমৎকার হাতের লেখায় সেগুলোকে মনে হয় দড়ির ওপর শুকাতে দেয়া কাপড়ের মতো। অরেলিয়ানোর মনে পড়ে এরকমই একটা ছক সে দেখেছে ইংরেজি বিশ্বকোষে, কাজেই সেটা সে সেই ঘরে নিয়ে যায় হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর ছকটির সঙ্গে তুলনা করার জন্যে। দেখে, দুটো একেবারে একই রকম।

সেই বিশেষ লটারির সময়টাতেই, গলায় কিছু একটা আটকে ঘুম ভেঙে যেতে শুরু করে অরেলিয়ানো সেগান্দোর, যেন কান্নার একটা ইচ্ছে চেপে রাখছে সে। ব্যাপারটাকে এই দুঃসময়েরই বয়ে আনা নানান অঘটনেরই আরেকটি হিসেবে নেয় পেত্রা কোতেস, তারপর এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সে অরেলিয়ানো সেগান্দোর টাকরায় খানিকটা করে মধু ছুঁইয়ে যায় আর খানিকটা মুলার সিরাপ খাইয়ে চলে। গলার ডেলাটা যখন এমনই আগ্রাসী হয়ে ওঠে যে নিঃশ্বাস নেয়াই কঠিন হয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার জন্যে, সে যায় পিলার তারনেরার কাছে, আরাম দিতে পারে এমন কোনো লতা-গুল্মের সন্ধান তার কাছে আছে কিনা তা জানার জন্যে। ছোটখাট একটা গোপন বেশ্যালয় চালিয়ে একশো বছর বয়েসে পৌঁছনো ভয়ডরশূন্য দাদীর কিন্তু ভেষজ কুসংস্কারে বিশ্বাস নেই, বরং ব্যাপারটা সে তার তাসগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়। দেখতে পায়, রুইতনের বিবির গলায় ইশকাপনের গোলামের অস্ত্র বিঁধে আছে, আর এ-থেকে সে ধরে নেয় অরেলিয়ানোর ছবিতে পিন দিয়ে ফুটো করার কুখ্যাত পদ্ধতিতে ফারনান্দা তার স্বামীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, তবে ডাকিনী বিদ্যায় তার হাতুড়ে বিদ্যার কারণে ওখানে সে একটা টিউমার গজিয়ে ফেলেছে। বিয়ের ছবি ছাড়া অরেলিয়ানো সেগান্দোর আর কোনো ছবি না থাকাতে আর তার সবগুলো কপি বাড়ির অ্যালবামে রয়ে যাওয়াতে, বৌ-এর চোখ এড়িয়ে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে সেগুলো খুঁজতে থাকে সে, আর শেষ পর্যন্ত ড্রেসারের তলায় মূল বাক্সগুলোর ভেতর আধ ডজন পট্টি নজরে আসে তার। লাল, ছোট ছোট, রাবারের রিংগুলোকে ডাকিনী বিদ্যার সরঞ্জাম ভেবে সেগুলো সে পকেটে পুরে নেয়, যাতে পিলার তারনেরাকে দেখানো যায়। ওগুলো যে আসলে কী পিলার তারনেরা অবশ্য তা বুঝতে পারে না, কিন্তু জিনিসগুলো তার এতোই সন্দেহজনক বলে মনে হয় যে উঠোনে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলে সে। ফারনান্দার সম্ভাব্য অভিশাপ জাদুটোনা দিয়ে অকেজো করে দেয়ার জন্যে সে অরেলিয়ানো সেগান্দোকে বলে সে যেন একটা উমে-বসা মুরগিকে পানিতে ভিজিয়ে সেটাকে চেস্টনাট গাছের নিচে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে, আর অরেলিয়ানো সেগান্দো তখন এমন পরম বিশ্বাসের সঙ্গে কাজটা করে যে খুঁড়ে তোলা মাটি শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে না দিতেই তার মনে হতে থাকে আগের চেয়ে ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে সে। ওদিকে পট্টিগুলোর অন্তর্ধানকে ফারনান্দা অদৃশ্য চিকিৎসকদের প্রতিশোধ হিসেবেই মনে করে, তারপর তার শেমিজের ভেতর একটা পকেটের মতো সেলাই করে তার ছেলের পাঠানো নতুন পট্টিগুলো রেখে দেয়।

মুরগিটা গোর দেয়ার ছ'মাস পর একদিন মাঝরাতে অরেলিয়ানো সেগান্দো কাশতে কাশতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তার মনে হয় একটা কাঁকড়ার থাবা তার গলা টিপে ধরেছে। আর তখনই সে বুঝতে পারে, তার ধ্বংস করা ওইসব যাদুর পট্টি আর পানিতে ভেজানো মুরগি সত্ত্বেও একটা মন খারাপ করা সত্যি কথা হল সে মারা যাচ্ছে। কাউকে কিছু বলে না সে। আমারান্তা উরসুলাকে ব্রাসেল্‌স্‌ না পাঠিয়েই তাকে মরতে হবে এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠে সে এমন কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে যা সে আগে কোনো দিন করেনি, আর, একটার বদলে হপ্তায় তিনটে লটারির আয়োজন করে। খুব ভোরবেলা থেকেই তাকে দেখা যেতো শহরময় ছুটোছুটি করছে, চলে যাচ্ছে এমনকি সবচেয়ে দূরবর্তী আর বাজে এলাকাতেও, এমন উদ্বিগ্নভাবে টিকিট বিক্রির চেষ্টা করছে যা কেবল যে-লোক মারা যাচ্ছে তার বেলা ছাড়া ভাবা যায় না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে হাঁক দিতো, 'এসে গেছে ঐশ্বরিক বিধানের লটারি। এটা হাতছাড়া করবেন না, কারণ একশো বছর পর পর দেখা মেলে এর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে হাসিখুশি, আকর্ষণীয় আর মুখর হিসেবে সবার কাছে হাজির করার করুণ প্রয়াস পায় সে, কিন্তু তার ঘর্মাক্ত দেহ আর চেহারার মলিন দশা দেখে খুব ভালো করেই বোঝা যেতো তার মন পড়ে আছে অন্যখানে। যে-থাবাগুলো ভেতরে ভেতরে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছিল সেগুলোর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পেতে মাঝে মধ্যে সে কোনো ফাঁকা বাড়িতে চলে যেতো যেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এমনকি মাঝ রাত্তিরেও নিষিদ্ধ-পল্লীতে চলে যেতো সে, প্রসন্ন বরাতের ভরসা দিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতো ফনোগ্রাফের পাশে বসে বসে কেঁদে আকুল হওয়া নিঃসঙ্গ রমণীদের। টিকিটগুলো দেখিয়ে সে তাদের বলতো, 'এই নম্বরটা গত চার মাসে একবারও আসেনি। এটা হাতছাড়া কোরো না। যতোটা ভাবো, জীবন তার চেয়েও ছোট।' শেষ অব্দি তার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে ওরা, হাসাহাসি শুরু করে তাকে নিয়ে, আর শেষ দিনগুলোতে ওরা আর তাকে আগের মতো দন অরেলিয়ানো না ডেকে একেবারে তার মুখের ওপরই জনাব ঐশ্বরিক বিধান বলে ডাকতো। গলাতে উল্টোপাল্টা সুর বাজতে থাকে তার। প্রথমে সেটা বেসুরো হতে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ে পরিণত হয়, কিন্তু তারপরেও, পেত্রা কোতেসের উঠোনে লোকজন যে আশার আলো বয়ে আনতো তা যেন উবে না যায় সেদিকে নজর রাখার মতো উদ্যম তার নষ্ট হয় না। অবশ্য, তার গলা যখন নষ্ট হয়ে যায় আর সে বুঝতে পারে যে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যথাটা সহ্যের বাইরে চলে যাবে, তখন তার বোধোদয় হয় যে শুয়োর আর ছাগলের লটারি তার মেয়েকে ব্রাসেল্স্ পর্যন্ত নিতে পারবে না, কাজেই মহাপ্লাবনে নষ্ট হয়ে যাওয়া জমি লটারির অসাধারণ কথাটা মাথায় আসে তার, যে-জমি খুব সহজেই যে কেউ মেরামত করে নিতে পারবে যথেষ্ট টাকা থাকলে। কাজটা এমনই অসাধারণ যে, মেয়র নিজে একটা ঘোষণার মাধ্যমে তাতে সাহায্য করার কথা জানিয়ে দেন, নানান সঙ্ঘ তৈরি হয় একশো পেসো দিয়ে একেকটা টিকিট কেনার জন্যে, এক হপ্তারও কম সময়ের ভেতর বিক্রি হয়ে যায় সেগুলো। লটারির রাতে বিজয়ীরা এমন এক মহা উৎসবের আয়োজন করে যার তুলনা করা চলে কেবল কলা কম্পানির রমমার সময়কার লটারিগুলোর সঙ্গেই, আর তখন শেষবারের মতো অরেলিয়ানো সেগান্দো মরদ ফ্রান্সিসকোর গানগুলো বাজায় অ্যাকোর্ডিয়ানে, কিন্তু সেগুলো গাইতে পারে না সে।

দুই মাস পর ব্রাসেল্স্ যায় আমারান্তা উরসুলা। কেবল বিশেষ সেই লটারি থেকে পাওয়া টাকাটাই নয়, আগের মাসগুলোয় যত টাকা-পয়সা অরেলিয়ানো সেগান্দো জমাতে পেরেছিল, সেই সঙ্গে পিয়ানোলা, ক্ল্যাভিকর্ড ইত্যাদি আরো সব মেরামতির অযোগ্য আজেবাজে জিনিস বিক্রি করে অল্প যা কিছু পেয়েছিল তার সবই সে তুলে দেয় মেয়েটার হাতে। তার হিসেব অনুযায়ী, টাকাটা আমারান্তা উরসুলার পড়াশোনার খরচ মেটাবার জন্যে যথেষ্ট, কাজেই যা বাকি থাকে তা হল তার বাড়ি ফিরে আসার খরচ। প্যারিস আর সেই শহরের সর্বনেশে নিয়তি যে ব্রাসেল্স্-এর খুব কাছে এ-ব্যাপারটা চিন্তা করে শিউরে উঠে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারনান্দা এই যাত্রার বিপক্ষে ছিল, কিন্তু ফাদার আঞ্জেল তাকে তরুণী ক্যাথলিক রমণীদের জন্যে সন্ন্যাসিনীদের চালানো একটা আশ্রমের ঠিকানা দেয়া চিঠি দিতে সে শান্ত হয়, তাছাড়া আমারান্তা উরসুলা কথা দেয় তার পড়াশুনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ওখানেই থাকবে। ফ্রান্সিসকান কয়েকজন সন্ন্যাসিনীর তত্ত্বাবধানে আমারান্তা উরসুলার ভ্রমণের ব্যবস্থাও করে দেয় সেই যাজক-পল্লীর পাদ্রী, সন্ন্যাসিনীরা যাচ্ছে তলেদো, তারা আশা প্রকাশ করে বেলজিয়াম পর্যন্ত মেয়েটাকে সঙ্গ দেয়ার মতো নির্ভরযাগ্য লোকজন সেখানে পাওয়া যাবেই। এই সমন্বয় ঘটানো জরুরি-পত্রযোগাযোগ চলাকালে অরেলিয়ানো সেগান্দো পেত্রা কোতেসের সাহায্যে আমারান্তা উরসুলার মালপত্র গোছগাছ করে ফেলে। সেই রাতে তারা ফারনান্দার বিয়ের একটা তোরঙ্গে এমন গোছানোভাবে তার জিনিসপত্র রাখে যে স্কুল ছাত্রীটির মুখস্থ হয়ে যায় আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার সময় সে কোন স্যুট আর কাপড়ের চপ্পল পরবে, জাহাজ থেকে নামার সময়ই বা সে কোন তামার বোতামঅলা নীল কোট আর কর্ডোভার জুতো পরে নামবে। সে আরো জানতো গ্যাংপ্ল্যাংক বেয়ে ওপরে ওঠার সময় কী করে হাঁটতে হবে যাতে সে পড়ে না যায়, জানতো খাওয়ার সময় ছাড়া কখনোই সেই সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গ ত্যাগ করা যাবে না বা তার কেবিন ছেড়ে বের হওয়া চলবে না, আর সমুদ্রে থাকাকালীন কোনো কারণেই কারো প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে না, তা সে পুরুষই হোক বা নারী। সমুদ্রপীড়ার তরল ওষুধভরা ছোট্ট একটা বোতল আর ঝড় ঠেকানোর জন্যে ফাদার অ্যাঞ্জেল-এর নিজের হাতে লেখা ছয়টা প্রার্থনার একটা নোটবই সঙ্গে রাখে সে। টাকা-পয়সা রাখার জন্যে ফারনান্দা তাকে মোটা কাপড়ের একটা বেল্ট বানিয়ে দেয়, এমনকি ঘুমনোর সময়ও ওটা খোলা বারণ। সে তাকে কড়া ক্ষারের একটা তরল দিয়ে ধোয়া আর অ্যালকোহল দিয়ে জীবাণুনাশ করা একটা কমোডপটও দিতে চায়, কিন্তু তার স্কুলের বন্ধুরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এই ভয়ে আমারান্তা উরসুলা ওটা নিতে রাজি হয় না। মাস কয়েক পর, মৃত্যুর সময়, অরেলিয়ানো সেগান্দোর মনে পড়ে যাবে আমারান্তা উরসুলাকে শেষবারের মতো দেখার দৃশ্যটি, সে তখন ফারনান্দার শেষ উপদেশটি শোনার জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচের জানলা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। তার পরনে রেশমের একটা গোলাপী পোশাক, সঙ্গে বাম কাঁধে কাঁটা দিয়ে আটকানো নকল পান্‌সি ফুলের কাঁচুলি, বগ্‌লস আঁটা নিচু গোড়ালিঅলা তার সেই কর্ডোভার জুতো, ইলাস্টিকের ফিতা দিয়ে উরু পর্যন্ত টেনে রাখা সাটিনের মোজা। একহারা গড়ন, চুল লম্বা, খোলা, আর চোখজোড়া প্রাণোচ্ছল, ঠিক যেমন উরসুলার ছিল এই বয়েসে, আর যেভাবে সে না কেঁদে, তবে না হেসেও বটে, বিদায় জানায় সেটাও চরিত্রের সেই একই শক্তির পরিচায়ক। তার মেয়ে যখন আঙুলের ডগা দিয়ে উড়ন্ত চুমো ছুঁড়ে দেয় অরেলিয়ানো সেগান্দোর দিকে কোচটা তখন জোরে ছুটতে শুরু করেছে, সেটার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে আর ফারনান্দা যাতে হোঁচট না খায় সেজন্যে তার বাহু আঁকড়ে ধরে অরেলিয়ানো সেগান্দো কোনোরকমে হাত নেড়ে বিদায় জানায় তাকে। একটা কালো বিন্দু হয়ে দিগন্তে মিশে যাওয়া ট্রেনটির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে প্রখর রোদের ভেতর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দম্পতিটি, বিয়ের পর এই প্রথমবারের মতো হাতে হাত রেখে।

ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে পাঠানো প্রথম চিঠিটা তখনো পৌঁছোয়নি, অগাস্টের নয় তারিখ হোসে আর্কাদিও সেগান্দো মেলকিয়াদেসের ঘরে বসে কথা বলছিল অরেলিয়ানোর সঙ্গে, এবং কী বলছে সেটা না বুঝেই হঠাৎ সে বলে ওঠে:

'সব সময় মনে রাখবি তিন হাজারেরও বেশি লোক ছিল তারা, আর তাদের সবাইকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল সাগরে।'

তারপরেই সে মুখ থুবড়ে পড়ে পার্চমেন্টের ওপর, মারা যায় চোখ দুটো খোলা অবস্থাতেই। ঠিক সেই মুহূর্তে, ফারনান্দার বিছানায়, তার যমজ ভাই তার গলাটা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা ইস্‌পাতের কাঁকড়ার হাতে প্রলম্বিত আর ভয়ংকর যন্ত্রণার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বৌ-এর পাশে মরার কথা রাখতে এক হপ্তা আগে সে বাড়ি ফিরে এসেছিল, তখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, শরীরে চামড়া আর হাড় ক'খানা ছাড়া কিছু নেই, সঙ্গে তার সেই ভ্রাম্যমাণ তোরঙ্গ আর অকেজো অ্যাকোর্ডিয়ানটা। তার কাপড়চোপড় গোছগাছ করে তোরঙ্গে ভরতে পেত্রা কোতেস সাহায্য করেছিল তাকে, তারপর এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে বিদায় জানিয়েছিল, কিন্তু পাকা চামড়ার যে-জুতোজোড়া সে কফিনে পরতে চেয়েছিল সেটা দিতে ভুলে যায় সে। কাজেই তার মৃত্যুর খবর শুনে, কালো পোশাক পরে, জুতোজোড়া একটা খবরের কাগজে মুড়ে, সে ফারনান্দার কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে লাশটা একনজর দেখার। ফারনান্দা তো তাকে দরজা পেরিয়ে ভেতরেই ঢুকতে দেবে না।

পেত্রা কোতেস অনুনয় বিনয় করে বলে, 'আমার জায়গায় নিজেকে চিন্তা করে দেখো। ভেবে দেখো, নিশ্চয়ই কী ভালোই না বাসতাম আমি ওকে যে এই অপমানটা সহ্য করতে চলে এসেছি।'

ফারনান্দা জবাব দেয়, 'একজন রক্ষিতার সব অপমানই প্রাপ্য। কাজেই তোমার আরেক মরদ না মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, জুতোজোড়া তখন তাকে পরিয়ো।'

নিজের দেয়া কথা রাখতে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর গলা কেটে ফেলে রান্নাঘরের একটা ছুরি দিয়ে, যাতে লোকজন তাকে জ্যান্ত কবর দিতে না পারে। একই রকম দেখতে দুটো কফিনে রাখা হয় লাশ দুটো, আর তখন দেখা যায় যে, বয়োসন্ধির আগে ওরা দু'জন দেখতে যেমন এক রকম ছিল, মৃত্যুর সময়েও আবার তেমনি একই রকম হয়ে গেছে তারা। অরেলিয়ানো সেগান্দোর হৈ-হুল্লোড়ভরা পানোৎসবের পুরনো সেই ইয়ার-দোস্তরা তার বাক্সের ওপর বেগুনি লাল ফিতা জড়ানো একটা ফুলের তোড়া অর্পণ করে তাতে এই কথা ক'টা লিখে: *ক্ষান্ত দাও, গরুর দল, জীবন দু'দিনের*। এই অশ্রদ্ধাজনক ব্যাপার দেখে ফারনান্দা এমনই ক্ষেপে যায় যে ফুলের তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে ময়লার ঢিবির ওপর। শেষ মুহূর্তের সেই ডামাডোলের ভেতর মনমরা সেই মাতালেরা, যারা দু'জনকে কাঁধে করে বাড়ি থেকে বের করে আনে, তারা কফিন দুটো গুলিয়ে ফেলে ভুল কবরে গোর দিয়ে বসে তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘদিন মেলকিয়াদেসের ঘর ছেড়ে বেরোয় না অরেলিয়ানো। একেবারে মুখস্ত করে ফেলে সে তুলতুলে হয়ে আসা বইগুলোর উদ্ভট সব কিংবদন্তী, খঞ্জ হারমানের বিদ্যার সংশ্লেষণ, ডাকিনী বিদ্যার ওপর লেখা টীকা-টিপ্পনী, পরশপাথর তৈরির সূত্রাবলী, নস্ত্রাদামুসের *শতাব্দী* আর প্লেগের ওপর তাঁর গবেষণা; কাজেই, তার নিজের সময়ের কোনো কিছু না জেনে, বরং মধ্যযুগের একজন লোকের প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে বয়োসন্ধিতে পৌঁছোয় সে। যখনই তার ঘরে যেতো, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ দেখতো পড়ায় ডুবে রয়েছে সে। ভোরবেলা তাকে চিনিছাড়া এক মগ কফি এনে দিতো সে, দুপুরে নিয়ে আসতো একথালা ভাত আর ভাজা কলার কয়েক ফালি; অরেলিয়ানো সেগান্দো মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে এছাড়া অন্য কিছু খাওয়া হচ্ছে না। অরেলিয়ানোর চুল একেবারে ছোট ছোট করে ছাঁটা ছিল সে-সময়ে; বিস্মৃত কিছু তোরঙ্গের ভেতর পাওয়া কিছু পুরনো কাপড়চোপড় সংস্কার করে তার পরার উপযোগী করে দিয়েছিল সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ, আর যখন তার গোঁফ গজাতে শুরু করে সে তাকে এনে দেয় কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ক্ষুর আর লাউয়ের যে-খোলটা কর্নেল দাড়ি কামাবার মগ হিসেবে ব্যবহার করতো সেটা। তার সঙ্গে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার চেহারার যতোটা মিল, ততটা মিল তার তার ছেলেদের সঙ্গেও ছিল না, বিশেষ করে দুই চোখের নিচের প্রকটা হয়ে থাকা হাড়, আর দৃঢ, খানিকটা নিষ্ঠুরতা মাখানো ঠোঁটজোড়ার দিক দিয়ে। অরেলিয়ানো সেগান্দো যখন এই ঘরটায় পড়তো তখন উরসুলার বেলায় যা ঘটেছিল, সে-রকম সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ-ও মনে করে অরেলিয়ানো বুঝি নিজের সঙ্গে কথা বলছে। আসলে, কথা বলছিল সে মেলকিয়াদেসের সঙ্গে। প্রচণ্ড গরম পড়া এক দুপুরে, যমজ দুই ভাইয়ের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর, জানলা থেকে আসা আলোর উল্টো দিকে বিষণ্ন বৃদ্ধ লোকটিকে তার কাকের ডানার মতো টুপি পরা অবস্থায় অরেলিয়ানো দেখতে পায় তার নিজের জন্মেরও মেলা দিন আগে থেকে তার মাথায় ঢুকে থাকা একটি স্মৃতির মূর্ত রূপের মতো। ততদিনে অরেলিয়ানো পার্চমেন্টের বর্ণমালার শ্রেণীবিন্যাস শেষ করে ফেলেছে, কাজেই মেলকিয়াদেস যখন তাকে জিজ্ঞেস করে ওটা কোন ভাষায় লেখা সেটা সে আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা, তখন উত্তর দিতে তার একটুও দেরি হয় না।

সে বলে, 'সংস্কৃত।'

মেলকিয়াদেস তাকে জানায় এই ঘরে তার ফিরে আসার সুযোগ সীমিত। তবে শান্তি নিয়েই সে পরম মৃত্যুর তৃণভূমিতে চলে যাবে কারণ পার্চমেন্টটা একশ বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো হতে যতটুকু সময় আছে তার মধ্যেই সংস্কৃত শিখে ফেলার মতো যথেষ্ট সময় অরেলিয়ানো পাবে, আর তখন সেটা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে। মেলকিয়াদেসই অরেলিয়ানোকে বলে দেয় যে, নদীর দিকে যে সরু পথটা চলে গেছে, কলা কম্পানির সময়ে যেখানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া হোতো, সেখানে এক জ্ঞানী কাতালোনিয়র একটা বইয়ের দোকান আছে, সেই দোকানে আছে সংস্কৃত শেখার একটা আদর্শলিপি, চটজলদি সে ওটা কিনে না নিলে জিনিসটা ছয় বছরের ভেতর পোকার পেটে চলে যাবে। অরেলিয়ানো যখন সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদকে বইয়ের আলমারিগুলোর একেবারে ডান দিককার দ্বিতীয়টায় মুক্ত *জেরুজালেম* আর মিল্টনের কবিতার বইয়ের মাঝখানের বইটা নিয়ে আসতে বলে, সেই মহিলাটি তার দীর্ঘ জীবনে এই প্রথমবারের মতো কোনো অনুভূতি বাইরে ফুটে বেরুতে দেয়, আর সেটা একটা বিস্ময়ের অনুভূতি। যেহেতু সে পড়তে জানে না, কাজেই তাকে অরেলিয়ানো যা বলে তা সে মুখস্ত করে নেয়, তারপর কামারশালায় থেকে যাওয়া সতেরোটা সোনার মাছের একটা বিক্রি করে কিছু টাকা-পয়সার জোগাড় করে; সেই যে এক রাতে বাড়িতে সৈন্যদের তল্লাশির সময় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার পর থেকে সোনার মাছগুলোর খবর অরেলিয়ানো আর সে ছাড়া কেউ জানতো না।

অরেলিয়ানো তার সংস্কৃত চর্চায় ক্রমেই এগিয়ে চলে, আর মেলকিয়াদেসের আসা-যাওয়াও ধীরে ধীরে কমতে কমতে দুপুরের উজ্জ্বল আলোয় মিলিয়ে যেতে থাকে। শেষ যে-বার অরেলিয়ানো তার অস্তিত্ব টের পায় মেলকিয়াদেস তখন স্রেফ একটা অদৃশ্য উপস্থিতিমাত্র, বিড়বিড় করে সে বলে: 'সিঙ্গাপুরের বেলাভূমিতে জ্বরে মৃত্যু হয়েছে আমার।' এরপর থেকেই ঘরটা ধুলোবালি, গরম, উঁইপোকা, লাল পিঁপড়া আর মথপোকার কব্জায় চলে যায়, পার্চমেন্টের জ্ঞানকে তারা করাতকাটা গাছের গুঁড়ো বানিয়ে ছাড়ে।

বাড়িতে খাবারের কোনো ঘাটতি নেই। অরেলিয়ানো সেগান্দো মারা যাওয়ার পরের দিন তার এক বন্ধু, সেই যে-লোকটা অশ্রদ্ধাজনক লেখাসহ একটা ফুলের তোড়া এনেছিল, সে ফারনান্দাকে দেয়ার জন্যে কিছু টাকা নিয়ে আসে, টাকাটা তার স্বামীর কাছ থেকে ধার নিয়েছিল সে। এরপর থেকে প্রতি বুধবার এক মিস্তি ছোকরা একটা ঝুড়িতে করে এক হপ্তার জন্যে যথেষ্ট খাবার বাড়িতে দিয়ে যেতে শুরু করে। কেউ কোনো দিন জানতে পারে না যে, খাবারগুলো পাঠাতো পেত্রা কোতেস, আর সেটা এ-কথা ভেবে যে, যে-মানুষটা একদিন তাকে অপমান করেছিল তাকেই অপমান করার একটা উপায় এই অবিরল দাক্ষিণ্য। তারপরেও কিন্তু সে নিজে যতটা আশা করেছিল তার অনেক আগেই তার মনের বিদ্বেষটা মিলিয়ে যায়, আর এরপর থেকে খাবারটা সে পাঠিয়ে যেতে থাকে একটা গর্ব থেকে, আর শেষ পর্যন্ত, সহানুভূতির কারণে। বহুবারই, যখন লটারিতে তুলবার মতো কোনো জন্তু থাকতো না, আর লোকজনও ব্যাপারটার ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল, ফারনান্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতে কিছু খেতে পারে সেজন্যে সে নিজে না খেয়ে থাকতো, আর এভাবেই, তার নিজের বাড়ির পাশ দিয়ে ফারনান্দার শবযাত্রা চলে যেতে দেখার আগ পর্যন্ত, নিজেকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে সে।

সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের ক্ষেত্রে বাড়ির লোকের সংখ্যাহ্রাসের বিষয়টি হওয়া উচিৎ ছিল আধা শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কাজ করে যাওয়ার পুরস্কার হিসেবে পাওয়া বিশ্রাম। যে চুপচাপ, দুর্জ্ঞেয় রমণী এই বংশে সুন্দরী রেমেদিওসের দেবদূতোপম বীজ আর হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর রহস্যময় গাম্ভীর্য রুয়ে দিয়েছিল, বাচ্চাকাচ্চাদের মানুষ করার কাজে গোটা একটা নিঃসঙ্গ জীবন যে উৎসর্গ করে দিয়েছিল, সেই রমণীর মুখ থেকে একটা আহাজারিও বেরোয়নি কোনোদিন, যদিও তারা কি তার সন্তান না সন্তানের সন্তান সেকথা সে প্রায় মনেই করতে পারতো না, আর অরেলিয়ানোকে তো সে এমনভাবে দেখাশোনা করতো যেন সে তার পেটের সন্তান, যদিও জানতো না যে আসলে সে বাচ্চাটার নানার মা। ওরকম একটা বাড়িতেই কেবল তার পক্ষে সম্ভব ছিল সারাজীবন ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে রাত্তিরবেলা ইঁদুরের আওয়াজের মধ্যে একটা মাদুর পেতে শোয়া, সম্ভব ছিল কেউ তার দিকে চেয়ে আছে এমন একটা ভয়ার্ত অনুভূতি নিয়ে একরাতে জেগে উঠে এটা দেখা যে আসলে একটা বিষাক্ত সাপ তার পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে জানতো উরসুলাকে বললে সে তাকে তার নিজের বিছানাতেই শুতে দেবে, কিন্তু তখন সময়টাই এমন যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে না বললে কেউ কোনো কিছু সম্বন্ধে জানতে পারে না, কারণ [illegible] হৈচৈ, যুদ্ধের চমক আর বাচ্চাকাচ্চার দেখাশোনার ভেতর অন্যের সুখশান্তি নিয়ে ভাববার মতো সময় ছিল না কারোর। যাকে সে কখনো দেখেইনি সেই পেত্রা কোতেস-ই একমাত্র লোক যে তাকে মনে রেখেছিল। সব সময় সে খেয়াল রেখেছে যেন রাস্তাঘাটে পরে বেরোবার মতো সুন্দর একজোড়া জুতো তার থাকে, কখনো কাপড়-চোপড়ের অভাব না হয় তার, এমনকি লটারি যখন স্রেফ অলৌকিকের ওপর ভরসা করে চলছে, তখনো। ফারনান্দা যখন এ-বাড়িতে আসে তখন তার এ-কথা ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল যে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ এক চিরস্থায়ী চাকরাণী, আর যদিও সে একথা বহুবারই শোনে যে সে হল তার স্বামীর মা, কিন্তু এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, কথাটা ভুলে যেতে তার যতদিন লেগেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি সময় লেগেছিল সেকথা আবিষ্কার করতে। সান্তা সেফিয়া দে লা পিয়েদাদকে অবশ্য তার এই নিচু অবস্থান নিয়ে কোনোদিনই বিচলিত বলে মনে হয়নি। লোকজনের বরং মনে হতো যে-কোনোরকম বিরতি ছাড়া, কোনো অভিযোগ না করে বয়োসন্ধি থেকে যে-বাড়িতে সে থেকে আসছে, কলা কম্পানির সময় থেকে যে-বাড়িটাকে বাড়ির চেয়েও বেশি মনে হতো সেনাছাউনি বলে, সে-বাড়িটা সাফসুতরো আর ঠিকঠাক রেখে কোনাঘুপচিতে পড়ে থাকাটাই তার পছন্দ। কিন্তু উরসুলা মারা যাওয়ার পর তার এই অতিমানবিক খাটুনি আর কাজ করার অসাধারণ ক্ষমতা নষ্ট হতে শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা কেবল এই নয় যে সে বুড়ো হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, বরং গোটা বাড়িটাকেই যেন বার্ধক্যের সংকটে পেয়ে বসেছে রাতারাতি। হালকা শেওলা জমে ওঠে দেয়ালের গায়ে। আঙিনাতে তো ফাঁকা কোনো জায়গাই থাকে না, বারান্দার সিমেন্ট কাচের মতো ভেঙে ফেলে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আগাছা, আর সেই ফাটল থেকে গজিয়ে ওঠে ঠিক সেই সব হলুদ ফুল একশ বছর আগে উরসুলা যেগুলো দেখেছিল মেলকিয়াদেসের নকল দাঁত রাখা গ্লাসে। প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ রোখার মতো আয়ু বা সাধ্য কোনোটাই ছিল না সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের, সারাদিন শোবার ঘরের টিকটিকি তাড়িয়ে বেড়াতো সে, যদিও রাতের বেলাই ফিরে আসতো সেগুলো। একদিন সকালে সে দেখে লাল পিঁপড়েগুলো ধসিয়ে ফেলা ভিত ছেড়ে, বাগান পেরিয়ে, রেলিং বেয়ে, যেখানে বেগনিয়াগুলো মেটেরঙা হয়ে রয়েছে সেখানে উঠে বাড়ির একেবারে মধ্যে ঢুকে পড়েছে। প্রথমে একটা ঝাঁটা দিয়ে, তারপর পোকা মারার ওষুধ দিয়ে, সবশেষে কাপড় ধোয়ার কড়া ক্ষারের তরল দিয়ে সেগুলো মারার চেষ্টা করে সে, কিন্তু পরদিনই দেখা যায় আগের মতোই নাছোড় আর অজেয় ভঙ্গিতে ফিরে এসেছে সেগুলো ঠিক আগের জায়গায়। নিজের ছেলেমেয়ের কাছে চিঠি লেখায় ব্যস্ত ফারনান্দা এই লাগামছাড়া ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কিছুই জানতে পায় না। সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ একাই লড়ে যায়, রান্নাঘরে আগাছার প্রবেশ ঠেকাতে যুঝে চলে সেগুলোর সঙ্গে, দেয়াল থেকে মাকড়সার জালের ফিতাগুলো উপড়ে ফেলে, যদিও কয়েক ঘণ্টা পরে ঠিকই আবার তৈরি হয়ে যায় সেগুলো, ঘষে ঘষে মেরে ফলে উইপোকাগুলো। কিন্তু যখন দেখে দিনে সে তিনবার করে ঝাড়া-মোছা করার পরেও মেলকিয়াদেসের ঘরটা পর্যন্ত ধুলোময় আর মাকড়সার জালে ভর্তি রয়ে যায় আর তার প্রবল ঘষামাজার পরেও সেটা ময়লা-আবর্জনা, আর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার হুমকির সম্মুখীন, যা কেবল কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া আর সেই তরুণ অফিসারই আগেভাগে দেখতে পেয়েছিল, তখন সে বুঝতে পারে হার হয়েছে তার। তখন সে তার জরাজীর্ণ রোববারের পোশাকটা পরে নেয়, উরসুলার একজোড়া পুরনো জুতো পায়ে গলায়, আমারান্তা উরসুলার দেয়া এক জোড়া সুতোর মোজা পরে নেয়, আর তারই রেখে যাওয়া দু'-তিনপ্রস্থ বাড়তি কাপড়ের একটা পুঁটুলি বানায়।

অরেলিয়ানোকে সে বলে, 'আমি আর পারছি না বাপু। আমার বুড়ো হাড়ের পক্ষে এ-বাড়ি বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

অরেলিয়ানো যখন জিজ্ঞেস করে সে কোথায় যাচ্ছে, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ একটা আবছা ইঙ্গিত করে, যেন নিজের গন্তব্যের ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অবশ্য, এরপর সে আরেকটু খোলাসা করার চেষ্টা করে বলে তার এক জ্ঞাতি ভাই রিয়োহাচায় থাকে, তার কাছেই যাচ্ছে সে জীবনের শেষ ক'টা দিন পার করে দেবার জন্যে। ব্যাখ্যাটা খুব একটা যুতসই হয় না। তার বাপ-মার মৃত্যুর পর শহরের কারো সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না, বা কারো কাছ থেকে কোনো

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি বা সংবাদও পায়নি সে কোনোদিন, বা কখনো কোনো আত্মীয়-স্বজনের কথাও শোনা যায়নি তার মুখ থেকে। স্রেফ নিজের কাছে যা আছে, এক পেসো পঁচিশ সেন্ট, তাই নিয়ে সে চলে যাবে বলে গোঁ ধরলে অরেলিয়ানো তাকে চোদ্দটা সোনার মাছ দেয়। ঘরের জানলা দিয়ে অরেলিয়ানো দেখে, পা টেনে টেনে, বয়েসের ভারে নুয়ে পড়ে কাপড়ের পঁটুলিটা হাতে আঙিনা পেরিয়ে যাচ্ছে সে, দেখে, সদর দরজার একটা ফাঁক দিয়ে তার হাতটা গলিয়ে দিয়েছে সে, আর, বেরিয়ে যাওয়ার পর হুড়কোটা লাগিয়ে দিয়েছে আগের জায়গায়। এরপর তার কথা কখনো শোনা যায়নি আর।

এই নিরুদ্দেশের খবরটা শোনার পর, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ কিছু নিয়ে পালালো কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তোরঙ্গ, জামা-কাপড়, দেয়ালকুঠুরি একটা একটা করে খুঁজে দেখতে দেখতে গোটা একটা দিন তারস্বরে সকার-বকার করে মরে ফারনান্দা। জীবনে প্রথমবারের মতো আগুন জ্বালাতে গিয়ে আঙুল পুড়িয়ে ফেলে সে, আর, কিভাবে কফি বানাতে হয় তা দেখিয়ে দেবার জন্যে সাহায্য চাইতে হয় তাকে অরেলিয়ানোর কাছে। কিছুদিন যেতে অরেলিয়ানোই বুঝে নেয় রান্নাঘরের দায়িত্ব। ঘুম থেকে উঠেই সকালের নাস্তা তৈরি পেয়ে যেতো ফারনান্দা, তারপর সে ফের ঘর ছেড়ে বেরুতো কেবল জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর ঢাকা দিয়ে অরেলিয়ানোর রেখে যাওয়া দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্যে, আর সেটা নিয়ে সে চলে যেতো থালাটা লিনেন-এর টেবিল-ঢাকার ওপর রেখে চারপাশে মোমদানগুলো নিয়ে পনেরোটা খালি চেয়ার বসানো টেবিলটার নিঃসঙ্গ প্রান্তে বসে খাওয়ার জন্যে। এমনকি ওরকম পরিস্থিতিতেও অরেলিয়ানো আর ফারনান্দা তাদের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিতো না, বরং দু'জনেই যার যার মতো যার যার ঘর পরিষ্কার করে যেতো আর, এদিকে মাকড়সার জাল তুষারের মতো পড়তো এসে গোলাপের ঝাড়গুলোর ওপর, ছেয়ে ফেলতো কড়িকাঠ, গদির মতো আস্তর ফেলতো দেয়ালগুলোয়। এই সময়টার দিকেই ফারনান্দার মনে হতে শুরু করে যে বাড়িটা বামনাকার ভূতে ভরে যাচ্ছে। জিনিসপত্তরের, বিশেষ করে প্রতিদিন যেগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর যেন নিজে থেকেই জায়গা বদলানোর একটা ক্ষমতা জন্মেছে। যে-কাঁচিজোড়া বিছানার ওপর রেখেছে বলে সে নিশ্চিত, সব কিছু উল্টে-পাল্টে তা-ই খুঁজে খুঁজে সময় নষ্ট করার পর সেটা সে পায় রান্নাঘরের একটা তাকের ওপর, অথচ সে ভেবেছিল চার দিন ওখানে যাওয়া হয়নি তার। রুপোর সিন্দুকটা থেকে হঠাৎই চামচগুলো গায়েব হয়ে যায়, তারপর তিনটে পাওয়া যায় বেদীর ওপর, বাকি তিনটে গোসলখানায়। সে লিখতে বসলে জিনিসপত্তরের এই ভ্রাম্যমাণতা হয়ে উঠতো আরো ক্লান্তিকর। ডানপাশে রাখা কালির দোয়াতটা চলে যাবে বামে, চোষকাগজটা হয়ে যাবে লাপাত্তা, যদিও দু'দিন পর সেটাকে পাওয়া যাবে তার বালিশের নিচে, আর হোসে আর্কাদিওকে লেখা চিঠি তালগোল পাকিয়ে যাবে আমারান্তা উরসুলাকে লেখা চিঠির সঙ্গে, আর সব সময়ই সে এই যন্ত্রণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুগতো যে চিঠিগুলো বোধহয় সে ভুল খামে ঢুকিয়ে ফেলেছে, যা আসলে প্রায়ই ঘটতো। একবার সে তার ঝরনা কলমটা হারিয়ে ফেলে। দুই হপ্তা পর, ডাকপিওন সেটা নিজের থলেতে আবিষ্কার করে ফেরত দিয়ে যায়। তার আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেটার মালিকের খোঁজ করেছিল সে। ফারনান্দা প্রথমে ভাবে, পট্টিগুলোর অন্তর্ধানের মতো এসব বোধহয় সেই অদৃশ্য চিকিৎসকদের কাজ, আর সে এমনকি তাকে একলা থাকতে দেবার অনুরোধ জানিয়ে তাদেরকে একটা চিঠি লিখতেও শুরু করে, কিন্তু অন্য কোনো একটা কাজ করতে গিয়ে তার চিঠি লেখায় বাধা পড়ে, তারপর ঘরে ফিরে সে যে কেবল চিঠিটাকেই নিখোঁজ দেখতে পায় তা নয়, ওটা সে কেন লিখছিল সেটা পর্যন্ত ভুলে বসে থাকে। একটা সময় তার মনে হয় কাজটা বুঝি অরেলিয়ানোর। তার ওপর নজর রাখতে শুরু করে সে, তার চলার পথে জিনিসপত্তর ফেলে রাখে, চেষ্টা করে ভিন্ন জায়গায় ওগুলো সরিয়ে রাখার সময় তাকে ধরে ফেলবার, কিন্তু শিগ্‌গিরই সে বুঝে যায় অরেলিয়ানো রান্নাঘর বা পায়খানায় যাওয়া ছাড়া মেলকিয়াদেসের ঘর ছেড়ে বেরোয় না, বুঝে যায়, ছলচাতুরী করার লোক সে নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাস জন্মে, এসব ভূতেরই কারসাজী, আর তাই যে-জিনিসটা যেখানে ব্যবহার করবে সেটাকে সেখানেই রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সে। একটা লম্বা সুতো দিয়ে কাঁচিজোড়া তার বিছানার মাথার সঙ্গে বেঁধে নেয় সে। কলম আর চোষকাগজ বেঁধে রাখে টেবিলের পায়ার সঙ্গে, আর সাধারণত সে যেখানে বসে লিখতো তার ডান দিকে টেবিলের ওপর কালির দোয়াতটা সে আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়। সমস্যাগুলো যে রাতারাতি সব সমাধান হয়ে যায় তা নয়, কারণ সুতো দিয়ে কাঁচিজোড়া বাঁধার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা যায় সুতোটা যথেষ্ট লম্বা নয়, ফলে কাটাকুটি করা যাচ্ছে না। সেই একই ঘটনা ঘটে কলমের সঙ্গে বাঁধা সুতো, এমনকি তার নিজের হাত নিয়েও, কিছুক্ষণ লেখার পর কালির দোয়াতের কাছে আর পৌঁছোতে চায় না হাতটা। ব্রাসেল্‌স্‌-এ থাকা আমারান্তা উরসুলা বা রোমে থাকা হোসে আর্কাদিও এসব তুচ্ছ ঘটনা কোনোদিনই জানতে পারে না। ফারনান্দা তাদের জানায় সে খুব সুখী, আর আসলেও তাই সে, তার ঠিক ঠিক কারণটা এই যে নিজেকে তার সব ধরনের আপোসরফা থেকে মুক্ত বলে মনে হয়, যেন জীবন তাকে আরো একবার তার বাবা-মা'র জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কেউই দৈনন্দিন সমস্যাগুলোতে ভোগে না, কারণ লোকজনের কল্পনার ভেতর আগে থেকেই সেগুলোর সমাধান হয়ে থাকে। সেই অন্তহীন চিঠি চালাচালি তার সময়জ্ঞান লুপ্ত করে দেয়, বিশেষ করে সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ চলে যাওয়ার পর থেকে। তার ছেলে আর মেয়ের ফিরে আসার নির্ধারিত তারিখ দুটোকে উল্লেখবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করে দিন মাস আর বছরের হিসেব রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু বারবার ওরা ওদের পরিকল্পনা বদল করাতে তারিখগুলো গোলমাল পাকিয়ে যায়, মুহূর্তগুলো হয়ে যায় বিশৃঙ্খল, আর একটা দিন এতোটাই অন্য আরেক দিনের মতো হয়ে যায় যে দিন যে কাটছে তা বোঝাই যায় না। এই বিলম্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধৈর্য হওয়ার বদলে বরং একটা গভীর আনন্দ অনুভব করে ফারনান্দা। এটা তাকে মোটেই বিচলিত করে না যে হোসে আর্কাদিও তার অন্তিম শপথ-এর পূর্বক্ষণের ঘোষণা দেয়ার বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বলে যাচ্ছে যে সে কূটনীতিবিদ্যায় পাঠ নেয়ার জন্যে অ্যাডভান্সড্ থিয়োলজিতে তার পড়াশোনা শেষ করার অপেক্ষায় আছে, তার কারণ ফারনান্দা জানে, সন্ত পিটারের সিংহাসনের দিকে যে-সিঁড়ি উঠে গেছে তা কত খাড়া আর বিপদসংকুল। বরং অন্য লোকজনের কাছে যে-খবরের কোনো মূল্যই নেই, যেমন তার পুত্র পোপের দর্শনলাভ করেছে, সেইসব খবর শুনে তার মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সে ঠিক একই রকম খুশি হয়ে ওঠে যখন আমারান্তা উরসুলা তাকে চিঠি লিখে জানায় যে আগে যতটা সময় লাগবে বলে ভাবা হয়েছিল, তার পড়াশোনা শেষ হতে তার চেয়ে বেশি দিন লাগবে, তার কারণ, তার পাওয়া দুর্দান্ত সব গ্রেড তাকে এমন কিছু সুযোগ এনে দিয়েছে যা তার বাবা হিসেবের মধ্যেই ধরেনি।

সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদ সেই ব্যাকরণ বইটা অরেলিয়ানোকে এনে দেবার তিন বছরেরও বেশি সময় কেটে যাবার পর প্রথম পাতাটা অনুবাদ করে উঠতে সক্ষম হয় সে। কাজটা যদিও পণ্ডশ্রম নয়, তবে এটা এমন এক রাস্তা বরাবর বাড়ানো প্রথম পদক্ষেপ যে-রাস্তার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আগেভাগে কিছু বলা অসম্ভব, কারণ হিস্পানি ভাষায় লেখা জিনিসটার কোনো অর্থই বোঝা যায় না: লাইনগুলো লেখা হয়েছে সাংকেতিক ভাষায়। লেখাটার পাঠোদ্ধার করার মতো সূত্র বের করার মালমশলা অরেলিয়ানোর হাতে নেই কিছুই, কিন্তু মেলকিয়াদেস যেহেতু তাকে বলে গেছে পার্চমেন্টের মর্মোদ্ধার করার জন্যে প্রয়োজনীয় বইপত্তর জ্ঞানী কাতালোনিয়র দোকানে রয়েছে, সে ঠিক করে ফারনান্দার সঙ্গে কথা বলবে, যাতে সে তাকে ওগুলো জোগাড় করার অনুমতি দেয়। পাথরের কুঁচিতে ভরে যাওয়া আর সেগুলোর লাগামছাড়া সংখ্যাবৃদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত হার মেনে নেয়া ঘরটায় বসে বসে সে ভাবতে থাকে সবচেয়ে ভালোভাবে কী করে আর্জিটা পাড়া যায় ফারনান্দার কাছে, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার তার একমাত্র সুযোগটা যখন উপস্থিত হয়, অঙ্গার পাত্র থেকে তাকে খাবার নিতে দেখার সময়, তখন বহু কসরত করে তৈরি করা অনুরোধটা তার গলায় এসে আটকে যায়, মুখ দিয়ে কোনো কথাই ফোটে না। এই সময়টাতেই ফারনান্দার ওপর সতর্ক নজর রাখতে শুরু করে অরেলিয়ানো। কান পেতে শোনে শোবার ঘরে তার পায়ের আওয়াজ। শুনতে পায়, সে তার দুই সন্তানের চিঠির জন্যে অপেক্ষা করতে আর নিজের চিঠিগুলো ডাকপিওনের হাতে দেবার জন্যে দরজার দিকে যাচ্ছে, আর গভীর রাত পর্যন্ত খস্‌খস্, অধৈর্য শব্দ তুলে কাগজের ওপর কলমের আঁচড় কেটে চলেছে, আর তারপর অরেলিয়ানো শুনতে পায় সুইচ নেভানো আর অন্ধকারে তার প্রার্থনার শব্দ। তারপরই কেবল ঘুমোতে যায় সে, এই ভেবে যে, পরের দিন প্রতীক্ষিত সেই সুযোগটা পাওয়া যাবে। অনুমতিটা পাওয়া যাবে, এই ধারণায় সে এতোটাই উজ্জীবিত হয়ে ওঠে যে এক সকালে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল কেটে, জট পাকানো দাড়ি কামিয়ে, আঁটোসাঁটো একজোড়া প্যান্ট আর কৃত্রিম কলারঅলা একটা শার্ট পরে নিয়ে–সেটা সে কার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে কে জানে–রান্নাঘরে অপেক্ষায় করতে থাকে ফারনান্দা কখন সকালের নাস্তা নিতে আসবে সেজন্যে। নিত্যদিনের নারীটি, সব সময় যে মাথা উঁচু করে চলতো, দৃঢ় পায়ে হাঁটতো, সে কিন্তু আসে না, আসে নকুলের চামড়ার হাতাছাড়া কোট পরা, অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যের অধিকারী এক বৃদ্ধা মহিলা, মিনে করা কার্ডবোর্ডের একটা মুকুট পরে আর এমন একটা অবসন্ন চেহারা নিয়ে যা দেখে বোঝা যায় গোপনে কান্নাকাটি করেছে সে। সত্যি বলতে কি, অরেলিয়ানো সেগান্দোর তোরঙ্গে পাওয়ার পর পোকায় কাটা রানীর পোশাকটা ফারনান্দা বহুবার পরেছে। নিজের রাজকীয় অঙ্গভঙ্গি দেখে উচ্ছ্বসিত অবস্থায় তাকে আয়নার সামনে দেখলে যে কেউই মনে করতো মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। রাজপোশাকটা সে স্রেফ তার স্মৃতি উস্কে দেবার একটা উপায়ে পরিণত করেছে। প্রথমবার পোশাকটা পরার পর শত চেষ্টা করেও বুকের ভেতর একটা দলা পাকিয়ে ওঠা আর চোখ দুটো পানিতে ভরে যাওয়া ঠেকাতে পারেনি সে, কারণ তখন তার নাকে এসে লেগেছে সেই অফিসারটির বুটপালিশের গন্ধ যে তাকে রানী বানাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের বাড়িতে এসেছিল, আর তখন তার অন্তরাত্মাটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার হারানো স্বপ্নগুলোর জন্যে এক আকুলতায়। নিজেকে তার এতো বয়েসী, এতো জরাজীর্ণ বলে মনে হয়, জীবনের সেরা সময় থেকে নিজেকে তার এতো দূরবর্তী বলে বোধ হয়ে যে, সবচেয়ে খারাপ বিষয়গুলোর জন্যেও তার বুকটা এক আকুল আকাঙ্খায় হু হু করে ওঠে, আর কেবল তখন-ই সে আবিষ্কার করে তার প্রাণ কতটা কাঁদছে বারান্দায় অরিগ্যানোর হালকা সুবাস, সন্ধ্যায় গোলাপের ঘ্রাণ আর এমনকি ভূঁইফোঁড় লোকজনের পশুসুলভ আচার-ব্যবহারের অভাবে। চাপ চাপ ছাইয়ের মতো তার যে-হৃদয়টা দৈনন্দিন বাস্তবতার সবচেয়ে জোরালো আঘাতও অনায়াসে সয়েছে, খান খান হয়ে তা ভেঙে পড়ে স্মৃতিকাতরতার প্রথম ঢেউয়েই। সময় তাকে যতোই ক্ষয়ে ফেলছিল, বিষণ্ন বোধ করার প্রয়োজনটা তাতোই একটা দোষে পরিণত হচ্ছিল। তার নিঃসঙ্গতার ভেতরই সে মানবিক হয়ে ওঠে। তারপরেও, যে-সকালে রান্নাঘরে ঢুকতে এক পাণ্ডুর, কৃশকায় বালক চোখদুটোয় কুহকমাখা একটা দীপ্তি নিয়ে তার দিকে এক পেয়ালা কফি বাড়িয়ে দেয়, উপহাসের থাবা তখন ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে তাকে। বালকের অনুরোধ সে যে শুধু নাকচই করে দেয় তা নয়, এরপর থেকে সে বাড়ির চাবি সেই অব্যবহৃত পট্টিগুলো-রাখা পকেটে পুরে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। এই সাবধানতার কোনো দরকার ছিল না, তার কারণ ইচ্ছে করলে অরেলিয়ানো বাড়ি থেকে তো পালিয়ে যেতে পারতোই, এমনকি সবার চোখ এড়িয়ে ফিরেও আসতে পারতো। কিন্তু সেই দীর্ঘ বন্দিদশা, জগতের অনিশ্চয়তা, বাধ্যতার অভ্যেস তার বুকের বিদ্রোহের বীজগুলোকে শুকিয়ে ফেলেছিল। কাজেই সে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁয়াড়েই ফিরে গিয়ে বারবার পড়তে থাকে পার্চমেন্টের পাতাগুলো, আর গভীর রাত পর্যন্ত শুনতে থাকে শোবার ঘরে ফারনান্দার ফোঁপানো কান্নার শব্দ। একদিন ভোরবেলা বরাবরের মতো আগুন জ্বালাতে গেছে সে, দেখে, আগের দিন ফারনান্দার জন্যে সে যে খাবার রেখে গিয়েছিল তা পড়ে আছে নিভে যাওয়া ছাইয়ের ভেতর। তখন সে ফারনান্দার শোবার ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় নকুলের চামড়ার হাতাহীন কোট-ঢাকা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে সে, আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে, আর তার গায়ের চামড়া পরিণত হয়েছে গজদন্তের এক আবরণে। চার মাস পর এসে পৌঁছেও হোসে আর্কাদিও ফারনান্দাকে ঠিক সেই অবস্থাতেই দেখতে পায়।

নিজের মায়ের সঙ্গে এর চেয়ে মিল সম্পন্ন কোনো মানুষের কথা ভাবাও যায় না। পরনে তার মলিনদর্শন রেশমি কাপড়ের স্যুট, গোল শক্ত কলারের শার্ট, গলায় নেকটাই-এর বদলে পাতলা সিল্কের একটা ফিতা বো-র মতো করে বাঁধা। তার চেহারায় আরক্তিম, অবসন্ন একটা ভাব, চোখে কেমন যেন একটা চমকে যাওয়া দৃষ্টি, আর ঠোঁটজোড়া পাতলা। মাথার মধ্যেখান দিয়ে সোজা, ক্লান্ত একটা রেখা তার যে চকচকে মসৃণ কালো চুলকে দু'ভাগ করে দিয়ে চলে গেছে সে-চুলে সন্তদের চুলের মতো একই কৃত্রিম ভাব। খুব ভালো করে নিখুঁত-করা দাড়ির যে-ছায়া তার তেল চিটচিটে মুখে পড়েছে সেটাকে লাগছে বিবেকের একটা প্রশ্নের মতো। তার হাত দুটো পাণ্ডুর, তাতে পরজীবীর মতো সবুজ শিরা আর আঙুল, আর তার বাম হাতের তর্জনীতে নিরেট সোনার একটা আংটি, তাতে ওপালের একটা গোল সূর্যমুখী বসানো। সে যে অনেক দূর থেকে এসেছে সেকথা বোঝার জন্যে দরজা খোলার পর অরেলিয়ানোকে আগন্তুকের পরিচয়টা বলে দেবার দরকার পড়ে না। হোসে আর্কাদিও যখন ছোট ছিল তখন ছায়ান্ধকারে তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে তার মাথায় উরসুলা যে সুগন্ধি পানি ছিটিয়ে দিতো, বাড়িতে তার পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পানির সুবাসে চারদিক ভরে ওঠে। এতোগুলো বছরের অনুপস্থিতির পরেও কী এক অজ্ঞাত কারণে এখনো সে নিদারুণ বিষণ্ন আর নিঃসঙ্গ এক শরৎ-শিশুই রয়ে গেছে। প্রথমেই সে তার মায়ের ঘরে যায়, সেখানে চার মাস ধরে অরেলিয়ানো তার দাদার দাদার পানির পাইপে পারদ গরম করে গেছে মেলকিয়াদেসের ফর্মুলা মোতাবেক দেহটাকে সংরক্ষণ করার জন্যে। তাকে অবশ্য কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে না হোসে আর্কাদিও। মৃতদেহের কপালে একটা চুমো খেয়ে তার স্কার্টের নিচ থেকে পকেটের মতো একটা খাপ বের করে নেয়, ব্যবহার না করা পট্টিগুলো আর ফারনান্দার কেবিনেটের চাবি ছিল সেটার ভেতর। কুণ্ঠাহীনভাবে, স্থিরসংকল্পের সঙ্গে প্রত্যেকটা কাজ সারে সে, যদিও সেটা তার নিস্তেজ চেহারার সঙ্গে মানায় না। কেবিনেট থেকে সে কুলচিহ্ন বসানো দামাস্কাসের ছোট্ট একটা বাক্স বের করে, সেটার ভেতরে চন্দনসুবাসিত একটা লম্বা চিঠি পায়, সে-চিঠিতে ফারনান্দা একেবারে অকপটে লিখে রেখেছে হোসে আর্কাদিওর কাছে গোপন করে যাওয়া অগুনতি সত্য কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ানো অবস্থাতেই, আগ্রহের সঙ্গে, তবে কোনোরকম উৎকণ্ঠা ছাড়া চিঠিটা পড়ে সে, তৃতীয় পাতায় এসে থেমে দ্বিতীয়বারের মতো অরেলিয়ানোর দিকে তাকায় তাকে শনাক্ত করার ভঙ্গিতে।

গলায় ক্ষুরের ধার এনে বলে, 'জারজটা তাহলে তুই।'

'আমি অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।'

হোসে আর্কাদিও বলে, 'তোর ঘরে যা।'

চলে যায় অরেলিয়ানো, আর পরে, লোকসমাগমহীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, কৌতূহলের বশেও বাইরে আসে না। রান্নাঘর থেকে সে মাঝে মাঝে দেখতো, নিজের উৎকণ্ঠাভরা নিঃশ্বাসে নিজেরই শ্বাসরুদ্ধহওয়ার জোগাড় করে হোসে আর্কাদিও বাড়ির এ-মাথা ওমাথা পায়চারি করছে, মাঝরাতের পরেও শোবার ঘরগুলোয় তার সেই পায়চারীর শব্দ অরেলিয়ানোর কানে আসতো। মাসের পর মাস তার গলার কোনো আওয়াজ পায় না সে, সেটা কেবল এজন্যে নয় যে হোসে আর্কাদিও তাকে কখনো ডাকে না, বরং এজন্যেও যে তার ইচ্ছেও হোতো না যে সে তাকে ডাকুক, তাছাড়া পার্চমেন্ট ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে ভাববার সময়ও পেতো না সে। ফারনান্দা মারা যাওয়ার পরে সে শেষ দুটো ছোট মাছের একটা বের করে তার যে-বইগুলো দরকার সেগুলোর খোঁজে জ্ঞানী কাতালোনিয়র দোকানে গিয়েছিল। পথে তার যা নজরে পড়েছিল তার কিছুই তাকে আকৃষ্ট করেনি, সম্ভবত তার কারণ এই যে, তুলনা করার মতো যথেষ্ট স্মৃতি ছিল না তার, তাছাড়া যে-সময়টাতে নির্জন সব রাস্তাঘাট আর বাড়িঘর দেখার জন্যে সে তার আত্মাটি পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারতো তখন সে ওগুলোকে যে-রকম কল্পনা করতো, সেগুলো আসলে সে-রকমই রয়ে গিয়েছিল। ফারনান্দা তাকে যে অনুমতি দেয়নি, নিজেকে সে মাত্র একবার সেই অনুমতি দেয় ন্যূনতম সময়ের জন্যে, কাজেই, এক সময়ে যে-রাস্তায় স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া হতো সেটা আর তাদের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান রচনা করা এগারোটা ব্লক ধরে হেঁটে চলে সে কোথাও না থেমে, হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে হাজির হয় চলাফেরারও জায়গার অভাব এমনই সংকীর্ণ সেই অগোছাল আর বিষণ্ন জায়গাটায়। উঁইয়ে-খাওয়া সব তাকের ওপর, মাকড়সার জালে চিটচিটে হয়ে থাকা একেকটা কোনে, এমনকি যেখান দিয়ে হাঁটাচলা করার কথা সেখানে পর্যন্ত এলোমেলোভাবে রাখা বইগুলো দেখে সেটাকে বইয়ের দোকানের বদলে পুরনো বইয়ের আস্তাকুঁড়ই মনে হয় বেশি। একটা লম্বা টেবিলে, সেটার ওপরও পুরনো বই আর কাগজ-পত্তর ডাঁই করে রাখা, দোকানের মালিক খানিকটা অদ্ভুত বেগুনি অক্ষরে একটা স্কুলের খাতার খোলা পাতায় গদ্য রচনা করে চলেছেন ক্লান্তিহীনভাবে। কাকাতুয়ার পুচ্ছের মতো কপালের ওপর নেমে আসা রুপোলি চুলে ছাওয়া মাথাটা তাঁর খুব সুন্দর, আর তাঁর প্রাণবন্ত ঘনসন্নিবদ্ধ নীল চোখজোড়া থেকে এমন এক মানুষের অমায়িকতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যার সব বই-ই পড়া হয়ে গেছে। তার পরনে খাটো প্যান্ট, গা ভিজে যাচ্ছে ঘামে, কে এলো তা দেখার জন্যেও লেখা থামান না তিনি। সেই অসম্ভবরকমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগোছালো দশার ভেতর থেকেও অরেলিয়ানোর তার দরকারী পাঁচটি বই উদ্ধার করতে কোনো সমস্যাই হয় না, কারণ বইগুলো যেখানে থাকবে বলে মেলকিয়াদেস তাকে জানিয়েছিল ঠিক সেখানেই ছিল সেগুলো। একটা কথাও না বলে, ছোট্ট সোনার মাছটাসহ ওগুলো জ্ঞানী কাতালোনিয়র হাতে তুলে দেয় সে, তিনি সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেন, তাঁর দু'চোখের পাতা বুঁজে আসে সাঁড়াশির দুটো দাঁড়ার মতো। কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় বলে ওঠেন, 'নির্ঘাৎ মাথা খারাপ তোমার,' তারপর অরেলিয়ানোকে তিনি পাঁচটা বই আর তার ছোট্ট সোনার মাছটা ফিরিয়ে দেন।

তারপর হিস্পানি ভাষায় বলেন, 'তুমি ওগুলো নিয়ে নিতে পারো। শেষ যে-লোক ওই বইগুলো পড়েছিল সে হল অন্ধ আইজ্যাক, কাজেই যা করবে ভেবে চিন্তে কোরো।'

মেম্-এর শোবার ঘরটা আগের অবস্থায় নিয়ে আসে হোসে আর্কাদিও, মখমলের পর্দাগুলো পরিষ্কার করায়, আর রাজকীয় বিছানার চাঁদোয়ার বুটির সঙ্গে সেগুলোও সারিয়ে নেয়, তারপর আবার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে গোসলখানাটা, সেটার সিমেন্টের চৌবাচ্চাটা আঁশটে, খস্‌খসে প্রলেপ পড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। তার ওয়েস্টকোটের পকেটে রাজ্যের যে-সব টুটোফাটা, অদ্ভুত কাপড়, নকল সুগন্ধি আর সস্তা গয়না ছিল সেগুলো সে এই দুই জায়গায় রেখে দেয়। বাড়ির বাকি অংশের একমাত্র যে-জিনিসটা তাকে চিন্তিত করে তোলে বলে বোধ হয় তা হল পারিবারিক বেদীর ওপর থাকা সন্তদের মূর্তিগুলো; এক বিকেলে উঠোনে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে সে। এগারোটারও পরে ঘুম থেকে উঠবে সে। সোনালী ড্রাগন আঁকা একটা জীর্ণ আঙরাখা আর হলুদ ঝালর লাগানো একজোড়া চপ্পল পরে ঢুকবে গিয়ে গোসলখানায়, তারপর সেখানে সে এমন এক আচার-অনুষ্ঠান পালন করবে যার নিষ্ঠা আর দৈর্ঘ মনে পড়িয়ে দেবে সুন্দরী রেমেদিওসকে। গোসল শুরু করার আগে তৈলস্ফটিকের তিনটে ছোট অলংকৃত বোতলে আনা লবণ ছিটিয়ে চৌবাচ্চাটাকে সুরভিত করবে। লাউয়ের খোলটা দিয়ে কিন্তু সে গায়ে পানি ঢালবে না, তার বদলে নেমে পড়বে সেই সুগন্ধি পানিতে, তারপর সেই শীতলতা আর আমারান্তার স্মৃতির এনে দেয়া প্রশান্তিতে, চিৎ হয়ে ভেসে থাকবে সেখানে দুই ঘণ্টা। বাড়ি আসার দিন কতেক পর সে তার রেশমি কাপড়ের স্যুটটা বিদেয় করে দেয়, সেটা একেতো এই শহরের পক্ষে বেজায় গরম, তাছাড়া ওটা ছাড়া তার আর কোনো স্যুট ছিল না, তার বদলে সে পরে পিয়েত্রো ক্রেসপি নাচ শেখানোর সময় যে-রকম প্যান্ট পরতো ঠিক সে-রকম একজোড়া আঁটোসাঁটো প্যান্ট আর জীবন্ত শুঁয়োপোকার লালা থেকে তৈরি সুতোয় বোনা একটা রেশমি শার্ট, তাতে বুকের ওপর তার নামের আদ্যক্ষরগুলো সেলাই করা। হপ্তায় দু'বার সে একটা বড় গামলায় তার সমস্ত কাপড়চোপড় ধুয়ে নিতো, তারপর, গায়ে দেবার মতো আর কিছু না থাকায়, যতক্ষণ সে-সব না শুকাতো ততক্ষণ আঙরাখাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে থাকতো। কখনোই বাড়িতে খেতো না সে। সিয়েস্তার সময়কার গরম কমে এলে বাইরে বেরিয়ে যেতো, ফিরতো বেশ রাত হবার পর। তারপরই বিড়ালের মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে আর আমারন্তার কথা ভাবতে ভাবতে শুরু করতো তার উৎকণ্ঠাভরা পায়চারি। আমারান্তা, আর রাতের বাতির দীপ্তির ভেতর সন্তদের ভয়ংকর চেহারা–বাড়ির এই দুটো স্মৃতিই তার মনে গেঁথে আছে। রোমে থাকাকালীন, বহুবার, বিভ্রমসৃষ্টিকারী অগাস্ট মাসে ঘুমের মাঝখানে চোখ মেলে তাকিয়ে একটা মার্বেল পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চা থেকে লেসের পেটিকোট আর হাতে-বাঁধা পট্টি নিয়ে আমারান্তাকে উঠে আসতে দেখেছে সে। অরেলিয়ানো হোসে যেখানে এই ছবিটাকে যুদ্ধের রক্তাক্ত জলাভূমিতে ডুবিয়ে দিতে চাইতো, সেখানে হোসে আর্কাদিও চাইতো উদগ্র লালসার নর্দমার ভেতর সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওদিকে নিজের মাকে সে তুষ্ট করে রাখতো তার যাজকীয় বৃত্তির আষাঢ়ে গপ্পো দিয়ে। হোসে আর্কাদিও বা ফারনান্দা কারো কাছেই মনে হয়নি যে তাদের পত্রবিনিময়টা ছিল আসলে নানান কল্পকথা বিনিময়। রোমে পা দিয়েই হোসে আর্কাদিও সেমিনারির পাট চুকিয়ে দিলেও মনের মধ্যে জিইয়ে রেখেছিল ঈশ্বরতত্ত্ব আর বাইবেলবর্ণিত আইনকানুনের কিংবদন্তীর কথা, যাতে তার মায়ের বিকারগ্রস্ত চিঠির মধ্যে যে অবিশ্বাস্য উত্তরাধিকারের কথা লেখা থাকতো–যে-উত্তরাধিকার তাকে বাঁচিয়ে দেবে ত্রাস্তিভিয়ার অঞ্চলে এক চিলেকোঠায় দুই বন্ধুকে নিয়ে কাটানো অপরিসীম দুর্দশা আর মালিন্যের জীবন থেকে–সেটা বিপন্ন না হয়। আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়ে লেখা ফারনান্দার শেষ চিঠিটা হাতে পাওয়ার পরেই সে তার মিথ্যে জাঁকজমকের উচ্ছিষ্টগুলো একটা স্যুটকেসে ভরে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয় এক জাহাজের খোলের যাত্রী হয়ে, যেখানে সে সঙ্গী হিসেবে পায় কসাইখানার গরুর পালের মতো গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো অভিবাসীদের, খাবার বলতে পায় ঠাণ্ডা ম্যাকারনি আর পোকা-ধরা পনির। ফারনান্দার উইলটা পড়ার আগেই–সেটা অবশ্য তার দুর্ভাগ্যের বিস্তারিত, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়–ভাঙাচোরা আসবাব-পত্র আর বারান্দার আগাছাগুলোই তাকে বলে দেয় যে সে এমন এক ফাঁদে পড়েছে যে-ফাঁদ থেকে তার মুক্তি নেই, চিরদিনের জন্যে নির্বাসিত হয়ে গেছে সে হীরের দ্যুতির মতো আলো আর রোমক বসন্তের চিরকালীন হাওয়া থেকে। যে-বাড়িতে উরসুলার বুড়ো বয়েসের অনর্থক বকবকানি তার মনে জগৎ সম্বন্ধে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই বাড়ির ভেতর দিয়ে হাঁপানীজনিত প্রবল অনিদ্রার সময় হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে নিজের দুর্ভাগ্যের থৈ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতো সে। ছায়ান্ধকারের ভেতর অরেলিয়ানোকে যাতে সে হারিয়ে না ফেলে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে উরসুলা তার জন্যে শোবার ঘরের একটা কোনা বরাদ্দ করে দিয়েছিল, আর একমাত্র সেই জায়গাটিতেই অরেলিয়ানো নিরাপদ ছিল সন্ধ্যার পর বাড়িময় ঢুঁড়ে বেড়ানো মৃত মানুষদের হাত থেকে। উরসুলা তাকে বলতো, 'তুই কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ কাজ করলেই কিন্তু সন্তরা সে-কথা বলে দেবে আমায়।' তার শৈশবের আতংকভরা রাতগুলো শেষ পর্যন্ত সেই কোনাটায় এসে ঠেকে, আর সেখানেই সে গুপ্তচর সন্তদের সতর্ক, হিমশীতল নজরের সামনে ভয়ে ঘামতে ঘামতে একটা টুলের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতো বিছানায় যাওয়ার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত। এই যন্ত্রণাভোগটা অনর্থক, কারণ এমনকি তখনো সে তার চারপাশের সমস্ত কিছু নিয়ে এমনিতেই আতংকে ভুগতো, আর তৈরিই হয়ে থাকতো জগতের সব কিছুতেই ভয় পাওয়ার জন্যে: রাস্তায় দেখা হওয়া মহিলারা তার রক্ত বিষিয়ে দেবে; বাড়ির মেয়েরা শুয়োরের লেজঅলা বাচ্চার জন্ম দেবে; লড়িয়ে মোরগ মানুষের মরণ ডেকে এনে আরেকজনের বাকি জীবনটা অনুশোচনায় ভরে দেবে; ছোঁয়ামাত্র আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ ডেকে আনবে; অনিশ্চিত উদ্যোগগুলো কেবল মোহমুক্তি আর পাগলামিরই জন্ম দেবে—প্রত্যেকটি জিনিস, সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণা দিয়ে যা-কিছু তৈরি করেছেন আর শয়তান যে-সমস্ত জিনিস বিকৃত করে দিয়েছে তার সব কিছুকেই ভয় পেতো সে। দুঃস্বপ্নের সাঁড়াশীতে নিষ্পেশিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠে জানলার আলো, গোসলখানায় আমারান্তার আলিঙ্গন আর রেশমের প্যাড লাগানো দুই পায়ের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সুখ তাকে সেই আতংক থেকে মুক্তি দিতো। বাগানের সেই আলোয় এমনকি উরসুলাকেও অন্যরকম মন হতো কারণ সেই আলোর ভেতর সে ভয়ংকর বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতো না, বরং কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তার দাঁত মেজে দিতো, যাতে পোপের মতো উজ্জ্বল হাসির অধিকারী হতে পারে সে, তার নখ একটু রং লাগিয়ে দিতো, যাতে সারা দুনিয়া থেকে রোমে আসা তীর্থযাত্রীরা হতবাক হয়ে যায় তাদেরকে আশীর্বাদ করার সময় পোপের হাত দেখে, তাছাড়া সে তার চুলও আঁচড়ে দিতো পোপের মতো করে, আর তার গায়ে, জামা-কাপড়ে, সুগন্ধি জল ছিটিয়ে দিতো যাতে তার শরীর আর জামাকাপড় থেকে পোপের মতোই সুবাস ছড়ায়। একবার 'গানদোলফো' দুর্গের আঙিনা থেকে একটা ব্যালকনির ওপর পোপকে দেখেছিল হোসে আর্কাদিও, তিনি তখন একদল তীর্থযাত্রীর উদ্দেশে একই ভাষণ সাত ভাষায় দিচ্ছিলেন, কিন্তু আসলে যেটা ছাড়া অন্য কিছুই তার মনোযোগ কাড়েনি তা হল তাঁর হাত দুটোর শুভ্রতা—যা দেখে মনে হচ্ছিল যেন চুনের ভেতর ভেজানো হয়েছে ও-দুটোকে, তার গ্রীষ্মকালীন পোষাকের চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতা, আর কোলনের গোপন সুবাস।

তার বাড়ি ফেরার প্রায় এক বছর পর, রুপোর শামদান আর কুলচিহ্ন আঁকা চেম্বারপটটা পেটের দায়ে বিক্রি করে দেবার পরে—যদিও বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সেই চরম সন্ধিক্ষণে দেখা যায় চেম্বারপটটার শীর্ষদেশে সামান্য সোনার গিল্টি ছাড়া আর কিছুই নেই—হোসে আর্কাদিওর একমাত্র বিনোদন হয়ে দাঁড়ায় শহর থেকে বাচ্চা-কাচ্চা বাড়িতে নিয়ে আসা, যাতে তারা সেখানে খেলাধুলা করতে পারে। সিয়েস্তার সময় সে ওদের নিয়ে বাগানে হাজির হবে, আর ওরা দড়ি লাফানো খেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলবে, বারান্দায় গান গাইবে, বসার ঘরে আসবাবপত্রের ওপর দড়াবাজি করবে, আর সেই ফাঁকে সে ঘুরে ঘুরে তাদের আদব-কায়দা শেখাবে। সেই সময়টায় সে আঁটোসাঁটো প্যান্ট আর রেশমী শার্ট পরা ছেড়ে দিয়ে আরবদের দোকান থেকে কেনা সাধারণ কাপড়ের জামা প্যান্ট ধরেছে, যদিও ঠিকই বজায় রেখেছে তার ঢিলেঢালা মর্যাদাবোধ আর পোপসুলভ ভাবভঙ্গি। মেম্-এর স্কুলবন্ধুদের মতো, এই বাচ্চারাও দখল করে নেয় বাড়িটা, গভীর রাতেও দেখা যায় গালগপ্পে মেতে আছে তারা, গান গাইছে, ট্যাপ নাচ নাচছে, ফলে মনে হয় বাড়িটা যেন নিয়মকানুনহীন একটা বোর্ডিং স্কুল। ওরা তাকে মেলকিয়াদেসের ঘরে গিয়ে বিরক্ত না করা পর্যন্ত অরেলিয়ানো বাচ্চাগুলোর এই দৌরাত্ম্য নিয়ে মাথা ঘামাতো না। একদিন সকালে দুটো বাচ্চা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে নোংরা, বড় বড় চুলঅলা এক লোককে কাজের বেঞ্চিতে বসে পার্চমেন্টের পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত দেখে চমকে ওঠে। ভেতরে যাওয়ার সাহস ওদের হয় না ঠিকই, কিন্তু ঘরটার ওপর নজর রাখে ওরা। ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলতে বলতে ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয়, বরগার ফোকর দিয়ে ঘরের ভেতর জ্যান্ত জীবজন্তু ছেড়ে দেয়, আর একবার তো ওরা দরজা-জানলা এমনভাবে পেরেক ঠুকে আটকে দেয় যে গায়ের জোরে সেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে আদ্ধেক দিন কাবার হয়ে যায় অরেলিয়ানোর। দুষ্টুমি করে বিনে শাস্তিতে পার পেয়ে যাওয়ার মজা পেয়ে, এক সকালে অরেলিয়ানো যখন রান্নাঘরে তখন চারটে বাচ্চা ঢুকে পড়ে তার ঘরে, পার্চমেন্টটা নষ্ট করে ফেলার মতলব নিয়ে, কিন্তু হলুদ পাতাগুলোতে তারা হাত রাখতেই একটা দৈব শক্তি তাদেরকে শূন্যে তুলে ফেলে ওভাবেই ঝুলিয়ে রাখে অরেলিয়ানো ফিরে এসে পার্চমেন্টগুলো ওদের হাত থেকে কেড়ে না নেয়া পর্যন্ত। এরপর আর কোনোদিন ওরা বিরক্ত করেনি তাকে।

বয়োসন্ধির দোরগোড়ায় পৌঁছেও খাটো প্যান্ট পরতো সবচেয়ে বড় চারটে বাচ্চা, তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে হোসে আর্কাদিওর ব্যক্তিগত চেহারাসুরত নিয়ে। অন্যদের আগেই এসে পৌঁছতো তারা, তারপর সকালটা ব্যয় করতো তার দাড়ি কামানো, গরম তোয়ালে দিয়ে শরীর দলাইমলাই করা, হাত-পায়ের নখ কেটে পালিশ করা আর সুগন্ধি জল দিয়ে শরীরটা সুবাসিত করার কাজে। অনেকবারই এমন হয়েছে যে হোসে আর্কাদিও যখন চিৎ হয়ে পানিতে ভেসে আমারান্তার কথা ভাবছে তখন তারা চৌবাচ্চায় নেমে পড়েছে তার আপাদমস্তক সাবান মাখিয়ে দিতে। এরপর তারা তার গা মুছিয়ে দিতো, পাউডার ছড়িয়ে দিতো সারা গায়ে, জামা-কাপড় পরিয়ে দিতো। কোঁকড়া, সোনালী চুল, আর খরগোশের মতো গোলাপী কাচের চোখের একটি বাচ্চা এ-বাড়িতে ঘুমোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যে-বন্ধনে সে আর হোসে আর্কাদিও বাঁধা পড়ে তা এতোই দৃঢ় যে হাঁপানীর টানের সময় সে যখন ঘুমোতে পারতো না, বাচ্চাটি তাকে সঙ্গ দিতো, অন্ধকারে তার সঙ্গেই পায়চারী করে বেড়াতো বাড়িময়। একদিন রাতে, উরসুলা যে-ঘরে ঘুমোতো সেই ঘরে, ফেটে-পড়া সিমেন্টের ফাঁক থেকে আসা হলুদ আলোর একটা দীপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পায় ওরা, যেন মাটির নিচের একটা সূর্য ঘরের মেঝেটাকে জানলার শার্সির কাচে পরিণত করে ফেলেছে। এমনকি আলোটাও জ্বালাতে হয় না তাদের। উরসুলার খাটটা সবসময় যে-কোনায় থাকতো, দীপ্তিটা সেইখানেই সবচেয়ে বেশি, আর সেখানের কয়েকটা ভাঙা ফলক ওঠাতেই একটা গোপন কুঠুরি বেরিয়ে পড়ে, এই কুঠরিটাই খুঁজে খুঁজে হদ্দ হয়ে গিয়েছিল অরেলিয়ানো সেগান্দো তার উন্মত্ত খোঁড়াখুঁড়ির সময়। আর ওখানেই তামার তার দিয়ে মুখ আঁটা তিনটে মোটা কাপড়ের বস্তার ভেতরে পাওয়া যায় সাত হাজার দু'শো চোদ্দটি হিস্পানি স্বর্ণমুদ্রা।

এই ধন-দৌলত আবিষ্কারটা যেন আগুনের দপ করে জ্বলে ওঠা। আর হোসে আর্কাদিও এই হঠাৎ-পাওয়া সম্পদ নিয়ে রোমে ফিরে না গিয়ে, যদিও এই স্বপ্নটাই সে দেখেছিল তার করুণদশার ভেতর, বাড়িটাকেই একটা ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গে রূপান্তরিত করে ফেলে। পর্দা আর বিছানার ওপরের চাঁদোয়াটা বদলে সেখানে লাগায় নতুন মখমলের কাপড়, গোসলখানার মেঝেটা বাঁধিয়ে দেয় পাথরের ফলক দিয়ে আর দেয়ালে বসায় টালি। খাবার ঘরের আলমারি ভরে ওঠে নানান ফলের আচার, কাসন্দি আর জ্যাম-এ, ওদিকে, হোসে আর্কাদিও রেল স্টেশন থেকে তার নিজের নাম লেখা বাক্সে যে-সব দ্রাক্ষামদিরা আর শরাব নিয়ে আসতো সেগুলো রাখার জন্যে অব্যবহৃত ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা আবার খুলে দেয়া হয়। এক রাতে সে আর সবচেয়ে বড় চারটে বাচ্চা মেতে ওঠে এক পানভোজনের উৎসবে, চলে সেটা ভোর অব্দি। সকাল ছ'টার সময় ন্যাংটো অবস্থায় বেরিয়ে আসে সবাই শোবার ঘর থেকে, চৌবাচ্চাটা খালি করে শ্যাম্পেন দিয়ে ভর্তি করে সেটাকে। তারপর সবাই একসঙ্গে সেটার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুগন্ধি বুদবুদে সোনালী হয়ে ওঠা আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখির মতো সাঁতরাতে থাকে, ওদিকে এই আনন্দোৎসবের একপ্রান্তে হোসে আর্কাদিও চিৎ হয়ে ভেসে থাকে, চোখ খোলা রেখেই ভাবতে থাকে আমারান্তার কথা। তার এই দ্ব্যর্থবোধক আনন্দের তিক্ততার কথা ভাবতে ভাবতে, নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে ওভাবেই ভেসে থাকে সে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাচ্চাগুলো ক্লান্ত হয়ে দলবেঁধে শোবার ঘরে গিয়ে গা মোছার জন্যে টেনে ছিঁড়ে ফেলে পর্দাগুলো, আর সেই ডামাডোলের ভেতর চার টুকরো করে ফেলে রক ক্রিস্টালের আয়নাটা, হুড়োহুড়ি করে বিছানায় শুতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে চাঁদোয়াটা। গোসলখানা থেকে ফিরে এসে হোসে আর্কাদিও দেখে, লণ্ডভণ্ড শোবার ঘরটায় ন্যাংটো হয়ে একজন আরেকজনের গায়ের ওপর শুয়ে আছে ওরা। যতটা না এই ক্ষতির কারণে, তারচেয়ে সেই উন্মত্ত উৎসবের অসারতার ভেতর নিজের ওপর তার যে-বিরক্তি আর করুণা জন্মে সেই কারণে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বের করে আনে সে যাজকীয় সেই চাবুকটা যেটা সে পশুর লোমের জামা আর মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে একটা তোরঙ্গের তলায় রাখতো, তারপর উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে নির্দয়ভাবে চাবকাতে চাবকাতে তাড়িয়ে দেয় ওদেরকে বাড়ি থেকে, এরকম চাবকানি কেউ কখনো হিংস্র নেকড়ের পালকেও চাবকায়নি। হাঁপানীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা আক্রমণে বেশ কয়েকদিন ভুগে একবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে সে, চেহারা হয়ে যায় মুমূর্ষু রোগীর মতো। যন্ত্রণাভোগের তৃতীয় রাতে শ্বাসকষ্টের জ্বালায় টিকতে না পেরে, অরেলিয়ানোর ঘরে গিয়ে বলে সে যেন কাছের একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে তার জন্যে গন্ধ শোঁকার কিছু পাউডার এনে দেয়। কাজেই, এই দ্বিতীয়বারের জন্যে বাড়ির বাইরে যায় অরেলিয়ানো। ধুলোমলিন জানলা আর লাতিন ভাষায় লেখা লেবেল লাগানো সিরামিকের বোতলভরা ছোট্ট ওষুধের দোকানটায় পৌঁছতে মাত্র দুটো ব্লক পেরোতে হয় তাকে, সেখানে নীলনদের সাপের মতো গোপন সৌন্দর্য নিয়ে বসে থাকা একটি মেয়ে তাকে সেই ওষুধটা দিয়ে দেয় যেটার নাম হোসে আর্কাদিও একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল। রাস্তার বাতির হলদেটে বাল্বের আলোয় কোনোমতে আলোকিত নির্জন শহরটাকে দ্বিতীয়বারের মতো দেখেও অরেলিয়ানোর মনে প্রথমবারের চেয়ে বেশি কোনো কৌতূহল জাগে না। হোসে আর্কাদিও যখন ভাবছে অরেলিয়ানো বুঝি পালিয়েই গেছে, এমন সময় ফিরে আসে সে, পা চালিয়ে আসার কারণে খানিকটা হাঁপাতে হাঁপাতে, আর ঘরবন্দি হয়ে থাকার ফলে হাঁটাহাঁটি না করাতে দুর্বল ও ভারি হয়ে যাওয়া পা দুটো টেনে টেনে। জগৎ সম্পর্কে তার উদাসীনতা এতোই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে দিন কতক পরে হোসে আর্কাদিও তার মাকে দেয়া কথা ভুলে অরেলিয়ানোকে তার ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি সেখানে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়।

অরেলিয়ানো তাকে বলে, 'বাইরে আমার কোনো কিছু করার নেই।'

ঘরবন্দি হয়ে পার্চমেন্টের ভেতর ডুবে থাকে সে, ধীরে ধীরে সেটার পাঠোদ্ধার করে যায়, কিন্তু কোনো অর্থ দাঁড় করাতে পারে না। হোসে আর্কাদিও তার ঘরে নিয়ে আসতো শুয়োরের মাংসের ফালি, মুখে বসন্তের রেশ রেখে যাওয়া মিষ্টি ছাতু, আর, দু'বার দুটো বিশেষ উপলক্ষে সে নিয়ে আসে দু'গ্লাস চমৎকার ওয়াইন। পার্চমেন্টের ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ নেই, ওটা তার কাছে অবসরযাপনের খামখেয়ালি একটা উপায় ছাড়া কিছু নয়, তবে তার মনোযোগ কেড়ে নেয় তার নিঃসঙ্গ স্বজনটির জগৎ, তার বিরল প্রতিভা আর জাগতিক বিষয়ে এক দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান। তখন সে আবিষ্কার করে যে, অরেলিয়ানো ইংরেজি পড়তে পারে, পার্চমেন্ট পাঠ ছাড়াও বিশ্বকোষটার ছয় ভল্যুমের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত সে একেবারে উপন্যাসের মতো পড়ে ফেলেছে। সে ভেবেছিল এই কারণেই বুঝি অরেলিয়ানো রোম সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলতে পারে যেন অনেকদিন ওখানে থেকেছে সে, কিন্তু শিগ্‌গিরই সে আবিষ্কার করে বিশ্বকোষে যা আছে তার বাইরেও অনেক কিছু তার জানা, যেমন জিনিসপত্রের দাম। এসব তথ্য সে কোথায় পেল জিজ্ঞেস করায় যে-জবাব মেলে তা স্রেফ এই, 'সব কিছুই জানা হয়ে গেছে।' অন্য দিকে, অরেলিয়ানো এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করে অবাক হয়ে যায় যে, হোসে আর্কাদিও যখন বাড়িময় পায়চারী করে বেড়াতো তখন তার যে-চেহারাটি সে কল্পনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিল, তার থেকে অনেক অন্য রকম লাগে হোসে আর্কাদিওকে কাছে থেকে দেখলে। সে হাসতে জানে, বাড়িটার সাবেক কাল সম্পর্কে মাঝে মধ্যেই স্মৃতিকাতরতায় আক্রান্ত হতে পারে, মেলকিয়াদেসের ঘরটার করুণ দশা নিয়ে উদ্বেগও দেখাতে পারে। একই রক্তের এই দুই নিঃসঙ্গ মানুষের এই কাছে আসাটা কিন্তু বন্ধুত্ব নয় মোটেই, কিন্তু তাদের দু'জনকে একই সঙ্গে আলাদা এবং একত্র করে দেয়া অতল নিঃসঙ্গতাটাকে আরো ভালোভাবে সহ্য করতে সাহায্য করে এই কাছে আসাটা। গেরস্থালি কিছু সমস্যা হোসে আর্কাদিওকে নাজেহাল করে ছাড়ছিল, সেগুলোর জট ছাড়াতে এবার সে অরেলিয়ানোর শরণাপন্ন হওয়ার ফুরসত পায়। অন্যদিকে অরেলিয়ানো এক্তিয়ার পায় বারান্দায় গিয়ে বসার আর পড়ার, আগের মতোই সময়মাফিক এসে পৌঁছনো আমারান্তা উরসুলার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করার আর গোসলখানা ব্যবহার করার, হোসে আর্কাদিও এসে যেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে।

বেশ গরম পড়া এক ভোরে, দু'জনেই ওরা চমকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে সদর দরজায় ব্যস্তসমস্ত করাঘাতে। দেখা যায়, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণবর্ণ এক বৃদ্ধ, মুখটাতে ভৌতিক অনুপ্রভা এনে দেয়া বড় বড় সবুজ-রঙা চোখ তার, আর কপালে ছাইদাগা ক্রুশ আঁকা। জামা-কাপড় ছেঁড়াফাঁড়া, জুতো টুটাফাটা, মাল-পত্র বলতে কাঁধে কেবল একটা পুরনো ঝোলা, দেখতে ভিক্ষুকের মতো, কিন্তু তারপরেও, তার হাবভাবে এমন একটা সম্ভ্রম-জাগানো ভাব রয়েছে যা তার বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে একেবারে বেমানান। বৈঠকখানার আধো-অন্ধকারের মধ্যেও তার দিকে একবার তাকিয়েই ওরা বুঝে যায় যে আত্মরক্ষার তাগিদ নয়, বরং মজ্জাগত হয়ে যাওয়া একটা ভীতিই তাকে বেঁচে থাকার গোপন রসদ যুগিয়েছে। লোকটা অরেলিয়ানো আমাদোর, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সতেরো ছেলের মধ্যে একমাত্র সে-ই বেঁচে আছে, আর ফেরারী হিসেবে তার দীর্ঘ, বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি খুঁজে ফিরছে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে কাকুতি-মিনতি করে বলে ওরা যেন তাকে এ-বাড়িতে একটু আশ্রয় দেয়, সমাজচ্যুত একজন মানুষ হিসেবে ঘুরে বেড়ানোর সময় রাতের বেলায় এই বাড়ির কথাই মনে মনে ভেবেছে সে তার জীবনের অবশিষ্ট একমাত্র আশ্রয়প্রাচীর হিসেবে। কিন্তু হোসে আর্কাদিও আর অরেলিয়ানো তাকে চিনতে পারে না। ভবঘুরে মনে করে ওরা তাকে রাস্তায় বের করে দেয়। আর তারপরেই, দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা এমন একটা নাটকের শেষ দৃশ্য দেখতে পায় যে-নাটক শুরু হয়েছিল হোসে আর্কাদিওর বোধ-বুদ্ধি হওয়ারও আগে। বছরের পর বছর ধরে অরেলিয়ানো আমাদোরকে তাড়া করে ফেরা, ডালকুকুরের মতো তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে আদ্ধেক দুনিয়া চষে ফেলা দুই পুলিশ বেরিয়ে আসে বাড়ির উল্টো দিকের ফুটপাতের অ্যালমন্ড গাছগুলোর আড়াল থেকে, তারপর তাদের মাউজার তাক করে দুটো গুলি নিখুঁতভাবে সেঁধিয়ে দেয় ছাইদাগা ক্রুশটার ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চাগুলোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকেই আসলে হোসে আর্কাদিও একটা সমুদ্রগামী জাহাজের খবরের অপেক্ষায় ছিল, বড়দিনের আগেই নেপল্‌সের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে জাহাজটা। অরেলিয়ানোকে সে-কথা বলেও রেখেছে সে, আর এমনকি সে যাতে কিছু করে খেতে পারে সেজন্যে তাকে একটা ব্যবসা ধরিয়ে দিয়ে যাওয়ার কথাও ভেবে রেখেছে। কারণ ফারনান্দার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর থেকেই সেই ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তার এই শেষ আশাটাও পূরণ হয় না। সেপ্টেম্বরের এক সকালে, রান্নাঘরে বসে অরেলিয়ানোর সঙ্গে কফি পান করার পর হোসে আর্কাদিও যখন তার প্রাত্যহিক গোসল সারছে, এমন সময় টালিগুলো সরিয়ে তৈরি করা ফোকর গলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে সেই চারটে বাচ্চা, যাদেরকে সে বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র সুযোগ হোসে আর্কাদিওকে না দিয়ে, জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা চৌবাচ্চার ভেতর, হাতের মুঠোয় তার চুল ধরে মাথাটা চুবিয়ে রাখে পানির ভেতর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মৃত্যুর বুদবুদগুলো মিলিয়ে যায় পানির ওপর আর তার নিস্পন্দ, পাণ্ডুর ডলফিন শরীরটা তলিয়ে যায় সুগন্ধি পানির তলদেশে। তারপর, যে-গুপ্তস্থানের কথা তারা আর তাদের শিকার ছাড়া আর কেউ জানতো না সেখান থেকে বের করে নেয় সেই তিন বস্তাভর্তি সোনা। রীতিমতো সামরিক অভিযানের মতো দ্রুততায়, সুশৃঙ্খলভাবে আর পাশবিকতার সঙ্গে সারা হয় কাজটা। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকা অরেলিয়ানো এসবের কিছুই টের পায় না। সেই দিনই, বিকেলবেলা, রান্নাঘরে হোসে আর্কাদিওকে না পেয়ে সারা বাড়ি খুঁজে শেষে সে দেখে চৌবাচ্চার সুগন্ধি অম্ভসার ওপর ভেসে আছে তার প্রকাণ্ড, ফুলেওঠা শরীরটা, তখনো ভেবে চলেছে আমারান্তার কথা। আর কেবল তখনই অরেলিয়ানো উপলব্ধি করে কতোটা ভালোবাসতে শুরু করেছিল সে হোসে আর্কাদিওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীর গলায় বাঁধা রেশমের একটা রশি ধরে, ডিসেম্বরের প্রথম দেবদূতদের সঙ্গে, নাবিকদের হাওয়ায় ভেসে ফিরে আসে আমারান্তা উরসুলা। কোনোরকম জানান না দিয়েই চলে আসে সে, পরনে হাতির দাঁতের রঙের একটা পোশাক, প্রায় হাঁটুতক পৌঁছনো একছড়া মুক্তোর মালা, হাতে পান্না ও পোখরাজের আংটি, সেই সঙ্গে সোয়ালো পাখির লেজের মতো ব্রোচ দিয়ে কানের পেছনে ধরে রাখা সোজা সোজা চুলের একটা চমৎকার খোপা। ছয় মাস আগে যাকে সে বিয়ে করেছে সে-লোকটা রোগাপাতলা, ফ্ল্যান্ডার্স-এর বনেদী ঘরের সন্তান, চেহারায় নাবিক নাবিক একটা ভাব। বৈঠকখানার দরজাটা স্রেফ একটু ঠেলা দিয়ে খুলতেই আমারান্তা উরসুলা বুঝে যায় যে সে যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি দিন অনুপস্থিত ছিল সে, আর সেটা অনেক বেশি সর্বনাশের কারণ হয়েছে।

যতটা না খুশি হয়ে তার চেয়ে বেশি শংকিত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'হায় ঈশ্বর। দিব্যি বোঝা যাচ্ছে বাড়িতে কোনো মেয়েলোক নেই।'

বারান্দায় মালপত্তর ধরছে না। যেটা নিয়ে সে তার স্কুলে গিয়েছিল, ফারনান্দার সেই পুরনো তোরঙ্গটা ছাড়াও আমারান্তা উরসুলা নিয়ে এসেছে দুটো খাড়া তোরঙ্গ, চারটে বড় বড় স্যুটকেস, তার ছাতা রাখার একটা ব্যাগ, চারটে টুপির বাক্স, পঞ্চাশটা ক্যানারি পাখি সমেত একটা বিশাল খাঁচা আর তার স্বামীর ভেলোসিপীড (বাইসাইকেলের আদিম সংস্করণ—অনুবাদক), সেটাকে ভাঁজ করে একটা বিশেষ বাক্সের ভেতর ঢোকানো হয়েছে, তার ফলে তার স্বামীর পক্ষে সেটাকে একটা চেলোর মতো করে বয়ে বেড়াতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। আমারান্তা উরসুলা তার এই দীর্ঘ সফরের পর একটা দিনও বিশ্রাম নেয় না। তার স্বামীর আনা জিনিসপত্তরের সঙ্গে পুরনো ডেনিমের একটা ওভারঅল-ও রয়েছে, সেটা পরে সে নতুন করে বাড়িটার সংস্কারসাধনে নেমে পড়ে। যে-সব লাল পিঁপড়া এরিমধ্যে বারান্দার দখল নিয়ে নিয়েছিল সেগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় সে, গোলাপের ঝাড়গুলোতে ফিরিয়ে আনে প্রাণের স্পন্দন, আগাছাগুলো উপড়ে ফেলে আর পটগুলোতে নতুন করে ফার্ন, অরিগ্যানো আর বেগনিয়া লাগিয়ে রেলিং বরাবর সেগুলো সাজিয়ে রাখে। একদল ছুতোর মিস্ত্রি, তালার মিস্ত্রি আর রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করে সে, তারা মেঝের ফাটল সারায়, দরজা-জানলাগুলোকে ফের কব্জার ওপর বসায়, আসবাবপত্র মেরামত করে, ভেতর আর বাইরের দেয়াল চুনকাম করে, আর তাতে করে আমারান্তা উরসুলা বাড়ি ফেরার তিন মাসের মধ্যে সেই পিয়ানোর দিনগুলোর তারুণ্য আর উৎসবের মেজাজ ফিরে আসে। বাড়ির সবাই সারা দিনমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোনো পরিস্থিতিতে এতো খোশমেজাজে আর ছিল না কখনো, তেমনি এর আগে গান গাইতে, নাচানাচি করতে আর অতীতের সবকিছু আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলতে এমন আগ্রহও দেখা যায়নি কারো মধ্যে। আমারান্তা উরসুলা তার ঝাড়ুর এক ধাক্কায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন, ফালতু জিনিসপত্রের স্তূপগুলো আর কোনায় কোনায় জমা হতে থাকা নানান কুসংস্কারের উপাদান বিদেয় করে দেয়, রেহাই দেয় শুধু, উরসুলার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত, বৈঠকখানায় রাখা রেমেদিওসের একটা দাগেরোটাইপ ছবি। দম ফাটানো হাসি হাসতে হাসতে সে বলে ওঠে, 'দেখো দেখি কী কাণ্ড! চৌদ্দ বছর বয়েসী দাদী!' একদিন যখন এক রাজমিস্ত্রি এসে বলে বাড়িভর্তি খালি ভূত, আর সেগুলো তাড়াবার একমাত্র উপায় হল মাটির নিচে পুঁতে রাখা গুপ্তধন খুঁজে বের করা, সে উঁচু গলায় একটা হাসি হেসে জবাব দেয়, তার ধারণা পুরুষ মানুষের কুসংস্কারে বিশ্বাসী হওয়াটা ঠিক নয়। আমারান্তা উরসুলা এতোটাই স্বতঃস্ফূর্ত, এতোটাই বাঁধনছাড়া, একটা মুক্ত আর আধুনিক মনের অধিকারী যে তাকে এসে পৌঁছুতে দেখে অরেলিয়ানো ঠিক ভেবে পায় না সে তার নিজের দেহতনুটা নিয়ে কী করবে। 'হাহ্ হা,' সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরান্তা উরসুলা বলে উঠেছিল, 'দেখো, দেখো, আমার ছোট্ট মানুষখেকোটা কত্ত বড় হয়েছে।' অরেলিয়ানো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই সে তার সঙ্গে নিয়ে আসা বহনযোগ্য ফনোগ্রাফটায় একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে তাকে হাল-সময়ের নাচের পদক্ষেপ শেখাতে লেগে যায়। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কয়েকটা নোংরা প্যান্ট পেয়েছিল অরেলিয়ানো, আমারান্তা উরসুলা তাকে বাধ্য করে ওগুলো বদলাতে, সেই সঙ্গে তাকে কয়েকটা রঙচঙে শার্ট আর দু-রঙা জুতো দেয় সে, তাছাড়া সে যখন দেখতো মেলকিয়াদেসের ঘরে বড় বেশিক্ষণ সময় কাটাচ্ছে অরেলিয়ানো, তখন তাকে সে জোর করে পাঠিয়ে দিতো রাস্তায়।

উরসুলারই মতো কর্মঠ, ছোটখাটো, অনমনীয়, আর প্রায় সুন্দরী রেমেদিওসের মতো রূপসী ও আকর্ষণীয় আমারান্তা উরসুলার একটা বিরল গুণ হল, ফ্যাশন সংক্রান্ত ব্যাপার আগে থেকেই অনুমান করতে পারে সে। ডাকযোগে যখন তার কাছে হাল ফ্যাশনের পোশাক-আশাকের ছবি আসে তখন সেগুলো স্রেফ এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, সে নিজে যে-সব ডিজাইন করে আমারান্তার মান্ধাতার আমলের পায়ে-চালানো মেশিনে সেলাই করেছে সেগুলোতে কোনো ভুলভাল হয়নি। য়্যুরোপ থেকে যতো ফ্যাশন সাময়িকী, শিল্পকলা বিষয়ক প্রকাশনা আর জনপ্রিয় সঙ্গীত রিভিয়্যু বেরোয় তার সব কিছু রাখে সে, সেগুলোতে স্রেফ চোখ বুলোলেই সে বুঝতে পারে জাগতিক কর্মকাণ্ড ঠিক সেভাবেই চলছে যে-রকমটি সে ভেবে রেখেছে। ধুলোবালি আর গরমে জেরবার এক মৃত শহরে তার মতো মানমানসিকতার এক রমণী যে কেন ফিরে এসেছে তা এক রহস্য, তা-ও আবার এমন এক স্বামীর সঙ্গে যার কিনা পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় থাকবার মতো অঢেল টাকা-পয়সা তো আছেই, সেই সঙ্গে লোকটা তাকে এতো ভালোবাসে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেচেই সে নিজেকে বৌ-এর হাতে তুলে দিয়েছে তাকে সিল্কের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে বেড়ানোর জন্যে। সে যাই হোক, যতোই সময় গড়াতে থাকে ততোই মেয়েটার এখানে থাকার ইচ্ছেটা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে, কারণ একদিকে সে যেমন এমন একটা পরিকল্পনাও হাতে নেয় না যা বাস্তবায়ন করতে খুব বেশি সময় লাগবে, ঠিক তেমনি এমন একটা কাজও সে করে না যার পেছনে মাকোন্দোর জীবনটা আরামদায়ক করা বা শেষ বয়সটা শান্তিপূর্ণভাবে এখানে কাটানোর উপায় খোঁজার চেষ্টা থাকে না। সে-সব লক্ষ্য যে ঝোঁকের মাথাতেই ঠিক করা হয়েছে তা ক্যানারি পাখির খাঁচাটা দেখেই বোঝা যায়। এক চিঠিতে তার মা যে পক্ষিনিধনের কথা লিখেছিল সেকথা খেয়াল রেখে মাসের পর মাস যাত্রা স্থগিত রেখেছিল সে, শেষে যখন একটা জাহাজ পাওয়া যায় যেটা 'সৌভাগ্যের দ্বীপপুঞ্জ'-তে থামবে তখন সেটায় চেপে বসেছিল সে, তারপর সবচেয়ে সুন্দর পঁচিশ জোড়া ক্যানারি পাখি বাছাই করেছিল মাকোন্দোর আকাশ ফের পাখিতে ভরে দিতে। তার অগুনতি হতাশাজনক উদ্যোগের মধ্যে ওটার পরিণতিই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে করুণ। বাচ্চা দেয়ার পর পাখিগুলোকে আমারান্তা উরসুলা জোড়ায় জোড়ায় ছেড়ে দেয়, কিন্তু নিজেদের মুক্ত দশা টের পাওয়ার পরই দেরী না করে শহর ছেড়ে পালায় তারা। বাড়িটার প্রথম সংস্কারসাধনের সময় উরসুলা কিছু পাখির খাঁচা তৈরি করেছিল, সেগুলো দিয়ে বৃথাই তাদের ভেতর ভালোবাসা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে সে। অ্যালমন্ড গাছে এসপারাতো ঘাস দিয়ে তৈরি করা পাখির বাসা, ছাদে ছাদে পাখি খাওয়ার বীজ ছড়িয়ে রাখা, আর খাঁচাছাড়া পাখিগুলোকে চলে যাওয়া থেকে নিরস্ত করার জন্যে বন্দি পাখিগুলোকে ডেকে তুলে গান গাওয়ানো, এসবের কোনো কিছুই কাজে আসে না, কারণ প্রথম সুযোগেই উড়াল মারে তারা, তারপর আকাশে একটা পাক খেয়ে নেয়, আর ঠিক ওই পাক খাওয়ার সময়েই সৌভাগ্যের দ্বীপের দিক নির্ণয় করে ফেলে তারা।

ফিরে আসার পর এক বছর পার হয়ে যায়, আর এই সময়ের মধ্যে আমারান্তা উরসুলা যদিও কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে উঠতে বা কোনো পার্টি দিতে পারে না, কিন্তু তখনো সে বিশ্বাস করতো যে, দুর্ভাগ্যের একান্ত পছন্দের এই জনগোষ্ঠীটাকে বাঁচানোটা অসম্ভব কোনো কাজ নয়। তার স্বামী গাস্তঁ বৌয়ের কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করা থেকে সযত্নে বিরত থাকে, যদিও সেই সর্বনেশে দুপুরে ট্রেন থেকে নামার পর হতেই সে একটা কথা বুঝে গেছে যে তার বৌয়ের সংকল্পের পেছনে রয়েছে একটা স্মৃতিকাতরতার মরীচিকা। বাস্তবতার কাছে আমারান্তা উরসুলাকে পরাজয় মেনে নিতেই হবে এই স্থিরবিশ্বাসে সে এমনকি তার সাইকেলটা জোড়াও লাগায় না, তবে শিগ্‌গিরই লেগে পড়ে রাজমিস্ত্রিরা যে-সব মাকড়সার জাল নষ্ট করে ফেলেছে সেগুলোর ভেতর থেকে সবচেয়ে বড় বড় ডিম খোঁজার কাজে, আর সেই ডিমগুলো সে হাতের নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষুদে ক্ষুদে মাকড়সার দিকে আতশকাচ দিয়ে তাকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পরে, অলস হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতে বসে থাকতে না হয় সেজন্যেই তার বৌ এসব মেরামতির কাজ করে যাচ্ছে ভেবে গাস্তঁ পেছনের চাকার চাইতে ঢের বড় সামনের চাকাঅলা তার চমৎকার সাইকেলটার অংশগুলো জোড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সঙ্গে মন প্রাণ ঢেলে দেয় ওই এলাকায় যত দেশী পোকামাকড় পাওয়া যায় সেগুলো ধরে ধরে সংরক্ষণ করে জ্যামের বোতলে পুরে লীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রাক্তন শিক্ষক, প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপকের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কাজে; লীজ বিশ্ববিদ্যালয়েই গাস্তঁ কীটতত্ত্বের ওপর উচ্চতর পড়াশোনা করেছিল, যদিও তার মূল বৃত্তি ছিল বিমানচালনা। সাইকেলে চড়ার সময় তার পরনে থাকে দড়াবাজদের আঁটোসাঁটো পোশাক, রঙচঙে মোজা, আর একটা শার্লক হোমস মার্কা টুপি, কিন্তু পায়ে হেঁটে চলাফেরার সময় সে পরে নিখাদ প্রাকৃতিক লিনেনের স্যুট, সাদা জুতো, সিল্কের একটা বো-টাই, চ্যাপ্টা মাথাঅলা একটা খড়ের টুপি, সেই সঙ্গে তার হাতে শোভা পায় উইলো কাঠের একটা ছড়ি। নাবিক নাবিক চেহারাটা তার আরো ফুটেছে পাণ্ডুর চোখ দুটোর কারণে, আর তার ছোট্ট গোঁফজোড়া দেখলে মনে হয় যেন কাঠবেড়ালের রোম। বয়েসে সে তার বৌ-এর চেয়ে অন্ততপক্ষে পনেরো বছরের বড়, কিন্তু তাকে খুশি রাখার সতর্ক সংকল্প আর একজন চমৎকার প্রেমিকের গুণাবলী সেই পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। সত্যি বলতে কী, সতর্ক চালচলনের অধিকারী, চল্লিশের ওপর বয়েসী এই লোকটিকে তার গলায় বাঁধা দড়ি আর সার্কাসের সাইকেলসহ দেখলে কেউ ভাবতেও পারে না যে সে তার বৌয়ের সঙ্গে লাগামছাড়া ভালোবাসার এক চুক্তিতে আবদ্ধ, আর তারা দু'জনেই সেই পারস্পরিক তাড়নার কাছে নিজেদের সঁপে দিতো ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জায়গাতে, তাদের উদ্দীপনা তাদেরকে যেখানে ঠেলে নিয়ে যেতো সেখানেই, যে-রকম তারা তাদের সম্পর্ক শুরু হওয়ার পর থেকেই এক প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে করে এসেছে, যা কিনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর উত্তরোত্তর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আরো গভীর এবং আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। গাস্তঁ যে অন্তহীন প্রজ্ঞা আর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন এক আগ্রাসী প্রেমিক-ই কেবল তা কিন্তু নয়, সেই সঙ্গে সে সম্ভবত মানব প্রজাতির ইতিহাসে একমাত্র নমুনা যে কিনা ভায়োলেট ফুল চাষ করা একটা ক্ষেতে বিমানের জরুরী অবতরণ ঘটিয়ে তার নিজের আর তার দয়িতার প্রাণ-সংশয়ের কারণ হয়েছিল স্রেফ সেখানে সহবাস করার জন্যে।

বিয়ের দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল তাদের, যখন আমারান্তা উরসুলা যে-স্কুলে পড়তো সেটার ওপর গাস্তঁ একটা স্পোর্টস্ বাইপ্লেনে চেপে চক্কর দেয়ার সময় উড়োযানটা পতাকা ওড়ানোর খাম্বাটা এড়াতে একটা দুঃসাহসী কৌশল খাটাতে গিয়েছিল আর তার ফলে ক্যানভাস আর অ্যালুমিনিয়াম পাতের আদিম কাঠামোর লেজের দিকটা আটকে গিয়েছিল বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে। এরপর হতে সে স্প্লিন্টে বাঁধা তার পা-টার দিকে নজর না দিয়ে, আমারান্তা উরসুলা যেখানে থাকতো এবং যেখানকার নিয়ম-কানুন ঠিক ফারনান্দা যেমনটি চেয়েছিল ততোটা কড়া ছিল না, সেই সন্ন্যাসিনীদের বোর্ডিং-হাউস থেকে তাকে প্রতি হপ্তান্তে তুলে নিয়ে স্থানীয় ক্লাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যেতো। বিস্তীর্ণ পতিত জমিগুলোর ওপরে রোববারের বাতাসে পনেরো শো ফুট উঁচুতে এক অন্যকে ভালোবাসাবাসি শুরু করতো ওরা, নিচের লোকজন যতোই ছোট হয়ে আসতো ততোই নিজেদের আরো অন্তরঙ্গ বলে মনে হতো তাদের। আমারান্তা উরসুলা তাকে'মাকোন্দোর কথা বলতো, বলতো মাকোন্দো হল পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ আর সবচেয়ে শান্তির শহর, বলতো, অরিগ্যানোর সুবাসে ভুরভুর করা একটা বিরাট বাড়ির কথা যেখানে সে এক বিশ্বস্ত স্বামী, দুটো শক্ত-সমর্থ ছেলে আর একটা মেয়ে নিয়ে বাস করতে চায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, ছেলে দুটোর নাম হবে রডরিগো আর গঞ্জালেস, কক্ষনোই অরেলিয়ানো আর হোসে আর্কাদিও নয়, আর মেয়েটার ভার্জিনিয়া, কক্ষনোই রেমেদিওস নয়। স্মৃতিকাতরতার মাধ্যমে আদর্শরূপ দেয়া শহরটাকে এমন একনিষ্ঠার সঙ্গে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সে যে গাস্তঁ বুঝে গিয়েছিল সে যদি তাকে মাকোন্দোতে না নিয়ে যায় তাহলে আমারান্তা উরসুলা বিয়ে করবে না। কাজেই সে তাতে রাজি হয়ে যায়, ঠিক যেমনটি পরে সে ঐ দড়ির ব্যাপারে রাজি হয়েছিল, কারণ সে ভেবেছিল এটা স্রেফ একটা দু'দিনের খেয়াল, দিন কতেক পরেই কেটে যাবে। কিন্তু দু'দুটো বছর মাকোন্দোতে কেটে যাওয়ার পরেও যখন আমারান্তা উরসুলা সেই প্রথম দিনের মতোই সুখী থেকে যায়, তখন তার টনক নড়ে। এলাকায় ব্যবচ্ছেদযোগ্য যত পোকামাকড় ছিল, তার সব ততদিনে গাস্তঁ ব্যবচ্ছেদ করে ফেলেছে, হিস্পানী বলছে স্থানীয় লোকের মতো, সমাধান করে ফেলেছে ডাকযোগে আসা সব ক'টা সাময়িকীর শব্দজট। ফিরে যাওয়ার অজুহাত হিসেবে আবহাওয়ার কথাটা সে তুলতে পারেনি, কারণ প্রকৃতি তাকে এমন একটা উপনিবেশিক যকৃত উপহার দিয়েছে যেটার কারণে সিয়েস্তার ঢুলুঢুলু ভাব তাকে ধরেনি, আর ভিনেগারের পোকাভরা পানিও তাকে কাবু করতে পারেনি। এখানকার রান্না তার এতোই পছন্দের যে একবার এক বসাতে ইগুয়ানার বিরাশিটা ডিম সাবড়ে দেয় সে। অন্যদিকে আবার আমারান্তা উরসুলা ট্রেনে করে বরফ দেয়া বাক্সে মাছ আর শামুক, ক্যানে ভরা মাংস আর সংরক্ষণ করা ফল আনিয়ে নিয়েছিল, কেবল ওগুলোই খেতে পারতো সে, আর তখনো য়্যুরোপীয় কেতায় পোশাক পরতো আর ডাক মারফত নানান ডিজাইন পেতো, অথচ তার কিন্তু যাওয়ার জায়গা বলতে কোনো কিছু ছিল না, তার কাছে আসার মতোও ছিল না কেউ; এদিকে তার স্বামীও তার খাটো স্কার্ট, বাঁকা ফেল্টের টুপী আর সাতনরী হারের প্রশংসা করার মতো মানসিক অবস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। মনে হতো, নিজেরই সৃষ্টি করা গেরস্থালি সমস্যা নিজে সমাধান করে অষ্টপ্রহর নিজেকে ব্যস্ত রাখাটাই আমারান্তা উরসুলার সাফল্যের গোপন কথা, হাজারটা কাজ যেনতেনভাবে করে পরদিন সেগুলো সে এমন এক বিধ্বংসী অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঠিকঠাক করতো যে লোকজনের মনে পড়ে যেতো ফারনান্দা আর তার সেই বংশগত রোগটার কথা, যে-রোগ হলে লোকে কোনো কিছু তৈরি করে সেটাকে আবার ভাঙার বা খুলে ফেলার জন্যেই। তার আমুদে প্রতিভাটা এখনো এতোটাই সজীব যে নতুন নতুন রেকর্ড আসা মাত্র গাস্তঁকে বৈঠকখানায় ডেকে এনে গভীর রাতঅব্দি সে সেইসব নাচের ছন্দে পা মেলানো মকশো করতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেগুলো তার স্কুলের সঙ্গী-সাথীরা স্কেচ এঁকে একেঁ বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে, আর সচরাচর ব্যাপারটা শেষ হতো ভিয়েনিজ দোলকেদারায় বা নগ্ন মেঝের ওপর দু'জনের মিলনের মধ্যে দিয়ে। ষোলআনা সুখী হওয়ার জন্যে আমারান্তা উরসুলার যে-জিনিসটা দরকার ছিল তা হল বাচ্চাকাচ্চা; কিন্তু, বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো সন্তান না নেয়ার যে-চুক্তি সে তার স্বামীর সঙ্গে করেছিল সেটার অসম্মান সে করতে চায়নি।

অবসর সময়টা কাটাতে কিছু করার জন্যে সকালবেলাটা লাজুক অরেলিয়ানোর সঙ্গে মেলকিয়াদেসের ঘরে কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে গাস্তঁ। অরেলিয়ানোর সঙ্গে সে-ও উপভোগ করতে শুরু করে দেশের গোপন সব কোনাঘুপচির কথা মনে করার খেলায়, সে-সব জায়গার কথা অরেলিয়ানো এতো ভালোভাবে জানে যেন মেলা দিন থেকেছে সে ওখানে। বিশ্বকোষে যে-সব কথা নেই সে-সব সে কী করে জানে জিজ্ঞেস করায় গাস্তঁ ঠিক সেই জবাবটি পায় যা হোসে আর্কাদিও পেয়েছিল: 'সব কিছুই জানা হয়ে গেছে।' সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজি আর ফরাসী শিখেছে অরেলিয়ানো, সেই সঙ্গে অল্প-স্বল্প লাতিন আর গ্রীক। সে-সময় যেহেতু অরেলিয়ানো প্রতিদিন বিকেলবেলা বাইরে বেরুতো আর আমারান্তা উরসুলা তার হাত খরচের জন্যে ফি হপ্তায় কিছু টাকা আলাদা করে রাখতো, সে-কারণে তার ঘরটাকে মনে হতো জ্ঞানী কাতালোনিয়র বইয়ের দোকানেরই একটা শাখা। গভীর রাত পর্যন্ত গোগ্রাসে বই গিলে যেতো সে, যদিও যেভাবে সে তার পড়াশোনার কথা উল্লেখ করতো তাতে গাস্তঁর কাছে মনে হতো কিছু শেখার জন্যে নয় বরং সে যা-জানে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্যেই বই কিনতো সে, তবে পার্চমেন্ট তাকে যতটা টানতো এমন আর কোনো কিছুই নয়। সকালবেলার সিংহভাগটা সে এই পার্চমেন্টের পেছনেই ব্যয় করতো। গাস্তঁ আর তার বৌ দু'জনেই তাকে পারিবারিক ব্যাপার-স্যাপারে জড়াতে চাইলে কী হবে, অরেলিয়ানো মানুষটা একটু বিবাগী ধরনের, রহস্যে ঘেরা, যে-রহস্যের মেঘ দিন দিন আরো ঘনীভূত হচ্ছিল। পরিস্থিতিটা এমনই দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে যে অরেলিয়ানোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চেয়েও ব্যর্থ হয় গাস্তঁ, অবসর কাটানোর জন্যে অন্য উপায় দেখতে হয় তাকে। এই সময়টাতেই বিমানডাক স্থাপনের চিন্তাটা মাথায় আসে তার।

পরিকল্পনাটা নতুন কিছু নয়। সত্যি বলতে কী, আমারান্তা উরসুলার সঙ্গে যখন তার দেখা হয় তখন-ই কাজটা অনেক দূর এগিয়ে রাখা ছিল, তবে সেটা মাকোন্দোর জন্যে নয়, বরং পাম অয়েলের ব্যবসায় যেখানে তার পরিবারের টাকা খাটানো আছে সেই বেলজিয় কঙ্গো-র জন্যে। বিয়ের তাগিদে, আর বৌকে খুশি করার জন্যে মাকোন্দোতে মাস কতেক থাকার সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে বাধ্য হয়েই ব্যাপারটা মুলতুবি রাখতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু সে যখন দেখতে পায়, এলাকার উন্নতির জন্যে আমারান্তা উরসুলা একটা সমিতি তৈরি করবে বলে ঠিক করেছে, আর, একবার সে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারে ইঙ্গিত করাতে তাকে নিয়ে তার বৌ এমনকি ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি, তখনই সে বুঝে যায় এসব দু'-একদিনে শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার নয়। কাজেই, আফ্রিকাতে পথ-প্রবর্তক হওয়া যে-কথা ক্যারিবিয় অঞ্চলে হওয়াও সেই একই কথা বিবেচনা করে ফের যোগাযোগ করে সে ব্রাসেল্সে তার বিস্মৃত পার্টনারদের সঙ্গে। এসব কাজের পাশাপাশি, সেই প্রাচীন ভূতগ্রস্ত এলাকায় পাথরের কুঁচি ছড়ানো আর সমভূমির মতো দেখতে একটা জায়গায় বিমান অবতরণের স্থান ঠিক করে, তারপর নেমে পড়ে বায়ু চলাচলের দিক, উপকূলীয় এলাকাটার ভৌগলিক অবস্থা, আর আকাশপথে চলাচলের সেরা পথগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, কিন্তু একথা তার তখন খেয়াল করার মতো অবস্থা নেই যে তার শ্রম আর অধ্যবসায়, যা কিনা সেই মি. হার্বাটের শ্রম আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তুলনীয়, তাই দেখে শহরটায় একটা ভয়ানক সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ছে যে তার আসল মতলব রুট ঠিক করা নয়, কলা গাছ লাগানো। যে-পরিকল্পনাটা মাকোন্দোতে তার স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়াটাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে সেটার ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে বেশ ক'বার প্রাদেশিক রাজধানী সফর করা, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করা, লাইসেন্স বাগানো, আর নিরংকুশ স্বত্বাধিকার পাওয়ার কাগজপত্রে সই সাবুদ করা, ইত্যাদি কাজ সেরে ফেলে সে, এরই ফাঁকে ব্রাসেল্সে তার মা-বাবার সঙ্গে পত্রযোগাযোগও অব্যাহত রাখে, আর এই যোগাযোগটা হয়ে দাঁড়ায় অদৃশ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে ফারনান্দার সেই চিঠি চালাচালির মতোই, আর শেষতক একজন দক্ষ মেকানিকের তত্ত্বাবধানে প্রথম বিমানটা জাহাজযোগে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সে কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে সক্ষম হয়, সে-লোক সবচেয়ে কাছের বন্দরে সেটার অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে নিজেই বিমানটাকে উড়িয়ে মাকোন্দো নিয়ে আসবে। ব্যাপারটা প্রথম মাথায় ঢোকার আর আবহাওয়া সংক্রান্ত হিসেবনিকেশ করার এক বছরের মধ্যে, যাদের সঙ্গে তার চিঠি চালাচালি হচ্ছিল তাদের দেয়া পৌণপুনিক ওয়াদাতে বিশ্বাস করার ফলে, রাস্তা ধরে পায়চারী করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে গাস্তঁ, তখন তার চোখ থাকে আকাশের দিকে, আর বিমানটা একসময় উদয় হবে এই আশায় কান পাতা থাকে বাতাসে।

আমারান্তা উরসুলা ব্যাপারটা খেয়াল করেনি, কিন্তু তার প্রত্যাবর্তন অরেলিয়ানোর জীবনে আমূল একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হোসে আর্কাদিওর মৃত্যুর পর জ্ঞানী কাতালোনিয়র দোকানের বাঁধা খদ্দের হয়ে গিয়েছিল সে। তাছাড়া, যে-স্বাধীনতা সে তখন ভোগ করতো আর যে-সময় তার হাতে থাকতো তাতেও শহরটা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জেগে উঠেছিল তার, যদিও শহরটাকে আবিষ্কার করার সময় কোনোরকম বিস্ময়বোধ তার মধ্যে কাজ করতো না। ধুলোমলিন, নির্জনসব রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়াতো সে, রীতিমত বৈজ্ঞানিকের আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলোর ভেতরটা, মরিচার আগ্রাসনে জর্জরিত জানলার ধাতব আবরণগুলো, মৃত পাখি আর স্মৃতির ভারে নুয়ে পড়া বাসিন্দাদের। মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করতো প্রাচীন সেই কলা-কম্পানির শহরের উবে যাওয়া জৌলুসটা কেমন ছিল, যে-শহরের শুকনো সুইমিং পুল কানায় কানায় ভরে উঠেছে নারী-পুরুষের পচতে থাকা জুতোয়, যে-শহরের রাই ঘাসের কারণে বিধ্বস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িগুলোর ভেতর সে আবিষ্কার করে তখনো লোহার শেকল-বাঁধা একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের কংকাল আর একটা টেলিফোন, তখনো সেটা বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ওটা তুলতে যন্ত্রণাকাতর, দূরবর্তী এক মহিলা ইংরেজিতে কথা বলে ওঠে আর তার জবাবে সে বলে জ্বী, ধর্মঘট শেষ হয়েছে, তিন হাজার মৃত লোককে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, কলা কম্পানি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে আর বহু বছর পর মাকোন্দোতে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরে এসেছে। উদ্দেশ্যহীন এইসব ঘোরাফেরাই তাকে নিয়ে যায় নিষিদ্ধ এলাকায়, একসময় যেখানে পানভোজনোৎসব চাঙ্গা করতে বান্ডিলের পর বান্ডিল টাকা পোড়ানো হয়েছে, অথচ এখন যা কিনা এমনসব রাস্তাঘাটের একটা গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে যে-সব রাস্তাঘাটের অবস্থা অন্যগুলোর তুলনায় ঢের দুর্দশাগ্রস্ত আর করুণ, একটা-দুটো লাল বাতি তখনো জ্বলছে, রয়েছে ফুলের মালার ঝড়তি-পড়তি দিয়ে সাজানো পরিত্যক্ত কিছু নাচঘর, সেখানে নিতান্তই হেঁজিপেঁজিদের পাণ্ডুর, স্থূলকায়া বিধবারা, ফরাসী দাদীদের মায়েরা আর ব্যাবিলনিয় রমণীরা তখনো বসে আছে তাদের ফনোগ্রাফের পাশে। তার পরিবারের কথা, এমনকি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কথা মনে আছে এমন একজনকেও খুঁজে পায় না অরেলিয়ানো, কেবল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ নিগ্রো লোকটি ছাড়া, বুড়ো সেই মানুষটির তুলোটে চুল দেখলে ছবির নেগেটিভের কথা মনে পড়ে, নিজের বাড়ির দরজায় বসে তখনো সে সূর্যাস্তের শোকবিধূর স্তোত্র গেয়ে চলেছে। কয়েক হপ্তায় শিখে নেয়া বিকৃত পাপিয়ামেন্তো ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলে অরেলিয়ানো, মাঝে মাঝে লোকটা তার নাতনির মেয়ের তৈরি করা মুরগির মাথার স্যুপ ভাগ করে খায় অরেলিয়ানোর সঙ্গে। শক্ত হাড়গোড়ের বিশালদেহী এক কৃষ্ণকায় এক রমণী সে, ঘোটকীর মতো পাছা, টাটকা তরমুজের মতো স্তনের বোঁটা, সেই সঙ্গে গোল আর নিখুঁত একটা মাথা, তারের মতো চুলের একটা শক্ত আবরণে ঘেরা, দেখলে মনে হয় মধ্যযুগের যোদ্ধাদের শিরস্ত্রাণ। নাম তার নিগ্রোমান্তা। অরেলিয়ানো সে-সময় রুপোর বাসনকোসন, মোমবাতি, ইত্যাদি, বাড়ির টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করে পেট চালাচ্ছে। পকেটে যখন ফুটো পয়সাও থাকে না, আর সেটাই ঘটে বেশিরভাগ সময়ে, তখন সে বাজারের পেছনে চলে যায়, তারপর লোকজনকে বলে কয়ে তারা যে মুরগির মাথাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল সেগুলো নিয়ে এসে নিগ্রোমান্তাকে দেয় মশলাপাতি আর পুদিনাপাতা সহযোগে স্যুপ বানাবার জন্যে। নিগ্রোমান্তার দাদার বাবা মারা যাওয়ার পর সে ও-বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেও, স্কোয়ারের কালো অ্যালমন্ড গাছের নিচে নিগ্রোমান্তার সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয়ে যেতো, যখন নিগ্রোমান্তা তার বুনো জন্তু তাড়াবার বাঁশি ফুঁকে নিশাচর কিছু পেঁচা ডেকে আনতো। প্রায় সময়ই তার সঙ্গে থেকে যেতো সে, মুরগির মাথার স্যুপ আর গরীব মানুষের প্রিয় খাবার-দাবার নিয়ে আলাপ করতো পাপিয়ামেন্তোতে, আর সে হয়তো আলাপটা চালিয়েই যেতো কিন্তু নিগ্রোমান্তা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল সে থাকলে খদ্দেররা আসতে ভয় পায়। বার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক তার লোভ হলেও, আর যদিও তার কাছে খোদ নিগ্রোমান্তাকেই মনে হতে পারতো ভাগাভাগি করে নেয়া একটা স্মৃতিকাতরতার স্বাভাবিক পরিণতি বলে, কিন্তু তারপরেও সে তার সঙ্গে বিছানায় যায়নি। কাজেই আমারান্তা উরসুলা মাকোন্দোতে ফিরে এসে যখন দমবন্ধ করা একটা ভগিনীসুলভ আলিঙ্গন তাকে উপহার দেয়, অরেলিয়ানো তখনো কুমারই রয়ে গেছে। আমারান্তা উরসুলাকে দেখলেই, বিশেষ করে সে যখন তাকে হাল সময়ের নাচের পদক্ষেপগুলো শেখায়, সে তার হাড়ের ভেতর ঠিক সেই মদোন্মত্ততা অনুভব করে যা তার নানার দাদা অনুভব করেছিল গোলাঘরের ভেতর পিলার তারনেরা তার তাস দেখানোর ছুতোনাতা করার সময়। যন্ত্রণাটাকে দমিয়ে রাখার জন্যে আরো গভীরভাবে ডুবে যায় সে পার্চমেন্টের ভেতর, এড়িয়ে যায় তার খালার নির্দোষ তোষামুদে কথাবার্তা, যে-খালা অরেলিয়ানোর রাতগুলোকে বিষিয়ে ফেলছে মানসিক যন্ত্রণার একটা ধারাস্রোতে, কিন্তু সে তাকে যতোই এড়িয়ে চলে, ততোই আরো উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে অপেক্ষা করে থাকে সারাক্ষণ বাড়ির অসম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় প্রণয়যন্ত্রণাকাতর আমারান্তা উরসুলার নির্মম হাসি, সুখী বেড়ালের মতো গর্জন, আর তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গীতের জন্যে। এক রাতে তার বিছানার থেকে মাত্র তিরিশ ফুট দূরে রুপোর কাজ করার বেঞ্চিটার ওপর বুভুক্ষু দম্পতিটি বোতল-টোতল ভেঙে শেষ পর্যন্ত মিউরিয়াটিক এসিডের ছোটখাটো একটা পুকুরের ভেতর সহবাসে লিপ্ত হয়। অরেলিয়ানো যে কেবল এক মিনিটের জন্যেও ঘুমোতে পারে না তা নয়, পরের দিনটা কাটে তার জ্বরের ঘোরে, রাগে-ক্ষোভে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। যে-রাতে অনিশ্চয়তার কাঁটার আঘাত সয়ে আর আমারান্তা উরসুলার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসা এক পেসো পঞ্চাশ সেন্ট মুঠির ভেতর চেপে প্রথমবারের মতো সে অপেক্ষা করে থাকে কখন নিগ্রোমান্তা আ্যালমন্ড গাছগুলোর ছায়ার ভেতর আসবে সেজন্যে, সেদিন তার কাছে মনে হয় যেন অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে; পয়সাটা যে তার খুব দরকার ছিল তা নয়, কিন্তু সে চেয়েছে আমারান্তা উরসুলাকে কাজটার সঙ্গে জড়াতে, তাকে কালিমা লিপ্ত করতে; তার সেই দুঃসাহসিক অভিযানে তাকে কোনোভাবে একটা বাজে কাজে ব্যবহার করতে। নিগ্রোমান্তা এসে তাকে নকল মোমবাতিতে আলোকিত তার ঘরের ভাঁজ করা খাটিয়ায় নিয়ে যায়—সে-খাটের তোষক-বিছানায় অনুপভোগ্য প্রণয়ের চিহ্ন বর্তমান—নিয়ে যায় তার বুনো কুকুরের মতো শরীরটার কাছে, শক্ত হয়ে যাওয়া, আত্মাবিহীন যে-শরীরটা একরকম তৈরি-ই হয়ে ছিল একটা ভয় পাওয়া শিশু হিসেবে তাকে খারিজ করে দেয়ার জন্যে, কিন্তু হঠাৎ করেই তা আবিষ্কার করে এমন এক পুরুষ মানুষকে যার প্রচণ্ড শক্তির দাবিতে নিগ্রোমান্তার মনের ভেতরে ভূকম্পজনিত পুনর্বিন্যাসের মতো একটা আলোড়ন দরকার হয়ে পড়ে।

দু'জনে জুটি বাঁধে ওরা। অরেলিয়ানো সকালটা ব্যয় করতো পার্চমেন্টের অর্থোদ্ধারে, তারপর দুপুরে চলে যেতো সেই শোবারঘরে যেখানে নিগ্রোমান্তা তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো কী করে কাজটা প্রথমে কেঁচোর মতো তারপর শামুকের মতো আর সবশেষে কাঁকড়ার মতো করে করতে হয় তাই শেখাতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতক্ষণ না অরেলিয়ানোকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে হতো তাকে বারোয়ারী প্রণয়লীলার জন্যে। নিগ্রোমান্তার কোমরে যে একটা ছোট্ট বেল্ট আছে—দেখতে যেটা চেলোর তার দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়, কিন্তু ইস্পাতের মতো শক্ত, কোনটা আগা কোনটা মাথা বোঝা ভার, যেন ওটা তার সঙ্গেই জন্মেছে তার সঙ্গেই বড় হয়েছে—এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে বেশ কয়েক হপ্তা লেগে যায় অরেলিয়ানোর। প্রায় সবসময়েই, ভালোবাসাবাসির অবসরে, বিছানায় পুরোপুরি নগ্ন হয়ে খাওয়া-দাওয়া করতো ওরা মাথাঝিমঝিম-করা গরমের ভেতর, আর মরিচার কারণে দস্তার সিলীংয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকা দিবাকালীন নক্ষত্রের নিচে। এই প্রথমবারের মতো নিগ্রোমান্তার বরাতে জোটে এক বাঁধা মানুষ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক হাড়-গুঁড়ো-করা জাঁতাকল—কথাটা সে নিজের মুখেই বলেছিল, দমফাটানো হাসিতে ফেটে প'ড়ে—আর সে এমনকি রোমান্টিক সব স্বপ্নও দেখতে শুরু করে, আর ঠিক তখনই অরেলিয়ানো তার কাছে খুলে বলে আমারান্তা উরসুলার ব্যাপারে তার অবদমিত প্রবল আসক্তির কথা, যে-আসক্তিমুক্তির ওষুধ সে তার এই বিকল্প ব্যবস্থাটার মধ্যে খুঁজে পায়নি বরং তার প্রণয় অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত হওয়াতে সেটা ভেতরে ভেতরে আরো বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। এরপরেও নিগ্রোমান্তা তাকে আগের মতো আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করতো, তবে তার সেবার বদলে সে এমন কড়াকড়িভাবে তাকে দাম দিতে বাধ্য করতো। ঐ অরেলিয়ানোর কাছে পয়সা না থাকলে আগের হিসেবের সঙ্গে সেটা লিখে রাখতো, সংখ্যায় নয়, দরজার পেছনে নিজের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে দাগ কেটে কেটে। সূর্যাস্তের সময় নিগ্রোমান্তা যখন স্কোয়ারের ছায়ার ভেতর দিয়ে ভেসে বেড়াতো, অরেলিয়ানো তখন সচরাচর এই সময়েই রাতের খাবার খেতে বসে আমারান্তা উরসুলা আর গাস্তঁ-র সঙ্গে আবছাভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করার পর একা আগন্তুকের মতো বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে আবার নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলতো, কিন্তু কিছুই লিখতে, পড়তে বা এমনকি চিন্তাও করতে পারতো না এ-বাড়ির রাতগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলা উচ্চহাসি, ফিসফিসানি, প্রথমদিকের ক্রীড়াচ্ছল খুনসুটি আর তার পরের প্রণয়কাতর সুখের বিস্ফোরণের কারণে। তো, গাস্তঁ তার উড়োজাহাজের জন্যে অপেক্ষা শুরু করার দু'বছর আগে এই ছিল অরেলিয়ানোর জীবন, আর সেদিনও সেটা ঠিক সে-রকমই ছিল যেদিন সে জ্ঞানী কাতালোনিয়র দোকানে গিয়ে দেখে চারটে ঝগড়াটে ছেলে উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে মধ্যযুগে আরশোলা কিভাবে মারা হতো তাই নিয়ে। অরেলিয়ানোর আগ্রহ যে কেবল সেই সব বইপত্রের ব্যাপারেই যেগুলো একমাত্র শ্রদ্ধেয় বিডি-রই (ইংরেজ বেনেডিকক্তিয় সাধু পুরুষ এবং পণ্ডিত; জন্ম: ৬৭৩ মৃত্যু: ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দ;—অনুবাদক) পড়া আছে, সে-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বৃদ্ধ গ্রন্থবিক্রেতা খানিকটা পিতৃসুলভ বিদ্বেষ নিয়েই তাকে আলোচনাটায় অংশ নেয়ার জন্যে বললে সে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে জানায় যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ডানাঅলা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতঙ্গ এই আরশোলা সেই ওল্ড টেস্টামেন্টের সময়েই চটী জুতোর আক্রমণের শিকার হতো, কিন্তু তারপর থেকে প্রজাতিটা সেটাকে নিধন করার যে-কোনো, এমনকি সবগুলো পদ্ধতি—সোহাগা মাখানো টমেটোর ফালি থেকে ময়দা আর চিনি পর্যন্ত—সাফল্যের সঙ্গে রুখে দিয়েছে, সেই সঙ্গে প্রজাতিটির এক হাজার ছয়শ তিনটি রূপভেদ প্রতিহত করে দিয়েছে মানুষজাতি তার জন্ম লগ্ন থেকে খোদ মানুষসহ যে-কোনো জীবন্ত প্রাণীর প্রতি যে-সব হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, নিরলস আর নিষ্করুণ প্রচেষ্টাটি—এমনই এক পর্যায় অব্দি যে, বংশবৃদ্ধির একটা প্রবৃত্তিকে যেমন মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে বলা হয়েছে, তেমনি তার চেয়েও নিশ্চিত আর জরুরী আরেকটিও নিশ্চয়ই ছিল আর সেটা হল আরশোলা মারার প্রবৃত্তি, আর এই প্রজাতিটি যে মানুষের হিংস্রতার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে তার কারণ তারা আশ্রয় নিয়েছিল ছায়ার ভেতর, অন্ধকারের ভেতর, যেখানে তারা অন্ধকার সম্বন্ধে মানুষের জন্মগত ভীতির কারণেই অবধ্য থেকে গেছে, যদিও দুপুরের রোদের ব্যাপারে তারা এমনই সংবেদনশীল রয়ে গিয়েছিল যে মধ্যযুগ থেকেই, আর বর্তমানকালেও, আর *পার অমিনা সেকুলা সেকুলারাম*, আরশোলা মারার একমাত্র কার্যকর পন্থা হল সূর্যের আলোর প্রখর দীপ্তি।

বিরাট সেই কাকতালীয় ঘটনাটাই এক বিরাট বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটিয়ে দেয়। প্রতিদিন বিকেলবেলা অরেলিয়ানো দেখা করতে থাকে সেই চার বিতার্কিক, তার জীবনের প্রথম আর শেষ বন্ধু আলভারো, জার্মান, আলফনসো আর গাব্রিয়েল-এর সঙ্গে। এক লিখিত বাস্তবতায় মুখ গুঁজে থাকা তার মতো একজন মানুষের পক্ষে বইয়ের দোকানে শুরু হওয়া আর বেশ্যালয়ে সমাপ্তি ঘটা সে-সব ঝোড়ো বৈঠকগুলো হয়ে দাঁড়ায় রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের মতো একটা ব্যাপার। এ-কথাটা তার মাথায় কখনো আসেনি যে সাহিত্য হলো মানুষজনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার জন্যে উদ্ভাবন করা সবচাইতে ভালো খেলনা যা-কিনা আলভারো এক পানোৎসবের সময় হাতে কলমে প্রমাণ করে দেয়। এসব খামখেয়ালি দৃষ্টিভঙ্গির উৎস যে জ্ঞানী কাতালোনিয়র সৃষ্টি করা নানান উদাহরণ সে-কথা আবিষ্কার করতে বেশ কিছুদিন লেগে যাবে অরেলিয়ানোর, আর সেই বৃদ্ধ মনে করতেন, যদি কোনো জ্ঞান মটরশুঁটি রান্নার নতুন কোনো উপায় বের করার কাজে না লাগে তাহলে সে-জ্ঞানের কোনো দামই নেই।

যে-বিকেলে অরেলিয়ানো আরশোলা ওপর বক্তৃতা ঝেড়েছিল সেদিন বিতর্কটা শেষ হয় মাকোন্দোর এক প্রান্তে মিথ্যের এক বেশ্যালয়ে, সেই সব মেয়ের বাড়িতে যারা পেটের দায়ে বিছানায় যেতো। মাসী মহিলা এক হাসিখুশি *মামাসান্তা*, দরজা খোলা আর বন্ধ করার একটা বাতিক আছে তার। তার মুখের সার্বক্ষণিক হাসিটা সম্ভবত তার খদ্দেরদের সরলতার অবদান, কারণ এমন একটা স্থাপনাকে তারা বাস্তব বলে ধরে নিয়েছে কল্পনা ছাড়া অন্য কোথাও যার কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে এমনকি সেইসব জিনিসও মিথ্যে, অলীক, যেগুলো ধরাছোঁয়ার ভেতরের জিনিস: বসলেই ভেঙে যায় এমনসব আসবাবপত্র, ভেতরে মুরগি বাসা বেঁধেছে এরকম একটা নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাওয়া ফনোগ্রাফ, কাগজের ফুলের বাগান, কলা কম্পানি আসার আগের সময়কার ক্যালেন্ডার, কখনো প্রকাশিত না হওয়া সাময়িকী থেকে কেটে রাখা প্রিন্টসহ ফ্রেম। এমনকি আশেপাশের এলাকা হতে আসা ভীতু, ছোটখাট বেশ্যারা পর্যন্ত: মাসী মহিলা যখন তাদের খবর দেয় খদ্দের এসে পড়েছে তখন আসলে তা নেহাত কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনোরকম সম্ভাষণ ছাড়াই এসে পড়তো তারা তাদের ছোট ছোট ফুল তোলা পোশাক পরে, যে-পোশাক আরো পাঁচ বছর আগের, আর সে-পোশাক তারা ঠিক সে-রকম সরলতা নিয়েই খুলে ফেলতো যে-রকম সরলতা নিয়ে সেগুলো পরেছিল তারা, আর ভালোবাসাবাসির প্রবল বেগের সময় তারা আবেগের বশে চিৎকার করে বলে উঠতো ওহ্ ঈশ্বর, দেখো ছাদটা কিভাবে ভেঙে পড়ছে, আর যে-মুহূর্তে ওরা ওদের এক পেসো পঞ্চাশ সেন্ট পেয়ে যেতো তখনই সেটা খরচ করে ফেলতো মাসী মহিলারই বিক্রি করা পনির দেয়া রোল কিনে, সেটা আবার বেচতো সেই মাসী মহিলাই, মুখের হাসিটা আগের চেয়ে অনেক ছড়িয়ে দিয়ে, কারণ সে জানতো সেই খাবারটাও সত্যিকারের খাবার নয়। অরেলিয়ানো, যার দিনগুলো সে-সময় শুরু হতো মেলকিয়াদেসের পার্চমেন্ট দিয়ে আর শেষ হতো নিগ্রোমান্তার বিছানায়, সে তার ভীরুতার একটা নির্বোধ নিদান খুঁজে পেয়েছে ছোট্ট সেই কাল্পনিক বেশ্যাখানায়। গোড়ার দিকে সে কিছুতেই সুবিধে করতে পারতো না, মাসী মহিলা একেবারে মোক্ষম সময়ে গিয়ে ঘরের ভেতর হাজির হয়ে নায়ক-নায়িকার যৌন ক্ষমতা সম্পর্কে নানান মন্তব্য করে যেতো। কিন্তু যতোই সময় গড়াতে থাকে ততোই জগতের ও-সব দুর্ঘটনার সঙ্গে সে এতোটাই পরিচিত হয়ে ওঠে যে অন্যসব রাতের চেয়ে অসংযত এক রাতে সেই ছোট্ট অভ্যর্থনা ঘরে কাপড় জামা ছেড়ে তার অকল্পনীয় পুরুষাঙ্গের ওপর একটা বিয়ারের বোতলের ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে বাড়িময় দৌড়ে বেড়ায়। এসব উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালি কাজকর্ম একটা কেতাদুরস্ত ব্যাপারে পরিণত করে সে-ই, আর মাসী মহিলাও কোনোরকম আপত্তি ছাড়া, সেগুলো বিশ্বাস না করেই, তার সার্বক্ষণিক হাসি নিয়ে সে-সব উপভোগ করে যায়, ঠিক যেমন জার্মান নামের ছেলেটা এটা প্রমাণ করতেই বাড়িটা পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে যে কোনো অস্তিত্বই নেই সেটার, বা আলফনসো কাকাতুয়াটার ঘাড় মটকে মুরগির স্যুপ গরম হতে থাকা পাত্রের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটাকে।

অরেলিয়ানো নিজেকে তার চার বন্ধুর সঙ্গে ভালোবাসা আর ঐক্যের একই বন্ধনে বাঁধা মনে করলেও—আর সেটা এমন এক পর্যায় পর্যন্ত যে তাদেরকে তার একজন বলেই মনে হতো—অন্যান্যদের চেয়ে গাব্রিয়েলের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ সে। ঘনিষ্ঠতাটা তৈরি হয় সেদিন যেদিন তেমন কিছু না ভেবেই সে কর্নেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার উল্লেখ করায় একমাত্র গাব্রিয়েলই মনে করে অরেলিয়ানো কাউকে নিয়ে মজা করছে না। এমনকি সেই মাসী, সাধারণত যে-কিনা কোনো কথাবার্তায় অংশ নিতো না, সে পর্যন্ত এক ক্রোধোন্মত্ত আবেগ নিয়ে বলে যে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া–যার সম্পর্কে তাকে সত্যি সত্যিই একসময় কিছু কথা বলতে শোনা গিয়েছিল–সে নাকি উদারপন্থীদের খুন করার জন্যে সরকারের বানানো এক চরিত্র। ওদিকে গাব্রিয়েল কিন্তু কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার অস্তিত্বে অবিশ্বাস প্রকাশ করে না, কারণ কর্নেল ছিল তার দাদার দাদা কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেস-এর সহযোদ্ধা, এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। শ্রমিক হত্যার সেই প্রসঙ্গটা উঠতে স্মৃতির চঞ্চলমতি জারিজুরিগুলো আরো জটিল হয়ে দেখা দেয়। যতোবারই অরেলিয়ানো প্রসঙ্গটা ওঠাতো ততোবারই, শুধু মাসীই নয়, তার চেয়ে বেশি বয়েসী অনেকেই স্টেশনে ঘেরাও হয়ে পড়া শ্রমিক, মরা মানুষ বোঝাই দুশো গাড়ির একটা ট্রেনের পৌরাণিক কাহিনীটাকে অস্বীকার তো করতোই, তারা এমনকি জোর গলায় এমনও বলতো যে সব কিছুই বৈধ কাগজপত্রে আর স্কুলের পাঠ্য বইতে লেখা আছে: কলা কম্পানির কখনো কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই, কেউই বিশ্বাস করে না এমন কিছু বাস্তব ঘটনার সূত্রে অরেলিয়ানো আর গাব্রিয়েলের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয়, আর তা ওদের দু'জনের জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, দু'জনেই তারা আবিষ্কার করে যে-জগৎটা ফুরিয়ে গিয়ে কেবল তার স্মৃতিকাতরতা রয়ে গেছে সেই জগতের স্রোতের ভেতর চলে এসেছে তারা দিগভ্রষ্ট হয়ে। গাব্রিয়েল তো যেখানে রাত সেখানেই কাত। বেশ কয়েক অরেলিয়ানো তাকে রুপোর কামারশালায় এনে রাখে, কিন্তু ভোর না হওয়া পর্যন্ত শোবারঘরগুলোর ভেতরে হেঁটে বেড়ানো মৃত লোকজনের জ্বালায় রাতগুলো সে জেগেই কাটিয়ে দেয়। পরে সে তাকে নিগ্রোমান্তার হাতে ছেড়ে দেয়, মেয়েটা তখন তাকে তার অবসরে তার বহু-ব্যবহৃত কামরায় নিয়ে যায়, আর তার হিসেবটা লিখে রাখে অরেলিয়ানোর বাকির হিসেবের পাশে খালি থাকা অল্প খানিকটা জায়গায় খাড়া খাড়া দাগ দিয়ে।

অগোছালো জীবনযাপন করার পরেও কিন্তু পুরো দলটা জ্ঞানী কাতালোনিয়র অনুপ্রেরণায় এমন কিছু করতে চাইতো যা টিকে থাকবে। যে-শহরে কারোরই এখন আর প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডীর ওপারে যেতে ইচ্ছে করে না, সেই শহরে সাঁইত্রিশ নম্বর নাটকীয় অবস্থার খোঁজে একটা গোটা রাত্তির কাটাতে তিনিই বাধ্য করেছিলেন তাদেরকে ধ্রুপদী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা আর তার বিরলসব বই-পত্তরের ভাঁড়ারটা নিয়ে। বন্ধুত্ব ব্যাপারটা আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে, ফারনান্দার নীচুতার কারণে তার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে থাকা এক জগতের মনোহারিত্বে হতবাক হয়ে পড়ে, অরেলিয়ানো ঠিক সেই সময় পার্চমেন্ট নিয়ে তার গবেষণা ছেড়ে দেয় যখন সেটা নিজেকে মেলে ধরছিল কবিতার চরণে লেখা সাংকেতিক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। কিন্তু বেশ্যালয়গমন ত্যাগ না করেও যে সব কিছু করার যথেষ্ট সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যায় এই বোধটা তাকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের মেলকিয়াদেসের কামরায় ফিরিয়ে আনে যে শেষ সূত্রগুলো না পাওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়বে না সে। এই সময়েই গাস্ত বিমানের জন্যে অপেক্ষা করতে শুরু করে, আর আমারান্তা এমনই নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে যে এক সকালে গিয়ে হাজির হয় ঘরটায়।

অরেলিয়ানোর উদ্দেশে বলে ওঠে সে, 'কী খবর, মানুষখেকো, ফের নিজের গুহায় ফিরে এসেছিস?'

নিজের ডিজাইন করা পোশাক আর নিজেরই তৈরি করা লম্বা, মাছের কশেরুকার হারে রীতিমত দুর্ধর্ষ লাগছে তাকে। স্বামীর বিশ্বস্ততার ব্যাপার নিঃসন্দেহ হয়ে যাওয়াতে এখন আর সেই রশি ব্যবহার করে না সে, আর, ফিরে আসার পর বোধহয় এই প্রথমবারের মতো খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। তার আগমন টের পেতে তার দিকে তাকানোর দরকার হয় না অরেলিয়ানোর। কনুই জোড়া টেবিলের ওপর রেখেছে সে, এতো ঘনিষ্ঠভাবে, এতো নিঃসহায়ের মতো যে, অরেলিয়ানো তার হাড়ের গহীন ভেতরের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়, আর আমারান্তা উরসুলা আগ্রহী হয়ে ওঠে পার্চমেন্টের ব্যাপারে। এদিকে অরেলিয়ানো নিজের অস্বস্তি এড়াতে, যে-গলার স্বরটা তার হারিয়ে যাচ্ছিল, যে-জীবনটা তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, যে-স্মৃতিটা পরিণত হচ্ছিল এটা পচা সামুদ্রিক প্রাণীতে, সে-সবই আঁকড়ে ধরে, আমারান্তা উরসুলার সঙ্গে কথা বলে যায় নানান বিষয় নিয়ে, সংস্কৃত ভাষার যাজকীয় নিয়তি, একটা কাগজের উল্টো দিকের লেখা যেমন আলোতে কাগজটা ধরলে পড়ে ফেলা যায় তেমনি সময়ের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যাতে নিজেরাই নিজেদের কাছে হেরে না যায় সেজন্যে সেগুলোর অর্থোদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা, নস্ত্রাদামুসের *শতাব্দীসমূহ* আর সন্ত মিলেনাসের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক কান্তাব্রিয়া-র ধ্বংস নিয়ে। হঠাৎ করেই, আলাপে কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটিয়ে, জন্মের সময় থেকেই যে-আবেগ তার ভেতর ঘুমিয়ে ছিল সেই আবেগের তাড়নায় অরেলিয়ানো তার হাতটা রাখে আমারান্তা উরসুলার হাতের ওপর, এই ভেবে যে, চূড়ান্ত সেই সিদ্ধান্তটা তার সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাবে। সে যাই হোক, স্নেহময় যে-সারল্য নিয়ে আমারান্তা উরসুলা ছোটবেলায় কাজটা করতো ঠিক সেইভাবে অরেলিয়ানোর তর্জনীটা আঁকড়ে ধরে সে, আর সেই অবস্থাতেই অরেলিয়ানো তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়। ওভাবেই থাকে তারা, দুটো তর্জনীর বাঁধনে বাঁধা পড়ে, যদিও বরফশীতল সে-তর্জনীদুটো কোনোভাবেই কোনো কিছু আদান-প্রদান করে না, তারপর একসময় আমারান্তা উরসুলা তার ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের ভেতর থেকে জেগে উঠে নিজের কপালে নিজেই একটা চাপড় বসিয়ে দেয়। আঁতকে বলে ওঠে, 'পিঁপড়া!' মন থেকে পাণ্ডুলিপির কথা উবে যায় তার, নাচের ছন্দে পা ফেলে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেখান থেকেই আঙুলের ডগা দিয়ে অরেলিয়ানোর দিকে একটা চুমো ছুঁড়ে দেয়, ঠিক যেভাবে ব্রাসেল্‌স যাবার দিন বিকেলবেলা সে তার বাবাকে বিদায় জানিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে, 'ওসব তুমি পরেও বলতে পারবে আমাকে। আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম, পিঁপড়ার বাসায় চুন দেবার দিন আজ।'

মাঝে মধ্যেই, বাড়ির ওদিকটায় কোনো কাজ থাকলে, অরেলিয়ানোর ঘরে একটা ঢুঁ মারাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায় তার, স্বামী যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আকাশ দেখায় ব্যস্ত, সে তখন কয়েকটা মিনিট কাটিয়ে যেতো অরেলিয়ানোর ঘরে। এই পরিবর্তনে উৎসাহ পেয়ে, পরিবারের সবার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে সে-সময় বাড়িতে থেকে যাওয়া শুরু করে অরেলিয়ানো, ঠিক যেমনটা সে করতো আমারান্তা উরসুলা বাড়িতে ফিরে আসার প্রথম দিকটায়। গাস্তঁ খুশি হয় এতে। খাওয়া-দাওয়ার পর কথাবার্তার সময়, কখনো কখনো যা ঘণ্টাখানেক ধরেও চলতো, গাস্তঁ জানায় তার পার্টনাররা তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। তারা তাকে জানিয়েছে তারা নাকি একটা জাহাজে বিমানটা উঠিয়ে দিয়েছে, অথচ জাহাজটা কিন্তু এসে পৌঁছোয়নি, এদিকে তার শিপিং এজেন্টরা তাকে জোর দিয়ে বলছে জাহাজটা কোনোদিনই আসবে না, কারণ ক্যারিবিয় জাহাজের তালিকায় ওটার নামই নেই। ওদিকে তার পার্টনাররা বার বার বলছে শিপমেন্টটা ঠিকই আছে, এমনকি তারা এ-ইঙ্গিতও করেছে যে গাস্তঁ তাদেরকে মিথ্যে কথা লিখছে। চিঠি চালাচালিটা পারস্পরিক সন্দেহের এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছোয় যে গাস্তঁ শেষ পর্যন্ত ঠিক করে আর চিঠি লিখবে না, আর তার কথাবার্তায় যে-সুরটা ফুটে উঠতে শুরু করে তা হলো সে নিজেই বরং ব্রাসেল্‌সে একটা ঝটিকা সফরে গিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে বিমানটা নিয়ে আসবে। অবশ্য, আমারান্তা উরসুলা যখন আবারো জানায় সে এমনকি স্বামী খোয়াতে রাজি কিন্তু মাকোন্দো ছেড়ে কোথাও যাবে না, তখন পরিকল্পনাটা মাঠে মারা যায়। গোড়ার দিকে অরেলিয়ানো গাস্তঁকে ভেলোসিপীডের পিঠে সওয়ার এক গর্দভ বলেই মনে করতো, আর তাকে ঘিরে খানিকটা করুণাও বোধ করতো সে। পরে, বেশ্যালয়ে যখন পুরুষ মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তার আরো ভালো করে জানার সুযোগ ঘটে তখন তার মনে হয় গাস্তঁ-র নম্রতা-ভদ্রতার মূলে রয়েছে সীমাহীন কামাসক্তি। কিন্তু তাকে আরো ভালো করে জানার পর সে যখন উপলব্ধি করে যে গাস্তঁ-র বাধ্যগত আচার-আচরণ আসলে তার প্রকৃত স্বভাব বিরোধী, তখন তার মনে একটা বিদ্বেষপ্রসূত সন্দেহ জেগে ওঠে যে উড়োজাহাজের জন্যে অপেক্ষার এই ব্যাপারটা ভান ছাড়া কিছু নয়। এরপর সে ভাবে, দেখে যতটা মনে হয় গাস্তঁ আসলে ততটা বোকা নয়, উল্টো বরং অসীম একনিষ্ঠা, সক্ষমতা আর ধৈর্যসম্পন্ন একজন মানুষ যে-কিনা নিজের বৌকে জয় করে নিতে চায় চিরন্তন মতৈক্য, কখনো 'না' না বলা, আর এক অন্তহীন বশ্যতার ভান করার একঘেয়েমী দিয়ে, নিজের ফাঁদে তাকে নিজেই জড়িয়ে পড়তে দিয়ে, যতদিন পর্যন্ত না নিজের হাতের কাছের এতোসব বিভ্রান্তি দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠে আমারান্তা উরসুলা নিজেই বাক্স-পেঁটরা গুছিয়ে য়্যুরোপ রওনা হবে। অরেলিয়ানোর আগের সেই করুণা এক হিংস্র বিরাগে পরিণত হয়। গাস্তঁ-র পদ্ধতিটা তার কাছে এতোই বিকৃত কিন্তু সেই সঙ্গে আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতোই কাজের বলে মনে হয় যে আমারান্তা উরসুলাকে হুঁশিয়ার করে দেবার ঝুঁকি নেয় সে। আমারান্তা উরসুলা অবশ্য অরেলিয়ানোর মনের ভেতরে ভালোবাসার গুরুভার, অনিশ্চয়তা আর ঈর্ষা খেয়াল পর্যন্ত না করে তার সন্দেহটা হেসেই উড়িয়ে দেয়। অরেলিয়ানোর ভেতরে সে যে ভ্রাতৃপ্রতিম স্নেহের অতিরিক্ত একটা কিছু জাগিয়ে তুলছে সে-বিষয়ে সে সেদিন পর্যন্ত কিছুই জানতো না যেদিন পীচফলের একটা ক্যান খুলতে গিয়ে সে নিজের আঙুলে খোঁচা খেতেই অরেলিয়ানো এমন আগ্রহভরে আর নিবেদনের সঙ্গে রক্তটা চুষে নেবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে যে তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি বয়ে যায়।

অস্বস্তির সঙ্গে একটা হাসি হেসে সে বলে ওঠে, 'অরেলিয়ানো! বড্ড সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মন তোর।'

এরপরই সব ওলটপালট হয়ে যায় অরেলিয়ানোর। আমারান্তা উরসুলার আহত হাতের তালুতে ছোট ছোট, প্রতিরোধহীন চুমো দিয়ে তার হৃদয়ের নিভৃততম পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে টেনে বের করে নিয়ে আসে এক অন্তহীন, ক্ষতবিক্ষত অন্ত্রকে, সেই পরজীবী জন্তুটাকে যেটার জন্ম হয়েছে তার নিজের আত্মোৎসর্গের ভেতরে। আমারান্তা উরসুলাকে অরেলিয়ানো বলে চলে একা একা কাঁদবার জন্যে কিভাবে সে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে পড়তো, তার সমস্ত ঝাল ঝাড়তো গোসলখানায় আমারান্তা উরসুলার শুকোতে দেয়া অন্তর্বাসটার ওপর। সে তাকে বলে কী উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে নিগ্রোমান্তাকে সে বলতো তার কানে বিড়ালের মতো গজরাতে আর গাস্তঁ গাস্তঁ গাস্তঁ বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে, কতখানি চালাকীর সঙ্গে সে তার সুগন্ধির বোতলগুলো তছনছ করেছিল যাতে পেটের দায়ে যে-সব ছোট ছোট মেয়ে বিছনায় যায় তাদের ঘাড়ে সে সেই সুবাস পায়। সেই বিস্ফোরণের রোষ দেখে ভয় পেয়ে, আমারান্তা উরসুলা তার আঙুলগুলো মুঠো পাকিয়ে ফেলতে শুরু করে, গুটিয়ে ফেলতে থাকে শামুকের মতো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আহত হাতটা সব রকমের ব্যথা মুক্ত হয়ে যায়, করুণার সবরকম চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে হয়ে ওঠে সেটা পান্না আর পোখরাজের একটা ডেলা, পাথুরে আর অনুভূতিহীন হাড়ের সমষ্টি।

যেন থুতু ছিটাচ্ছে এমনিভাবে আমারান্তা উরসুলা বলে ওঠে, 'উজবুক! প্রথম জাহাজেই বেলজিয়াম চলে যাচ্ছি আমি।'

এরকমই এক বিকেলে জ্ঞানী কাতালোনিয়র বইয়ের দোকানে এসে হাজির হয় আলভারো তার অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার—পশুপাখির একটা বেশ্যাপাড়ার কথা তারস্বরে চেঁচিয়ে ঘোষণা করতে করতে। ওটার নাম 'সোনালী শিশু', আদতে বিশাল একটা আকাশ-খোলা বৈঠকখানা, সেটার ভেতর দিয়ে কম করে হলেও অন্তত দু'শো বকজাতীয় পাখি ইচ্ছেমতো আসা-যাওয়া করে কান ঝালাপালা করা কক্ কক্ শব্দে সময় ঘোষণা করতে করতে। নাচের মঞ্চটা ঘিরে থাকা তারের খোঁয়াড়টায় আর আমাজনীয় বড় বড় ক্যামেলিয়ার মাঝখানে নানান রঙের সব বক, শুয়োরের মতো মোটাসোটা কুমীর, বারোটা বলয়াকার অস্থিসহ র‍্যাটল সাপ, আর সোনার গিলটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা খোলসঅলা একটা কচ্ছপ রয়েছে, ছোট্ট একটা কৃত্রিম সমুদ্রে থেকে থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে সেটা। রয়েছে বিশাল একটা সাদা কুকুর, নম্র ভদ্র, আর বাচ্চা পয়দা করার একটা ঘোড়া, খাবার পাওয়ার জন্যে সেটা সব কিছুর পরেও প্রজননের কাজ করে। এক নিবিড় সরলতা আছে পরিবেশটার মধ্যে, যেন সদ্য তৈরি হয়েছে সেটা, আর যে-সব মুলাটো মেয়ে অসহায়ভাবে রক্ত-লাল পাঁপড়ি আর সেকেলে ফনোগ্রাফের রেকর্ডের ভেতর বসে থাকে তারা ভালোবাসার এমনসব কায়দা-কানুন জানে যা লোকে ফেলে রেখে গেছে বিস্মৃত এই পার্থিব স্বর্গে। দলটা যে-রাতে প্রথমবারের মতো বিভ্রান্তির সেই কাচঘরটায় ঢুঁ মারে, বেতের দোলকেদারায় বসে প্রবেশপথটা আগলে রাখা জাঁকাল আর মিতভাষিণী রমণীটির কাছে মনে হয় সময় উল্টো ঘুরে তার উৎসমূলে ফিরে যাচ্ছে, কারণ যে-পাঁচজন এগিয়ে আসছিল তাদের মধ্যে সে হালকা-পাতলা আর তাতারদের মতো গালের হাড়সহ পাণ্ডুরবরণ এক লোককে দেখতে পায়, নিঃসঙ্গতার উপদংশ রোগ যাকে মার্কা মেরে দিয়েছে চিরদিনের জন্যে, সৃষ্টির সেই আদিম মুহূর্ত থেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে ওঠে, ' ঈশ্বর, ঈশ্বর, অরেলিয়ানো!'

নতুন করে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে দেখতে পায় সে, ঠিক যেমন সে দেখেছিল তাকে একটা কুপির আলোয়, যুদ্ধের আগে, গৌরবের নিঃসঙ্গতা আর মোহভঙ্গের নির্বাসনের অনেক আগে, দূরবর্তী সেই সকালে যেদিন সে তার শোবার ঘরে গিয়েছিল তার জীবনের প্রথম হুকুম দিতে: তাকে ভালোবাসা দেবার হুকুম। সে আর কেউ নয়, পিলার তারনেরা। বহু বছর আগে, একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে পৌঁছুবার পর থেকেই সে তার নিজের বয়েসের হিসেব রাখার বদ রীতিটা ছেড়ে দিয়ে তার তাসগুলোর ছলনাভরা কল্পনা আর অনুমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বাস করতে শুরু করেছে স্মৃতির স্থবির আর প্রান্তস্থিত সময়ের ভেতর, পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে যাওয়া, বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া ভবিষ্যতের ভেতর, ভবিষ্যতের ওপারে।

সেই রাত থেকে অরেলিয়ানো আশ্রয় নেয় তার অচেনা প্রপ্রপিতামহীর করুণাভরা কোমলতা আর বোধ-এর মধ্যে। তার বেতের দোলকেদারায় বসে বসে পিলার তারনেরা স্মৃতি রোমন্থন করে যেত, পুনঃনির্মাণ করে যেত বংশটার যত জাঁকজমক আর দুর্ভাগ্য, আর মাকোন্দোর দীপ্তি, যা-কিনা অপসৃত ইদানীং, ওদিকে আলভেরো তার হো হো হাসি দিয়ে ভয় দেখিয়ে যেত কুমীরগুলোকে, আর আলফানসো আগের হপ্তায় দুর্ব্যবহার করা চার খদ্দেরের চোখ খুবলে তুলে নেয়া বকগুলোর আষাড়ে গপ্পো শুনিয়ে যেত, আর গাব্রিয়েল সেই গম্ভীরদর্শন মুলাটো মেয়েটার সঙ্গে বসে থাকতো ঘরে, মেয়েটা টাকা নিতো না, বরং চিঠি লিখিয়ে নিতো তার চোরাকারবারী ছেলেবন্ধুর কাছে যে-কিনা ওরিনাকোর ওপারে জেলের ভেতর দিন কাটাচ্ছে, কারণ সীমান্তরক্ষীরা তাকে ধরে একটা চেম্বারপটের ওপর বসিয়ে দেয়ার পর সেটা ভরে উঠেছিল মল আর হীরার একটা মিশ্রণে। মায়ের মতো এক মাসীর এই সত্যিকারের বেশ্যালয়টাই সেই জগৎ অরেলিয়ানো যেটার কথা তার দীর্ঘ বন্দিদশায় ভেবেছিল। এমন চমৎকার বোধ করে সে, নিখাদ শ্রেষ্ঠত্বের এতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি যে, যে-বিকেলে আমারান্তা উরসুলা তার বিভ্রান্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় সেই বিকেলে সে অন্য কোনো আশ্রয়ের কথা ভাবে না। কথার সাহায্যে নিজের ভার লাঘব করার জন্যে তৈরিই হয়ে ছিল সে, যাতে তার বুকটা বেঁধে রাখা গিঁঠগুলো খুলে ফেলতে পারে, কিন্তু শেষমেষ পিলার তারনেরার কোলের ওপর গরম আর ক্ষতিপূরণমূলক তরল পদার্থ নির্গত করাই সার হয়। পিলার তারনেরা কোনোরকম বাধা দেয় না তাকে, আঙুলের ডগা দিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় মাথার চুলে, অরেলিয়ানো যে প্রেমে পড়ে কাঁদছে সেটা সে মুখে না বললেও মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পুরানো এই ফোঁপানীটা চিনতে তার এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

সান্ত্বনার সুরে সে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাছা, এবার বলে ফেল দেখিনি, মেয়েটা কে।'

অরেলিয়ানো তা বলতেই একটা হাসিতে ফেটে পড়ে সে, পুরনো দিনের সেই ঠা ঠা হাসি, শেষ পর্যন্ত যা কিনা ঘুঘু পাখির ডাকে পরিণত হয়। কোনো বুয়েন্দিয়ার বুকের মধ্যে এমন কোনো গোপন কথা নেই যা তার অজানা, কারণ এক শতাব্দী বয়েসী তাস আর অভিজ্ঞতা তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে এই বংশের ইতিহাসটা নিশ্চিত পুনরাবৃত্তির একটা যন্ত্র, এমন একটা ঘূর্ণায়মান চাকা যেটার অক্ষদণ্ডের ক্রমবর্ধমান আর অনপনেয় ক্ষয় না হলে সেটা ঘুরতেই থাকতো অনন্তকাল ধরে।

হাসতে হাসতে সে তাকে বলে, 'কিচ্ছু ভাবিস না, এই মুহূর্তে ও যেখানেই থাক, তোর জন্যেই অপেক্ষা করে আছে ও।'

আমারান্তা উরসুলা যখন গোসল সেরে বেরিয়ে আসে তখন বিকেল সাড়ে চারটা। অরেলিয়ানো তার নিজের ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তাকে, গায়ে তার নরম নরম ভাঁজপড়া একটা আঙরাখা আর মাথায় পাগড়ির মতো করে পেঁচিয়ে রাখা একটা তোয়ালে। প্রায় পা টিপে টিপে, নেশার ঘোরে থাকায় হোঁচট খেতে খেতে তাকে অনুসরণ করে অরেলিয়ানো, আর আঙরাখাটা আমারান্তা উরসুলা খুলেছে কেবল ঠিক সেই মুহূর্তে বিয়ের ঘরটায় অরেলিয়ানো ঢুকে পড়তেই ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফের গায়ে জড়িয়ে নেয় আমারান্তা উরসুলা। অরেলিয়ানো নিঃশব্দে একটা ইঙ্গিত করে পাশের ঘরের দিকে, দরজাটা আধ-খোলা, সে জানে গাস্তঁ ও-ঘরে একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছে মাত্র।

আমারান্তা উরসুলা কোনো শব্দ না করে বলে ওঠে, 'বেরিয়ে যা।'

মৃদু হেসে, অরেলিয়ানো তাকে দুই হাতে তুলে ধরে বেগনিয়া ফুলের একটা পাত্রের মতো, তারপর চিৎ করে ফেলে দেয় বিছানার ওপর। আমারান্তা উরসুলা কোনো বাধা দেবার আগেই জান্তব এক টানে তার স্নানের পোশাকটা খুলে ফেলে সে, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সদ্যোস্নাত এক নগ্নমূর্তির গহ্বরের ওপর যে-নগ্নমূর্তির গায়ের রঙ, মিহি রোমের রেখা আর গোপন তিলগুলো অন্যসব ঘরের অন্ধকারের ভেতর বসে অনেক আগেই কল্পনা করা হয়ে গেছে। যে-কোনো বিচক্ষণ রমণীর সমস্ত চালাকি খাটিয়ে আন্তরিকভাবেই বাধা দেবার চেষ্টা করে আমারান্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উরসুলা, তার পিচ্ছিল, নমনীয় আর সুগন্ধি বেজির মতো শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে চেষ্টা করে হাঁটু দিয়ে অরেলিয়ানোর বৃক্ক বরাবর গুঁতো দিতে আর নখ দিয়ে মুখটা বৃশ্চিক-ছোবলে আঁচড়ে দিতে, কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে এপ্রিলের সাদামাটা সূর্যাস্ত দেখার সময় নেয়া শ্বাস বলে মনে হতে পারে এমন একটা হাঁপানিও বেরোয় না দু'জনের কারো মুখ থেকে। যুদ্ধটা ভয়ংকর, আমরণ, কিন্তু মনে হয় যেন তাতে হিংস্রতার লেশমাত্র নেই, কারণ যুদ্ধটা ধীর, সাবধানী, গম্ভীর, এলোপাথাড়ি সব আক্রমণ আর ভৌতিক গা-বাঁচানোর যুদ্ধ, কাজেই সে-সব চলাকালীন অপরাজিতা ফুল ফুটে উঠবার মতো, বা গাস্তঁর পক্ষে পাশের ঘরে বসে তার বৈমানিকের স্বপ্নগুলো ভুলে যাওয়ার মতো যথেষ্ট অবসর জোটে, ভাবখানা যেন ওরা দু'জন এক বৈরী জুটি, একটা অ্যাকুরিয়ামের তলায় নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার তাল করছে। সেই বুনো আর আনুষ্ঠানিক সংগ্রামের উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যে আমারান্তা উরসুলা বুঝতে পারে তার অতি সতর্ক নীরবতা এতোটাই অযৌক্তিক যে ধ্বস্তাধস্তির যে-শব্দটা তারা এড়াতে চাইছে তা একটু দূরে বসে থাকা তার স্বামীর আরো অনেক বেশি সন্দেহের কারণ হতে পারে। তখন সে হাসতে শুরু করে তার ঠোঁটজোড়া বন্ধ করে, যদিও রণে ভঙ্গ না দিয়ে, তবে কপট সব কামড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে আর ধীরে ধীরে নিজের শরীরটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দু'জনেই বুঝে যায় যে তারা একই সঙ্গে শত্রু-মিত্র দুই-ই, আর মারামারিটা পরিণত হয় গতানুগতিক হুটোপুটিতে, আক্রমণগুলো আলিঙ্গনে। হঠাৎ করে, প্রায় খেলাচ্ছলে, আরেক পশলা দুষ্টুমীর মতো করে, আমারান্তা উরসুলা তার প্রতিরোধে ক্ষান্ত দেয়, কিন্তু সে নিজেই যা ঘটিয়ে ফেলেছে তাতে ভয় পেয়ে গিয়ে ফের যখন লড়াইয়ে ফিরে আসতে চায় ততক্ষণে ঢের দেরি হয়ে গেছে। প্রবল একটা সংঘর্ষ তাকে নিশ্চল করে দেয় তার ভরকেন্দ্রে, তাকে রোপণ করে দেয় তার নিজের জায়গায়, আর তার প্রতিরোধের ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে যায় কমলা রঙা শীষ আর মৃত্যুর অপর পারের অদৃশ্য ভূ-গোলকগুলো ঠিক কেমন তা আবিষ্কার করার দুর্দমনীয় উৎকণ্ঠায়। যে-বেড়ালগর্জনটা এরিমধ্যে তার ভেতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে সেটার বেরিয়ে আসা ঠেকাতে হাত বাড়িয়ে একটা তোয়ালে জোগাড় করে নিজের মুখের ভেতর গুঁজে দেবার জন্যে কোনোমতে একটু সময় জোটে তার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমোদ-উৎসবের এক রাতে, পিলার তারনেরা তার নিজের স্বর্গের প্রবেশপথের ওপর নজর রাখার সময় বেতের দোলকেদারায় বসা অবস্থাতেই মারা যায়।

তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী, কফিনে পুরে নয় বরং তার দোলকেদারাতে বসা অবস্থাতেই কবর দেয়া হয় তাকে, নাচঘরের মেঝেতে খোঁড়া একটা বিশাল গর্তের ভেতর আটজন লোক দড়ি ধরে নামিয়ে দেয় সেটা। কালো পোশাক পরা, কাঁদতে কাঁদতে পাংশু হয়ে যাওয়া মুলাটো মেয়েরা তাদের কানের দুল, ব্রোচ আর আংটি খুলে গর্তটার ভেতর ফেলে দিয়ে একটা অলীক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করে বসে, কোনো নাম বা তারিখবিহীন একটা ফলক বসিয়ে বুঁজে দেয়া হয় গর্তটা, তারপর সেটা ঢাকা পড়ে যায় আমাজনীয় ক্যামেলিয়া ফুলের স্তূপের তলায়। জীব-জন্তুগুলোকে বিষ খাইয়ে মারার পর ইট আর চুন-সুরকি দিয়ে দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দেয় ওরা, তারপর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে তাদের কাঠের তোরঙ্গগুলো নিয়ে, সেগুলোর ভেতর সারি সারি করে রাখা আছে সন্তদের ছবি, নানান সাময়িক পত্র থেকে নেয়া ছবি, আর অনেক দূরের, উদ্ভট, প্রাক্তন সম্মিতদের ছবি, তাদের কারো মলের সঙ্গে হীরে বেরোয়, কারো বা খাদ্য তালিকায় থাকে মানুষখেকোরা, কারো কারো মাথায় আবার গহীন দরিয়ার মধ্যে পরিয়ে দেয়া হয় তাসের দেশের রাজার মুকুট।

ওটাই সব কিছুর শেষ। এক দীর্ঘস্থায়ী বসন্তের জন্যে আকুল বাসনার কাছে পরাজিত জ্ঞানী কাতালোনিয় তাঁর বইয়ের দোকানটা নিলামে বিক্রি করে দিয়ে নিজের জন্মস্থান সেই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এক গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর সামান্য যা কিছু বাকি থাকে তার সবকিছু, অতীতের সব ধ্বংসাবশেষ পচতে থাকবে পিলার তারনেরার কবরের ভেতর, প্রার্থনা সঙ্গীত আর শস্তা সব অলংকারের মাঝখানে। আগে থেকে কেউ টের পায়নি তাঁর সিদ্ধান্তের কথাটা। কলা কম্পানির যখন রমরমা অবস্থা সেই সময় অগুনতি সব যুদ্ধের একটা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি মাকোন্দোতে, আর তারপর ইনকিউনাবুলা (১৫০০ খৃস্টাব্দের পূর্বের গ্রন্থ —অনুবাদক) আর নানান ভাষার বইয়ের প্রথম সংস্করণের একটা দোকান দেবার চেয়ে বেশি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কোনো কিছু মাথায় আসেনি তাঁর, আর সেই দোকানে দাঁড়িয়ে পথের ওধারের বাড়িটাতে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনার পালা আসার ফাঁকে সাময়িক খদ্দেররা এমনভাবে সে-সব বইয়ের পাতা উল্টে যেতো যেন বটতলার বই সেগুলো। জীবনের আদ্ধেকটা সময় সেই দোকানের পেছনে বসেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, তাঁর অতি-সতর্ক হাতে বেগুনি-লাল কালিতে স্কুল নোটবই থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিঁড়ে নেয়া পাতায় হিজিবিজি লিখে, যদিও কেউ-ই ঠিক জানতো না তিনি কী লিখছেন। অরেলিয়ানোর সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম দেখা হয় তখন তাঁর কাছে ওরকম বহুবর্ণ পাতাভর্তি দু'দুটো বাক্স ছিল যা দেখে মেলকিয়াদেসের সেই পার্চমেন্টের কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক, আর তখন থেকে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তৃতীয় আরেকটা বাক্স ভর্তি করে ফেলেছিলেন তিনি, কাজেই এটা ধরে নেয়া খুবই সঙ্গত ছিল যে মাকোন্দো আসার পর থেকে লেখা ছাড়া কোনো কাজ করেননি তিনি। চার বন্ধুর সঙ্গেই কেবল সম্পর্ক ছিল তাঁর, ওদের কাছ থেকে তিনি লাটিম আর ঘুড়ি নিয়ে তার বদলে বই দিতেন, আর ওরা যখন সবেমাত্র গ্রামার স্কুলে পড়ছে তখনই ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেনেকা আর ওভিদ। এমনভাবে তিনি ক্লাসিকাল লেখকদের কথা বলতেন যেন বাড়ির লোকজনের মতো পরিচিত তাঁরা, যেন কোনো এক সময় তাঁরা সবাই তাঁর সঙ্গে একই ঘরে থেকেছে, তাছাড়া তিনি এমন সব কথা জানতেন যা তাঁর জানার কথা নয়, এই যেমন সন্ত অগাস্তিন তাঁর পোশাকের নিচে উলের একটা জ্যাকেটা পরতেন যেটা তিনি চোদ্দ বছরে একবারের জন্যেও খোলেননি, ওদিকে, একটা কাঁকড়া বিছে কামড়ে দেয়াতে ভিলানোভা-র জাদুকর আরনালদো নাকি ছোটবেলাতেই নপুংসক হয়ে গিয়েছিলেন। লিখিত শব্দের প্রতি তাঁর উৎসাহটা ছিল আসলে গুরুগম্ভীর সমীহ আর সূক্ষ্ম অশ্রদ্ধার একটা মিশেল। এমনকি তাঁর নিজের পাণ্ডুলিপিও সেই দ্বৈততার হাত থেকে রেহাই পায়নি। ওগুলো অনুবাদ করার জন্যে কাতালোনিয় ভাষা শিখে আলফনসো একবার এক তাড়া কাগজ পকেটে পুরে রেখেছিল, আর তার পকেট সবসময়েই খবরের কাগজের ক্লিপিং আর অদ্ভুত অদ্ভুতসব ব্যবসা-বাণিজ্যের ম্যানুয়ালে ভর্তি থাকতো, কিন্তু একরাতে সেগুলো সে হারিয়ে ফেলে সেই সব ছোট্ট মেয়ের বাড়িতে যারা পেটের দায়ে বিছানায় যেতো। জ্ঞানী কাতালোনিয় ব্যাপারটা জানতে পেরে কোথায় চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবেন তা না উল্টো হেসে গড়াগড়ি যেতে যেতে মন্তব্য করেছিলেন যে ওটাই সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিণতি। অন্যদিকে আবার তিনি সেই তিনটে বাক্স তাঁর নিজের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এমনই গোঁ ধরেন যে তাঁকে ফেরায় কার সাধ্যি, আর রেলের ইন্সপেক্টররা যখন বাক্স তিনটিকে মাল হিসেবে চালান দিতে চায় তখন তো তিনি তাদের উদ্দেশে এক পশলা কার্থেজিয় সকার-বকার বর্ষণ করে গেলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলোকে প্যাসেঞ্জার কোচে তাঁর নিজের কাছে রাখতে দেয়া হলো। তখন তিনি মন্তব্য করলেন, 'মানুষ যখন ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে আর সাহিত্য যায় মাল হিসেবে, তখনই বোঝা যায় দুনিয়ার বারোটা বাজতে আর কিছু বাকি নেই।' এরপর তাঁকে আর কোনো কিছু বলতে শোনেনি কেউ। যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে একটা হপ্তা একেবারে ডুব মেরে রইলেন তিনি, কারণ সময় যতোই এগিয়ে আসছিল তাঁর মেজাজ ততোই তিরিক্ষি হয়ে উঠছিল, আর ফারনান্দাকে যে-ভূতগুলো জ্বালিয়েছিলো ঠিক সেই ভূতগুলোর আক্রমণের শিকার হয়ে তাঁর জিনিসপত্রও এ-জায়গারটা ও-জায়গায় চলে যাওয়া শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ দিয়ে তাঁর খিস্তি বেরুতো, 'যত্তোসব! লন্ডন সম্মেলনের সাতাশ নম্বর অনুশাসনের ওপর হেগে দিই আমি।'

জার্মান আর অরেলিয়ানো তাঁর কাজকর্ম গুছিয়ে দেয়। রীতিমতো বাচ্চার মতো তাঁকে সাহায্য করে তারা, সেফটি পিন দিয়ে তাঁর পকেটের সঙ্গে গেঁথে দেয় তাঁর টিকিট আর ইমিগ্রেশনের কাগজপত্তর, একটা লম্বা লিস্টিতে লিখে দেয় মাকোন্দো ত্যাগ করার পর থেকে বার্সেলোনায় নামার আগ পর্যন্ত কী কী তাঁর না করলেই নয়, কিন্তু তারপরেও, তাঁর আদ্ধেক টাকা-পয়সা যে প্যান্টে রাখা ছিল সেটা একদিন বেখেয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দেন তিনি। যাত্রার আগের রাতে, বাক্সগুলোয় পেরেক মারা শেষ করে আর প্রথমবার মাকোন্দোতে আসার সময় যে-স্যুটকেসটা তিনি নিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেটার ভেতরই কাপড়চোপড় সব ভরে নিয়ে, যে-উদ্ধত ঔদার্য তিনি তাঁর নির্বাসনের দিনগুলোতে প্রদর্শন করেছেন সে-রকম এক ঔদার্য নিয়ে বইয়ের তাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর শান্ত চোখ দুটো কুঁচকে তিনি বলেন, 'এখানকার এই সমস্ত বিষ্ঠা আমি তোমাদের জন্যে রেখে যাচ্ছি!'

তিন মাস পর, ডাকে-আসা বড়সড় একটা খামে ঊনত্রিশটা চিঠি আর পঞ্চাশটা ছবি পায় ওরা, গভীর সমুদ্রের কর্মহীন সময়ে ওগুলো জমে উঠেছিল জ্ঞানী কাতালোনিয়র কাছে। চিঠিগুলোয় কোনো তারিখ দেয়া না থাকলেও কোনটার পর কোনটা লেখা হয়েছিল তা বুঝতে কোনো অসুবিধেই হয় না। গোড়ার দিককার চিঠিগুলোয় তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে বলে গেছেন সমুদ্রপাড়ির ঝক্কির কথা, সেই তিনটে বাক্স কেবিনে নিজের সঙ্গে রাখার ব্যাপারে আপত্তি করায় কার্গো অফিসারকে পানিতে ফেলে দেবার অদম্য ইচ্ছের কথা, কুসংস্কারের বশে নয় বরং 'তের' সংখ্যাটাকে অন্তহীন ভেবে সেটার ব্যাপারে এক মহিলার নির্জলা মূর্খতার কথা, আর প্রথম দিনের ডিনারের সময়েই জাহাজের খাবারের পানিতে লেরিডার ঝরনাগুলোর পাশে জন্মানো রাতে-তোলা বীটের স্বাদ শনাক্ত করে জেতা বাজিটার কথা। যতোই সময় গড়িয়ে গেছে ততোই অবশ্য জাহাজের বাস্তবতার গুরুত্ব কমে এসেছে তাঁর কাছে, আর এমনকি অতি সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলোও স্মৃতিকাতরতার যোগ্য হয়ে উঠেছে, কারণ জাহাজটা যতোই দূরে সরে গেছে তাঁর স্মৃতিও হয়ে উঠেছে ততোই বিষণ্ন। স্মৃতিকাতরতার সেই প্রক্রিয়াটা এমনকি ছবিগুলোর মধ্যেও স্পষ্ট। ফেনশীর্ষ তরঙ্গ ভরা অক্টোবরের ক্যারিবিয় সাগরে তোলা প্রথম দিককার ছবিগুলোতে হাসপাতালের জ্যাকেটের মতো দেখতে স্পোর্টস শার্ট আর তুষারশুভ্র কেশরসহ তার চেহারায় বেশ একটা সুখী সুখী ভাব ফুটে আছে শেষের ছবিগুলোতে তাকে দেখা যাচ্ছে একটা কালো কোট আর সিল্কের স্কার্ফ পরা অবস্থায়, মুখটা পাণ্ডুর, হেমন্তের সমুদ্রে স্বপ্নচরের মতো ভেসে চলা একটা শোকার্ত জাহাজের ডেকে পা না দেয়ার কারণে চেহারায় একটা মৌনীভাব। জার্মান আর অরেলিয়ানো তার সেই চিঠিগুলোর জবাব দেয়। প্রথম দিকটায় তিনি এতো চিঠি লেখেন যে মাকোন্দোতে যখন ছিলেন তখনো তাঁকে এতো কাছের বলে মনে হয়নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের কাছে, আর যে-বিদ্বেষ নিয়ে তিনি মাকোন্দো ছেড়েছিলেন তার প্রায় কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না সেগুলোতে। প্রথমে তিনি জানান, সব কিছুই প্রায় একই রকম আছে, যে-বাড়িতে জন্মেছিলেন সেটার গোলাপী শামুকগুলো এখনো আছে, সেঁকা এক টুকরো পাউরুটির সঙ্গে শুকনো হেরিং মাছের স্বাদ এখনো আগের মতোই আছে, গাঁয়ের ঝরনাটার পানি সন্ধ্যেবেলায় এখনো সেই আগের মতোই সুবাস ছড়ায়। বেগুনি-লাল হিজিবিজিভরা সেই নোটবইয়ের পাতাগুলোতেই লেখেন তিনি, আর তার প্রত্যেকটায় জুড়ে দেন একটা করে বিশেষ অনুচ্ছেদ। তারপরেও, আর যদিও তিনি নিজে বিষয়টা খেয়াল করেননি, পুনরুজ্জীবনমূলক আর উদ্দীপনাভরা সেই চিঠিগুলো ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে মোহভঙ্গের যাজকীয় চিঠিতে। এক শীতের রাতে, স্যুপটা যখন ফায়ার প্লেসে গরম হচ্ছে তখন হঠাৎ সেই বইয়ের দোকানটার পেছনের অংশের উত্তাপটার জন্যে, ধুলিধূসর অ্যালমন্ড গাছে রোদের গুনগুন শব্দের জন্যে, সিয়েস্তার তন্দ্রাচ্ছন্ন সময়ের ট্রেনের বাঁশির শব্দের জন্যে মনটা কেমন করে ওঠে তাঁর, ঠিক যেমন মাকোন্দো থাকাকালীন তাঁর মন কেমন করে উঠতো উনুনের শীতকালীন স্যুপ, কফি-বিক্রেতার ডাক আর বসন্তের দ্রুতগামী ভরত পাখিগুলোর জন্যে। দুটো আয়নার মতো মুখোমুখি দুই স্মৃতিকাতরতার কারণে মন খারাপ করে তিনি তাঁর অসাধারণ বাস্তববোধ খুইয়ে বসেন, আর শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেন যে ওদের সবাইকেই পরামর্শ দিতে শুরু করেন মাকোন্দো ছাড়ার জন্যে, এই জগৎ আর মানবিক হৃদয় সম্পর্কে ওদেরকে যা কিছু শিখিয়েছেন সব ভুলে যাওয়ার জন্যে, হোরেসের ওপর হেগে দেয়ার জন্যে, আর ওরা যেখানেই থাকুক না কেন একথা সবসময় মনে রাখার জন্যে যে অতীত একটা মিথ্যে ছাড়া কিছু নয়, স্মৃতির দিকে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, চলে যাওয়া বসন্ত দিন আর ফেরবার নয়, আর, সবচেয়ে উন্মত্ত সবচেয়ে একনিষ্ঠ প্রেমও শেষঅব্দি একটা ক্ষণস্থায়ী সত্য ছাড়া কিছু নয়।

আলভারোই প্রথম ব্যক্তি যে মাকোন্দো ত্যাগ করার উপদেশটা গ্রহণ করে। সবকিছু বিক্রি করে দেয় সে, তার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে যে বাধ্য জাগুয়ারটা পথচলতি লোকজনকে উত্যক্ত করতো, মায় সেটা অব্দি, তারপর, কখনোই যাত্রা ফুরোয় না এমন একটা ট্রেনের অন্তহীন একটা টিকেট কাটে। যাত্রাপথের স্টেশন থেকে পাঠানো পোস্টকার্ডে সে সোল্লাসে বর্ণনা করে যায় তার কোচ থেকে দেখা তাৎক্ষণিক ছবিগুলো; ব্যাপারটা যেন এরকম যে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বিস্মৃতির ভেতর ছুঁড়ে ফেলছে সে একটা দীর্ঘ আর বিলীয়মান কবিতা: লুসিয়ানার তুলোর ক্ষেতের দানবীয় সব নিগ্রো, কেন্টাকির সুনীল ঘাসের ভেতর ডানাঅলা ঘোড়া, অ্যারিজোনার নারকীয় সূর্যাস্তলগ্নে গ্রীস দেশের কপোত-কপোতীর দল, মিশিগানের একটা হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে জলছবি আঁকায় মগ্ন লাল সোয়েটার পরা একটি মেয়ে, যে তার উদ্দেশে তার তুলি নাড়ে, বিদায় জানাতে নয় বরং আশায় আশায়, কারণ তার জানা নেই যে, যে-ট্রেনটা সে চলে যেতে দেখছে সেটা কখনোই ফিরে আসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এরপর, সোমবারে ফিরে আসবে বলে এক শনিবার মাকোন্দো ছাড়ে আলফনসো আর জার্মান, কিন্তু তারপর আর তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। জ্ঞানী কাতালোনিয় চলে যাওয়ার এক বছর পর মাকোন্দোতে পড়ে থাকে কেবল গাব্রিয়েল, তখনো নিগ্রোমান্তার খেয়ালি দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে ভেসে চলেছে সে, আর একটা ফরাসী সাময়িক পত্রিকার এক প্রতিযোগিতার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে, যে-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্যারিস-ভ্রমণ। পত্রিকাটা রাখে অরেলিয়ানোই, আর সে তাকে উত্তরগুলো পূরণ করতেও সাহায্য করে, মাঝে মধ্যে তার বাড়িতে বসেই, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সিরামিকের বোতল আর মাকোন্দোতে টিকে থাকা একমাত্র ওষুধের দোকানের সর্বরোগহর পরিবেশের মধ্যেখানে, যেখানে থাকে গাব্রিয়েলের গোপন সখী মার্সিডিজ। যে-অতীতটার ধ্বংস ভেতরে ভেতরে নিজেকেই গ্রাস করে প্রতি মুহূর্তে শেষ হয়ে গিয়েও শেষটাকে আর শেষ করছিল না সেই অতীতেরই অবশিষ্টাংশ এটা। নিষ্ক্রিয়তার এমন চূড়ান্ত দশায় পৌঁছোয় শহরটা যে গাব্রিয়েল যখন প্রতিযোগিতাটায় জিতে দুই প্রস্থ কাপড়, এক জোড়া জুতো আর র‍্যাবলে-র রচনাসমগ্র নিয়ে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হয়, তখন এঞ্জিনিয়ারকে হাত নেড়ে ইশারা করতে হয় তার, ট্রেন থামিয়ে তাকে তুলে নেবার জন্যে। পুরনো সেই তুর্কিদের সড়কটা তখন একটা পরিত্যক্ত এলাকা, আরবদের মধ্যে তখনো যারা রয়ে গেছে তারা নিজেদেরকে যমের হাতে সঁপে দিয়ে তাদের প্রাচীন রীতি অনুয়ায়ী বাড়ির সদর দরজায় বসে আছে, যদিও বেচা-কেনা কাপড়ের শেষ গজটাও তারা বিক্রি করে দিয়েছে মেলা দিন আগে, আর ছায়াচ্ছন্ন শো-কেসে এখন রয়েছে কেবল মুণ্ডহীন ম্যানিকিনগুলো। আলবামার প্র্যাটভিল শহরে বসে প্যাট্রিসিয়া ব্রাউন তার নাতি-নাতনিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠে আর গুলফার কাসন্দি ভরা রাতে যে-শহরটাকে স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে পারতো, কলা কম্পানির সেই শহরটা এখন বুনো ঘাসের একটা সমতলভূমি। ফাদার অ্যাঞ্জেলের জায়গা নিয়েছেন যে বৃদ্ধ পাদ্রী, যাঁর নাম জানার কষ্টটুকুও কেউ স্বীকার করতে রাজি নয়, তিনি গেঁটে বাত আর সন্দেহের অনিদ্রায় অস্থির হয়ে ঈশ্বরের করুণালাভের অপেক্ষা করছেন একটা দোলখাটিয়ায় অলসভাবে গা এলিয়ে দিয়ে, ওদিকে গিরগিটি আর ইঁদুরগুলো কাছের গির্জাটার উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছে। যে-মাকোন্দোকে পাখিরাও ভুলে গেছে, যেখানে ধুলোবালি আর গরমের এমনই দৌরাত্ম্য যে শ্বাস নেয়া পর্যন্ত কঠিন, সেখানে, লাল পিঁপড়ের আওয়াজের কারণে দু'চোখের পাতা এক করা প্রায়-অসম্ভব এমন এক বাড়িতে, নিঃসঙ্গতা, ভালোবাসা আর ভালোবাসার নিঃসঙ্গতার কারণে বিচ্ছিন্ন আমারান্তা উরসুলা আর অরেলিয়ানো-ই শুধু দু'টি সুখী প্রাণী; শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীতে তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই।

গাস্তঁ ব্রাসেল্‌স ফিরে গেছে। বিমানটার জন্যে অপেক্ষা করে করে হদ্দ হয়ে একদিন সে তার অতি দরকারি জিনিসগুলো একটা ছোট্ট স্যুটকেসে পুরে, পত্রযোগাযোগের ফাইলটা নিয়ে মাকোন্দো ত্যাগ করেছিল, এই ইচ্ছে নিয়ে যে, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-বন্দোবস্তটা পেয়েছে সেটা আরো বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা প্রকল্প প্রাদেশিক সরকারের কাছে পেশ করা একদল জার্মান পাইলটের এক্তিয়ারে চলে যাওয়ার আগেই বিমানযোগে ফিরে আসবে। সেই বিকেলে তাদের প্রথম মিলনের পর থেকে অরেলিয়ানো আর আমারান্তা উরসুলা গাস্তঁর অসতর্কতার বিরল মুহূর্তগুলোর সুযোগ নিয়ে হঠাৎ সাক্ষাতে মুখে কাপড়-ঢোকানো কামনার তীব্র আবেগ নিয়ে ভালোবাসাবাসিতে মত্ত হতো আর প্রায় প্রতিবারই তাতে বাগড়া পড়তো অপ্রত্যাশিতভাবে সে ফিরে আসায়। কিন্তু নিজেদেরকে বাড়িতে একা পেয়ে নষ্ট হওয়া সময়টা পুষিয়ে নিতে বিকারগ্রস্তের মতো ব্যস্ত প্রণয়ী যুগলে পরিণত হয়ে পড়ে ওরা। উন্মত্ত, লাগামবিহীন এই কামাবেগ কবরের মধ্যে ফারনান্দার হাড়গোড় সব কাঁপিয়ে দিতো, আর ওদেরকে রাখতো এক সার্বক্ষনিক উত্তেজনার ভেতর। খাবার ঘরের টেবিলের ওপর দুপুর দুটোয় যেমন, ভাঁড়ার ঘরে রাত দুটোর সময়েও একইভাবে শোনা যাবে আমারান্তা উরসুলার শিৎকার, তার আর্ত সঙ্গীত। হাসতে হাসতে সে বলবে, 'যে-সময়টা আমরা এতোদিন নষ্ট করেছি সেটার কথা ভাবলেই সবচেয়ে আফসোস হয় আমার।' কামাবেগের সেই হতবিহ্বলতার ভেতরেই সে চেয়ে চেয়ে দেখে পিঁপড়েগুলো বাগানটা তছনছ করে ফেলছে, বাড়ির কড়িকাঠগুলো দিয়ে তারা মিটিয়ে নিচ্ছে তাদের প্রাগৈতিহাসিক খিদে, দেখে, বারান্দাটায় ফের দখলিস্বত্ব কায়েম করে ফেলেছে সজীব শুঁয়োপোকার প্রবল ধারাস্রোত, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ওগুলোকে তার শোবার ঘরে পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পোকাগুলোকে ঠেকানো নিয়ে মাথা ঘামায় না আমারান্তা উরসুলা। পার্চমেন্টের সঙ্গ ত্যাগ করে অরেলিয়ানো, আগের মতো ঘরবন্দি হয়ে পড়ে, জ্ঞানী কাতালোনিয়র চিঠির উত্তরও দেয় হেলাফেলা করে। বাস্তববুদ্ধি, সময়জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ, সব লোপ পায় ওদের। কাপড় খোলার সময় বাঁচাতে আবারো দরজা-জানলা বন্ধ করে দেয় ওরা, আর সুন্দরী রেমেদিওস যেমনটি চেয়েছিল ওরাও তেমনি বাড়িময় হেঁটে বেড়ায়, নগ্ন হয়ে গড়াগড়ি যায় উঠোনের ধূলিকাদার মধ্যে, আর এক বিকেলে তো সিস্টার্নের ভেতর সহবাস করতে গিয়ে ডুবেই মরতে বসে দু'জনে। অল্প ক'দিনের মধ্যেই লাল পিঁপড়েগুলোর চেয়ে ঢের বেশি ধ্বংসের কারণ হয় ওরা বাড়িটার; বৈঠকখানার আসবাবপত্র শেষ করে দেয়, যে-দোলখটিয়াটা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার বিষণ্ন, অস্থায়ী প্রণয়গুলোর ধকল সহ্য করেছে সেটা পর্যন্ত কুটি কুটি করে ফেলে ওরা ওদের পাগলামীর তাণ্ডবে, তোষকগুলোর নাড়িভূঁড়ি বের করে পুরোটা মেঝেতে ঢেলে তুলোর ঝড়ে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় করে। অরেলিয়ানো ঠিক তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মতোই এক হিংস্র প্রেমিক হলে কী হবে, ধ্বংসের সেই স্বর্গে আমারান্তা উরসুলাই শাসন চালিয়ে যায় তার উন্মত্ত প্রতিভা আর তার ভীষণ সাঙ্গীতিক খিদে নিয়ে, যেন তার দাদীর দাদী যে অজেয় শক্তি নিয়ে মিছরির ক্ষুদে ক্ষুদে জীব-জন্তু তৈরির কাজে নেমেছিল, ঠিক সেই শক্তি নিয়োজিত করেছে সে প্রণয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু তারপরেও সে যখন মনের সুখে গান গেয়ে উঠছে আর নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্য নতুন আবিষ্কারে নিজেই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে, অরেলিয়ানো তখন ক্রমেই আরো আত্মমগ্ন আর মৌন হয়ে উঠছে, কারণ তার কামাবেগটা আত্মকেন্দ্রিক আর তীব্র। তারপরেও দু'জনেই তারা সেই শিল্পে দক্ষতার এমনই চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যায় যে উত্তেজনা নিঃশেষিত হওয়ার পর তারা ব্যস্ত হয়ে পড়তো তাদের অবসন্নতাকে কাজে লাগাতে। মগ্ন হয়ে পড়তো নিজেদের দেহপুজো নিয়ে, আবিষ্কার করতো যে, প্রণয়ের অবসর মুহূর্তগুলোর ভেতর অনাবিষ্কৃত সব সম্ভাবনা রয়ে গেছে যা-কিনা কামনার সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। অরেলিয়ানো যখন আমারান্তা উরসুলার উন্নত স্তনে ডিমের সাদা অংশটা মাখাতে কিংবা কোকা-র মাখন দিয়ে তার নমনীয় কোমল উরুযুগল আর পিচফলের মতো পেট মসৃণ করার কাজে ব্যস্ত থাকতো, আমারান্তা উরসুলা সেই সময় খেলা করতো অরেলিয়ানোর দুর্দান্ত যন্ত্রটা নিয়ে, যেন ওটা একটা পুতুল, সেটার ওপর ভাঁড়ের মতো চোখ আঁকতো সে তার লিপস্টিক দিয়ে, তুর্কিদের মতো গোঁফ বসাতো সেটার ওপর তার ভুরু আঁকার পেন্সিল দিয়ে, পরিয়ে দিতো ওটাতে অরগ্যাঞ্জা বো টাই আর ছোট ছোট টিনের পাত দিয়ে তৈরি করা টুপি। একরাতে তারা নিজেদের মাথা থেকে পা অব্দি পিচফলের জ্যাম মাখিয়ে কুকুরের মতো এক অন্যকে চেটে চেটে বারান্দার মেঝের ওপর মিলনে লিপ্ত হয়, আর শেষে ওদেরকে প্রায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলার উপক্রম করা পিঁপড়াগুলোর ধারাস্রোত ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় ওদের।

সেই বিকারগ্রস্ততায় যখন বিরতি পড়তো, আমারান্তা উরসুলা বসতো গাস্তঁর চিঠির জবাব দিতে। তাকে তার এতো দূরের আর এতো ব্যস্ত বলে মনে হতো যে তার ফিরে আসার ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই ঠেকতো তার কাছে। গাস্তঁ তার গোড়ার দিককার একটা চিঠিতে লেখে যে তার পার্টনাররা আসলেই সেই বিমানটা পাঠিয়েছিল, কিন্তু ব্রাসেলস-এর এক শিপিং এজেন্ট ভুল করে সেটাকে তাঙ্গানিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে, সেখানে ওটা ডেলিভারে দেয়া হয়েছে মাকোন্দো নামের এক যাযাবর উপজাতির কাছে। সেই তালগোল পাকানো ব্যাপারটা এতো সমস্যার জন্ম দিয়েছে যে স্রেফ বিমানটা ফিরে পেতেই হয়তো দু'বছর লেগে যাবে। কাজেই হুট করে একটা অসময়ে তার ফিরে আসার সম্ভাবনাটা নাকচ করে দেয় আমারান্তা উরসুলা। অন্যদিকে, জ্ঞানী কাতালোনিয়র কাছ থেকে আসা চিঠিপত্তর আর নীরব ফার্মাসিস্ট মার্সিডিজের কাছ থেকে পাওয়া গাব্রিয়েলের খবর ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে অরেলিয়ানোর কোনো সংশ্রবই থাকে না। গোড়ার দিকে এই যোগাযোগটা বাস্তব যোগাযোগই থাকে। রূ দ্যফিন নামের এক রাস্তার এক গোমড়ামুখো হোটেল থেকে পরিচারিকারা যে-সব খবরের কাগজ আর খালি বোতল ফেলে দিতো সেগুলো বিক্রির পয়সা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে প্যারিসে থেকে যাবে বলে গাব্রিয়েল তার ফিরতি টিকেটটা জমা দিয়ে দিয়েছিল। তখনকার সেই গাব্রিয়েলকে অরেলিয়ানো সহজেই কল্পনা করে নিতে পারতো, পরনে তার কচ্ছপের মতো গলাঅলা একটা সোয়েটার, সেটা সে কেবল তখনই খোলে যখন মনপার্নাস জেলার ফুটপাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাফেগুলো বসন্তকালীন প্রেমিক-প্রেমিকায় ভরে ওঠে, দিনে সে পড়ে পড়ে ঘুমায় আর রাতে, বাঁধাকপির গন্ধঅলা যে-ঘরে রোকমাদুর ক'দিন পর মারা যাবে সেখানে ক্ষুধার অনুভূতিটা চাপা দেয়ার জন্যে অনবরত লিখে চলে। কিন্তু তারপরেও, তার সম্পর্কিত খবরাখবর ধীরে ধীরে এতোই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে আর জ্ঞানী মানুষটির চিঠিপত্তরও এমন অনিয়মিত আর বিষণ্ন হয়ে আসে যে আমারান্তা উরসুলা যেভাবে তার স্বামীর কথা ভাবতো, ঠিক তেমনি অরেলিয়ানোও ওদের কথা ভাবতে থাকে, আর দু'জনেই তারা এমন একটা শূন্য জগতে ভাসতে শুরু করে যেখানে একমাত্র দৈনন্দিন আর চিরকালীন বাস্তবতা হল প্রণয়।

হঠাৎ, আনন্দভরা অসচেতনতার সেই জগতে একটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো এসে পড়ে গাস্তঁর ফিরে আসার খবরটা। চোখ মেলে তাকায় অরেলিয়ানো আর আমারান্তা উরসুলা, গভীর গর্ত কাটে তাদের আত্মার ভেতর, যার যার বুকের ওপর হাতটা রেখে তাকায় সেই চিঠিটার দিকে, আর উপলব্ধি করে তারা একে অন্যের এতো কাছাকাছি চলে এসেছে যে বিচ্ছেদের বদলে মৃত্যুই বেশি কাঙ্ক্ষিত তাদের। আমারান্তা উরসুলা তখন তার স্বামীকে পরস্পরবিরোধী সত্য কথায় ভরা একটা চিঠি লেখে, সে যে তাকে ভালোবাসে সে-কথাটা আরো একবার জানায়, জানায় তাকে আবার দেখার জন্যে সে কতটা উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গেই সে নিয়তির একটা ষড়যন্ত্র হিসেবে অরেলিয়ানোকে ছাড়া বেঁচে থাকার অসম্ভবপরতার কথাটাও স্বীকার করে। ওরা যা আশা করেছিল তা তো ঘটেই না, উল্টো গাস্তঁ একটা শান্ত, প্রায় পিতৃসুলভ জবাব লিখে পাঠায়, তাতে দুটো পৃষ্ঠার পুরোটাই সে ব্যয় করেছে কামাবেগের ক্ষণস্থায়ীত্বের ব্যাপারে ওদের সতর্ক করে দিয়ে, আর সে তার সংক্ষিপ্ত বিবাহিত অভিজ্ঞতায় যতটুকু সুখী হয়েছিল ওরা যেন সে-রকমই সুখী হতে পারে সেই দ্ব্যর্থহীন কামনা জানিয়ে শেষে একটা অনুচ্ছেদ জুড়ে দিয়েছে। এটা এমনই এক অভাবনীয় আচরণ যে তার স্বামী তাকে তার নিয়তির হাতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার জন্যে যে-অজুহাতটা চাইছিল সেটাই তার হাতে তুলে দিয়েছে মনে করে আমারান্তা উরসুলা অপমানিত বোধ করে। মনের বিদ্বেষটা তার আরো বাড়ে, যখন ছয় মাস পর, শেষ অব্দি যেখানে বিমানটা ফের খুঁজে পেয়েছে গাঁস্ত, সেই লিপল্ডভিল থেকে লোকটা স্রেফ এই কারণে আবার চিঠি লেখে যে, মাকোন্দোয় তার রেখে যাওয়া জিনিসের মধ্যে যে-জিনিসটার যা-হোক কিছু আবেগজনিত মূল্য আছে তার কাছে সেই ভেলসিপীড-টা যেন জাহাজে করে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমারান্তা উরসুলার আক্রোশটা অরেলিয়ানো নির্বিবাদে সহ্য করে যায়, তাকে এটা দেখানোর চেষ্টায় যে, সুখের দিনে যেমন দুঃখের দিনেও তেমনি ভালো এক স্বামী হওয়ার ক্ষমতা আছে তার নিজের, আর গাস্তঁ-র শেষ পয়সাটাও যখন শেষ হয়ে যায় তখন দৈনন্দিন যে-প্রয়োজনটা তাদের ঘিরে ধরে তা তাদের মধ্যে সংহতির এমন একটা বন্ধন তৈরি করে যা-কিনা কামাবেগের মতো চোখ ধাঁধানো আর হঠকারী নয়, বরং তা তাদেরকে তাদের হৈচৈপূর্ণ আর কামুকতাভরা দিনগুলোর মতো করেই মিলনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিপ্ত করে আবার। পিলার তারনেরা যে-সময়টায় মারা যায় তখন ওরা একটা বাচ্চা আশা করছে।

আমারান্তা উরসুলা তার গর্ভাবস্থার আলস্যমাখা সময়ের ভেতরেও মাছের মেরুদণ্ডের হাড় দিয়ে গলার হার তৈরির একটা ব্যবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। মার্সিডিজ যদিও এক ডজন কিনে নেয়, কিন্তু সে ছাড়া আর কোনো খদ্দের জোগাড় করা সম্ভব হয় না তার পক্ষে। এই প্রথমবারের মতো অরেলিয়ানো উপলব্ধি করে ভাষার ব্যাপারে তার প্রতিভা, তার অসাধারণ, অগাধ জ্ঞান, দূর অতীতের নানান কীর্তিকাহিনী আর স্থানগুলো মনে রাখার তার বিরল গুণ, এ-সবই তার বৌয়ের খাঁটি গয়না ভরা বাক্সের মতোই মূল্যহীন, যদিও মাকোন্দোর সব বাসিন্দার টাকা-পয়সা জড়ো করলে যা হবে গয়নাগুলোর দাম তার সমান। অলৌকিক ভাবে বেঁচে থাকে ওরা। আমারান্তা উরসুলা তার রসবোধ বা যৌন উত্তেজক দুষ্টুমীর ব্যাপারে তার প্রতিভা না হারালেও, দুপুরের খাওয়ার পর বারান্দায় সজাগ আর চিন্তিত ধরনের সিয়েস্তা কাটানোর একটা অভ্যেস জন্মে তার। অরেলিয়ানো তাকে সঙ্গ দেয়। কখনো কখনো রাত নামার আগ পর্যন্ত ওখানেই চুপচাপ বসে থাকে দু'জন, মুখোমুখি, একে অন্যের চোখের ভেতর তাকিয়ে, তাদের সেই কেলেংকারিভরা দিনগুলোতে যেমন ঠিক সে-রকমভাবেই একে অন্যকে ভালোবেসে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ওদেরকে নিজেদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করে। নিজেদেরকে দেখতে পায় তারা মহাপ্লাবনের হারিয়ে যাওয়া স্বর্গে, জলকাদাভরা গর্তের মধ্যে দাপাদাপি করছে, উরসুলার গায়ে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে গিরগিটি মারছে, ভান করছে যেন তাকে জ্যান্ত কবর দেবে, আর সেই স্মৃতিগুলো ওদেরকে বলে দেয় যেদিন থেকে ওদের দু'জনের স্মৃতি তৈরি হয়েছে সেদিন থেকেই ওরা সুখী। অতীতের আরো গভীরে গিয়ে আমারান্তা উরসুলার মনে পড়ে যায় সেই বিকেলটার কথা যেদিন সে রুপোর দোকানটায় গিয়েছিল, আর তার মা তাকে বলেছিল ছোট্ট অরেলিয়ানো কারো সন্তান নয়, কারণ পানিতে ভাসমান একটা ঝুড়ির ভেতর পাওয়া গেছে তাকে। বৃত্তান্তটা ওদের দু'জনের কাছেই অসম্ভাব্য বলে ঠেকলেও, তাদের কাছে এমন কোনো তথ্য নেই যা দিয়ে ওটার জায়গায় সত্যটা প্রতিস্থাপিত করা যায়। সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পর যে-ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত হয় তা হল ফারনান্দা অরেলিয়ানোর মা নয়। আমারান্তা উরসুলার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে অরেলিয়ানো পেত্রা কোতেসের ছেলে, যার সম্পর্কে সে কেবল বদনামই শুনে এসেছে, আর সেই অনুমানটা তার মনের ভেতর আতংকের একটা মোচড় দেয়।

সে তার বৌয়ের ভাই এই নিশ্চিত বিশ্বাসে জ্বলে পুড়ে অরেলিয়ানো শেষ অব্দি নিজের জন্মরহস্যের সূত্রসন্ধানে ছাতা-পড়া, পোকায়-কাটা, পুরনো কাগজপত্তর ঘাঁটতে যাজক-বাড়িতে ছুটে যায়। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাদান সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরনো যে-কাগজপত্র সে পায় তা হল আমারন্তা বুয়েন্দিয়ার সার্টিফিকেটটা, ফাদার নিকানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেইনা যাকে বয়োসন্ধিকালে ঠিক সেই সময়টায় দীক্ষা দিয়েছিলেন যখন তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে চকোলেটের জারিজুরিটার আশ্রয় নিয়েছিলেন। অরেলিয়ানোর মনে হতে থাকে সেই সতেরো অরেলিয়ানোরই এক অরেলিয়ানো সে, যাদের জন্মের সনদপত্র সে ওই চার ভল্যুমের ভেতর খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু দীক্ষাদানের তারিখগুলো তার নিজের বয়েসের চেয়ে অনেক পুরনো। দোলখাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে এতোক্ষণ তার কার্যকলাপ দেখছিলেন বাতের ব্যথায় কাতর পাদ্রী, আত্মীয়তার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলে অনিশ্চয়তায় অরেলিয়ানো কাঁপছে দেখে এবার তিনি জিজ্ঞেস করেন তার নাম কী।

সে জবাব দেয়, 'অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।'

পাদ্রী তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার সুরে বলেন, 'তাহলে আর খুঁজে খুঁজে হয়রান হোয়ো না। বহু আগে এখানে একটা রাস্তা ছিল ওই নামে, আর তখন রাস্তার নামে ছেলেপুলেদের নাম রাখার একটা রেওয়াজ চালু ছিল লোকজনের মধ্যে।'

রাগে কাঁপতে থাকে অরেলিয়ানো।

সে বলে, 'ও! আপনিও তাহলে বিশ্বাস করেন না।'

'কী বিশ্বাস করি না?'

'কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ত্রিশটা গৃহ যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু তার সব ক'টাতেই তিনি হেরে গিয়েছিলেন,' অরেলিয়ানো জবাব দেয়। 'আর্মি তিন হাজার শ্রমিককে ঘেরাও করে মেশিনগানের গুলিতে মেরে ফেলেছিল, আর তারপর দু'শো গাড়ি লাগানো একটা ট্রেন বোঝাই করে লাশগুলো ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রে।'

করুণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান পাদ্রী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'বাবা আমার, তুমি আর আমি যে এই এখন বেঁচে আছি এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলেই আমার আর কিছু চাই না।'

কাজেই, সেই ঝুড়ির গল্পটাই মেনে নেয় আমারন্তা উরসুলা আর অরেলিয়ানো, বিশ্বাস হয়েছে বলে নয়, বরং ওটা তাদেরকে সেই আতংকটার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে বলে। গর্ভাবস্থাটা যতোই এগোতে থাকে ততোই ওরা দু'জনে একটি সত্ত্বায় পরিণত হতে থাকে, আর, যে-বাড়িটাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেবার জন্যে স্রেফ একটা অন্তিম ফুঁৎকার হলেই হয়, সেই বাড়ির নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ক্রমেই একাত্ম হয়ে পড়ে ওরা। যতটুকু না হলেই নয় ঠিক ততটুকু জায়গার মধ্যে নিজেদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ করে ফেলে তারা, বসে-বসে চালিয়ে যাওয়া প্রণয়ের সৌন্দর্য যেখানে দৃশ্যমান ফারনান্দার সেই শোবার ঘর থেকে বারান্দাটা যেখানে শুরু হয়েছে সেখান পর্যন্ত, আমারান্তা উরসুলা যেখানে বসে সদ্যোজাত শিশুটির জন্যে মোজা আর টুপি বোনে আর অরেলিয়ানো জ্ঞানী কাতালোনিয়র কাছ থেকে অবরে-সবরে আসা চিঠির জবাব দেয়। বাড়ির বাকি অংশটা ছেড়ে দেয়া হয় ধ্বংসের নাছোড় আগ্রাসনের হাতে। রুপোর কাজের দোকানটা, মেলকিয়াদেসের কামরা, সান্তা সোফিয়া দে লা পিয়েদাদের আদিম আর নীরব রাজ্য এমন একটা গার্হস্থ্য জঙ্গলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গহীনে ডুবে থাকে যার ভেতরে ঢোকার সাহস কারো হয়ে ওঠে না। প্রকৃতির গোগ্রাসবেষ্টিত অবস্থায় অরেলিয়ানো আর আমারান্তা উরসুলা অরিগ্যানো আর বেগনিয়া চাষ করে যেতে থাকে, সেই সঙ্গে কলিচুন দিয়ে সীমানা আঁকার মধ্যে দিয়ে মানুষ আর পিঁপড়ার মধ্যেকার প্রাচীন যুদ্ধের শেষ পরিখাগুলো খুঁড়ে রক্ষা করে নিজেদের জগৎটাকে। আমারান্তা উরসুলার যত্ন না-নেয়া চুল, মুখে দেখা দিতে থাকা কালো কালো ছোপ, তার পা ফুলে-ওঠা, তার আগের সেই মিলনপটিয়সী বেজির মতো শরীরের বিকৃতি, এসব, সে যখন দুর্ভাগা সব ক্যানারি পাখির খাঁচা আর বন্দি স্বামীকে নিয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল তখনকার সেই তারুণ্যেভরা আমারান্তা উরসুলার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটাতে পারলেও তার মনের প্রাণোচ্ছল ভাবটির ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। হাসতে হাসতে সে বলতো, 'যত্তসব! কে ভাবতে পেরেছিল যে আমরা শেষ অব্দি মানুষখেকোদের মতো হয়ে উঠবো!' শেষ যে-হুমকিটা জগৎসংসারের সঙ্গে ওদের একটা সংযোগ ঘটিয়ে দেয় সেটার সূত্রপাত ঘটে গর্ভাবস্থার ছ'মাসের সময়, নিশ্চিতভাবেই জ্ঞানী কাতালোনিয়র লেখা নয় এমন একটা চিঠি এসে। চিঠিটা ছাড়া হয়েছে বার্সেলোনা থেকে, কিন্তু খামের ওপর ঠিকানাটা মামুলি নীল কালিতে দাপ্তরিক হাতে লেখা, আর সেটার গোবেচারা নৈর্ব্যক্তিক চেহারাই বলে দেয় ওতে দুঃসংবাদ ছাড়া সুসংবাদ নেই। আমারান্তা উরসুলা চিঠিটা খুলতে যাবে ঠিক সেই সময় তার হাত থেকে ওটা কেড়ে নেয় অরেলিয়ানো।

বলে ওঠে, 'না, এই চিঠিটা খুলো না। ওটাতে কী লেখা তা আমি জানতে চাই না।'

ওর অনুমানই ঠিক, জ্ঞানী কাতালোনিয়র চিঠি নয় ওটা। ফারনান্দা একবার যেখানে তার বিয়ের আংটিটা রেখে ভুলে গিয়েছিল সেই তাকটার ওপর মথগুলোর করুণার ওপর ছেড়ে দেয়া হয় অজ্ঞাতনামা লোকটার না-পড়া চিঠিটা, নিজের ভেতরের দুঃসবাদের আগুনে ওটা নিজে নিজেই শেষ হয়ে যেতে থাকে, ওদিকে তখন নিঃসঙ্গ প্রেমিকযুগল পাল তুলে দিয়েছে শেষ পর্বের দিনগুলোর উজান স্রোতে, যদিও অনুতাপবিহীন আর কুলক্ষুণে সেই দিনগুলো বৃথাই চেষ্টা করে ওদেরকে মোহভঙ্গ আর বিস্মৃতির মরুভূমির দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। ভয়াবহ সেই বিপদটা টের পেয়ে অরেলিয়ানো আর আমারান্তা উরসুলা শেষ মাসগুলো কাটায় হাত ধরাধরি করে, অবৈধ মিলনের উন্মত্ততার ভেতর যার সৃষ্টি সেই শিশুটির প্রতি ভালোবাসায় বিশ্বস্ত থেকে। রাতের বেলা, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে থাকে ওরা, চাঁদের আলোয় পিঁপড়াকুলের মাটিভাঙার আওয়াজ, কিংবা মথপোকার গুঞ্জন, অথবা পাশের ঘরগুলোয় আগাছা গজানোর নিরন্তর, সুস্পষ্ট, বাঁশির মতো শব্দ তাদেরকে ভয় দেখাতে পারে না। বহুবার তাদের ঘুম ভেঙে যায় মৃতদের হাঁটাচলায়। শুনতে পায়, সৃষ্টির রীতিনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে উরসুলা বংশরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে চলেছে, আর হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া খুঁজে চলেছে মহৎ সব আবিষ্কারের পৌরাণিক সত্য, ফারনান্দা প্রার্থনা করে যাচ্ছে, আর কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া নিজেকে হতবুদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তুলছে যুদ্ধ আর ক্ষুদে ক্ষুদে সোনার মাছের ছলনায়, আর অরেলিয়ানো সেগান্দো তার লাম্পট্যর ডামাডোলের মধ্যেও নিঃসঙ্গতায় ডুবে মরছে, আর এই সময়টাতেই ওরা জানতে পারে যে কোনোকিছুতে প্রবলরকমের আচ্ছন্নতা মৃত্যুকেও বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টিকে থাকতে পারে, আর ওরা এই নিশ্চয়তা পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে যে দুর্দশার যে-স্বর্গটাকে পোকামাকড়েরা শেষ অব্দি মানুষের কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সেটা ভবিষ্যৎকালের প্রাণীরা অন্যান্য প্রজাতি পোকামাকড়দের কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অনেক দিন পরেও তারা দু'জনে যে যার স্বরূপ বজায় রেখেই ভূত হয়ে একে অন্যকে ভালোবেসে যেতে পারবে।

এক রোববার, বিকেল ছ'টার সময় প্রসব-বেদনা শুরু হয় আমারান্তা উরসুলার। পেটের দায়ে বিছানায় যাওয়া মেয়েগুলোর হাসিখুশি মাসীটি তাকে খাবার ঘরের টেবিলটার ওপর শোয়ায়, শরীরের দু'পাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে তার পেটের ওপর চড়ে বসে, তারপর আনাড়ীর মতো, যেন টগবগিয়ে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে সে, এমনিভাবে চাপ দিয়ে চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমারান্তা উরসুলার আর্তচিৎকার চাপা পড়ে যায় এক দুর্দান্ত ছেলে-শিশুর কান্নার শব্দে। চোখভরা অশ্রু নিয়ে আমারান্তা উরসুলা তাকিয়ে দেখে বাচ্চাটা হয়েছে দুর্দান্ত বুয়েন্দিয়াদের মতোই, হোসে আর্কাদিওদের মতো শক্তপোক্ত আর জেদী, অন্যদিকে চোখদুটো অরেলিয়ানোদের মতো বড় বড়, অতীন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন, আর, বংশটা একেবারে গোড়া থেকে পত্তন করে দিয়ে সেটার নানান ক্ষতিকর দোষত্রুটি আর নিঃসঙ্গচারী স্বভাব দূর করার জন্যে আগে থেকেই তৈরী, কারণ এক শতাব্দীর মধ্যে একমাত্র ওরই জন্ম হয়েছে ভালোবাসা থেকে।

'ও এক সত্যিকারের মানুষখেকো,' আমারান্তা উরসুলা বলে। 'আমরা ওকে রদ্রিগো বলে ডাকবো।'

'না,' তার স্বামী প্রতিবাদ করে বলে ওঠে। 'ওর নাম রাখবো আমরা অরেলিয়ানো, বত্রিশটা যুদ্ধ জয় করবে ও।'

অরেলিয়ানো আলোটা উঁচু করে ধরে, আর দাই বাচ্চাটার সারা শরীরে লেগে থাকা নীল আঠালো পদার্থটা মুছতে শুরু করে একটা কাপড় দিয়ে। ওকে যখন উপুড় করা হয় তখনই কেবল ওরা দেখতে পায় যে অন্য সব পুরুষ মানুষের চেয়ে বাড়তি একটা জিনিস আছে তার, সেটা ভালো করে দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়ে সবাই। জিনিসটা আর কিছু না, শুয়োরের লেজ।

ওরা অবশ্য তাতে বিচলিত হয় না। এ-বিষয়ে পরিবারের অতীত নজিরটার কথা অরেলিয়ানো আর আমারান্তা উরসুলার জানা নেই, উরসুলার ভয়ংকর হুঁশিয়রীর কথাও তাদের স্মরণ নেই, আর তাছাড়া দাই-ও তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে বাচ্চাটার দ্বিতীয় দাঁত গজালেই লেজটা কেটে ফেলতে কোনো অসুবিধে হবে না। এরপর আর ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তার অবকাশ পাওয়া যায় না, কারণ অঝোর ধারায় রক্ত ঝরে চলেছে তখন আমারান্তা উরসুলার শরীর থেকে। মাকড়সার জাল আর ছাইয়ের গোলা দিয়ে রক্তপাতটা থামানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেটা হয়ে দাঁড়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত দিয়ে ঝরনাধারা বন্ধ করার চেষ্টার মতো। প্রথম কয়েক ঘণ্টা আমারান্তা উরসুলা তার খোশ মেজাজ বজায় রাখার চেষ্টা করে। হাত বাড়িয়ে অরেলিয়ানোকে কাছে টেনে নিয়ে সে তাকে চিন্তা করতে মানা করে, কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে মরার জন্যে তার মতো মেয়েলোকের জন্ম হয়নি, আর দাইয়ের ভয়ংকর সব চিকিৎসাপদ্ধতি দেখে তো সে হেসেই খুন হয়ে যায়। কিন্তু অরেলিয়ানো ক্রমেই আশা ছেড়ে দেয়, আর আমারান্তা উরসুলা ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকে বিছানার সঙ্গে, যেন তার ওপর থেকে আলো সরে যাচ্ছে, আর তারপর সে তলিয়ে যায় একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে। সোমবার সকালে এক মহিলাকে নিয়ে আসে ওরা তার বিছানার পাশে, মানুষ আর পশুপাখি দুই জাতের জন্যেই অব্যর্থ, জ্বালাময় প্রার্থনাবাণী আওড়াতে থাকে সে, কিন্তু ভালোবাসাহীন কোনো কৌশলই আমারান্তা উরসুলার তীব্র আবেগসম্পন্ন রক্তকে থামাতে পারে না। বিকেলবেলা, চব্বিশ ঘণ্টার মরিয়া চেষ্টার পর কোনোরকম চিকিৎসা ছাড়াই যখন তার রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় আর তার মুখের পাশটা ফুটে উঠে সেখানকার কালো কালো ছোপগুলো প্রায়-স্বচ্ছ জিপসামের জ্যোতিশ্চক্র হয়ে মিলিয়ে গিয়ে ফের তার মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে, তখন ওদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে সে বেঁচে নেই।

বন্ধুদের যে অরেলিয়ানো কতটা ভালোবাসে, ওদের অভাব যে কতটা বাজে তার বুকে, সেই মুহূর্তে ওদের সঙ্গ পেতে সে যে কী না করতে পারে আগে সেকথা বুঝতে পারেনি সে। বাচ্চাটার মা বাচ্চাটার জন্যে যে-ঝুড়িটা তৈরি করেছিল সেটাতেই তাকে রাখে অরেলিয়ানো, মৃতদেহের মুখটা ঢেকে দেয় একটা কম্বল দিয়ে, তারপর, অতীতের দিকে যাওয়া যায় এমন একটা প্রবেশপথের খোঁজে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় শহরের ভেতর। অনেকদিন যেখানে তার যাতায়াত নেই, সেই ঔষধের দোকানের দরজায় গিয়ে টোকা মারে, দেখতে পায় সেটা একটা ছুতোরের দোকান হয়ে গেছে। হাতে বাতি নিয়ে যে-বৃদ্ধা মহিলা দরজাটা খুলে দেয় সে তার বিকারগ্রস্ত দশা দেখে তার জন্যে করুণা অনুভব করে ঠিকই, কিন্তু বলে যে কস্মিনকালেও এখানে কোনো ওষুধের দোকান ছিল না, আর মার্সিডিজ নামের পাতলা গলা আর ঢুলু ঢুলু চোখের কোনো মেয়েকে সে জীবনেও দেখেনি। জ্ঞানী কাতালোনিয়র সাবেক বইয়ের দোকানের দরজায় কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে শুরু করে অরেলিয়ানো, জানে ভালো করেই যে ভালোবোসার ঘোরটা যাতে কেটে না যায় সেজন্যে যে-কান্নাটা সে সময়মতো কাঁদেনি তারই দাম চুকাচ্ছে সে এখন তার এই বিলম্বিত ফোঁপানি দিয়ে। 'স্বর্ণ শিশু'-র সিমেন্টের দেয়ালে ঘুষি মারতে থাকে সে পিলার তারনেরার নাম ডেকে ডেকে; উজ্জ্বল কমলারঙের যে-চাকতিগুলো আকাশ পাড়ি দিচ্ছে, আর বহুবার ছুটির দিনে রাত্রিবেলায় শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে কাদাচোখা পাখি ঘুরে বেড়ানো আঙিনা থেকে যেগুলোর কথা সে ভেবেছে, সেই চাকতিগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না। মুখ থুবড়ে পড়া নিষিদ্ধপাড়াটার শেষ খোলা সালোতে এক দল অ্যাকোর্ডিয়ানবাদক বাজিয়ে চলেছে রাফায়েল এসকালোনার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান, লোকটা বিশপের ভাস্তে, আর মরদ ফ্রান্সিসকোর গোপন বিদ্যের উত্তরাধিকারী। পরিচারক লোকটা, নিজের মায়ের ওপর হাত তুলেছিল বলে যার একটা হাত শুকিয়ে খানিকটা কুঁচকে গিয়েছে, সে অরেলিয়ানোকে আমন্ত্রণ জানায় আখের রস দিয়ে তৈরি এক বোতল মদ পান করার জন্যে, আর এরপর অরেলিয়ানোও তাকে এক বোতল কিনে দেয়। পরিচারক তাকে তার হাতের দুর্ভাগ্যের কথাটা জানায়। অরেলিয়ানো তাকে বলে তার মনটার দুর্ভাগ্যের কথা, যে-মনটা তার শুকিয়ে খানিকটা কুঁচকে গেছে তার বোনের বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহার করা জন্যে। শেষ অব্দি দু'জনে মিলে কাঁদতে বসে যায়, তখন মুহূর্তের জন্যে অরেলিয়ানোর মনে হয় ব্যথাটা বুঝি চলে গেছে। কিন্তু মাকোন্দোর শেষ ভোরে সে যখন ফের একা হয়ে পড়ে, স্কোয়ারের মধ্যেখানে এসে গোটা দুনিয়াটাকে জাগিয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে সে তার দুই বাহু ছড়িয়ে দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

'বন্ধু-বান্ধব এক দঙ্গল বেজন্মা ছাড়া কিছু নয়।'

বমি আর চোখের পানির একটা পুকুরের ভেতর থেকে নিগ্রোমান্তা তাকে উদ্ধার করে। নিজের ঘরে নিয়ে যায় সে তাকে, মুছেটুছে শরীর পরিষ্কার করে দেয়, তারপর বানিয়ে দেয় এক কাপ ক্বাথ। ব্যাপারটা তাকে খানিকটা স্বস্তি দেবে মনে করে একটা চারকোল নিয়ে এসে অগুনতি যে-সব মিলনের পয়সা তখনো সে অরেলিয়ানোর কাছে পেতো সেগুলো মুছে দেয়, আর তারপর আপনা থেকেই তার মনের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ দুঃখের কথা বলে যেতে থাকে যাতে করে কাঁদার সময় সে একা বোধ না করে। একটা ভোঁতা আর ছোটখাটো ঘুম দিয়ে উঠে অরেলিয়ানো তার মাথাব্যথাটার ব্যাপারে সচেতন হয় ফের। চোখ মেলে তাকায় সে, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে যায় তার।

ঝুড়িটা খুঁজে পায় না সে। বাচ্চাটার দেখাশোনার ভার নিতে আমারান্তা মরণ থেকে জেগে উঠেছে ভেবে খুশির একটা বাঁধভাঙা জোয়ারে আপ্লুত হয়ে যায় তার মন। কিন্তু কম্বলের নিচে মৃতদেহটা তখন রীতিমত পাথরের স্তূপ একটা। বাড়িতে ফিরে শোবার ঘরের দরজাটা সে খোলা পেয়েছিল এ-কথাটা মনে হতেই অরিগ্যানো ফুলের প্রভাতী দীর্ঘশ্বাসে একেবারে ভর্তি হয়ে থাকা বারান্দার ওপাশে চলে আসে অরেলিয়ানো, উঁকি মারে খাবার ঘরে, তখনো সেখানে প্রসব সময়ের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে: বড়সড় পটটা, রক্তমাখা চাদর, ছাইয়ের জার, কাঁচি আর মাছ ধরার সরঞ্জামের পাশের টেবিলের ওপর একটা খোলা ডায়াপারে বাচ্চার পেঁচানো নাড়িটা। রাতের বেলা দাই বাচ্চাটার কাছে ফিরে এসেছে ভেবে চিন্তা করার জন্যে একটু থামে সে। দোলকেদারায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়—এই দোলকেদারাতে বসেই এই পরিবারটির প্রথম যুগে এমব্রয়ডারি শেখাতো রেবেকা, কর্নেল জেরিনাল্‌দো মার্কেসের সঙ্গে চেকার খেলতো আমারান্তা, আর এটাতে বসেই বাচ্চাটার জন্যে ছোট ছোট কাপড়চোপড় তৈরি করেছিল আমারান্তা উরসুলা—আর তখন সুস্থাবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই চকিত মুহূর্তটিতে অরেলিয়ানো টের পায় যে, নিজের আত্মার ভেতর এতোখানি অতীতের দমবন্ধকরা ভার সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের আর বাকি সবার স্মৃতিকাতরতার মারাত্মক বর্শাঘাতে আহত হয়ে উপভোগ করতে থাকে সে মরা গোলাপ ঝাড়গুলোর গায়ে মাকড়সার জালের নাছোড়দশা, রাই ঘাসের অধ্যবসায়, ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল ভোরে বাতাসের ধৈর্য। আর তখনই সে দেখতে পায় বাচ্চাটিকে। বাচ্চা মানে চামড়ার একটা ফোলানো শুকনো থলে, জগতের সমস্ত পিঁপড়া সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাগানের শান বাঁধানো পথ ধরে তাদের গর্তের দিকে। অরেলিয়ানো স্থির হয়ে যায়। কারণটা এই নয় যে আতংকে তার শরীর অবশ হয়ে পড়ে, বরং এই কারণে যে ঠিক সেই অবাক-করা মুহূর্তেই মেলকিয়াদেসের রহস্যের চূড়ান্ত সমাধানটা পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে, আর মানুষের স্থান-কালের ক্রমানুসারে পার্চমেন্টের লিপিগুলোকে একেবারে খাপে খাপে মিলে যেতে দেখে সে: *বংশের প্রথমজন বাঁধা আছে একটা গাছের সঙ্গে আর শেষজন যাচ্ছে পিঁপড়ের পেটে।*

এর আগে কখনো এমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করেনি অরেলিয়ানো, মৃত আত্মীয় স্বজনদের কথা, নিজের মাথাব্যথার কথা ভুলে গিয়ে সে ফারনান্দার কাঠের তক্তা দিয়ে দরজা-জানলা পেরেক ঠুকে আটকে দেয়, যাতে পৃথিবীর কোনো প্রলোভন তার কাজে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, কারণ ততক্ষণে তার বুঝতে বাকি নেই যে মেলকিয়াদেসের পার্চমেন্টেই লেখা আছে তার ভবিতব্যের কথা। পৃথিবীর বুকে মনুষ্য বসবাসের সমস্ত নিদর্শন ঘরটা থেকে মুছে ফেলা প্রাগৈতিহাসিক গাছপালা, বাষ্পওঠা ছোট ছোট ডোবা আর জ্বলজ্বলে পোকামাকড়ের ভেতর অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় ওগুলোকে, কিন্তু সেগুলোকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসার মতো সুস্থ মানসিক অবস্থা তখন তার নেই, বরং সে ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে, কোনোরকম অসুবিধা ছাড়াই, যেন ওগুলো হিস্পানি ভাষাতেই লেখা আর সেগুলো পড়া হচ্ছে মধ্য দুপুরের চোখধাঁধানো আলোর দীপ্তির মধ্যে, এমনিভাবে জোরে জোরে পাঠোদ্ধার করতে শুরু করে। একেবারে খুঁটিনাটি বর্ণনাসমেত এই বংশেরই ইতিহাস সেটা, মেলকিয়াদেসের লেখা, একশো বছর আগেই। তার মাতৃভাষা সংস্কৃততে লিখেছে সে, জোড় লাইনগুলো সম্রাট অগাস্টাসের ব্যক্তিগত গুপ্ত সংকেতে, আর বেজোড় লাইনগুলোতে লাসিদিমোনিয় সামরিক সংকেতলিপিতে। আর, শেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে মেলকিয়াদেস ঘটনাগুলোকে মানুষের গতানুগতিক সময় অনুসারে সাজায়নি, বরং একসঙ্গে জড়ো করেছে একশো বছরের দৈনন্দিন ঘটনাবলী, এমনভাবে যেন মনে হয় সেগুলো সব একই সময়ের ব্যাপার। অরেলিয়ানো ব্যাপারটা তখনই খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিল যখন আমারান্তা উরসুলার ভালোবাসায় নিজেকে সে অন্ধ হতে দিয়েছিল। আবিষ্কারের উত্তেজনায় অরেলিয়ানো এমনকি সেই চিঠিটাও বাদ না দিয়ে পড়ে যায় যেটা মেলকিয়াদেস নিজে আর্কাদিওকে শুনতে বাধ্য করেছিল, আসলে যেটা ছিল তার মৃত্যুদণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রমণীর ভবিষ্যদ্বাণীটাও সে পেয়ে যায় যে-রমণী সশরীর সআত্মা স্বর্গে উঠে যাচ্ছিল, পেয়ে যায় বাবার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে আসা দুই যমজ শিশুর জন্মপরিচয়, যারা পার্চমেন্টের পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে মাঝপথেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল, স্রেফ এই কারণে নয় যে কাজটা করার মতো যোগ্যতা আর উদ্যম তাদের ছিল না, বরং এই কারণেও যে তাদের চেষ্টা ছিল অসময়োচিত। এইখানটায় এসে, নিজের জন্মপরিচয় জানার জন্যে অধীর হয়ে খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে যায় অরেলিয়ানো। আর তখনই শুরু হয় বাতাসটা, উষ্ণ, সদ্য-সৃষ্ট, অতীতের কণ্ঠস্বর আর প্রাচীন জেরানিয়াম ফুলের গুনগুন আর চরম একগুঁয়ে স্মৃতিকাতরতারও আগের মোহভঙ্গের দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ বাতাসটা। কিন্তু ব্যাপারটা সে খেয়াল করে না, তার কারণ সেই মুহূর্তে সে তার নিজের সত্তার সম্ভাবনা আবিষ্কার করছে এক কামুক প্রপিতামহের মধ্যে যে-প্রপিতামহ নিজেকে হঠকারীভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক মায়াসৃষ্টিকারী মালভূমির ওপর দিয়ে এক সুন্দরী রমণীর খোঁজে যাকে সে সুখী করতে পারবে না। লোকটিকে চিনে ফেলে অরেলিয়ানো, অনুসরণ করে চলে উত্তর প্রজন্মের লুকোনো পথ, তারপর আবিষ্কার করে ফেলে তার নিজের অস্তিত্বের প্রথম মুহূর্তটি, অসংখ্য কাঁকড়াবিছে আর হলুদ প্রজাপতির মধ্যে সূর্যাস্তের সময় এক গোসলখানায়, যেখানে এক মেকানিক তার লালসা চরিতার্থ করছিল এমন এক রমণীর ওপর নিজেকে যে নিঃশেষ করে ফেলছিল বিদ্রোহ করে করে। এমনই মগ্ন হয়ে থাকে সে যে বাতাসের দ্বিতীয় ঝাপটাটা যখন ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি নিয়ে এসে দরজা-জানলাগুলোকে কব্জা থেকে আলগা করে ফেলে, বাড়ির পুব অংশের ছাদটাকে খুলে নিয়ে যায়, আর এমনকি ভিত্তিটা পর্যন্ত তুলে ফেলে, তখনো কিছু টের পায় না সে। আর তখনই কেবল সে আবিষ্কার করে যে আমারান্তা উরসুলা তার বোন নয়, খালা, আর স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক স্রেফ এই কারণে রিয়োহাচায় হামলা চালিয়েছিল যাতে তারা নিজেদেরকে রক্তসম্পর্কের যারপরনাই জটিল একটা গোলকধাঁধার ভেতর খুঁজে ফিরতে পারে যতদিন পর্যন্ত না তারা সেই পৌরাণিক জন্তুটির জন্ম দেয় যে সেই বংশের ইতি টেনে দেবে। যে-সমস্ত ঘটনার কথা তার ভালো করেই জানা আছে সে-সব ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট না করে অরেলিয়ানো যখন এগারোটা পাতা বাদ দিয়ে এগিয়ে যায়, মাকোন্দো ততক্ষণে সেই বাইবেলিয় যুগের হারিকেনের রুদ্ররোষের কবলে পড়ে ঘুরপাক খাওয়া ধুলোবালি আর ধ্বংসস্তূপের একটা ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তারপরেও, যে-মুহূর্তটা সে যাপন করছে সেই মুহূর্তটাই পাঠোদ্ধার করে চলে সে, যে-সময়টা যাপন করে ফেলেছে সেটারও পাঠোদ্ধার করে, আর যেন সে একটা যাদুর আয়নার ভেতর তাকিয়ে আছে এমনিভাবে পার্চমেন্টের শেষ পাতাগুলোর পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে নিজেকে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে। এরপর সে আবার কিছু পাতা বাদ দিয়ে যায় নিজের মৃত্যুর তারিখ আর অবস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটার আগাম খবরটা জেনে সেটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। শেষ বাক্যটাতে পৌঁছোনোর আগেই অবশ্য সে বুঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় যে এই জন্মে তার পক্ষে আর ঘরটা ছেড়ে বেরুনো সম্ভব হবে না, কারণ এটা আগেই জানা হয়ে গেছে যে অরেলিয়ানো ব্যাবিলনিয়া যে-মুহূর্তে পার্চমেন্টের অর্থোদ্ধার শেষ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে আয়নার (বা মরীচিকার) শহরটাকে বাতাস নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মানুষের স্মৃতি থেকে নির্বাসিত করে দেবে, আর ওটাতে যা কিছু লেখা আছে তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, অনাদিকাল থেকে ভাবী কোনো কালে, তার কারণ, নিঃসঙ্গতার একশ বছরের সাজা পাওয়া জাতিগুলো পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ পায়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোফি-র জগৎ

মূল: ইয়স্তেন গার্দার

অনুবাদ: জি এইচ হাবীব

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নিয়ে একটি চমকপ্রদ, অভাবনীয় উপন্যাস!

সোফি অ্যামুন্ডসেন। চোদ্দ বছর বয়েসী এই নরওয়েজিয় বালিকা একদিন তাদের বাসার ডাকবাক্সে উঁকি মেরে দেখতে পায় সেখানে কে যেন অবাক-করা দু'টুকরো কাগজ ফেলে রেখে গেছে। কাগজ দুটোয় স্রেফ দুটো প্রশ্ন লেখা: "তুমি কে?" আর "এই পৃথিবীটা কোথা থেকে এল?"

অ্যালবার্টো নক্স নামের এক রহস্যময় দার্শনিকের লেখা সেই রহস্যময় চিরকুট দুটোর সেই কৌতূহল উস্কে দেয়া প্রশ্ন দুখানিই সূত্রপাত ঘটিয়ে দিল প্রাক-সক্রেটিস যুগ থেকে সার্ত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের রাজ্যে এক অসাধারণ অভিযাত্রার। পরপর বেশ কিছু অসাধারণ চিঠিতে আর তারপর সশরীরে, পোষা কুকুর হার্মেসকে সঙ্গে নিয়ে, অ্যালবার্টো নক্স সোফি-র কৌতূহলী মনের সামনে দিনের পর দিন একের পর এক তুলে ধরলেন সেই সব মৌলিক প্রশ্ন সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছেন বিভিন্ন দার্শনিক আর চিন্তাশীল মানুষ।

কিন্তু সোফি যখন এই চোখ ধাঁধানো আর উত্তেজনায় ভরা আশ্চর্য জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে আর অ্যালবার্টো নক্স এমন এক ষড়যন্ত্রের জালে নিজেদেরকে বাঁধা পড়তে দেখল যে খোদ সেটাকেই এক যারপরনাই হতবুদ্ধিকর দর্শনগত ধাঁধা ছাড়া অন্য কিছু বলা সাজে না।

অসাধারণ... তিন হাজার বছররের চিন্তার ইতিহাসকে ইয়স্তেন গার্দার চারশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত জটিল সব বিতর্কিত বিষয়কে, অথচ সেগুলোর গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়নি এতটুকু।... সোফির জগৎ এক অসাধারণ কীর্তি।

—সানডে টাইম্‌স

আপনার নিকটস্থ বইদোকানে খোঁজ করুন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমরখন্দ ▷ আমিন মাআলুফ

টাইটানিকের সঙ্গে আটলান্টিকের গভীর তলদেশে ডুবে গিয়েছিল একটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল– যেদিন টাইটানিক ডুবেছিল মার্কিন উপকূলের কাছাকাছি আটলান্টিকে। হ্যাঁ টাইটানিকের মধ্যেই ছিল ওটি। পাণ্ডুলিপিটি ছিল ওমর খইয়ামের লেখা রুবাইয়াতের। কি করে পারস্যের এই গৌরব উঠেছিল টাইটানিকে? তারই ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস। শুধু তাই নয়, কি ভাবে প্রবল বৈরি পরিবেশে একাদশ শতকে ওমর খইয়াম লিখেছিলেন তাঁর রুবাইগুলি! ইরানের ইস্পাহানের অধিবাসি ছিলেন ওমর খইয়াম কিন্তু গিয়েছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে। এক কাজী তাঁকে রক্ষা করেছিলেন কারণ তখন ঐ অঞ্চলের কোন রাজ্যেই কবি, দার্শনিক, গবেষক, চিন্তাবিদ কারুরই কোন মূল্য ছিল না, অধিকার ছিল না জ্ঞান চর্চার। আর ওমর খইয়াম তো ছিলেন কবি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খইয়াম রচনার আগে-পরে অনেক ঘটনাই ঘটেছিল সমরখন্দে– ওমর খইয়ামকে নিয়ে, তাঁর রুবাইগুলো নিয়ে। ১০৭২ সালে ওমর খইয়াম পৌঁছেছিলেন সমরখন্দে– ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল তখনই। তারপর বিংশ শতকের প্রথম দশকে এক আমেরিকান বুদ্ধিজীবীর নজরে আসে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খইয়ামের মূল পাণ্ডুলিপিটি। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে ওটি তাঁর হস্তগত হয়। নাম তাঁর বেঞ্জামিন লেসাজে। লেসাজে পাণ্ডুলিপিটি নিয়েই উঠেছিলেন টাইটানিকে। টাইটানিক ডোবার পর লেসাজে বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খইয়ামের পাণ্ডুলিপিটি বাঁচেনি।

AMARBOI.COM

লেবানিজ সাংবাদিক-সাহিত্যিক আমিন মাআলুফ তাঁর এই সমরখন্দ উপন্যাসে ওমর খইয়ামের সমরখন্দ আগমন থেকে নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ রচনা এবং সেটির ডুবে যাওয়ার ইতিহাসকে গ্রন্থিত করেছেন পরম দক্ষতায়। কল্পকাহিনীর আদলে লেখা এই ইতিহাস বিশ্ব সংস্কৃতির এক অপঠিত অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। এতে আছে সৃজনশীলতা, প্রেম-বিরহ, বিদ্রোহ-ধ্বংস, ব্যর্থতার এক রোমাঞ্চকর চিত্র।

আমিন মাআলুফ ফরাসি ভাষায় লিখেছিলেন উপন্যাসটি, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। বৃটেনে এটির ইংরেজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে।

সমরখন্দ উপন্যাসটি তিনটি পুরস্কার পেয়েছে এপর্যন্ত। প্রথম, প্রিক্স দ্য মাঁইসো দি লা প্রেস, দ্বিতিয়টি, দ্য রক অব তানিয়াস এবং ১৯৯৩ সালে এটি ভূষিত হয় অত্যন্ত সম্মানজনক সাহিত্য পুরস্কার প্রিক্স গনকোর্ট-এ।

খুব শীঘ্র এই **সমরখন্দ**-এরই বাংলা অনুবাদ আসছে বাঙালী পাঠকদের জন্য

অনুবাদ করছেন **আবীর হাসান**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~